প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা

সংকলনে

ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন

ড. নাসরিন সুলতানা

ড. কামরুন নাহার মনিরা

মোছাঃ ফারহানা আফরোজ

ডা. মোঃ জাকির হাসান

মোঃ জাহিদুল ইসলাম

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা-১৩৪১

প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা

(পরিমার্জিত সংস্করণ)

বিএলআরআই-এর প্রকাশনা নং : ১৬৬(৪)

৪র্থ সংস্করণ (পরিমার্জিত) : ১০০০ (এক হাজার) কপি

প্রকাশকাল : জুন, ২০২৩

সম্পাদনায়

ড. শাকিলা ফারুক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই
ড. মোঃ জিল্লুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই
ড. বিপ্লব কুমার রায়, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই
ড. গৌতম কুমার দেব, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই
ড. কামরুন নাহার মনিরা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই
ড. ছাদেক আহমেদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই
ড. মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই
মোছাঃ ফারহানা আফরোজ, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই
ডা. মোঃ জাকির হাসান, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই
মোঃ জাহিদুল ইসলাম, প্রকাশনা কর্মকর্তা, বিএলআরআই

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা-১৩৪১
ফোন : +৮৮-০২-২২৪৪৯১৬৭০-৭২
ফ্যাক্স : +৮৮-০২-২২৪৪৯১৬৭৫
ই-মেইল : dg@blri.gov.bd
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অর্থায়নে : ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প, বিএলআরআই।

শুভেচ্ছা মূল্য : ৩০০ (তিনশত) টাকা।

Livestock and Poultry Production Technology Manual

(4th Revised Edition)

Published by : Bangladesh Livestock Research Institute, Savar, Dhaka-1341.

Publication Year : June 2023

Citation : Livestock and Poultry Production Technology Manual (4th Revised Edition), BLRI, Savar, Dhaka, Page no. 1 - 364, Volume: 4, Year - June 2023.

মহাপরিচালকের বাণী

মেধাবী জাতি গঠনে ক্রমবর্ধমান জনশক্তির আমিষের চাহিদা পূরণে প্রাণিজ আমিষের অবদান অনস্বীকার্য। প্রাণিসম্পদ খাতে প্রচলিত সমস্যা নিরসনে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে মাঠ পর্যায় ও সংশ্লিষ্ট স্টোক হোল্ডারদের মাঝে হস্তান্তর করে প্রাণিসম্পদের বিকাশের জন্য সৃষ্টিলগ্ন থেকে বিএলআরআই তার সীমিত জনবল নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাণিসম্পদ খাতে প্রথম ও বহুল জনপ্রিয় প্রযুক্তি হলো গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ, পিপিআর ভ্যাকসিন, উন্নত জাতের HYV ফডার প্রযুক্তিসহ মোট ৯৩টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিএআরসিসহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর ও মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তির গুণগতমান ঠিক রাখার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা নিরলসভাবে কাজ করছে।

১৯৮৪ সালে প্রেসিডেন্সি অর্ডিন্যান্স-এর আদেশ বলে বিএলআরআই প্রতিষ্ঠিত হয়ে বর্তমানে ১২টি গবেষণা বিভাগ রয়েছে, যেখানে ১২৭ জন বিজ্ঞানী গবেষণা করে যাচ্ছেন। অতি সম্প্রতি কোভিড-১৯-এর ব্যাপকতা মোকাবিলায় কোভিড-১৯ সনাক্তকরণসহ লাম্পি স্কীন ডিজিজ (LSD) প্রতিরোধে ফিল্ড স্ট্রেইন থেকে LSD Vaccine Seed উদ্ভাবন, লবণ সহিষ্ণু HYV fodder উদ্ভাবন এবং অধিক মাংস ও ডিম উৎপাদনকারী (সুবর্ণ) মুরগির জাত উদ্ভাবন প্রযুক্তিগুলো প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যাপক পরিবর্তন আনবে।

খাদ্য নিরাপত্তা, আমিষের চাহিদা পূরণ, ভিশন ২০৪১-এর লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে গবেষণা করার ক্ষেত্রে বিএলআরআই বদ্ধপরিকর। SDG-2030, হটস্পট, ডেল্টাপ্ল্যান-এর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লাগসই ও সহনশীল প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রাণিসম্পদ খাতে জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাঠ পর্যায়ে সমস্যা নিরসনে আরো নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিএলআরআই অঙ্গীকারবদ্ধ।

"প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা"টিতে সংক্ষেপে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার যোগ্যতা, প্রয়োগ সম্ভাবনা এবং সর্বোপরি উৎপাদন পদ্ধতিসহ আয়-ব্যয়ের হিসাব ধাপে ধাপে সন্নিবেশন করা হয়েছে। ফলে এটি একাধারে খামারি, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক এবং নীতি নির্ধারকদের জন্য একটি প্রয়োজনীয় গাইড বুক হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আগ্রহী খামারি, উদ্যোক্তা, বেসরকারী সংস্থার কর্মী ও শিক্ষানবিশদের জন্য এটি গবাদি প্রাণী ও পোল্ট্রির উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার ধারণা। "প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা" পুনঃসংযোজন ও পরিমার্জনটিতে ৭৪টি প্রযুক্তি ও ১৯টি প্যাকেজসহ মোট ৯৩টি প্রযুক্তির বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে; যা মাঠ পর্যায়, শিক্ষক, গবেষক, সম্প্রসারণ কর্মকর্তাসহ সকল পর্যায়ে সহজে বোধগম্য হবে।

ইতোপূর্বে ২০০৯ সালের ৩য় সংস্করণের পর আরো বেশ কিছু প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর হয়, তার সংযোজন এবং সময়ের চাহিদার সাথে পূর্বের প্রযুক্তিগুলোর সংযোজন ও পরিমার্জন একান্ত প্রয়োজন হয় বিধায় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা সংযোজন ও পরিমার্জন রূপে ৪র্থ সংস্করণ ২০২৩ প্রকাশ করা হলো। "প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা" শীর্ষক কারিগরি পুস্তকটির প্রথম/দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত কয়েকটি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মুদ্রণজনিত কারণে প্রযুক্তি ব্যবহারকারীগণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে বিধায় এটির সংশোধন ও পরিমার্জন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এরই ফলশ্রুতিতে সংশোধিত ও পরিমার্জিত আকারে পুস্তকটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

ইনস্টিটিউটের যে সকল বিজ্ঞানী মূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও এতদসংক্রান্ত প্রকাশনা রচনায় নিরলস শ্রম প্রদান করেছেন। তাদের সবাইকে বিশেষ করে, এই প্রযুক্তি নির্দেশিকা সংকলনে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দকে অক্লান্ত প্রয়াসের জন্য জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। নির্দেশিকাটি প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প"-এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন
মহাপরিচালক

পরিচালক (গবেষণা)-এর বাণী

জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে ও পুষ্টি নিরাপত্তায় প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গবেষণার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অভিলক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ খাত সম্ভাবনাময়, ক্রমবর্ধমান ও লাভজনক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সাথে উপযুক্ত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার প্রাণিসম্পদ খাতকে কর্মসংস্থান ও সামাজিক পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ারে পরিণত করেছে। বর্তমান সরকার পরিবেশের ভারসাম্যতা বজায় রেখে, জলবায়ুর পরিবর্তন বিবেচনায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচিকে এগিয়ে নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ প্রেক্ষাপটে সার্বিক প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে প্রযুক্তি ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা সম্ভব হলে এসডিজি-২০৩০, ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে।

পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, জাত উদ্ভাবন, খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন ও পরীক্ষণ, প্রাথমিক সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তি প্রচারের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাণিজ উপকরণ ও পণ্যের মূল্য সংযোজন, খামারি ও উদ্যোক্তাদের পরামর্শ সেবা ও শিল্পায়নে বিএলআরআই তার সক্ষমতার মধ্যে কর্ম দায়িত্বগুলো পালন করছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমৃদ্ধ প্রতিবেশী বড় দেশগুলোর মাঝে সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে বিশ্ব খাদ্য সংকট ও পরিবর্তনশীল আবহাওয়া মোকাবেলা এবং সর্বোপরি বিশ্বায়ন প্রতিযোগিতায় টেকসই জাতীয় অর্থনৈতিক অর্জনে সহায়ক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রবৃদ্ধি সহায়ক গবেষণার ক্ষেত্রগুলো সম্প্রসারণে বিএলআরআই সদা তৎপর। সুস্থ-সবল জাতি গঠনে মানুষের প্রয়োজন সুষম পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্য। তার প্রয়োজন বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা। খাদ্যে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট পরিমিত খাদ্য উপাদান যেমন কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় খাদ্য। এর মধ্যে প্রোটিন হলো একটি প্রধান খাদ্য উপাদান যার প্রধান উৎস প্রাণিসম্পদ খাত। দেশের প্রাণিসম্পদের বিশেষ করে গবাদি প্রাণীর সংরক্ষণ, উৎপাদন, সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, গবাদি প্রাণী ও পাখির রোগবালাই দমন, গবাদি প্রাণীর খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে এবং উৎকর্ষতার গবেষণার জন্য ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৮ নম্বর অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঢাকার অদূরে সাভার উপজেলায় ৪২৬ একর জমির উপর প্রাণিসম্পদ-এর একটি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) প্রতিষ্ঠা হয়। প্রবর্তিত পূর্বতন আইনগুলি রহিত করে বাংলাদেশ সরকার "বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৮" আইনটি প্রবর্তন করেন। ১৯৮৬ সাল থেকে এর গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে বিএলআরআই স্থান, কাল ও চাহিদার নিরিখে ৭৪টি প্রযুক্তি ও ১৯টি প্যাকেজসহ মোট ৯৩টি প্রযুক্তি-প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছে যা যথা সময়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থার নিকট হস্তান্তর করেছে।

"প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা-২০২৩" শীর্ষক এই কারিগরি সংযোজন, সংস্করণ ও পরিমার্জন পুস্তকটিতে মোট ৯৩টি প্রযুক্তি ও প্যাকেজ সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে এর বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার যোগ্যতা, প্রয়োগ সম্ভাবনা এবং সর্বোপরি উৎপাদন পদ্ধতিসহ আয়-ব্যয়ের হিসাব ধাপে ধাপে পরিবেশন করা হয়েছে। আগ্রহী খামারি, উদ্যোক্তা, বেসরকারী সংস্থার কর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এটি প্রাণী-পাখির উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার ধারণা। "প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা" শীর্ষক কারিগরি পুস্তকটির ৩য় সংস্করণের পর নতুন হস্তান্তরিত প্রযুক্তিগুলো সংযোজন ও পরিমার্জন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ৭৪টি প্রযুক্তি ও ১৯টি প্যাকেজ সম্বলিত ৪র্থ সংস্করণ **"প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা-২০২৩"** প্রকাশ করা হচ্ছে। ইনস্টিটিউটের যে সকল বিজ্ঞানী মূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং পুস্তকটি রচনা ও সংশোধনে শ্রম দিয়েছেন তাদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ড. নাসরিন সুলতানা
পরিচালক (গবেষণা), বিএলআরআই

আহ্বায়কের বাণী

২০০৯ এর এপ্রিলে "প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা"-এর ৩য় সংস্করণে পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি থাকায় এবং নতুন হস্তান্তরিত প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারকারীগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এটির ৪র্থ সংশোধন ও পরিমার্জন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২ খ্রিঃ এর সেপ্টেম্বর মাসে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশে গঠিত চার সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে পুস্তকটির ৪র্থ সংস্করণের কাজ শুরু হয়। ২০০৯ সালে "প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকায়" ১৯টি প্যাকেজ ও ৪০টি প্রযুক্তি সন্নিবেশ করা হয়েছিল। ৪র্থ সংস্করণে আরও ৩৪টি প্রযুক্তি সংযোজন করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদের প্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, গবাদি প্রাণী ও ঘাসের উন্নতজাত উদ্ভাবন, প্রাণিপুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রাণিস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা ও এর সমাধান সম্পর্কিত প্রযুক্তি ও প্যাকেজ উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীগণ কাজ করে যাচ্ছে। BARC কর্তৃক প্রকাশিত Atlas 100 Technology-তে BLRI এর ৫টি প্রযুক্তি স্বগৌরবে জায়গা করে নিয়েছে। লেয়ার মুরগির স্ট্রেইন শুভ্রা- ২০১১ সালে এবং ভেড়ার পশমজাত দ্রব্যাদি তৈরি প্রযুক্তিটি ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নিকট হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিজ্ঞানীগণ সিলেকশন ও ব্রীডিং-এর মাধ্যমে বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত দেশি জাতের মেইল লাইন এবং দেশীয় আবহাওয়ায় অভিযোজিত বিদেশি জাতের ফিমেল লাইন ব্যবহার করে সম্প্রতি একটি অধিক মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত উদ্ভাবন করে। দেশীয় পরিবর্তনশীল আবহাওয়া উপযোগী মুরগির এই জাতটির নামকরণ করা হয়েছে "বিএলআরআই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ)"। বিএলআরআই উদ্ভাবিত মাংস উৎপাদনকারী এই জাতটির মাংসের স্বাদ দেশি মুরগির ন্যায়। এছাড়াও আরো গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি মাঠে রয়েছে, যেগুলি অত্যন্ত সময়োপযোগী। কাজেই এই প্রযুক্তি নির্দেশিকা ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তি ব্যবহারকারীগণ উপকৃত হবেন বলে আশা করি। তবে, ২০০৯ খ্রিঃ এর পূর্বে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব বর্তমান বাজার দরের সাথে সমন্বয় করা সম্ভব হয়নি বিধায় আমি আন্তরিক দুঃখিত। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কমিটির সকল সদস্যদের প্রতি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রায় ৩৬৪ পৃষ্ঠার পুস্তকটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। আমি বিনীতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্মানিত মহাপরিচালক ও পরিচালক (গবেষণা) মহোদয়ের প্রতি যারা সময়ে সময়ে প্রযুক্তি সন্নিবেশ করতে সহযোগিতা করেছেন। পরিশেষে, সকল বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালকগণকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা-এর সাফল্য কামনা করছি।

ড. কামরুন নাহার মনিরা
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	প্রাণী উৎপাদন সম্পর্কিত প্যাকেজ ও প্রযুক্তি প্যাকেজের নাম	প্রযুক্তি হস্তান্তরের সময়	প্রযুক্তি হস্তান্তর	পৃষ্ঠা নং
১।	গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ	১৯৯৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএআরসি	৯-১৩
২।	ডেইরি উৎপাদন	২০০২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৪-২১
৩।	বাছুর পালন	২০০২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২২-৩২
৪।	সবুজ ঘাস উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার	১৯৯৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩৩-৩৭
	প্রযুক্তির নাম			
৫।	ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (ইউএমএস)	১৯৯৫	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএআরসি	৩৮-৪০
৬।	দুধেল গাভী উৎপাদনে বিদেশী উন্নত জাতের ষাঁড়ের সংকরায়নের সঠিক মাত্রা	১৯৯৫	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৪১-৪২
৭।	বর্ষাকালে তাজা ও ভিজা খড় সংরক্ষণ	১৯৯৫	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএআরসি	৪৩-৪৫
৮।	ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক সংরক্ষণ প্রযুক্তি	১৯৯৭	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৪৬
৯।	গো-খাদ্য হিসেবে অ্যালজি উৎপাদন ও ব্যবহার	১৯৯৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৪৭-৪৯
১০।	দেশীয় পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ	১৯৯৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএআরসি	৫০-৫১
১১।	গো-খাদ্য হিসেবে চিটাগুড়ের ব্যবহার	১৯৯৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৫২
১২।	গো-খাদ্য হিসেবে ইপিল ইপিলের চাষ ও ব্যবহার	১৯৯৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৫৩-৫৬
১৩।	ভুট্টা ও কাউপি মিশ্র গো-খাদ্য চাষ ও ব্যবহার	১৯৯৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৫৭-৫৯
১৪।	গো-খাদ্য হিসেবে কলাগাছের সংরক্ষণ ও ব্যবহার	১৯৯৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৬০-৬২
১৫।	আঁখের উপজাত সংরক্ষণ ও গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার	১৯৯৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৬৩-৬৫
১৬।	লবণাক্ত, বন্যাকবলিত ও মধুপুর গড় এলাকার জন্য ঘাস উৎপাদন	১৯৯৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএআরসি	৬৬-৬৮
১৭।	পাহাড়ি জমিতে সবুজ ঘাস উৎপাদন ও ব্যবহার	১৯৯৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৬৯-৭১
১৮।	খামারের বর্জ্য থেকে ডাকউইড উৎপাদন ও গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার	১৯৯৯	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৭২-৭৫
১৯।	কৃত্রিম প্রজনন ও বাছাই এর মাধ্যমে গাভীর জাত উন্নয়ন	২০০১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৭৬-৭৯
২০।	অষ্টগ্রাম পনির উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	২০০১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৮০-৮২
২১।	দুধ উৎপাদনে উচ্চ ফলনশীল দেশী ঘাস বাকসা	২০০২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৮৩-৮৬
২২।	ভুট্টা খড়ের সংরক্ষণ ও ব্যবহার	২০০২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৮৭-৮৮
২৩।	কর্ণস্ট্র প্যালেট ফিড	২০১০	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও লালমনি এগ্রো লিঃ	৮৯-৯০
২৪।	বহুবর্ষজীবী উচ্চ ফলনশীল ঘাস বিএলআরআই নেপিয়ার -১	২০১২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মিল্কভিটা	৯১-৯২
২৫।	বহুবর্ষজীবী উচ্চ ফলনশীল ঘাস বিএলআরআই নেপিয়ার -২	২০১২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মিল্কভিটা	৯৩-৯৪
২৬।	বহুবর্ষজীবী উচ্চ ফলনশীল ঘাস বিএলআরআই নেপিয়ার -৩	২০১২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মিল্কভিটা	৯৫-৯৬
২৭।	বহুবর্ষজীবী উচ্চ ফলনশীল ঘাস বিএলআরআই নেপিয়ার - ৪	২০১২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মিল্কভিটা	৯৭-৯৯
২৮।	সবজি বর্জ্য থেকে প্রাণিখাদ্য উৎপাদন প্রযুক্তি	২০২০	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১০০-১০৫
২৯।	বিএলআরআই ঘাস-৫ (লবণ সহিষ্ণু)	২০২২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১০৬-১০৭
৩০।	ডোল পদ্ধতিতে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তি	২০১৭	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১০৮-১১১
৩১।	বাছুরের জন্য সটি পাউডার ভিত্তিক মিল্ক রিপ্লোসার	২০১২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও ব্র্যাক	১১২-১১৪
৩২।	সাজনা গাছের চাষ পদ্ধতি এবং গো-খাদ্য হিসেবে এর ব্যবহার	২০১৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১১৫-১২২
৩৩।	ফডারের বায়োমেট্রিক্যাল র‍্যাংকিং টুল	২০২০	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১২৩-১২৪
৩৪।	শস্য-উপজাত ভিত্তিক প্রাণী খাদ্য হিসাবে টি.এম.আর. প্রযুক্তি	২০১৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১২৫-১২৭

ক্রমিক নং	পোল্ট্রি উৎপাদন সম্পর্কিত প্যাকেজ ও প্রযুক্তি প্যাকেজের নাম	প্রযুক্তি হস্তান্তরের সময়	প্রযুক্তি হস্তান্তর	পৃষ্ঠা নং
৩৫।	ক্ষুদ্র খামারিদের জন্য বাণিজ্যিক লেয়ার পালন	২০০২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১২৮-১৩৭
৩৬।	ক্ষুদ্র খামারিদের জন্য ব্রয়লার পালন	২০০৩	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৩৮-১৪৩
৩৭।	ককরেল পালন	২০০৫	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৪৪-১৪৭
৩৮।	কোয়েল পালন	২০০০	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৪৮-১৫২
৩৯।	গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন	২০০৪	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএআরসি	১৫৩-১৫৯
৪০।	কবুতর পালন	২০০৯	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৬০-১৬৮
৪১।	পারিবারিক পর্যায়ে খরগোশ পালন	২০০৪	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৬৯-১৭৩
	প্রযুক্তির নাম			
৪২।	বাণিজ্যিক খামারে মুরগির জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা	২০০৩	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৭৪-১৭৬
৪৩।	পোল্ট্রি খাদ্যে নারিকেল, সরিষার খৈল এবং ইপিল ইপিলের ব্যবহার	২০০৩	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৭৭
৪৪।	স্বাস্থ্যসম্মত উন্নত চিক ব্রুডার	২০০৪	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৭৮-১৮০
৪৫।	দেশী (অর্গানিক) মুরগি উৎপাদনে উন্নত কৌশল	২০০৪	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএআরসি	১৮১-১৮২
৪৬।	উন্নত জাতের দেশী মুরগি উৎপাদনে বিজ্ঞান সম্মত কৌশল	২০১৭	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৮৩-১৮৫
৪৭।	বিএলআরআই লেয়ার স্ট্রেইন-১ (শুভ্রা) নামক বাণিজ্যিক মুরগি	২০১১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৮৬-১৮৭
৪৮।	বিএলআরআই লেয়ার স্ট্রেইন-২ (স্বর্ণা) নামক বাণিজ্যিক ডিমপাড়া মুরগি	২০১৭	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৮৮-১৮৯
৪৯।	বিএলআরআই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ)	২০২২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৯০-১৯৫
৫০।	মুরগির কৃত্রিম প্রজননের সহজ পদ্ধতি	২০০৯	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৯৬-১৯৯
	প্রাণিস্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্যাকেজ ও প্রযুক্তি			
	প্যাকেজের নাম			
৫১।	মুরগির রানীক্ষেত রোগ নিয়ন্ত্রণ	২০০৪	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২০০-২০২
৫২।	মুরগির গামবোরো রোগ নিয়ন্ত্রণ	২০০৪	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২০৩-২০৫
৫৩।	বাংলাদেশে গবাদিপ্রাণীর ক্ষুরারোগ দমন	২০০২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২০৬-২১০
৫৪।	পিপিআর রোগ দমনে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা	১৯৯৯	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২১১-২১৪
	প্রযুক্তির নাম			
৫৫।	গবাদিপ্রাণীর কৃমি রোগ দমন মডেল	২০০২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএআরসি	২১৫-২১৮
৫৬।	কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন পরীক্ষার জন্য মূল্য-সাশ্রয়ী হিমোলাইসিন	২০০২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২১৯-২২১
৫৭।	সালমোনেলা ভ্যাকসিন	২০০২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২২২-২২৩
৫৮।	মুরগির সালমোনেলোসিস রোগ নির্ণায়ক এন্টিজেন	২০০২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২২৪-২২৫
৫৯।	ELISA ভিত্তিক ক্ষুরা রোগ নির্ণয় পদ্ধতি	২০০২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২২৬
৬০।	পিপিআর রোগের সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি	২০০৩	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২২৭
৬১।	পিপিআর ভ্যাকসিন	২০০৩	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২২৮
৬২।	মুরগির মাইকোপ্লাজমা রোগ নির্ণায়ক এন্টিজেন	২০০৩	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২২৯
৬৩।	এইচ আই পরীক্ষার ফিল্টার পেপারের সাহায্যে রক্ত নমুনা সংগ্রহ	২০০৩	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২৩০-২৩১
৬৪।	পিপিআর ও রিন্ডারপেস্ট রোগ নির্ণয়ে EISA পদ্ধতি	২০০৩	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২৩২
৬৫।	এইচ আই পরীক্ষার জন্য মুরগির রানীক্ষেত নির্ণায়ক এন্টিজেন	২০০৬	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২৩৩-২৩৪
৬৬।	ছাগলের বসন্ত রোগের টিকা	২০০৬	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২৩৫-২৩৬
৬৭।	ছাগলের বসন্ত রোগ নির্ণয়ে EISA পদ্ধতি	২০০৬	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২৩৭-২৩৮

ক্রমিক নং	প্রাণিস্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্যাকেজ ও প্রযুক্তি প্রযুক্তির নাম	প্রযুক্তি হস্তান্তরের সময়	প্রযুক্তি হস্তান্তর	পৃষ্ঠা নং
৬৮।	পিপিআর ভাইরাসের বিরুদ্ধে এন্টিবডি নির্ণয়ে C-EISA পদ্ধতি	২০০৭	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২৩৯-২৪০
৬৯।	তাপ সহিষ্ণু পিপিআর ভ্যাকসিন	২০১১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২৪১-২৪৪
৭০।	বিএলআরআই এফএমডি ২০১৬ ত্রিযোজি (O, A, Asia-1) টিকার মাস্টার সীড	২০১৬	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২৪৫-২৪৭
৭১।	পিপিআর রোগ দমনে বিএলআরআই মডেল	২০১৬	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২৪৮-২৫৬
৭২।	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের (H5N1) এইচআই (HI) পরীক্ষার জন্য (HA) এইচএ	২০১৭	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২৫৭-২৫৯
৭৩।	ক্ষুরারোগ দমনে বিএলআরআই মডেল	২০১৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২৬০-২৭০
	ছাগল উৎপাদন সম্পর্কিত প্যাকেজ ও প্রযুক্তি			
	প্যাকেজের নাম			
৭৪।	দারিদ্র্য বিমোচনে ছাগল পালন	২০০২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২৭১-২৭৭
৭৫।	স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগল পালন	২০০৩	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২৭৮-২৮১
৭৬।	সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন	২০০২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২৮২-২৮৭
	প্রযুক্তির নাম			
৭৭।	কাঁঠাল গাছের পাতা ছাটাইয়ের মাত্রা ও ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার	২০০১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২৮৮-২৯০
৭৮।	ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল খামার স্থাপনে উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন ছাগল নির্বাচন কৌশল	২০০১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২৯১-২৯৩
৭৯।	ছাগলের বাচ্চা প্রতিপালন	২০০৪	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২৯৪-২৯৯
৮০।	স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগল ও ভেড়া পালনে "সাশ্রয়ী কমপ্লিট প্যালেট ফিড"-এর ব্যবহার	২০২১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩০০
	ভেড়া উৎপাদন সম্পর্কিত প্যাকেজ ও প্রযুক্তি			
	প্যাকেজের নাম			
৮১।	ভেড়ার প্রজনন ব্যবস্থাপনা	২০১৯	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩০১-৩০৪
	প্রযুক্তির নাম			
৮২।	দেশি ভেড়া হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাংলা ল্যাম্ব (ভেড়ার মাংস) উৎপাদন	২০১৯	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩০৫-৩০৮
৮৩।	পাহাড়ী অঞ্চলে ভেড়া পালনের কৌশল	২০১৯	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএআরসি	৩০৯-৩১৩
	মহিষ উৎপাদন সম্পর্কিত প্রযুক্তি			
	প্রযুক্তির নাম			
৮৪।	নিরাপদ মাংস উৎপাদনে দেশী উপকূলীয় মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি	২০১৯	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩১৪-৩২১
৮৫।	মহিষের ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশন প্রযুক্তি	২০১৭	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩২২-৩২৩
৮৬।	প্রজননের জন্য মহিষ ষাঁড় নির্বাচন ও পালন ব্যবস্থাপনা	২০১৬	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩২৪-৩৩৪
৮৭।	মহিষ খামারে জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা	২০১৬	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩৩৫-৩৪২
৮৮।	মহিষের অন্তঃপরজীবী বা কৃমি দমন মডেল	২০১৬	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩৪৩-৩৪৯
	গবেষণাগারে ও শিল্পক্ষাত ব্যবহার উপযোগী প্রযুক্তি			
	প্রযুক্তির নাম			
৮৯।	গাভীতে এমব্রায়ো ট্রান্সফার প্রযুক্তি ব্যবহার	২০০২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩৫০-৩৫২
৯০।	লাভজনক খামার ব্যবস্থাপনায় বিএলআরআই ফিডমাস্টার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার	২০১৬	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩৫৩-৩৫৫
৯১।	রক্তের নমুনা থেকে ডিএনএ নিষ্কাশন	২০০৯	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩৫৬-৩৫৭
৯২।	গবেষণাগারে ভ্রূণ উৎপাদন প্রযুক্তি	২০০৯	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩৫৮-৩৬০
৯৩।	মিনামিক্স-গবাদিপ্রাণির জন্য প্রিমিক্স ফিড	২০০৯	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩৬১-৩৬৩
	বিএলআরআই এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি			৩৬৪

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ

পটভূমি

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রিয় খাদ্য গরুর মাংস। প্রতি বছরে ৬০০×১০³ মে টন গরুর মাংস উৎপাদন হয়। এর পুরোটারই উৎস গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা। বাংলাদেশে গরুর মাংস উৎপাদনের কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি খামারি পর্যায়ে নেই। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে গরুর মাংস উৎপাদনের নির্দিষ্ট জাত আছে এবং এদের বাছুরগুলো ১৮ থেকে ২৪ মাস পালন করে মাংসের জন্য বাজারজাত করা হয়। উচ্চ মূল্য সম্পন্ন ভিল (Veal) উৎপাদনের জন্য অনেক সময় ৯ মাসেও গরুগুলোকে জবাই করে বাজারজাত করা হয়। এ ধরনের মাংস উৎপাদন পদ্ধতি বাংলাদেশে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত এবং মাংস উৎপাদনের জন্য গরুর জাতও পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাণী উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিবেচনায় রেখে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারে কি ভাবে লাভজনক ভাবে মাংস উৎপাদন করা যায় সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্যাকেজ প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। ষাঁড় ও বলদ অথবা পুনরুৎপাদন ক্ষমতাহীন গাভীগুলোই এ প্রক্রিয়াতে ব্যবহার হয়ে থাকে। খাদ্যাভাবে দেশী গবাদি প্রাণীগুলোর মাংস বা দুধ উৎপাদন আশানুরূপ নয়। ষাঁড় বা বলদগুলো কর্ষণ বা গাড়ি টানা শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং খাদ্যাভাবে দুর্বল থাকে। ফলে মাংস উৎপাদন আশানুরূপ হয় না। এরূপ ষাঁড় এবং বলদগুলোকে যখন পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা হয় তখন এদের অতীতের উৎপাদন ক্ষমতা খুব কম সময়ে পুষিয়ে আনতে চায়। বিষয়টি প্রায় সব জীবের জন্যই সত্য বলে বিবেচিত। অর্থাৎ কোনো জীবকে যখন কিছুদিন অপুষ্টিতে রেখে পুষ্টিযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করা হয় তখন উক্ত জীব তাঁর পূর্বের অপুষ্টিজনিত হ্রাসকৃত বৃদ্ধি পুষিয়ে নেয়। জীবের এ ধরনের বৃদ্ধিকে ক্ষতিপূরণমূলক বৃদ্ধি (Compensatory Growth) বলা হয়। অপুষ্ট

এবং দুর্বল গরুগুলো উন্নত পুষ্টি ও খাদ্যে স্বল্প সময়ে যে শরীর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তা লাভজনক মাংস উৎপাদন পদ্ধতি হিসেবে বিএলআরআই এর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। এর ভিত্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্যাকেজ প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়।

যে সমস্ত অঞ্চলে ব্যবহার যোগ্য : দেশের প্রায় সমস্ত অঞ্চল।

প্রযুক্তিটির মূল বৈশিষ্ট্য: 'কমপেনসেটরি গ্রোথ' ব্যবহারে দেশী অপুষ্ট গরু হতে লাভজনকভাবে মাংস উৎপাদন।

প্যাকেজ প্রযুক্তির বর্ণনা

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্যাকেজ চার (৪) টি পর্ব বিশিষ্ট একটি উৎপাদন প্রযুক্তি। পর্বগুলো হচ্ছে-

১. গরু নির্বাচন
২. কৃমিমুক্তকরণ
৩. পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা
৪. বাজারজাতকরণ।

১। গরুর বয়স ও নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য

হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রক্রিয়ায় গরুর বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ প্রক্রিয়ায় সাধারণত ২ বছর হতে ৫ বছরের গরু নির্বাচন করা যেতে পারে। দৈহিক গঠন বয়সের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে প্রাপ্ত গরুগুলো অঞ্চলভেদে গঠন আকৃতিতে এবং উৎপাদন ক্ষমতায় ভিন্ন। বিভিন্ন প্রকার গরুর একই পুষ্টি মাত্রায় এবং খাদ্য পদ্ধতি ব্যবহার করেও লাভজনক হারে দৈহিক ওজন বৃদ্ধি হয় না। এজন্য নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো ব্যবহার করে হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য গরু নির্বাচন করা জরুরি।

ক) দৈহিক আকার বর্গরূপ হবে
খ) গায়ের চামড়া ঢিলা, শরীরের হাড়গুলো আনুপাতিকহারে মোটা, মাথাটা চওড়া, ঘাড় চওড়া এবং খাটো
গ) পাগুলো খাটো এবং সোজাসুজিভাবে শরীরের সাথে যুক্ত
ঘ) পিছনের অংশ ও পিঠ চওড়া এবং লোম খাটো ও মিলানো এবং
ঙ) গরু অপুষ্ট বা দুর্বল কিন্তু রোগা নয়।

২। কৃমিমুক্ত করণ

প্রাণীর খাদ্যনালীতে ক্ষতিকর পরজীবী বাস করে। এরা গৃহীত খাদ্যের উৎকৃষ্ট অংশ খেয়ে জীবন ধারণ ও বংশবৃদ্ধি করে। এদের কারণে প্রাণী ঠিকমত পুষ্টি না পেয়ে দিন দিন রুগ্ন হয়ে যায়, এবং একসময় উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। গরুর খাদ্যনালীতে পরজীবী সনাক্ত করে কৃমির ঔষধ ব্যবহার করা ভালো। এজন্য নিকটস্থ একজন প্রাণী চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। প্রাণীর ওজনের ভিত্তিতে কৃমির ঔষধ ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। গরু নির্বাচনপূর্বক সংগ্রহের পর পরই পালের সব গরুকে একসাথে কৃমিমুক্ত করা উচিত। প্রাণী ডাক্তারের নির্দেশ মতে কৃমির ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

৩। পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ক) স্বল্প মূল্যে সহজপ্রাপ্য খাদ্য ব্যবহারে রশদ তৈরি
খ) প্রাপ্ত খাদ্যগুলো প্রয়োজনমত প্রক্রিয়াজাত
গ) উৎপাদন মৌসুমে খাদ্য সংগ্রহের পর মজুত
ঘ) প্রাণীর প্রয়োজনের ভিত্তিতে দৈনিক খাদ্যতালিকা প্রস্তুত
ঙ) খাদ্য সরবরাহ পদ্ধতি নির্বাচন এবং
চ) খাদ্যজনিত রোগ দমনের ব্যবস্থা।

গরু মোটাতাজাকরণে দু'ধরনের খাদ্যের সমন্বয়ে রশদ তৈরি করা হয়।

ক) আঁশ জাতীয় এবং
খ) দানাদার।

(ক) আঁশ জাতীয়

আমাদের দেশে আঁশ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে প্রায় ৭০.০ শতাংশই খড়। ঋতু ও অঞ্চল ভেদে দেশী এবং উন্নত সবুজ ঘাসও পাওয়া যায়। মোটাতাজাকরণে দু'ধরনের আঁশ জাতীয় খাদ্য ভিন্ন ভিন্ন বা এক সাথেও ব্যবহার হতে পারে। তবে উভয় প্রকার খাদ্যই প্রক্রিয়াজাত করা প্রয়োজন।

ধানের খড় হৃষ্টপুষ্টকরণে ব্যবহারের জন্য ইউএমএস প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই উদ্ভাবিত হয়েছে। উক্ত খাদ্য প্রযুক্তিটি প্রাথমিকভাবে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে ব্যবহারের জন্য উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু পরবর্তী গবেষণা কার্যক্রমে দেখা যায় যে, খড়ভিত্তিক উক্ত খাদ্য প্রযুক্তিটি সকল বয়সের ও উৎপাদন পদ্ধতির জন্য ব্যবহার হতে পারে। প্রযুক্তিটি বুকলেট আকারে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এবং বিএলআরআই হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। বর্ষা মৌসমে তাজা ও ভিজা খড় ইউরিয়া মিশিয়ে সংরক্ষণের পর গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে ব্যবহার করা যায়। একত্রে উক্ত প্রযুক্তির লিখিত বুকলেটে খাদ্য পদ্ধতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। সংরক্ষিত খড়ের সাথে শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত চিটাগুড় ব্যবহার করলে হৃষ্টপুষ্টকরণে আরও সুফল পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া দেশীয় সবুজ ঘাস বা উৎপাদিত ফডার হৃষ্টপুষ্টকরণে ব্যবহার করা যায়। দানা সংগ্রহের পর তাজা ও সবুজ ভুট্টা গাছের উপরের ৩/৪ অংশ টুকরো করে সরাসরি খাওয়ানো যায়। অধিক পরিমাণে পাওয়া গেলে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তি (ইতিমধ্যেই উদ্ভাবিত হয়েছে) ব্যবহার করে সাইলেজ করে হৃষ্টপুষ্টকরণে ব্যবহার করা যায়।

উল্লেখিত আঁশজাতীয় খাদ্যগুলো হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য সংগৃহীত প্রাণীকে যথেচ্ছা পরিমাণে খাওয়াতে হবে। আমাদের দেশে প্রাপ্ত সব ধরনের সবুজ ঘাসে সহজপাচ্য শক্তির উৎস আবহাওয়াগত কারণে শীত প্রধান দেশের সবুজ ঘাসের তুলনায় মোটামুটিভাবে কম থাকে। এজন্য গবেষণায় দেখা যায়, প্রাপ্ত সবুজ ঘাস খাওয়ানোর সময় শতকরা ১০ ভাগ চিটাগুড় সরাসরি মিশিয়ে দিলে ষাঁড় বা বলদের দৈহিক ওজন ২০-২৫ শতাংশ বেশি বৃদ্ধি পায়। এর মূলে বৈজ্ঞানিক কারণ বিদ্যমান। মূল কথা হলো গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে আমরা যদি সবুজ ঘাস ব্যবহার করি তাহলে খাওয়ানোর সময় শতকরা ১০ ভাগ চিটাগুড় ঘাসের সাথে সরাসরি মিশায়ে খাওয়াতে পারি। খামারি ভাইয়েরা ইউএমএস এবং চিটাগুড় মিশ্রিত সবুজ ঘাস ভিন্ন ভাবে খাওয়াতে পারেন। অথবা দুটো খাদ্য মিশ্রণ করেও খাওয়াতে পারে।

সারণি ১ : আঁশ জাতীয় খাদ্য প্রস্তুতের জন্য

সূত্র	খাদ্য	শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে গঠন	খাদ্যের ওজনের ভিত্তিতে গঠন
ইউএমএস	খড় : চিটাগুড় : ইউরিয়া	৮২ : ১৫ : ৩	১০০ : ২২-৩০ : ৩
সংরক্ষিত	খড় : ইউরিয়া	১০০ : ৪	১০০ : ২.০
তাজা ও ভেজা খড়	খড় : চিটাগুড়	৯০ : ১০	১০০ : ৩-৫
সবুজ ঘাস	সবুজ ঘাস : চিটাগুড়	১০০ : ১০	১০০ : ৩.০-৩.৫

(খ) দানাদার মিশ্রণ

আমাদের দেশে প্রাপ্ত দানাদার ব্যবহারে বিভিন্ন মিশ্রণ তৈরি করে আঁশ জাতীয় খাদ্যের অতিরিক্ত হিসেবে নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে। দানাদার মিশ্রণ তৈরির কিছু ফর্মুলা সারণি ২ এ দেয়া হলো-

সারণি ২ : গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে ব্যবহারযোগ্য কিছু দানাদার মিশ্রণ

খাদ্য	মিশ্রণ. ১	মিশ্রণ. ২	মিশ্রণ. ৩	মিশ্রণ. ৪	মিশ্রণ. ৫	মিশ্রণ. ৬	মিশ্রণ. ৭	মিশ্রণ. ৮
(১) শস্য (১০০০)								
চাল ভাংগা	-	২০০	-	২০০	-	-	১০০	১০০
গম ভাংগা	-	-	১৫০	-	-	-	-	১০০
ভুট্টা ভাংগা	-	-	-	-	-	১৮০	-	-
খেসারি ভাংগা	-	-	-	-	-	-	১০০	-
(২) কুঁড়া ভুসি								
গমের ভুসি	৫৪০	৩০০	২৫০	১৩০	-	২০০	১৫০	২৫০
ধানের ভুসি	-	২৩০	২৮০	২০০	৫৩০	২৩০	৩৮০	২৮০
খেসারি ভুসি	২০০	-	-	-	১৪০	১৫০	-	-
মসুর ভুসি	-	-	১০০	২৪০	১০০	-	-	-
(৩) আমিষের উৎস								
তিলের খৈল	১৫০	-	-	১৫০	১৫০	-	-	২০০
নারিকেলের খৈল	-	-	-	-	-	-	২০০	-
সরিষার খৈল	-	১৯০	১৪০	-	-	১৬০	-	-

খাদ্য	মিশ্রণ. ১	মিশ্রণ. ২	মিশ্রণ. ৩	মিশ্রণ. ৪	মিশ্রণ. ৫	মিশ্রণ. ৬	মিশ্রণ. ৭	মিশ্রণ. ৮
মাছের গুঁড়া	৮০	৫০	৫০	৫০	-	৫০	৪০	৪০
সয়াবিন মিল	-	-	-	-	৫০	-	-	-
(৪) খনিজ								
লবণ	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
ঝিনুকের পাউডার	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫
চুনাপাথরের পাউডার	-	-	-	-	-	-	-	-
(৫) পুষ্টি উপাদানের মাত্রা								
শুষ্ক পদার্থ (g/Kg)	৯০০	৯০০	৯০০	৯০০	৯০০	৯০০	৯০০	৯০০
মেটাবলিক শক্তি (MJ/Kg DM)	১০.৭০	১১.২৬	১০.৮৮	১১.০৪	১০.৪৯	১১.০৯	১১.০৬	১১.৪৯
আমিষ (g/Kg DM)	২০৯	১৮৭	১৮৩	১৮১	১৮৩	১৭৯	১৮৪	১৯৬

সারণি-২ এ গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে ব্যবহারের জন্য কয়েকটি খাদ্য ফর্মুলা প্রদত্ত হলো-

(ক) খড়ভিত্তিক খাদ্য ফর্মুলা

১. ইউএমএস যথেচ্ছা পরিমাণ + দানাদার মিশ্রণ (দৈহিক ওজনের শতকরা .০৮-১.০ ভাগ) এবং
২. ইউরিয়া দিয়ে সংরক্ষিত খড় + মোট খড়ের শতকরা ৩.০-৪.০ ভাগ চিটাগুড় + দানাদার মিশ্রণ (দৈহিক ওজনের শতকরা ০.৮-১.০ ভাগ)।

(খ) সবুজ ঘাস ভিত্তিক খাদ্য ফর্মুলা

১. সবুজ ঘাস + দানাদার মিশ্রণ (দৈহিক ওজনের শতকরা ০.০-১.০ ভাগ)
২. সবুজ ঘাস + মোট ঘাসের শতকরা ২.৫-৩.০ ভাগ চিটাগুড় + দানাদার মিশ্রণ (দৈহিক ওজনের শতকরা ০৮-১.০ ভাগ) এবং
৩. সবুজ ঘাস : ইউএমএস + দানাদার মিশ্রণ (দৈহিক ওজনের শতকরা ০.৮-১.০ ভাগ)।

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে পুষ্টিজনিত কিছু সমস্যা ও দমনের উপায়

(ক) এসিডোসিস

অনেক খামারি গরুকে প্রচুর পরিমাণে দানাদার খাদ্য, ভাত অথবা অনেক সময় চিটাগুড় সরাসরি খাইয়ে থাকেন। এ ধরনের খাদ্যগুলো একসঙ্গে বেশি পরিমাণ খাওয়ালে গরুর পেটে ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয়। গরুর পেট কামড়ায়, অস্বস্থিবোধ করে এবং মাত্রা বেশি হলে পেটে লাথি মারে ও শুয়ে পড়ে।

প্রতিরোধ

দানাদার মিশ্রণ কমপক্ষে দিনে দু'বারে অথবা তিনবারে ভাগ করে সরবরাহ করতে হবে। ভাত অন্যান্য দানাদার মিশ্রণের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। তবে খরচের বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। চিটাগুড় সরাসরি খাওয়ানো পরিহার করে বিভিন্ন আঁশ জাতীয় খাদ্যের সাথে ব্যবহারের প্রযুক্তি অনুসারে খাওয়ানো যায় (পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে)।

চিকিৎসা

এসিডোসিস হয়ে গেলে গরুর পুষ্টি প্রক্রিয়ায় দারুণভাবে ক্ষতি করে। গরুতে প্রচুর পরিমাণে পানি এবং এন্টাসিড যেমন ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট খাওয়াতে হবে। এ ছাড়া এ্যন্টিবায়োটিক এবং স্যালাইন মুখে খাওয়ানো যেতে পারে।

ব্লট

এ ধরনের রোগকে পেট ফুলা রোগ বলে। অন্যান্য কারণ না থাকলে সাধারণত ডাল জাতীয় ঘাস যথা- খেসারি, মাষকালাই ইত্যাদি ঘাস কচি অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে খেলে ব্লট হয়। এ ধরনের সবুজ ঘাস এককভাবে গরুকে যথেচ্ছা পরিমাণ খাওয়ানো উচিত নয়। এতে পেটফুলা রোগসহ পুষ্টিরও অপচয় হয়।

প্রতিকার
সবুজ ডাল জাতীয় ঘাসের সাথে কমপক্ষে ১৫ ভাগ খড় সরবরাহ করা যেতে পারে।

চিকিৎসা
ব্লট হয়ে গেলে প্যারাফিন, তিল বা তিসির তেল এবং এ্যন্টিবায়োটিক গরুকে খাওয়ানো যেতে পারে। বিপজ্জনক অবস্থায় পেট ক্যানুলা ব্যবহারে ছিদ্র করে দেয়া উচিত।

খাদ্য ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কিছু বিষয়
স্বল্প মূল্যে খাদ্যব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্মরণে রাখা প্রয়োজনঃ

ক) গরু সংগ্রহের পর হতে কমপক্ষে ৪৫-৬০ দিন গরুকে অধিক উন্নত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। এতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য প্রয়োজনীয় মোট সময় হ্রাস পাবে। শেষের দিনগুলোতে খাদ্যের পরিমাণ এবং গুণগত বৈশিষ্ট হ্রাস করে প্রথম দিনগুলোর খাদ্য খরচ পুষিয়ে নেয়া যেতে পারে।

খ) গরুর গায়ে অধিক পরিমাণে চর্বি না করা। এতে গরু দেখতে সুন্দর লাগলেও পুষ্টির অপচয় ও খরচ বৃদ্ধি পায়। তবে বাজারের চাহিদা মতে যদি অধিক চর্বিযুক্ত গরু উৎপাদন করা প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রে লাভের ভিত্তিতে গরু চর্বিযুক্ত করা যেতে পারে।

গ) খাদ্যের অপচয় বিশেষ করে আঁশ জাতীয় খাদ্যের অপচয় রোধ করা প্রয়োজন। এজন্য সরবরাহকৃত খাদ্যগুলো কেটে কেটে টুকরো করে দিলে অপচয় হ্রাস করা সম্ভব।

ঘ) আমাদের দেশে শীতের সময় গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য খাদ্যচাহিদা বৃদ্ধি পায়। শীতের সময়ে অবশ্যই গরুকে অতিরিক্ত শীত এবং ঠান্ডা বাতাস হতে রক্ষা করতে হবে। অন্যথায় এ সময়ে গরু দুর্বল ও শুকিয়ে যেতে পারে।

৪। বাজারজাতকরণ
গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্যাকেজ প্রযুক্তি ৯০ থেকে ১২০ দিনের জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছে। কিন্তু খামারিবৃন্দ শুধুমাত্র ঈদের বাজারের উচ্চমূল্যের দিকে দৃষ্টি রেখে গরু ক্রয় করে হৃষ্টপুষ্টকরণ করে থাকেন। অবশ্য ঈদের চড়া মূল্যে খামারিবৃন্দ বেশি লাভবান হয়ে থাকেন। ঈদ-উল-আযাহায় জীবন্ত গরু বিক্রি করা হয়। অন্যান্য সময়ে গরু জবাই এবং মাংসের গ্রেডিং করে বাজারজাত করা যেতে পারে। কিন্তু এখনও মাংস বাজারজাতকরণের প্রযুক্তিগুলোর ব্যবহার আমাদের দেশে শুরু হয়নি। উক্ত প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করে হৃষ্টপুষ্টকরণ প্যাকেজ প্রযুক্তি আরও সমৃদ্ধ হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

জীবন্ত গরু বাজারজাতকরণে বাজারের চাহিদা একটি বড় বিষয়। এজন্য হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রক্রিয়ায় গরু সংগ্রহের সময়ে গরুর মোট ওজন, রং এবং আকার-আকৃতি গুরুত্বপূর্ণ। বড় গরু ক্রয়ের ক্ষমতা খুব কম সংখ্যক ক্রেতার থাকে। এজন্য মাঝারি আকারের কালো বা লাল রং এর গরু নির্বাচন প্রয়োজন যা বাজারজাত করা সহজ হয় এবং মূল্যও বেশি পাওয়া যায়।

(ক) ঝুঁকির সম্ভাবনা
প্রাণী নির্বাচন এবং খাদ্য প্রণালী সঠিক না হলে অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকতে পারে।

(খ) লাভের হার
গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি ব্যবহারে একজন খামারি প্রতিগরু হতে ২০০০.০০ থেকে ৭৫০০.০০ টাকা পর্যন্ত লাভবান হতে পারেন। তবে লাভের মাত্রা নির্ভর করে প্রযুক্তির ৪টি পর্ব- যথা প্রাণী নির্বাচন, কৃমিমুক্তকরণ, খাদ্যব্যবস্থাপনা এবং বাজারজাতকরণের উপর।

(গ) পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া
প্রযুক্তিটি ব্যবহারের কারণে পরিবেশের উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই। বরং পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় অপুষ্ট গরুর রুমেন হতে মিথেন উৎপাদন প্রায় ৩০% হ্রাস পায় এবং পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এ প্রযুক্তিটি ইতিমধ্যেই খামারি পর্যায়ে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। দারিদ্রবিমোচন, আমিষ জাতীয় পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ যুবক ও মহিলাদের আয় বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তি বিশেষভাবে সফলতা লাভ করছে।

প্যাকেজের উদ্ভাবক : ড. খান শহীদুল হক

ডেইরি উৎপাদন

পটভূমি

প্রাণী পাখি প্রকৃতির বাসিন্দা হয়ে যতদিন চরে খেয়েছে ততদিন তার প্রয়োজনীয় খাদ্য সে নিজেই সংগ্রহ করেছে। মানুষ তার প্রয়োজনে যখন তাকে গৃহপালিত করেছে তখন থেকেই তার খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে মানুষকে ভাবতে হয়েছে, তৈরি করতে হয়েছে এগুলোর উপকরণ। এরপর প্রাণীসম্পদকে যখন শিল্প হিসেবে বিবেচনায় আনা হয়েছে তখন উপকরণগুলো শুধু তৈরি নয় কত সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে উপকরণ বা কাঁচামালগুলো সংগ্রহ ও সরবরাহ করা যায় সে চিন্তায়ই উদ্ভাবিত হয়েছে প্রাণীপুষ্টি বিজ্ঞানের। প্রাণী-পাখি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের শতকরা ৬৫-৭০ ভাগ খরচ হয় খাদ্যের জন্য। বাকি অংশ বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য ব্যয় হয়।

প্রাণী-পাখির খাদ্য তৈরি ও সরবরাহ প্রাণী-পাখির প্রয়োজন অনুসারে, স্বল্প মূল্যে এবং সঠিক পন্থায় না হলে এ শিল্প হতে মুনাফা অর্জন খুব কঠিন হয়ে পড়ে। মনে রাখতে হবে প্রাণী-পাখি একটি জীবন্ত শিল্প কারখানা যার কাঁচামাল সাধারণ খাদ্য বস্তু হলেও তা হতে যা উৎপাদন করে তা মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য বা ব্যবহার্য বস্তু। গাভীর খাদ্য তৈরির জন্য প্রতিটি গাভীর দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে শুষ্ক পদার্থ, শক্তি ও আমিষের প্রয়োজনীয়তা জানা প্রয়োজন। এ ধরনের উপাদানের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য আমাদের দেশে কোনো ফিডিং স্ট্যান্ডার্ড নেই। বিচ্ছিন্নভাবে যে হিসাবগুলো করা হচ্ছে তা কখনো মোট পাচ্য উপাদান বা Total Digestible Nutrients (TDN) এবং ডাইজেস্টবল ক্রুড প্রোটিন (Digestible Crude Protein, DCP) এর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে কখনও মেটাবলাইজেবল এ্যানার্জি (Metabolizable Energy) এবং রুমেন ডিগ্রেডেবল এবং ননডিগ্রেডেবল প্রোটিন-এর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে করা হচ্ছে। দুটো পদ্ধতিরই সুবিধা বা অসুবিধা আছে। তাছাড়া শুধুমাত্র ফিডিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে প্রাণীর পুষ্টি সরবরাহ অনেক সময় সম্ভবপর হয় না। খাদ্য সরবরাহ পদ্ধতি বা Feeding system অনুসরণও জরুরি।

আমাদের দেশে প্রাপ্ত প্রাণীখাদ্যের বিরাট অংশ কৃষিজ উপজাত। এ সমস্ত খাদ্যের পুষ্টিমান কম। ফলে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সম্পূরক খাদ্য সংযোজন দুটোই প্রয়োজন হয়। সম্পূরক খাদ্য ব্যবহারে খাদ্যের আন্তঃপ্রক্রিয়াসমূহ (feed interactions) প্রাণীর পুষ্টি সরবরাহে তারতম্য সৃষ্টি করে। কৃষিজ উপজাতের মধ্যে খড় জাতীয় খাদ্যই বেশি। খড় জাতীয় খাদ্যে প্রাপ্ত পুষ্টি উপাদান প্রাণীর রুমেনে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে না। ফলে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সম্পূরক খাদ্য সংযোজন প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে আমিষ জাতীয় খাদ্যের যে অংশ রুমেনে ফারমেন্টেশন

হয় তাকে রুমেন ডিগ্রেডিবল প্রোটিন বলে। রুমেন ডিগ্রেডিবল প্রোটিন রুমেন পরিবেশের জন্য এ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। এ ছাড়া খাদ্য প্রোটিনের জন্য একটি অংশ রুমেনে ফারমেন্টেশন না হয়ে খাদ্যনালীর পরবর্তী প্রকোষ্ঠসমূহে পরিপাক হয়ে উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। খাদ্য প্রোটিনের এ অংশটুকুকে রুমেন আনডিগ্রেডিবল প্রোটিন (Rumen undegradable Protein, UDP) বলে। পুষ্টি উৎপাদনের এ হিসেবটি (Agricultural Research Council, U.K. (ARC) কর্তৃক অনুসরণীয়।

খাদ্য তৈরিকরণ প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক ভাবনাগুলো নিম্নরূপ

- কি প্রকার প্রাণীর জন্য খাদ্য তৈরি করতে হবে
- নির্দিষ্ট প্রকার প্রাণীর জন্য কতটুকু শুষ্ক পদার্থ, শক্তি বা আমিষ প্রয়োজন
- সারা বছরে প্রাপ্ত খাদ্যসমূহ এবং তাদের পুষ্টি উপাদানের মাত্রা
- খাদ্য খাওয়ানোর পদ্ধতি নির্বাচন এবং
- খাদ্য খরচ নির্ণয়।

গাভীর খাদ্য

সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত একটি খামারে প্রাপ্ত গাভীর প্রকারভেদ এবং তাদের জন্য খাদ্য

দুধালো গাভীর খাদ্য = দেহ রক্ষার জন্য + দুধ উৎপাদনের জন্য + ওজন হ্রাস/বৃদ্ধির জন্য + ৬ মাসের উর্ধ্বের গর্ভের জন্য।

খাদ্য উপাদানের প্রয়োজনীয়তা

(ক) দৈহিক শুষ্ক পদার্থের প্রয়োজনীয়তা - Dry Matter Intake (DMI)

সূত্র : DMI = দৈহিক ওজন × ০.০৩ অথবা

DMI = দৈহিক ওজন × ০.০২৫ + দুধের ওজন × ০.১

শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ যদি শতকরা 'ক' হয়। তাহলে মোট ঘাস সরবরাহের পরিমাণ = $\frac{\text{DMI} \times 100}{\text{ক}}$

(খ) শক্তির প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় : দুধালো গাভীর যে সমস্ত কারণে শক্তি প্রয়োজন-

- দৈহিক ওজন সংরক্ষণ (MM)
- দৈহিক ওজন হ্রাস/বৃদ্ধির জন্য (Mr/Mg)
- দুধ উৎপাদনের জন্য (M2) এবং
- গাভীর চলাফেরার জন্য।

(গ) প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা

- গাভীর দেহ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টিস্যু প্রোটিন
- দুধ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় টিস্যু প্রোটিন এবং
- দৈহিক ওজন হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন।

(গ) খনিজের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেশে গাভীর পুষ্টি সরবরাহে প্রয়োজনীয় খনিজগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সরবরাহ সবচেয়ে সমস্যাপূর্ণ। বস্তুত আমাদের দেশের প্রাপ্ত খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ ফসফরাস আছে এবং সে তুলনায় ক্যালসিয়াম খুব কম থাকায় দুটি খনিজের ঘাটতি দেখা দেয়। ক্যালসিয়ামের অভাবে অনেক সময় অধিক উৎপাদনশীল ভাল স্বাস্থ্যের গাভী হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং জীবন বাঁচানো ঝুঁকিপূর্ণ ও খরচ বহুল হয়ে যায়। রোগটি মিল্ক ফিভার নামে পরিচিত। এ রোগটির জন্য খাদ্যের ক্যালসিয়াম ঘাটতিই মূল কারণ (খাদ্যে যদি ফসফরাসের প্রাপ্যতায় ঘাটতি থাকে তাহলে ক্যালসিয়ামের উপস্থিতিতেও এরোগ হতে পারে)। এজন্য গাভী গর্ভবতী হওয়ার ৬ মাস বয়স হতে অধিক ক্যালসিয়ামযুক্ত খাদ্য সরবরাহ অপরিহার্য। দানাদার মিশ্রণে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়ামের উৎস হিসেবে নিচের পদার্থগুলো ব্যবহার করা যায়। এগুলো অন্যান্য দানাদার খাদ্যের সাথে শতকরা ৪-৬ ভাগ পর্যন্ত মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

ক) **হাড়ের গুঁড়োঃ** একটি উৎকৃষ্টমানের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের উৎস। কিন্তু উপযুক্তভাবে তৈরি না করা হলে হাড়ের গুঁড়ো হতে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে হাড়ের গুঁড়োর দামও অনেক বেশি। তবে যে সমস্ত গাভী দৈনিক ১৫ লিটারের উপরে দুধ দেয় সেগুলোকে কিছু পরিমাণ হাড়ের গুঁড়ো দেয়া যেতে পারে।

খ) **লাইম স্টোন পাউডারঃ** এ খাদ্যটি বাংলাদেশে এখন পাওয়া যায়। ভারত ও পাকিস্থানে ক্যালসিয়ামের উৎস হিসেবে প্রচুর পরিমানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লাইম স্টোন পাউডার গরুর খাদ্যে শতকরা ৪-৫ ভাগ পরিমাণ মিশেয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

(গ) **ঝিনুকের পাউডারঃ** একটি সহজলভ্য ক্যালসিয়ামের উৎস। তবে মুরগিকে যেভাবে খাওয়ানো হয় সেভাবে গরুকে ঝিনুক খাওয়ানো যাবে না। ঝিনুককে পুরোপুরি পাউডার করে দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে গাভীকে খাওয়াতে হবে।

ঘ) **ডিমের খোসাঃ** ডিমের খোসা একটি উৎকৃষ্টমানের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের উৎস। যাদের ২/৪ টি গাভী আছে তারা নিকটবর্তী চায়ের দোকান অথবা হোটেল থেকে ডিমের খোসা সংগ্রহ করে সহজেই খাওয়াতে পারেন। এ ছাড়া হোটেলের মাংস ও মাছের কাঁটা শুকিয়ে গুঁড়ো করে গবাদিপ্রাণীর খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সবসময় ফ্রেশ ডিমের খোসা ব্যবহার করতে হবে।

ঙ) **ডাইক্যালসিয়াম ফসফেটঃ** এ ধরনের খনিজ বাজারে ক্যালসিয়াম ফসফরাসের উৎস হিসাবে পাওয়া যায় এবং গো-খাদ্যে ব্যবহার করা যায়। তবে এর দাম তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

দুধের উৎপাদনভিত্তিকে দানাদার খাদ্যের হিসাব

দুধেল গাভীর জন্য মিশ্রিত দানাদার খাদ্যে শক্তি ও আমিষের ঘনত্ব প্রতি কেজি শুষ্ক পদার্থ যথাক্রমে ১১.০-১৩.০ মেগাজুল ও ১৫০-১৯০ গ্রাম থাকা প্রয়োজনীয়। গাভীকে প্রয়োজন মোতাবেক সবুজ ঘাস বা প্রক্রিয়াজাতকরণ খড় খাওয়ালে দৈনিক দুধ উৎপাদনের ভিত্তিতে দানাদার মিশ্রণের প্রয়োজনীয়তার সমীকরণ এবং ৬ মাসের উর্ধ্বে গর্ভের জন্য মোট দানাদার মিশ্রণের পরিমাণ দেয়া হলো-

সারণি ১ : বিভিন্ন মাত্রায় দুধ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ওজনের দুধেল ও গর্ভবর্তী গাভীর খাদ্যে প্রয়োজনীয় দানাদার খাদ্যের মাত্রা

দৈনিক ওজন (কেজি)	প্রয়োজনীয় দানাদার খাদ্যের সমীকরণ [C= দানাদার খাদ্য (কেজি) + (Milk in Kg)]	দৈনিক দুধ উৎপাদন মাত্রা (Milk in Kg)	>৬.০ মাস গর্ভের জন্য দানাদারের প্রয়োজন (কেজি)
৩০০	C = 0.5+0.7 Milk	<৫.০	১.০
৩৫০	C = 0.7+0.4 Milk	<৮.০	১.০
৪০০	C = 2.0+0.4 Milk	<১২.০	১.০-১.৫০
৪৫০	C = 3.0+0.3 Milk	<১৫.০	১৫.০-১.০-১.৫

দুধালো গাভীর দৈনিক শুষ্ক পদার্থ, শক্তি ও আমিষের পরিমাণ এবং সবুজ ঘাস ও দানাদার মিশ্রণে তৈরি খাদ্য বিভিন্ন বয়স ও দুধ উৎপাদনের ভিত্তিতে ২ নং সারণিতে প্রদান করা হলো।

সারণি ২ : ওজন, দুধ উৎপাদন এবং গর্ভাবস্থার ভিত্তিতে গাভীর প্রয়োজনীয় দৈহিক পুষ্টি ও খাদ্যের পরিমাণ (আঁশজাতীয় খাদ্যে সবুজ ঘাসের হিসাবকৃত) পর্ব (এ)

গাভীর ওজন (কেজি)	দুধ উৎপাদন হার গ্রাম/দিন	প্রয়োজনীয় শক্তি			খাবার			
					আঁশজাতীয় খাবার (কেজি)		দানাদার খাবার (কেজি)	
		শুষ্ক পদার্থ (কেজি)	শক্তি (মেগাজুল)	প্রোটিন (গ্রাম/দিন)	গর্ভবতী নয়	গর্ভবতী >৬ মাস	গর্ভবতী নয়	গর্ভবতী >৬ মাস
২৫০	০.০	৭.৫০	৩১.০	৩১২	৩৪.০	৩০.০	-	১.০
২৫০	১.০	৭.৫০	৩১.০	৩১২	৩৪.০	৩০.০	-	১.০
২৫০	২.০	৭.৫০	৪২.০	৪৬১	৩০.০	৩০.০	১.০	১.০
২৫০	৩.০	৭.৫০	৪৭.০	৫৩৪	২৬.০	২৬.০	২.০	-
২৫০	৫.০	৭.৫০	৫৮.০	৬৮২	২২.০	২২.০	৩.০	-

গাভীর ওজন (কেজি)	দুধ উৎপাদন হার গ্রাম/ দিন	প্রয়োজনীয় শক্তি			খাবার			
					আঁশজাতীয় খাবার (কেজি)		দানাদার খাবার (কেজি)	
		শুষ্ক পদার্থ (কেজি)	শক্তি (মেগাজুল)	প্রোটিন (গ্রাম/দিন)	গর্ভবতী নয়	গর্ভবতী >৬ মাস	গর্ভবতী নয়	গর্ভবতী >৬ মাস
২৫০	৫.০	৭.৫০	৫৮.০	৬৮২	২২.০	২২.০	৩.০	-
৩০০	১.০	৯.০	৩৬.০	৩৫৮	৪০.০	৩৬.০	-	-
৩০০	১.০	৯.০	৪১.০	৪৩১	৪০.০	৩৬.০	-	১.০
৩০০	২.০	৯.০	৪৭.০	৫০৬	৩৬.০	৩৬.০	১.০	১.০
৩০০	৩.০	৯.০	৫২.০	৫৮০	৩২.০	৩২.০	২.০	২.০
৩০০	৪.০	৯.০	৫৭.০	৬৫৩	৩২.০	৩২.০	২.০	-
৩০০	৫.০	৯.০	৩৬.০	৭২৮	৩২.০	৩২.০	৩.০	-
৩৫০	০.০	১০.৫	৪০.০	৪০০	৪০.০	৩৬.০	১.০	২.০
৩৫০	১.০	১০.৫	৪৫.০	৪৭৪	৪০.০	৩৬.০	১.০	২.০
৩৫০	২.০	১০.৫	৫১.০	৫৪৯	৪০.০	৩৬.০	১.০	২.০
৩৫০	৩.০	১০.৫	৫৬.০	৬২২	৩৬.০	৩২.০	২.০	৩.০
৩৫০	৪.০	১০.৫	৬১.০	৬৯৫	৩৬.০	৩০.০	২.০	৪.০
৩৫০	৫.০	১০.৫	৬৮.০	৭৭২	৩৪.০	৩০.০	৩.০	৪.০
৩৫০	৬.০	১০.৫	৭২.০	৮৪৪	৩৪.০	-	৩.০	-
৩৫০	৭.০	১০.৫	৭৭.০	৯১৭	৩২.০	-	৪.০	-
৩৫০	৮.০	১০.৫	৮৩.০	৯৯২	৩২.০	-	৪.০	-
৪০০	০.০	১২.০	৪৫.০	৪৪৪	৪০.০	৩৬.০	২.০	৪.০
৪০০	১.০	১২.০	৫০.০	৫১৮	৪০.০	৩৬.০	২.০	৪.০
৪০০	২.০	১২.০	৫৬.০	৫৯৩	৪০.০	৩৬.০	২.০	৪.০
৪০০	৩.০	১২.০	৬১.০	৬৬৬	৪০.০	৩৬.০	৩.০	৪.০
৪০০	৪.০	১২.০	৬৬.০	৭৩৯	৪০.০	৩৪.০	৪.০	৫.০
৪০০	৫.০	১২.০	৭২.০	৮১৪	৪০.০	৩৪.০	৪.০	৫.০
৪০০	৬.০	১২.০	৭৭.০	৮৮৭	৩৪.০	৩৪.০	৫.০	৫.০
৪০০	৭.০	১২.০	৮২.০	৯৬১	৩৪.০	-	৫.০	-
৪০০	৮.০	১২.০	৮৮.০	১০৩৬	৩৪.০	-	৫.০	-
৪০০	৯.০	১২.০	৯৩.০	১১১০	৩৪.০	-	৫.০	-
৪০০	১০.০	১২.০	৯৮.০	১১৮৩	৩০.০	-	৬.০	-
৪০০	১১.০	১২.০	১০৩.০	১২৫৭	৩০.০	-	৬.০	-
৪০০	১২.০	১২.০	১০৯.০	১৩৩২	৩০.০	-	৬.০	-

সারণি ২ : ওজন, দুধ উৎপাদন এবং গর্ভাবস্থার ভিত্তিতে গাভীর প্রয়োজনীয় দৈহিক পুষ্টি ও খাদ্যের পরিমাণ (আঁশজাতীয় খাদ্যে সবুজ ঘাসের হিসাবকৃত) পর্ব (বি)

গাভীর ওজন (কেজি)	দুধ উৎপাদন হার গ্রাম/ দিন	প্রয়োজনীয় শক্তি আঁশজাতীয় খাবার (কেজি)			খাবার			
					দানাদার খাবার (কেজি)			
		শুষ্ক পদার্থ (কেজি)	শক্তি (মেগাজুল)	প্রোটিন (গ্রাম/দিন)	গর্ভবতী নয়	গর্ভবতী >৬ মাস	গর্ভবতী নয়	গর্ভবতী >৬ মাস
৪৫০	০.০	১২.০	৪৯.০	৪৮৫	৪০.০	৩৬.০	২.০	৩.০
৪৫০	১.০	১২.০	৫৪.০	৫৫৮	৪০.০	৩৬.০	২.০	৩.০
৪৫০	২.০	১২.০	৬০.০	৬৩৩	৪০.০	৩৬.০	২.০	৩.০
৪৫০	৩.০	১২.০	৬৫.০	৭০৭	৪০.০	৩৪.০	৩.০	৪.০
৪৫০	৪.০	১২.০	৭১.০	৭৮২	৪০.০	৩৪.০	৩.০	৪.০
৪৫০	৫.০	১২.০	৭৬.০	৮৫৬	৩৬.০	৩২.০	৪.০	৫.০
৪৫০	৬.০	১২.০	৮১.০	৯২৯	৩৬.০	৩২.০	৪.০	৫.০
৪৫০	৭.০	১২.০	৮৭.০	১০০৪	৩৪.০	-	৫.০	-
৪৫০	৮.০	১২.০	৯২.০	১০৭৭	৩৪.০	-	৫.০	-
৪৫০	৯.০	১২.০	১০২.২	১১৫০	৩০.০	৩০.০	-	৬.০
৪৫০	১০.০	১২.২	১০৩.০	১২২৫	৩০.০	-	৬.০	৩.০
৪৫০	১১.০	১২.২	১০৮.০	১২৯৯	৩৪.০	-	৭.০	-
৪৫০	১২.০	১২.৫	১১৩.০	১৩৭২	৩৪০	-	৭.০	-
৪৫০	১৩.০	১২.৫	১১৯.০	১৪৪৭	৩৪০	-	৭.০	-
৪৫০	১৪.০	১৩.০	১২৪.০	১৫২১	৩৪০	-	৭.০	-
৪৫০	১৫.০	১৩.০	১২১.৯০	১৫৯৮	৩৪০	-	৭.০	-
৫০০	০.০	১৩.০	৫৪.০	৫২৫	৪৫.০	৪০.০	৩.০	৪.০
৫০০	১.০	১৩.০	৫৯.০	৫৯৮	৪৫.০	৪০.০	৩.০	৪.০
৫০০	২.০	১৩.০	৬৫.০	৬৭৩	৪৫.০	৪০.০	৩.০	৪.০
৫০০	৩.০	১৩.০	৭০.০	৭৪৭	৪৫.০	৪০.০	৩.০	৪.০
৫০০	৪.০	১৩.০	৭৫.০	৮২২	৪৫.০	৪০.০	৩.০	৪.০
৫০০	৫.০	১৩.০	৮১.০	৮৯৬	৪০.০	৪০.০	৩.০	৪.০
৫০০	৬.০	১৩.০	৮৬.০	৯৬৯	৪০.০	৪০.০	৪.০	৪.০
৫০০	৭.০	১৩.০	৯১.০	১০৪৪	-	৪০.০	৪.০	৪.০
৫০০	৮.০	১৩.০	৯৭.০	১১১৭	-	৪০.০	৫.০	৫.০
৫০০	৯.০	১৩.০	১০২.০	১১৯০	-	৪০.০	৫.০	৫.০
৫০০	১০.০	১৪.০	১০৭.০	১২৬৫	-	-	৫.০	-
৫০০	১১.০	১৪.০	১১৩.০	১৩৩৯	-	-	৫.০	-
৫০০	১২.০	১৪.০	১১৮.০	১৪১২	-	-	৫.০	-
৫০০	১৩.০	১৪.০	১২৩.০	১৪৮৭	-	-	৬.০	-
৫০০	১৪.০	১৪.০	১২৯.০	১৫৬১	-	-	৬.০	-
৫০০	১৫.০	১৪.০	১৩৪.০	১৬৩৪	-	-	৭.০	-
৫০০	১৬.০	১৪.০	১৩৯.০	১৭০৩	-	-	৭.০	-
৫০০	১৭.০	১৪.০	১৩৪.০	১৭৮৩	-	-	৮.০	-
৫০০	১৮.০	১৫.০	১৫০.০	১৮৬৫	-	-	৮.০	-
৫০০	১৯.০	১৫.০	১৫৬.০	১৯৩১	-	-	৮.০	-
৫০০	২০.০	১৫.০	১৬১.০	২০০৫	-	-	৮.০	-

বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

খাদ্য সরবরাহের ভিত্তিতে বাছুরের বয়সকালকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(ক) ক্লোস্ট্রাম ফিডিং পিরিয়ড

বাছুর প্রয়োজনমতো ক্লোস্ট্রাম খাবে। অন্য কোনো খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা নেই। এ সময় জন্ম থেকে ৭ দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

(খ) সাকলিং পিরিয়ড

- আমাদের দেশে এ সময়কাল সাধারণত ১৮০ দিন বাছুরের বয়স পর্যন্ত ধরা যেতে পারে
- মায়ের সাথে থেকে পরিমাণ মত দুধ খাবে
- কাফ স্টার্টার (শতকরা ১৬-১৮ ভাগ আমিষ, ৭.১০ ভাগ আঁশ, ০.৬-০.৭ ভাগ ক্যালসিয়াম, ০.৪-০.৫ ভাগ ফসফরাস, ০.১৫-০.২০ ভাগ ম্যাগনেসিয়াম এবং ০.০৭-০.০৮ ভাগ সোডিয়াম থাকা আবশ্যক) খেতে দিতে হবে
- পরিমাণ মত উন্নত মানের ঘাস সরবরাহ করতে হবে।

(গ) পোস্ট উইনিং পিরিয়ড

- তিন মাস বয়স হতেই বাছুরকে আঁশ জাতীয় খাদ্যে অভ্যস্থ করতে হবে
- নির্দিষ্ট পরিমাণ উন্নতমানের দানাদার মিশ্রণ সরবরাহ করতে হবে
- আস্তে আস্তে বাড়ন্ত গরুর খাদ্যে রূপান্তর করতে হবে।

সারণি ৩ : বাছুরের তিন মাস বয়স পর্যন্ত খাদ্য তালিকা

বয়স	দুধ (কেজি)	স্কিম মিল্ক (কেজি)	কাফ-সার্টার (গ্রাম)	কচিঘাস/হে (গ্রাম)	দৈনিক খাদ্য সরবরাহ
প্রথম তিন দিন	২.৫০ (কলোস্ট্রাম)	-	-	-	৩ বার
৪র্থ-৭ম দিন	২.৫	-	-	-	৩ বার
২য় সপ্তাহ	৩.০০	-	৫০	২৫০	২ বার
৩য় সপ্তাহ	২.২৫	-	১০০	৩৫০	২ বার
৪র্থ সপ্তাহ	৩.০০	-	৩০০	৫০০	২ বার
৫ম সপ্তাহ	১.৫০	১.০০	৪০০	৫০০	২ বার
৬ষ্ঠ সপ্তাহ	-	২.৫০	৬০০	৬০০	২ বার
৭ম সপ্তাহ	-	২.০০	৭০০	৭০০	২ বার
৮ম সপ্তাহ	-	১.৭৫	৮০০	৮০০	২ বার
৯ম সপ্তাহ	-	১.২৫	১০০০	১০০০	২ বার
১০ম সপ্তাহ	-	-	১২০০	১১০০	২ বার
১১ সপ্তাহ	-	-	১৩০০	১২০০	২ বার
১২ সপ্তাহ	-	-	১৪০০	১৪০০	২ বার

দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে দুধ সরবরাহ

- প্রথম তিন সপ্তাহ দৈহিক ওজনের ১/১০ অংশ
- পরবর্তী দুই সপ্তাহ দৈহিক ওজনের ১/১৫ অংশ
- পঞ্চম সপ্তাহের পর দৈহিক ওজনের ১/২০ অংশ

অতিরিক্ত দুধ সরবরাহ করা হলে বাছুরের পেট খারাপ হয় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় সজাগ দৃষ্টি না রাখলে বাছুর অন্যান্য জীবাণু কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারে।

- দুধ অথবা কাফ-সার্টারের সাথে মিশিয়ে এন্টিবায়োটিক দিতে হবে
- খনিজ ব্লক সর্বদা চেটে খাওয়ার জন্য বাছুরের নিকট রাখা যেতে পারে
- জন্ম থেকে এক বছর পর্যন্ত বাছুরের খাওয়ানোর নিয়ম ও পরিমাণ ৩, ৪ এবং ৫ নং সারণিতে দেয়া হলো।

সারণি ৪ : কাফ-স্টার্টারের মিশ্রণ

খাদ্য উপাদান	স্টার্টার নং (শতকরা অংশ)			
	১	২	৩	৪
গম/ভুট্টা ভাঙ্গা	২০.০	৩০.০	৪৭.০	২৫.০
খেসারি ভাঙ্গা	২০.০	-	-	১৫.০
গমের ভুসি	-	৩০.০	১০.০	২০.০
তিলের খৈল	৩০.০	২০.০	২০.০	১২.০
ফিসমিল	৭.৭৫	-	-	১০.০
স্কিম মিল্ক পাউডার	২০.০	১৭.০	২০.০	১৫.৫
লবণ	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫
খনিজ (বাজার হতে ক্রয়কৃত)	২.০	২.০	২.০	২.০
এ্যান্টিবায়োটিক	২.০	২.০	২.০	২.০
ভিটামিন	০.০১	০.০১	০.০১	০.০১

খামারি পর্যায়ের সমস্যা

খামারি পর্যায়ে যতদিন গাভীর দুধ পর্যাপ্ত থাকে ততদিন খামারির ইচ্ছায় অথবা গাভীর কারচুপির জন্য বাছুর প্রয়োজন মাফিক দুধ পায়। গাভীর দুধ উৎপাদন সাধারণত ৬ মাসের পর কমে যায় এবং খামারিও বাছুরের দুধ পান সীমিত করে দেয়। কিন্তু এ বয়সে বাছুরের উন্নত মানের আঁশ জাতীয় ও দানাদার খাদ্য প্রয়োজন হলেও খামারি খেয়াল করেন না। বাছুর যে সমস্ত খাদ্য পায় তার মধ্যে অন্যতম থাকে খড়জাতীয় নিম্নমানের খাদ্য। ফলে বাছুর ধীরে ধীরে অপুষ্টিতে ভুগতে শুরু করে।

দুগ্ধ খামার পর্যায়ের সমস্যা

খামারে এক সাথে অনেক বাছুর রাখা হয় এবং দুধ উৎপাদনকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। ফলে প্রায়ই বাছুরের দুধ সরবরাহ হ্রাস পায়, অন্যদিকে অধিক দুধ উৎপাদনশীল গাভীর দুধ হাতে দোহানের ফলে বাছুর প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধও পান করে। ফলে বাছুরের অনেক সময় পেট খারাপ হয়। এতে আক্রান্ত বাছুরটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। একটি বাছুর অসুস্থ হলে অন্যগুলো অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত বাছুর নানান রোগে ভুগে। এরপর খামার পর্যায়ের ভাল ব্যবস্থাপনার কারণে বাছুরের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিম্নে দেয়া হলো।

সারণি ৫ : বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাছুরের খাদ্য পরিবেশন

বাছুরের বয়স (সপ্তাহ)	পরিবেশন যোগ্য খাদ্য উপাদান
১৩-১৬	দিনে দু'বার দুধ পান করাতে হবে। একই সাথে মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম দানাদার ও ১.০ কেজি সবুজ ঘাস খাওয়াতে হবে।
১৭-২০	দুধ পান দিনে দু'বার। একই সাথে মাথাপিছু ৭৫০ গ্রাম ও ৩.০ কেজি সবুজ ঘাস দিতে হবে।
২১-২৪	দুধ পান দিনে দু'বার। একই সাথে ১.০ কেজি দানাদার খাদ্য ও ৫.০-৭.০ কেজি সবুজ ঘাস দিতে হবে।
২৫-৩৫	দুধ পান বন্ধ করতে হবে। কিন্তু ১.০-১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য ৫.০-৭.০ কেজি সবুজ ঘাস ও কিছু খড় দিতে হবে।
৩৬-৫০	১.৫-২.০ কেজি দানাদার খাদ্য ১০.০-১২.০ কেজি সবুজ ঘাস ও ১.০-২.০ কেজি খড় দিতে হবে।

বাছুরের ৬ মাস বয়সের পর থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তাদের ওজনের ১% হারে দানাদার খাবারের সাথে ইউ.এম.এস. অথবা সাইলেজ বা সবুজ ঘাস বা ইউরিয়া দ্বারা সংরক্ষিত খড় খাওয়ালে ভাল দৈহিক ওজন বৃদ্ধি আশা করা যায়। এ সময়ে গরুকে খাওয়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার দানাদার মিশ্রণ ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া গরুকে খাওয়ানোর জন্য যে বিভিন্ন প্রকার আঁশ জাতীয় খাবার খাওয়ানো যায় তা হলো ইউরিয়া-মোলাসেস খড় (ইউ এম এস), ইউরিয়া সংরক্ষিত খড় এবং কাঁচা ঘাস (যেমন, নেপিয়ার, পারা, ভুট্টা, ওট, সরগম এবং ডাল জাতীয় ঘাস, খেসারি, মাষকালাই, ইপিল-ইপিল, ইত্যাদি)। ঘাস খড়ের সাথে মিশিয়ে বা অডাল ও ডাল জাতীয় ঘাস মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

এগুলোর একটি তালিকা ৬নং সারণিতে দেয়া হলো-

সারণি ৬ : বাড়ন্ত/বয়স্ক গরুর জন্য সম্ভাব্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ (গ্রাম/ কেজিগ্রাম)

উপাদান	মিশ্রণ-১	মিশ্রণ-২	মিশ্রণ-৩	মিশ্রণ-৪	মিশ্রণ-৫
চালের খুদ	-	-	-	২০০	১০০
গম ভাঙ্গা	-	১৫০	১৫০	-	-
খেসারি ভাঙ্গা	-	-	-	-	২২০
গম ভুসি	৫৪০	২৩০	২৩০	১৫০	১৫০
চালের কুঁড়া	-	৩০০	৩০০	১৮০	২৫০
খেসারি ভুসি	২০০	১০০	১০০	-	-
মসুরের ভুসি	-	-	-	২৪০	-
তিলের খৈল	১৫০	-	-	১৫০	-
নারিকেলের খৈল	-	-	-	-	২০০
সরিষার খৈল	-	১৪০	১৪০	-	-
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	৮০	৫০	৫০	৫০	৫০
লবণ	৫	৫	৫	৫	৫
ঝিনুকের গুঁড়া	২৫	২৫	২৫	২৫	২৫
মোট	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
পুষ্টিমান এম ই					
(মেগাজুল প্রতি কেজি)	১০.৭১	১১.২৬	১০.৮৮	১১.০৪	১১.০৬
প্রোটিন (গ্রাম/কেজি)	২০৭	১৮৭	১৮৩	১৮১	১৮৪

প্যাকেজের উদ্ভাবক : ড. খান শহীদুল হক

বাছুর পালন

বাছুর লালন পালনের গুরুত্ব

বাছুর উন্নয়নকে সাধারণত পালের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কারণ আজকের বাছুর আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। বাছুর লালন-পালন যদি যথাযথভাবে না করা হয় তবে ভবিষ্যৎ উৎপাদন হ্রাস পাবে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গাভীর উৎপাদন ক্ষমতা বজায় থাকে। পর্যায়ক্রমে উন্নত জাত এবং উৎপাদনশীল গাভী দ্বারা কম উৎপাদনশীল গাভীকে অপসারণের মাধ্যমেই উচ্চ উৎপাদনশীল পাল গঠন করা সম্ভব। তাই বাছুর লালন-পালন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

বাছুরের গর্ভকালীন যত্ন

বাছুরের গর্ভকালীন যত্ন বলতে প্রধানত মায়ের যত্নই বুঝায়। এক্ষেত্রে গর্ভবতী গাভীকে অন্তত গর্ভের শেষ তিনমাস পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ করতে হবে। দুধ দোহানো হলে ধীরে ধীরে শেষ তিন মাসে শুকিয়ে ফেলতে হবে। গাভীকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং পরিছন্ন পরিবেশে রাখতে হবে। অন্য গরুর সাথে যেন মারামারি না করে তা খেয়াল রাখতে হবে। প্রসব নিকটবর্তী হলে মেটারনিটি পেন বা আলাদা স্থানে রাখতে হবে।

জন্মের প্রাক্কালে যত্ন

অবশ্যই আলাদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো জায়গাতে রাখতে হবে। অপরিষ্কার স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাতে বাছুর প্রসব করলে বাছুরের বিভিন্ন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে। স্বাভাবিক প্রসবের লক্ষণ ব্যতীত অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পেলে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য। এ সময় শুকনো খড় বিছিয়ে দিয়ে পাশে পর্যাপ্ত খাওয়ার পানির ব্যবস্থা করতে হবে।

জন্মের পর বাছুরের যত্ন

জন্মের পর পরই বাছুরকে শুকনো খড়কুটো বা ছালার উপর রাখতে হবে। বাছুরের নাক ও মুখমন্ডল হতে লালা বা ঝিল্লি (Mucous) পরিষ্কার করতে হবে। নতুবা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি বাছুরের শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তবে বুকের পাঁজরের হাড়ে আস্তে

আস্তে কিছুক্ষণ পর পর কয়েক বার চাপ প্রয়োগ করতে হবে। বাছুরের নাকে, মুখে, নাভীতে ফু দিলেও ভালো ফল পাওয়া যায়। প্রয়োজনে শ্বাস-প্রশ্বাস বর্ধনকারী ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। জন্মের সাথে সাথে বাছুরের নাভীতে কিছু এন্টিসেপটিক যেমন টিংচার আয়োডিন, ডেটল বা সেভলন লাগাতে হবে। ফলে ধনুষ্টংকার, নাভী ফুলা, ইত্যাদি হবার সম্ভাবনা থাকে না। গাভী যেন তার বাছুরকে চাটতে (লেহন) পারে সে সুযোগ দিতে হবে অথবা শুকনো খড় বা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে শরীর মুছে দিতে হবে। এ অবস্থায় বাছুরকে পানি দিয়ে ধৌত করা সমীচীন হবে না। কারণ পানির সংস্পর্শে আসলে বাছুরের ঠান্ডা লেগে যেতে পারে এবং নানা ধরনের রোগের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। বাছুর উঠে দাঁড়ালে শালদুধ খাওয়াতে হবে।

বাছুরের বাসস্থান

বাছুরের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান বাছুরকে রোগমুক্ত রাখার প্রধান সহায়ক। বাছুরকে রোগমুক্ত রাখার জন্য তাদেরকে পৃথক প্রকোষ্ঠে রাখতে হবে এবং এর ফলে প্রতিটি বাছুরের রক্ষণাবেক্ষণ সহজতর হয়। অনেক বাছুর একসাথে রাখলে দুর্বল বাছুরগুলো সবল বাছুরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রয়োজনমাফিক খাবার খেতে পারে না এবং আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। বাছুরের ঘর ঢালু এবং শুকনো ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। বাসস্থানে আলো বাতাস সরাসরি প্রবেশের ব্যবস্থা থাকা উচিত। গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম ও শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা দ্বারা বাছুরগুলো যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ঘরের মেঝেতে শুকনো খড় বা ছালার চট বিছিয়ে দিতে হবে। প্রতিটি বাছুরের জন্য ৬ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি মাপের ঘরের প্রয়োজন। গ্রামীণ পর্যায়ে বাঁশ ও কাঠের সাহায্যে অতি সহজেই ঘর নির্মাণ করা সম্ভব। ঘরে খাদ্য ও পরিষ্কার পানি সরবরাহ করার জন্য পাত্র রাখতে হবে।

বাছুরের অন্যান্য যত্ন

বাছুরের প্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সময়মত খাদ্য ও পানি সরবরাহের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। রোগ প্রতিরোধক টিকা দিতে হবে। বৃহৎ খামারে প্রতিটি বাছুরকে আলাদা করে চেনার জন্য প্রয়োজনীয় ট্যাগ নম্বর দিতে হবে। বাছুর বড় হওয়ার সাথে সাথে শিং কেটে ফেলাই উত্তম। না হলে বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বাছুরের খাদ্যঃ বয়স ভেদে বাছুরের খাদ্য তিন ধরনের হতে পারে।

জন্মের পর থেকে সাত দিনঃ এ সময় বাছুর প্রয়োজনমত কলোস্ট্রাম, কাঁচিদুধ বা শালদুধ খাবে। অন্য কোনো খাবার না দিলেও চলবে।

এক সপ্তাহ বয়স হতে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত (৫-৬ মাস বয়স)

এ সময় বাছুরকে দুধের সাথে কাফ স্টার্টার দেয়া উচিত। দুধ খেলে ভিটামিন না দিলেও চলবে। কাফ স্টার্টার না দিলে বাছুরকে পরিমাণমত উন্নতমানের আঁশ জাতীয় খাবার সরবরাহ করতে হবে। কাফ স্টার্টারে নিম্নলিখিত পুষ্টি উপাদানসমূহ থাকতে হবে।

সারণি ১: : কাফ স্টার্টারের পুষ্টি উপাদান

পুষ্টি উপাদান	পরিমাণ (%)
আমিষ	১৬-১৮
আঁশ জাতীয় খাবার	৭-১০
ক্যালসিয়াম	০.৬-০.৭
ফসফরাস	০.৪-০.৫
ম্যাগনেসিয়াম	০.১৫-০.২০
সোডিয়াম	০.০৭-০.০৮

দুধ ছাড়ানোর পরবর্তীকাল

ট্রানজিশন পিরিয়ড বা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন সময়ের মাঝামাঝি হতে বাছুরকে ক্রমে আঁশ জাতীয় খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল হতে রপ্ত করতে হবে যাতে দুধ ছাড়ানোর পর বাছুর পুরোপুরি আঁশ জাতীয় খাদ্য নির্ভর হতে পারে। এ সময় আঁশ জাতীয় খাদ্যের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ দানাদার খাদ্যের মিশ্রণও সরবরাহ করতে হবে। বাছুরের এ সময়ের রসদ বাড়ন্ত গরুর অনুরূপ হবে।

বাছুরকে খাওয়ানোর পদ্ধতি

বাছুর জন্মের পরপরই বাছুরের ব্যবস্থাপনা এবং খাবার প্রণালী নিম্নরূপ হবেঃ

১. গাভীর গর্ভধারণের ২৭৮-২৯০ দিন (গড়ে ২৮৩) দিনের মধ্যে বাছুরের জন্ম আশা করা যায়

২. বাছুরের জন্মের পরপরই ফিটাল মেমব্রেন ও শ্লেষ্মা নাক মুখ থেকে সরিয়ে নেয়া উচিত

৩. জন্মের পরপরই বাছুরকে মায়ের শালদুধ (কলোস্ট্রাম) খাওয়াতে হবে।

শালদুধ খাওয়ানোর নিয়ম হলো, দৈনিক প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য ১০ কেজি অর্থাৎ ২০-২৫ কেজি ওজনের বাছুরের জন্য দৈনিক ১.২-১.৫ কেজি শালদুধ খাওয়াতে হবে। অবশ্যই আধ ঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টার মধ্যে এই দুধ খাওয়ানো শুরু করা উচিত। এই দুধ খাওয়ালে বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বাছুরকে প্রথম দিন উপরোক্ত নিয়মে খাওয়ানোর পর পরবর্তী প্রায় তিন মাস পর্যন্ত নিম্নের ছকে বর্ণিত খাবারপদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

সারণি ২ : জন্মের পর হতে তিন মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরকে খাওয়ানোর নিয়ম

বয়স (সপ্তাহ)	প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য দুধ	প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য দানাদার	কচি ঘাস/ ইউএমএস
১-২	১০	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৩-৪	৮	০.৫	সামান্য পরিমাণ
৫-৬	৬	১.০	প্রচুর পরিমাণ
৭-৮	৪	১.৫	প্রচুর পরিমাণ
৯-১০	২	২.০	প্রচুর পরিমাণ
১১-১২	০	২.৫	প্রচুর পরিমাণ

দুধ খাওয়ানো

সাধারণত প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য ৮ লিটার পরিমাণ দুধ খাওয়ানো উচিত। অর্থাৎ ৪০ কেজি ওজনের বাছুরের জন্য প্রায় ৩-৩.৫ লিটার দুধ খাওয়ানো উচিত। উর্পযুক্ত নিয়মানুসারে প্রায়তিন মাসের মধ্যে বাছুরকে দুধ ছাড়ানো যায়। এরপরও দুধ খাওয়ালে কোনো অসুবিধা নেই। তবে এ সময় বেশি দুধ খাওয়ানোতে আর্থিক অপচয় হয়। আমাদের দেশে বাছুরকে মোটামুটি ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে দুধ ছাড়ানো হয়।

বাছুরের দানাদার খাদ্য

এই দানাদার মিশ্রণ কম আঁশ যুক্ত এবং উচ্চ প্রোটিন ও উচ্চ শক্তি সম্পন্ন হতে হয়। দানাদার খাদ্যের দুটি ফর্মুলা নিচে দেয়া হলো।

সারণি ৩ : বাছুরের জন্য কাফ স্টার্টার (% হিসাবে)

উপাদান	১ নং	২ নং
গমের ভুসি	২৫	-
গম/চাল ভাঙ্গা	২০	২০
মাষকালাই/ খেসারি ভাঙ্গা	২৫	২৫
তিলের খৈল	১৫	-
নারিকেলের খৈল	-	১৫
ঢেঁকিছাটা চালের কুঁড়া	-	২৫
শুটকি মাছের গুঁড়া	৭	৭
চিটাগুড়	৫	৫
লবণ	১.৫	১
ঝিনুক/হাড়ের গুঁড়া	১	১.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫	০.৫
	১০০	১০০

কচি ঘাস অথবা ইউ এম এস

ছোট বাছুরকে কচি ঘাস, ডালজাতীয় ঘাস ইত্যাদি খাওয়ানো যেতে পারে। তবে অভ্যাস করলে ইউরিয়া মোলাসেস খড় বা ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাতকৃত খড় খাওয়ানো যেতে পারে। দৈহিক ওজনের ১.৫% হারে পূর্বে উল্লেখিত দানাদার খাবারের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস বা খড় খাওয়ালে মোটামুটি ভাল ফল আশা করা যায়।

বাড়ন্ত গরুকে খাওয়ানোর পদ্ধতি

বাছুরের বয়স মোটামুটি ৬ মাস বয়সের পর থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তাদের ওজনের ১% হারে দানাদার খাবারের সাথে ইউ এম এস বা সাইলেজ বা সবুজ ঘাস বা ইউরিয়া সংরক্ষিত খড় খাওয়ালে ভাল দৈহিক ওজন বৃদ্ধি আশা করা যায়।

সারণি ৪ : বাড়ন্ত, বয়স্ক গরুর জন্য সম্ভাব্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ (গ্রাম)

উপাদান	মিশ্রণ-১	মিশ্রণ-২	মিশ্রণ-৩	মিশ্রণ-৪	মিশ্রণ-৫
চালের খুদ	-	২০০	-	২০০	১০০
গম ভাংগা	-	-	১৫০	-	-
খেসারি ভাংগা	-	-	-	-	২৫০
গমের ভুসি	৫৪০	৩০০	২৫০	১৫০	১৫০
চালের কুঁড়া	-	২৫০	৩০০	২০০	২৫০
শুঁটকি মাছের গুঁড়া	৮	৫০	৫০	৫০	৫০
লবণ	৫	৫	৫	৫	৫
ঝিনুকের গুঁড়া	৫	৫	৫	৫	৫
মোট	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
পুষ্টিমান এম ই (মেগাজুল প্রতি কেজি)	১০.৭১	১১.২৬	১০.৮৮	১১.০৪	১১.০৬
প্রোটিন (গ্রাম/কেজি)	২০৭	১৮৭	১৮৩	১৮১	১৮৪
দাম (টাকা/ কেজি)	৭.৮৫	৭.৫৫	৭.৭৪	৭.৭০	৭.৭৭

বিএলআরআই- এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, ইউ এম এস বা ইউরিয়া সংরক্ষিত খড়ের সাথে ১.৫ কেজি গমের ভুসি এবং ১০০ গ্রাম শুটকি মাছের গুঁড়া ব্যবহার করে গরুর দৈনিক প্রায় ৭০০ গ্রাম ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে গরুকে খাওয়ানোর জন্য যে বিভিন্ন প্রকার দানাদার মিশ্রণ হতে পারে তার একটি তালিকা নিচে দেয়া হলো (এক কেজি মিশ্রণের পরিমাণ)। তাছাড়া গরুকে খাওয়ানোর জন্য যে বিভিন্ন প্রকার আঁশ জাতীয় খাবার খাওয়ানো যেতে পারে তা হলো ইউরিয়া- মোলাসেস খড় (ইউ এম এস), ইউরিয়া সংরক্ষিত খড় এবং কাচা ঘাস (যেমন নেপিয়ার, পারা, ভুট্টা, ওট, সরগম এবং ডাল জাতীয় ঘাস, খেসারি, মাষকলাই, ইপিল ইপিল ইত্যাদি)। এই ঘাস খড়ের সাথে মিশিয়ে বা সাধারণ ঘাস ও ডাল জাতীয় ঘাস মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া কখনই ডাল জাতীয় ঘাসকে এককভাবে খাওয়ানো ঠিক নয়, অন্য ঘাস বা খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো উচিত।

৫নং সারণিতে বিভিন্ন ঘাসের মিশ্রণ দেয়া হলো।

সারণি ৫ : বিভিন্ন ধরনের ঘাসের মিশ্রণ

	উপাদান	শুষ্ক পদার্থের হার শতকরা পরিমাণ	প্রোটিন (%)	বিঃ শক্তি (গঔ/কম)
মিশ্রণ-১	পারা	৬৫	১২	৮.৭
	কাউপি	২৫		
	মোলাসেস	১০		
মিশ্রণ-২	নেপিয়ার	৭০	১০	৮.২
	খেসারি	২০		
	মোলাসেস	১০		
মিশ্রণ-৩	ভুট্টা	৮০	১০	৮.৭
	খেসারি	২০		
মিশ্রণ-৪	দেশী ঘাস	৭০	৯	৮.১
	ইপিল ইপিল	২০		
	মোলাসেস	১০		

বাছুরের রোগ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা

বাছুরকে স্বাস্থ্যবান, কার্যক্ষম, উৎপাদনমুখি রাখতে শুধু সুষম খাদ্য সরবরাহই যথেষ্ট নয়, রোগব্যাধি হতে মুক্ত রাখাও একান্ত দরকার। রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে বাছুর দুর্বল, স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ে, ফলে এদের দৈহিক বৃদ্ধি, কার্যক্ষমতা ও উৎপাদন হ্রাস পায় এবং মাঝে মাঝে অকাল মৃত্যুতে মালিকের তথা দেশের গো-সম্পদের ক্ষতি হয়ে থাকে।

বাছুরের রোগ

বাছুরের রোগ সাধারণত দুই প্রকার। সাধারণ রোগ : যে সব রোগব্যাধি আক্রান্ত প্রাণীতে সীমাবদ্ধ থাকে, সহজে অন্য প্রাণীতে সংক্রামিত হয় না এবং তুলনামূলকভাবে প্রাণীর মৃত্যুর হার কম, তাকে সাধারণ রোগ বলে। যদিও সাধারণ রোগে মৃত্যুর হার কম, কিন্তু আক্রান্ত বাছুরের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, দৈহিক শক্তি ও বৃদ্ধি কমে যায় এবং উৎপাদন হ্রাস পায়। এজন্য সাধারণ রোগকে অবহেলা না করে ত্বরিত চিকিৎসা ব্যবস্থা নেয়া দরকার। আমাদের দেশে বাছুরের সচরাচর যে সব সাধারণ রোগ-বালাই দেখা যায় বা হয়, সেগুলোর প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে :

কাটা, পোড়া, ঘা, আঘাত ইত্যাদি

এগুলো জীবাণুঘটিত রোগ না হলেও অবহেলা করা উচিত নয়। এ রোগগুলোর কারণে বাছুরের প্রাথমিক কোনো ক্ষতি না হলেও পরবর্তীতে অন্যান্য রোগ বা রোগজীবাণুতে সহজে আক্রান্ত হতে পারে। তাছাড়া এ রোগগুলোর ফলে বাছুরের স্বাস্থ্য এবং কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে। তাই এসব সামান্য রোগকে অবহেলা না করে সময়মত প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

পেট ফাঁপা, বদ হজম ইত্যাদি

খাদ্যনালীতে কিছু আটকে গেলে অথবা কাদা বালি মিশ্রিত খাদ্য খেলে পেট ফাঁপা বা বদ হজম দেখা দিতে পারে। গ্যাসের জন্য পেট অত্যধিক ফুলে যায় ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। প্রাণী জাবর কাটাও বন্ধ করে দেয় এবং শরীরের তাপ কিছুটা বৃদ্ধি পায় (১০২°-১০৪° ফা.)। অসুখ দেখা দেয়ার সাথে সাথে খাদ্য বন্ধ রাখা দরকার এবং এ অবস্থায় প্রাণীকে ঢালু জায়গায় রাখতে হবে যেন তার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট না হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে পারগেটিভ বা কারমিনেটিভ মিকচার খাওয়ানের ব্যবস্থা নিলে ভাল হয়। প্রয়োজনবোধে অভিজ্ঞ ডাক্তারের সহায়তায় পেট ফুটো করে গ্যাস বের করে দেয়া যেতে পারে।

উদরাময়, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি

অনেক রোগের কারণে পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে, তবে অন্ত্রের রোগ এদের মধ্যে অন্যতম। ঘনঘন পাতলা পায়খানার কারনে বাছুরের মুখ শুকিয়ে যায় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। জীবাণুঘটিত পাতলা পায়খানার কারণে আক্রান্ত বাছুর মারাও যেতে পারে। প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে বাছুরকে সালফার জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়ানো যেতে পারে। দুর্বলতার জন্য স্যালাইন বা গ্লুকোজ ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।

কোষ্ঠ্যকাঠিন্য

বিভিন্ন কারণে কোষ্ঠ্যকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। কোষ্ঠ্যকাঠিন্য হলে খাদ্যে অরুচি, পেট ফোলাভাব, পেটব্যথা, পায়খানা শক্ত ও পরিমাণে খুব কম ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। কোষ্ঠ্যকাঠিন্যে ক্যাস্টর ওয়েল (ভেরেন্ডার তৈল) বাওয়েল লিলি (তিষির তৈল) ১/২-২ পাউন্ড খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। তাছাড়া লবণ, পানিসহ ম্যাগসালফ (Magsulf), পানিসহ ম্যাগকারব (Magcurb) বা অন্যান্য পারগেটিভ মিকচার (Purgative) খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সর্দি-কাশি

অত্যধিক ঠান্ডা, বৃষ্টিতে ভেজা, প্রখর রৌদ্রে থাকা, আবহাওয়ার পরিবর্তনহেতু সর্দি-কাশি হতে পারে। তাছাড়া রোগজীবাণুতে আক্রান্ত হলেও সর্দি-কাশি হতে পারে। নাক দিয়ে পানি পড়া, মাঝেমাঝে হাচিঁ বা কাশি দেয়া প্রাথমিক লক্ষণ, তবে এর সাথে শরীর ব্যথা ও জ্বর হতে পারে। সর্দি- কাশি দেখা দিলে আক্রান্ত বাছুরটিকে শুকনো আলো-বাতাস পূর্ণ ঘরে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়া দরকার। সালফার জাতীয় টেবলেট, সালফাডায়াজিন (Sulphadiazin), ভেসাডিন (Vesadin), ট্রিনামাইড (Trinamide), ইত্যাদি খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। কুসুম গরম সরিষার তৈল, ক্যামফর বা তারপিন লিনিমেন্ট দুই পাঁজরে মালিশ করা যেতে পারে।

উকুন

উকুন এক প্রকার বহিঃপরজীবী। আমাদের দেশে বাছুরসহ অধিকাংশ গবাদিপ্রাণী উকুন দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। উকুন আক্রান্ত বাছুরের শরীরের লোম উসকো খুসকো দেখায় এবং অনেক ক্ষেত্রে লোম ঝরে যায়। শরীরে চুলকানির জন্য বাছুর শরীর ঘষে বলে চামড়ার যথেষ্ট ক্ষতি

হয়। উকুন আক্রান্ত বাছুরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে। তাই, উকুনের প্রতি উদাসীন না থেকে সময়মত এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া ভাল। চিকিৎসার জন্য নেগুভন (Neguvon), নাগাসেন্ট (Nagaseent), গ্যামাক্সিন (Gamaxin), এসানটল (Asantol), ইত্যাদি উকুন ধ্বংসকারী ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

আঁটালি

আঁটালি এক ধরনের বহিঃপরজীবী। বাছুর কয়েক প্রকার আঁটালি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত বাছুরের গায়ে চুলকানি হয় ফলে বাছুর অস্বাভাবিক আচরণ করে। আঁটালি রক্ত চুষে খায় তাই রক্তশূন্যতা দেখা দেয়, ফলে বাছুরের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। আক্রান্ত বাছুরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়, ফলে বয়সের তুলনায় প্রাণীকে অনেক ছোট দেখায়। আঁটালি বিভিন্ন রোগের জীবাণু বহন করে বলে বাছুর এ সকল রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে এবং আটালির আক্রমণ বেশি হলে প্রাণীর পক্ষাঘাতে (Tick paralysis) আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে। উকুন এবং আঁটালি ধ্বংসের জন্য একই ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। কার্যকরভাবে আঁটালি এবং উকুন ধ্বংস করার জন্য ৫% ম্যালাথিয়ন বা অন্য কোনো কিটনাশক দ্রবণে আক্রান্ত বাছুরকে গোছল করাতে হবে। মনে রাখতে হবে কার্যকরভাবে আঁটালি ও উকুন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খামারের সকল গবাদিপ্রাণীকে এক সাথে চিকিৎসা দিতে হবে। একই সাথে খামার পরিষ্কার করে সকল আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে খামারে কিটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

কৃমি

জন্মের পরপরই এমনকি জন্মের আগেও বাছুর মাতৃ গর্ভে কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। যে সব কৃমি দ্বারা বাছুর আক্রান্ত হয় তার মধ্যে লম্বা, গোল, কেঁচো বা সূতা কৃমি (Roundworm) চেপ্টা বা পাতা কৃমি (Fluke), ফিতা কৃমি (Tapeworm) উল্লেখযোগ্য। এগুলো আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। বিভিন্ন প্রকারের কৃমি প্রাণীর পাকস্থলী ও অন্ত্রনালীতে বাস করে, আবার কোনো কোনো কৃমি কলিজা ও ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। কৃমি আক্রান্ত প্রাণী মাঠে বা চারণভূমিতে পায়খানা করার ফলে মাঠের ঘাস দূষিত হয়। এসব দূষিত ঘাস সুস্থ গরু খেলে তারাও কৃমিতে আক্রান্ত হয়। তাছাড়া অনেক কৃমি আছে যা শরীরের চর্ম ভেদ করে দেহে প্রবেশ করে। কৃমিতে আক্রান্ত বাছুর সহজে মারা না গেলেও স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে এবং দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়। আক্রান্ত বাছুরকে ঠিকমত খাবার দিলেও তার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হয় না। বরং দিনদিন রোগা হতে থাকে। কারণ কৃমি প্রাণীর খাবারের সারাংশে ভাগ বসায় এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতি সাধন করে। আক্রান্ত বাছুরের শরীরের লোম উসকো খুসকো দেখায়, বাছুর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দৈহিক বৃদ্ধি ও খাওয়া-দাওয়া কমে যায়। প্রাণী ক্রমান্বয়ে হাড্ডিসার হয়ে পড়ে এবং রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। কখনো পাতলা পায়খানা আবার কখনো কোষ্ঠ্যকাঠিন্য দেখা দেয়। আক্রান্ত বাছুরের শরীরে বিশেষত চোয়ালের নিচে পানি জমতে থাকে। গোল কৃমির জন্য নেমাফেক্স (Nemafex), ট্রোডেক্স (Trodex), রালনেক্স (Ralnex), নেলভার্ম (Nelverm); পাতাকৃমির জন্য বিলিভন (Bilivon), ফেসিনেক্স (Fesinex), জেনিল (Zenil); ফিতাকৃমির জন্য প্রিপিসাইড (Pripicide), ইউভিলন (Uvilon), ম্যানসলিন (Mansolin) ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। আমাদের দেশে গবাদি প্রাণীর লালন-পালন ব্যবস্থায় বছরে ২ বার ক্রিমির ঔষধ খাওয়ানো ভাল।

সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগ

সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগসমূহ সাধারণত বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া,ভাইরাস, ফাংগাস ও প্রোটোজোয়া দ্বারা সংঘটিত হয়। রোগের উৎপত্তির কারণ, উপসর্গ, চিকিৎসা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা জানা থাকলে ব্যাপক মৃত্যুর হাত থেকে বাছুর সম্পদকে রক্ষা করা সহজ হতে পারে।

বাছুরের সাদা উদরাময় (Calfscour/colibacillosis)

সাধারণত ২ সপ্তাহের নিচের বয়সের বাছুরে এ রোগ দেখা যায়। কাফস্কাওয়ার হলে বাঁছুর পাতলা সাদা পায়খানা করে, এটি বাছুরের একটি মারাত্মক ব্যাধি। খারাপ ব্যবস্থাপনা ও কৃত্রিম উপায়ে বাছুরকে ঠিকমত না খাওয়ানোর কারণে এ রোগ হতে পারে। তাছাড়া শালদুধের অভাব, এক সময়ে বা অনিয়মিতভাবে অত্যধিক পরিমাণে দুধ খাওয়ানো, অথবা অত্যধিক ঠান্ডা দুধ খাওয়ানো এবং বাছুরের মায়ের রসদে সবুজ খাদ্যের স্বল্পতার কারণে এ অবস্থা হতে পারে। এ রোগের কারণ এসকারেসিয়া কলাই (E. coli) নামক জীবাণু যা সাধারণত মানুষ অথবা প্রাণীর অন্ত্রে বাস করে।

লক্ষণ

১. বাছুর ঘন ঘন মল ত্যাগ করে
২. চাল ধোয়া পানির মত সাদা রং এর পচা দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা হয়
৩. অনেক সময় মলে রক্ত দেখা যায় এবং মলদ্বারের চারদিকে পাতলা মল লেগে থাকে

৪. প্রথম দিকে জ্বর হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে নেমে যায়
৫. খাওয়ায় অরুচি পরিলক্ষিত হয়
৬. বাছুর আস্তে আস্তে দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং অবশেষে মারা যায়

চিকিৎসা ও প্রতিকার

লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য দুধ খাওয়ানো বন্ধ রাখতে হবে। এরপর গম অথবা ভুট্টার কুঁড়া অথবা উষ্ণ পানি দিতে হবে এবং সাথে সাথে দুধ খাওয়ানোর পরিমাণ বাড়াতে হবে। প্রতিদিন আধা লিটার পর্যন্ত কলস্ট্রাম যোগাড় করে খাওয়াতে হবে। শরীরে পানি শূন্যতা দেখা দিলে প্রাণীকে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়াতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সালফার জাতীয় ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল বা ইনজেকশন দিতে হবে। এই রোগের প্রতিকার হিসেবে জন্মের পর বাছুরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও রোগমুক্ত জায়গায় রাখতে হবে এবং পরিমিতভাবে শালদুধ খাওয়াতে হবে।

নিউমোনিয়া (Pneumonia)

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি কারণে বাছুরের নিউমোনিয়া হতে পারে। এই রোগে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা বেড়ে যায়। কাশি হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসে অস্বাভাবিক ভাবে শব্দ হতে পারে। রোগের কারণ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষণের তারতম্য হয়ে থাকে। নিউমোনিয়ার প্রচলিত নাম শ্বাস রোগ, পাঁজর ব্যথা।

লক্ষণ

১. ঘন ঘন নিঃশ্বাস এই রোগের প্রধান ও প্রথম লক্ষণ
২. রোগের শেষ পর্যায়ে শ্বাস কষ্ট হয় এবং ইন্টারস্টিশিয়াল (Interstitial) নিউমোনিয়াতে শুষ্ক কাশি হয়
৩. তীব্র রোগে জ্বর হয় এবং নাক দিয়ে সর্দি পড়ে এবং
৪. বুকের মধ্যে গড় গড় শব্দ হয়

চিকিৎসা

প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন বাছুরের শিরায় অথবা মাংসপেশিতে দিতে হবে এবং সেই সাথে এন্টিহিস্টামিনিক ইনজেকশন নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।

সাবধানতা

শিরায় ইনজেকশনের ক্ষেত্রে ঔষধ ধীরে ধীরে প্রয়োগ করতে হবে। মাংসপেশিতে ও চামড়ার নিচে ইনজেকশনের ক্ষেত্রে এক জায়গায় ১০ মিলি এর বেশি প্রয়োগ করা উচিত নয়।

বাছুরের ডিপথেরিয়া (Calf diphtheria)

ডিপথেরিয়া একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগ দুই ভাবে হতে পারে। যেমন-

ক) বাছুরের ল্যারিংস (Larynx) আক্রান্ত হলে
খ) মুখ গহ্বর (Oral cavity) আক্রান্ত হলে

সাধারণত ৩ মাসের কম বয়সের বাছুরের মুখগহবরে সংক্রমণের ফলে ডিপথেরিয়া হয়। অপরদিকে ল্যারিংসে সংক্রমণের ফলে যে ডিপথেরিয়া হয় তা সাধারণত বেশি বয়সের বাছুরেই হয়। স্ফেরোফোরাস নেক্রোফোরাস (Spherophorus necrophorus) নামক ব্যাকটেরিয়া এই রোগের কারণ।

লক্ষণ

মুখগহবর সংক্রমিত হলে-

১. জ্বর হয়,
২. মুখ দিয়ে লালা পড়ে,

৩. বাছুর দুধ খেতে পারে না
৪. ল্যারিংস সংক্রমিত হলে মখ দিয়ে গোংগানির মত ঘড় ঘড় শব্দ হয়
৫. রোগের শেষ পর্যায়ে নাক দিয়ে পানি পড়ে এবং প্রাণী জিহ্বা বের করে রাখে এবং
৬. শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয় এবং মুখ দিয়ে লালা পড়ে

চিকিৎসা ও প্রতিকার

রোগ বিস্তার রোধকল্পে শক্ত (Coarse) খাবার দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সালফানিলামাইড এবং এন্টিবায়োটিক দ্বারা কার্যকর চিকিৎসা করা যেতে পারে।

ক্ষুরা রোগ (Foot and Mouth Disease)

ক্ষুরা রোগ ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত একটি মারাত্মক ছোয়াচে রোগ যার ফলে মুখে ও পায়ে এক সাথে ঘা বা ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ দেশে চার ধরনের ভাইরাস (A, O, C, Asia-1) দ্বারা এরোগের সৃষ্টি হয়। এলাকাভেদে ক্ষুরা রোগের প্রচলিত নাম জ্বরা,পাতা, তাপা, ক্ষুরাপাকা, ইত্যাদি। দূষিত খাদ্য, পানি, বাতাস বা আক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শের মাধ্যমে সুস্থ দেহে এ রোগ সংক্রমিত হয়।

লক্ষণ

১. প্রাথমিক অবস্থায় জবর দেখা দেয় এবং শরীরের তাপমাত্রা ১০১°-১০৫° ফা. পর্যন্ত হতে পারে
২. মুখ দিয়ে বিরামহীন লালা পড়ে, সময় সময় মুখে চপ চপ শব্দ হয়
৩. জিহ্বা ও মুখের ভেতরে এবং পায়ের ক্ষুরার মাঝখানে ফোসকা পড়ে এবং ফেটে গিয়ে ঘা বা ক্ষতের সৃষ্টি হয়
৪. পায়ের ঘা বা ক্ষতে মাছি ডিম পাড়ে এবং মাছির লার্ভা বা শুককীট ঘা বা ক্ষতে অধিকতর জটিলতার সৃষ্টি করে
৫. এ রোগে বাছুর মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মারা যায়

চিকিৎসা

১. ফিটকারির গুঁড়া পানিতে মিশিয়ে ভাল করে মুখ ও পায়ের ঘা ধুয়ে দিতে হবে
২. ট্রাইসালফার ১টি বড়ি ৩৫ কেজি ওজন মাত্রায় দিনে একবার খাওয়াতে হবে এবং পরদিন হতে অর্ধেক মাত্রায় পর পর ৩দিন খাওয়াতে হবে
৩. আক্রান্ত বাছুরকে নরম খাবার দিতে হবে
৪. চিকিৎসার ব্যাপারে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

রোগ প্রতিরোধ

সুস্থ বাছুরকে সময়মত টিকা দিলে এ রোগ হয় না। বাংলাদেশে ক্ষুরারোগের প্রতিষেধক টিকায় মোট ৩টি ভাইরাস স্ট্রেইন (A, O, Asia-1) ব্যবহার করা হয়।

ভাইরাস স্ট্রেইন এর উপর ভিত্তি করে ক্ষুরারোগের ২ ধরনের টিকা প্রস্তুত হয়। যথা :

(ক)	মনোভ্যালেন্ট টিকা	:	যে কোনো একটি স্ট্রেইন দ্বারা প্রস্তুত টিকা।
	প্রয়োগ মাত্রা	:	বাছুরের জন্য ৩ মিলি।
(খ)	বাইভ্যালেন্ট টিকা	:	যে কোনো ২টি স্ট্রেইন দ্বারা প্রস্তুত টিকা।
	প্রয়োগ মাত্রা	:	বাছুরের জন্য ৬ মিলি।

টিকার প্রয়োগ বিধি

উপরোক্ত টিকাগুলো প্রাণীর গলকম্বলের চামড়ার নিচে প্রতি ৪-৫ মাস অন্তর অন্তর দিতে হবে।

সতর্কতা

৪ মাসের কম বয়সী বাছুরে টিকা দেয়া হয় না।

টিকা সংরক্ষণ
রেফ্রিজারেটরে ২°- ৪° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়।

বাদলা (Black leg or Black quarter)
অল্প বয়স্ক প্রাণী অর্থাৎ ৬ মাস থেকে ২ বছরের গবাদিপ্রাণী এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। বাদলা একটি মারাত্বক সংক্রামক ব্যাধি যাতে মাংসের প্রদাহ ও রক্ত দুষ্টতা হয়ে থাকে। ক্লসট্রিডিয়াম সোভিয়াই (Clostridium Chauvoei) নামক ব্যাকটেরিয়া এই রোগের কারণ। দূষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে সুস্থ বাছুরের দেহে এ রোগ সংক্রমিত হয়।

লক্ষণ
১. তীব্র জ্বর অনুভূত হবে (১০৫°-১০৭° ফা.)
২. যে কোন ১ টি বা ২টি পায়ের (সম্মুখের বা পেছনের) উপরিভাগে মাংসবহুল জায়গা ফুলে ওঠে।
৩. ফুলাভাব পরে অন্যান্য দিকেও বিস্তার ঘটে। ফুলা স্থান প্রথমে গরম ও বেদনাদায়ক থাকে। পরে ঠান্ডা ও ব্যাথাহীন হয়ে পড়ে। ফুলা জায়গায় চাপ দিলে পচ পচ বা ফড়ফড় শব্দ করে যা এটাই এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।
৪. কোষ্ঠ্যকাঠিন্য দেখা দেয়।
৫. প্রাণী খুঁড়িয়ে হাঁটে।
৬. আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবশেষে মারা যায়।

চিকিৎসা
যথাসময়ে সালফার ড্রাগ বা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এন্টিবায়োটিক শিরায় প্রয়োগ করলে আক্রান্ত প্রাণীটি ভাল হতে পারে। ফুলা স্থানে গরম ছেক এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা কেটে দিলে রোগের প্রখরতা কমার সম্ভবনা থাকে।

প্রতিরোধ
সুস্থ অবস্থায় সময়মত প্রতিষেধক টিকা দেয়া দরকার।

টিকার প্রয়োগ মাত্রা
তিন মাস থেকে ৩ বছর বয়সী বাছুরকে ৫ মিলি টিকা কাঁধ বা ঘাড়ের চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হয়। টিকা প্রয়োগের পর স্থানটি উত্তমরূপে মালিশ করা প্রয়োজন। ছয় মাস পর পর এই টিকা প্রয়োগ করতে হয়।

সতর্কতা
টিকার বোতল খোলার পর ২৪ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হলে এই টিকা ব্যবহার করা যাবে না।

টিকা সংরক্ষণ
রেফ্রিজারেটরে ২°- ৪° সে. তাপমাত্রায় রাখতে হবে।

গলাফুলা (Haemorrhagic septicaemia)
গলাফুলা একটি ছোঁয়াচে এবং সংক্রামক ব্যাধি। সাধারণত অতি তীব্র ও তীব্র এই দুই পর্যায়ে এ রোগ পরিলক্ষিত হয়। পাস্টুরেলা মালটোসিডা (Pasteurella multocida) এবং পাস্টুরেলা হিমোলাইটিকা (Pasteurella haemolytica) ব্যাকটেরিয়া এই রোগের প্রধান কারণ। আমাদের দেশে সাধারণত বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এলাকাভেদে গলাফুলা রোগের প্রচলিত নাম ব্যাঙগা, ঘটু, গলঘটু, গলবেরা, ইত্যাদি। দূষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে সুস্থ দেহে রোগের জীবাণু প্রবেশ করে।

লক্ষণ
অতি তীব্র রোগে কোনো লক্ষণ ছাড়াই প্রাণী হঠাৎ মারা যায়। তীব্র রোগে নিচের লক্ষণগুলো দেখা যায়ঃ

১. দৈহিক তাপমাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় (১০৫°-১০৭° ফা.),
২. গলা ফুলে যায় এবং ফুলা জায়গায় হাত দিলে গরম অনুভূত হয়। ফুলা ক্রমশ গলা থেকে বুক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে,

৩. শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয় এবং শ্বাস ত্যাগের সময় আওয়াজ হয়,
৪. জিহ্বা ফুলে যায় এবং সময় সময় মুখ হা করে ও জিহ্বা বের করে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে,
৫. অনেক সময় কাশি হয়,
৬ চোখে পিঁচুটি দেখা যায়,
৭. নাক দিয়ে ঘন সাদা শ্লেষ্মা পড়তে দেখা যায়,
৮. পানাহার বন্ধ করে দেয়,
৯. প্রাণী ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সময়মত উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে মারা যায়।

চিকিৎসা

Oxytetracyclin (long acting) 1ml/10kg body weight i/m injection এবং ৭২ ঘণ্টা পর আরেকটি ইনজেকশন সমমাত্রায় মাংসে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতিষেধক

সুস্থ অবস্থায় সময় মত প্রতিষেধক টিকা দেয়া উচিত।

প্রয়োগমাত্রা

প্রাণীর গলার পার্শ্বে ঢিলা চামড়ার নিচে ১ মিলি টিকা এক বছর পর পর দিতে হয়।

সতর্কতা

কেবলমাত্র সুস্থ সবল প্রাণীতে এই টিকা দেয়া উচিত। টিকা প্রয়োগের স্থান কয়েক দিন ফুলা থাকতে পারে এবং দেহের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

টিকা সংরক্ষণ

রেফ্রিজারেটরে ২° - ৪° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে।

তড়কা (Anthrax)

তড়কা একটি অতি তীব্র (Peracute) বা তীব্র (Acute) সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত প্রাণী হঠাৎ মারা যায়। মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্তে বা পরে নাক, মুখ, মলদার ইত্যাদি দিয়ে তরল আলকাতরা রং এর রক্ত মিশ্রিত রস নির্গত হতে থাকে। ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস (Bacillus anthrasis) নামক ব্যাকটিরিয়া এই রোগের কারণ। দূষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে এ রোগ প্রাণীতে বিস্তার লাভ করে।

লক্ষণ

অতি তীব্র রোগে আক্রান্ত প্রাণী আকস্মিকভাবে মারা যায় এবং অনেক সময় লক্ষণ দেখা যায় না।

তীব্র রোগে নিম্ন লিখিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়

- প্রথমে অত্যধিক জ্বর (১০৫°- ১০৭° ফা.) হয়
- শরীরে লোম দাঁড়িয়ে যায়
- শরীর কাপতে থাকে
- শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও গভীর হয়
- প্রাণী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, কিংবা প্রাণীকে কিছুটা উত্তেজিত দেখা যায়
- এক সময় প্রাণী নিস্তেজ হয়ে পড়ে, খিচুনি হয় এবং মারা যায়

চিকিৎসা

সময়মত প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।

প্রতিষেধক

সুস্থ প্রাণীকে যথাসময়ে টিকা দেয়া দরকার।

টিকার প্রয়োগ মাত্রা

বাছুরের গলার চামড়ার নিচে ০.৫ মিলি টিকা প্রয়োগ করতে হয়। এই টিকা এক বছর পর পর দিতে হয়।

সতর্কতা

এই টিকা কেবল সুস্থ প্রাণীকে দেয়া উচিত। টিকা প্রদানের স্থান কয়েক দিনের জন্য ফুলা থাকতে পারে এবং শরীরের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

টিকা সংরক্ষণ

টিকার বোতল রেফ্রিজারেটরে ২°- ৪° সে. তাপমাত্রায় রাখতে হবে।

বাছুরের স্বাস্থ্য বিধি পালন

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে prevention is better than cure অর্থাৎ রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ যাতে না হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাছুরের স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগমুক্ত রাখার জন্য বিশেষ কয়েকটি নিয়মের প্রতি খেয়াল রাখলে ভবিষ্যতে অসুখ-বিসুখ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

১. জন্মের পরপরই বাছুরকে মায়ের শালদুধ (Colstrum) খাওয়াতে হবে। যেহেতু কলস্ট্রাম অধিক পরিমাণে ‘এন্টিবডি্‌ দ্বারা গঠিত সেহেতু নবজাত বাছুরের জন্য ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই শালদুধ খাওয়ালে বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
২. স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, পরিষ্কার সুষম খাদ্য, পরিষ্কার পানি, সেবা-যত্ন ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার।
৩. বাছুরগুলোকে পৃথক পৃথক রাখা উচিত। সুস্থ বাছুরকে কোনো অবস্থাতেই রোগাক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শে যেতে দেয়া যাবে না। এতে রোগ সংক্রমণের ভয় থাকে।
৪. বাছুরের শরীর নিয়মিত পরিস্কার করা উচিত। শুকনো খড় দ্বারা তাদের শরীর ঘষে পরিষ্কার করে গোসল করানো প্রয়োজন।
৫. খাবার পাত্র ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত।
৬. কুকুর, বিড়াল, উকুন, আটালি, মশামাছি, পোকা-মাকড় এ সবের যেন উপদ্রব না থাকে তা খেয়াল রাখা উচিত।
৭. কোনো রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া বা অসুস্থতা দেখা দেয়ার সাথে সাথে সেটাকে আলাদা করে ত্বরিত চিকিৎসা ব্যবস্থা ও পরিচর্যা করা উচিত।
৮. রোগে কোনো বাছুর মারা গেলে, তা মাটিতে পুঁতে রাখা বা পুড়ে ফেলা উচিত।
৯. বছরে দুবার অর্থাৎ বর্ষার প্রারম্ভে ও শরতের শেষে নির্দিষ্ট মাত্রায় কৃমিনাশক ঔষধ ব্যবহার করলে বাছুরের দৈহিক বৃদ্ধি ভাল হয়।
১০. যে সব রোগের প্রতিষেধক টিকা আছে, সময়মত স্থানীয় চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সে সকল রোগের প্রতিবেধক টিকা দেয়া দরকার।

উপসংহার

সর্বোপরি উপরিল্লেখিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাছুরকে লালন-পালন করলে সুস্থ সবল বাছুর পাওয়া সম্ভব এবং এর মাধ্যমে আমাদের দেশের প্রাণীসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।

প্যাকেজের উদ্ভাবক: ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, ড. এম. জে. এফ. এ. তৈমুর ও ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন

সবুজ ঘাস উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার

লাভজনক দুগ্ধ খামারের জন্য ঘাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পূর্বে আমাদের দেশে প্রাকৃতিক চারণভূমি ছিল যেখানে চড়ে গাভী তার প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের চাহিদা মেটাত। বর্তমানে সে সুযোগ অত্যন্ত কম। তাই গাভীর প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের চাহিদা মেটাতে খামারি ভাইদের অবশ্যই উচ্চফলনশীল ঘাসের আবাদ করতে হবে। নিম্নে কয়েকটি বহু বর্ষজীবী ঘাসের উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

নেপিয়ার (Pennisetum pur-pureum)

ক্রমিক নং	নেপিয়ার(বাজরা)	বহুবর্ষী ঘাস একবার লাগালে -৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন- চৈত্র মাসে।
২	মাটির ধরন	জলাবদ্ধ স্থান ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের মাটি এমনকি পাহাড়ি ঢাল ও সমুদ্র তীরবর্তী লবণাক্ত জমিতেও ঘাস জন্মে।
৩	জমি তৈরি	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	হে, প্রতি ২৫-২৬ হাজার কাটিং/মোথা
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	লাইন থেকে লাইনঃ ৭০ সিএম, কাটিং থেকে কাটিং ৩০ সিএম
৬	সার প্রয়োগ জমি তৈরির সময় ঘাস লাগানোর ১ মাস পর প্রতি কাটিং পর পর	ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০:৭০:৩০ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে. খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৭	সেচ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	৩০-৪৫ দিন পর পর- গ্রীষ্মকাল ৫০-৬০ দিন পর পর-শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	৫-৬ বার - ১ম বছর ৭-৯ বার - ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	১৫০-২০০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসে শুষ্ক পদার্থ- ২৫০ গ্রাম, জৈব পদার্থ- ২৪০ গ্রাম, প্রোটিন ২৫ গ্রাম ও ২.০ মেগাজুল বিপাকীয় শক্তি
১২	সংরক্ষণ	সাইলেজ তৈরি

এন্ড্রোপোগন (Andropogon gyanus)

ক্রমিক নং	এন্ড্রোপোগন	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন- চৈত্র মাসে।
২	মাটির ধরন	জলাবদ্ধ স্থান ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতেই জন্মে। তবে পাহাড়ের চূড়াতে বা বেশি ঢালু জমিতে এ ঘাস ভাল জন্মায় না।
৩	জমি তৈরি	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	২৮-৩০ হাজার মুথা প্রতি হে.
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	লাইন থেকে লাইনঃ ৭০ সিএম, কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ জমি তৈরির সময় ঘাস লাগানোর ১ মাস পর প্রতি কাটিং পর পর	ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০:৭০:৩০ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	২৫-৩০ দিন পর পর- গ্রীষ্মকাল ৩০-৪০ দিন পর পর-শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	৭-৯ বার - ১ম বছর ৯-১১ বার - ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	১০০-১৩০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসে শুষ্ক পদার্থ- ৩৭০ গ্রাম, জৈব পদার্থ- ৩৩৮ গ্রাম, প্রোটিন ২২ গ্রাম, ফাইবার ১৪৬ গ্রাম, পাচ্যতা ৬৪% ও বিপাকীয় শক্তি ৩.৭৮ মেগাজুল
১২	সংরক্ষণ	সাইলেজ তৈরি

স্প্লেনডিডা (Setaria splendida)

ক্রমিক নং	স্প্লেনডিডা	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন- চৈত্র মাসে।
২	মাটির ধরন	জলাবদ্ধ লবনাক্ত ও পাহাড়ি ঢাল ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতেই জন্মে।
৩	জমি তৈরি	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	৩৫-৪০ হাজার কাটিং/মুথা প্রতি হে.
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	লাইন থেকে লাইনঃ ৭০ সিএম, কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ জমি তৈরির সময় ঘাস লাগানোর ১ মাস পর প্রতি কাটিং পর পর	ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০:৭০:৩০ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	২৫-৩০ দিন পর পর- গ্রীষ্মকাল ৩০-৪০ দিন পর পর-শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	৭-৯ বার - ১ম বছর ৯-১১ বার - ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	১০০-১৩০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসে শুষ্ক পদার্থ- ৩৩৫ গ্রাম, জৈব পদার্থ- ৩১৭ গ্রাম, প্রোটিন ২১ গ্রাম, ফাইবার ১৮৩ গ্রাম, পাচ্যতা ৬০% ও বিপাকীয় শক্তি ৩.২০ মেগাজুল
১২	সংরক্ষণ	সাইলেজ বা হে (শুকিয়ে সংরক্ষণ) তৈরি

রোজী (Bracharia ruzizensis)

ক্রমিক নং	রোজী	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন- চৈত্র মাসে।
২	মাটির ধরন	জলাবদ্ধ লবনাক্ত ও পাহাড়ি ঢাল ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতেই জন্মে। এ ঘাস মধ্যম মানোরলবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।
৩	জমি তৈরি	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	৩৫-৪০ হাজার মুথা প্রতি হে.
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	লাইন থেকে লাইনঃ ৭০ সিএম, কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ জমি তৈরির সময় ঘাস লাগানোর ১ মাস পর প্রতি কাটিং পর পর	ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০:৭০:৩০ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	২৫-৩০ দিন পর পর- গ্রীষ্মকাল ৩০-৪০ দিন পর পর-শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	৭-৮ বার - ১ম বছর ৮-১০ বার - ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	৭০-৯০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসে শুষ্ক পদার্থ- ২২০ গ্রাম, জৈব পদার্থ- ১৯৯ গ্রাম, প্রোটিন ২৬ গ্রাম, ফাইবার ১১৬ গ্রাম, পাচ্যতা ৬০% ও বিপাকীয় শক্তি ২.১০ মেগাজুল
১২	সংরক্ষণ	সাইলেজ বা হে (শুকিয়ে সংরক্ষণ) তৈরি

সিগনাল (Bracharia decumbens)

ক্রমিক নং	সিগনাল	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন- চৈত্র মাসে।
২	মাটির ধরন	জলাবদ্ধ লবনাক্ত ও পাহাড়ি ঢাল ও লবণাক্ত স্থান ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতেই জন্মে।
৩	জমি তৈরি	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	৩৫-৪০ হাজার মুথা প্রতি হে.
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	লাইন থেকে লাইনঃ ৭০ সিএম, কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ জমি তৈরির সময় ঘাস লাগানোর ১ মাস পর প্রতি কাটিং পর পর	ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০:৭০:৩০ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	২৫-৩০ দিন পর পর- গ্রীষ্মকাল ৩০-৪০ দিন পর পর-শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	৭-৮ বার - ১ম বছর ৮-১০ বার - ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	৭০-৯০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসে শুষ্ক পদার্থ- ২৫৫ গ্রাম, জৈব পদার্থ- ২২৮ গ্রাম, প্রোটিন ১৯ গ্রাম, ফাইবার ১৩১ গ্রাম, পাচ্যতা ৬০% ও বিপাকীয় শক্তি ২.৪৭ মেগাজুল
১২	সংরক্ষণ	সাইলেজ বা হে (শুকিয়ে সংরক্ষণ) তৈরি

জাম্বু

ক্রমিক নং	জাম্বু	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন- চৈত্র মাসে।
২	মাটির ধরন	জলাবদ্ধ লবনাক্ত ও পাহাড়ি ঢাল ও লবণাক্ত স্থান ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতেই জন্মে।
৩	জমি তৈরি	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	৭ কে.জি. প্রতি হেঃ বা হেঃ প্রতি ৩৫-৪০ হাজার কাটিং/মোথা
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	লাইন থেকে লাইনঃ ৭০ সিএম, কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ জমি তৈরির সময় ঘাস লাগানোর ১ মাস পর প্রতি কাটিং পর পর	ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০:৭০:৩০ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	২৫-৩০ দিন পর পর- গ্রীষ্মকাল ৩০-৪০ দিন পর পর-শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	৫-৬ বার - ১ম বছর ৭-৮ বার - ২য় বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	১০০-১৫০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসে শুষ্ক পদার্থ- ১৯০ গ্রাম, জৈব পদার্থ- ১৮০ গ্রাম, প্রোটিন ২১ গ্রাম, ফাইবার ৭৫ গ্রাম, পাচ্যতা ৬৪% ও বিপাকীয় শক্তি ১.৯৫ মেগাজুল
১২	সংরক্ষণ	সাইলেজ তৈরি

পারা (Bracharia mutica)

ক্রমিক নং	পারা	বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়
১	রোপণের সময়	যে কোনো সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন- চৈত্র মাসে।
২	মাটির ধরন	জলাবদ্ধ, লবনাক্ত, পাহাড়ি ঢালসহ সব ধরনের মাটিতেই জন্মে।
৩	জমি তৈরি	উত্তমভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ্যা	২৮-৩০ হাজার কাটিং
৫	কাটিং লাগানোর দূরত্ব	লাইন থেকে লাইনঃ ৭০ সিএম, কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সিএম
৬	সার প্রয়োগ জমি তৈরির সময় ঘাস লাগানোর ১ মাস পর প্রতি কাটিং পর পর	ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপিঃ ৫০:৭০:৩০ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে. ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হে.
৭	সেচ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮	ঘাস কাটার সময়	৩০-৩৫ দিন পর পর- গ্রীষ্মকাল ৩৫-৪৫ দিন পর পর-শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	৬-৭ বার - ১ম বছর ৭-৯ বার - ২য় বছর
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	১০০-১২০ টন
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসে শুষ্ক পদার্থ- ২৬০ গ্রাম, জৈব পদার্থ- ২৪০ গ্রাম, প্রোটিন ১৮ গ্রাম, ফাইবার ১১৩ গ্রাম, পাচ্যতা ৬৪% ও বিপাকীয় শক্তি ২.৬০ মেগাজুল
১২	সংরক্ষণ	সাইলেজ তৈরি

প্যাকেজের উদ্ভাবক

ড. খান শহীদুল হক ও ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী

ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (ইউএমএস)

ভূমিকা

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা এ গত ১৯৯২ সাল থেকে দীর্ঘ গবেষণা ও কৃষক পর্যায়ে যাচাই করে দেশে প্রাপ্ত খড়, ইউরিয়া ও চিটাগুড়ের মিশ্রণে (৮২:৩:১৫) ইউ এম এস গো-খাদ্য প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র বা ইউ এম এস কী?

এটি ইউরিয়া, মোলাসেস এবং খড় (স্ট্র) এর একটি মিশ্রিত খাবার যা গরুকে প্রতিদিন শুকনা খড়ের পরিবর্তে চাহিদা মতো খাওয়ানো যায়। খাদ্যটিতে খড়, ইউরিয়া ও চিটাগুড় বা মোলাসেসের অনুপাত যথাক্রমে ৮২:৩:১৫।

ইউ এম এস কিভাবে তৈরি করা হয়

- ইউ এম এস তৈরির প্রথম শর্ত হলো এর উপাদানগুলোর অনুপাত সর্বদা সঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ ১০০ ভাগ ইউ এম এস এর শুষ্ক পদার্থের মধ্যে ৮২ ভাগ খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেস এবং ৩ ভাগ ইউরিয়া থাকতে হবে। এ হিসাব মতে ১০০ কেজি শুকনা খড়, ঘনত্বের উপর নির্ভর করে ২১-১৪ কেজি মোলাসেস এবং ৩ কেজি ইউরিয়া মেশালেই চলবে। খড় ভিজা বা মোলাসেস পাতলা হলে উভয়ের পরিমাণই বাড়িয়ে দিতে হবে।
- প্রথমে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়ার পরিমাণ মেপে নিতে হবে। বিভিন্ন পরিমাণ খড়ের সাথে ইউরিয়া ও মোলাসেস কী পরিমাণ মেশাতে হবে তার একটি সারণি নিম্নে দেয়া হলো।
- মোলাসেস ও ইউরিয়া ওজনের পর প্রয়োজন মতো পরিষ্কার পানিতে (সাধারণত ৪০-৬০ লিটার) এমন ঘনত্ব মেশাতে হবে যাতে সম্পূর্ণ দ্রবণ খড়ের সাথে সহজে মেশানো যায়। পানি বেশি হলে দ্রবণটুকু খড় চুষে নিতে পারবে না আবার কম হলে দ্রবণ ছিটানো সমস্যা হবে।
- শুকনো খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণটি আস্তে আস্তে ঝরণা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে, এবং সাথে সাথে খড়কে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে খড় দ্রবণ চুষে নেয়। এভাবে স্তরে স্তরে খড় সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণ সমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ওজন করা খড়ের সাথে পুরো দ্রবণ মিশিয়ে নিলেই ইউ এম এস প্রাণীকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়।
- অন্যভাবেও ইউ এম এস তৈরি করা যায়। এ পদ্ধতিতে যে কোনো প্রকার পাত্রে ওজন করা মোলাসেস ও ইউরিয়াতে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দ্রবণ তৈরি করে নিতে হবে। তারপর সারণিতে উল্লেখিত হিসাব মোতাবেক ওজন করা খড় এমনভাবে ভিজাতে হবে যাতে পুরো দ্রবণটি শুষে নেয়। উক্ত যে কোনো উপায়ে তৈরি ইউরিয়া মোলাসেস খড় সঙ্গে সঙ্গে গরুকে খাওয়ানো যায় অথবা একবারে ২/৩ দিনের তৈরি খড় সংরক্ষণ করে আস্তে আস্তে খাওয়ানো যায়। তবে কোনো অবস্থাতেই খড় বানিয়ে তিন দিনের বেশি রাখা উচিত নয়। কারণ তাতে খড়ে ইউরিয়া এবং মোলাসেসের পরিমাণ কমতে থাকবে।

সারণী ১: ইউ এম এস প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন উপাদানের আনুপাতিক হার

শুকনো খড় (কেজি)	পানি (লিটার)	মোলাসেস (কেজি)	ইউরিয়া (কেজি)
৫	২.৫-৩.৫	১.০৫-১.২০	০.১৫
১০	৫.০-৭.০	২.১০-২.৪০	০.৩০
২০	১০.০-১৪.০	৪.২০-৪.৮০	০.৬০
৫০	২৫.০-৩৫.০	১০.৫০-১২.০০	১.৫০
১০০	৫০.০-৬০.০	২১.০০-২৪.০০	৩.০০

ইউ এম এস খাওয়ানোর গবেষণালব্ধ ফল

- বিএলআরআই গবেষণায় দেখা গেছে বাড়ন্ত ষাঁড়কে (৩০০ কেজি) ইউ এম এস যথেচ্ছা পরিমাণ খাওয়ানোর সাথে দৈহিক ওজনের শতকরা ০.০৮-১.০ ভাগ দানাদার মিশ্রণ সরবরাহ করলে দৈনিক ৭০০ থেকে ৯০০ গ্রাম দৈনিক ওজন বৃদ্ধি পায়।
- অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে পাবনা অঞ্চলের গাভীকে শুকনো খড়ের পরিবর্তে ইউ এম এস খাওয়ালে গাভী প্রতি দৈনিক দানাদার খাদ্যের পরিমাণ ১.৫০ কেজি কম দিয়েও দুধের উৎপাদন প্রায় ১.০ লিটার বেড়ে যায়।

কেন ইউ এম এস খাওয়ালে গরুর দুধ বা ওজন বৃদ্ধি পায়?

- গরু রুমেনের প্রয়োজন মোতাবেক আস্তে আস্তে খড়ের সাথে ইউরিয়া থেকে নাইট্রোজেন এবং মোলাসেস থেকে শর্করার সরবরাহ পেয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, মোলাসেস একইভাবে খনিজ পদার্থও প্রাণীকে সরবরাহ করে।
- উক্ত খাদ্য প্রণালী গরুর রুমেনের পরিবেশ সঠিক রাখে। ফলে খড় জাতীয় খাদ্যের পরিপাচ্যতা বৃদ্ধি পায়।

সুবিধা

- ইউ এম এস বাছুর, বাড়ন্ত, দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী গরু অথবা মহিষকে তাদের চাহিদা মতো খাওয়ানো যায়।
- শুধু ইউ এম এস খাওয়ালেও গরুর ওজন বৃদ্ধি পায়।
- ইউ, এম, এস তৈরির পদ্ধতি সহজ। একজন শ্রমিক অনায়াসে দৈনিক ৫০০-৬০০ কেজি ও শ্রমিক খরচ বাবদ কেজি প্রতি ইউ, এম, এস এর খরচ পড়ে ০.৬৫ হতে ০.৭৫ টাকা। মোলাসেস ও শ্রমিকের ওপর এই খরচ নির্ভর করবে।
- গবেষণায় দেখা গেছে যে, এ পদ্ধতিতে খড়ের সঙ্গে ১.০০ টাকার মোলাসেস খাইয়ে প্রায় ৫.০০ থেকে ৭.০০ টাকা মূল্যের গরুর মাংস উৎপাদন সম্ভব।
- ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক চেটে খাওয়ালে প্রাণীর যে উপকার হয় তা ইউ এম এস দ্বারাই সম্ভব। উপরন্তু কৃষক কম মূল্যে নিজের বাড়িতেই ইউ এম এস তৈরি করতে পারেন। ব্লক চেটে খাওয়ানোর মতো কোনো ঝামেলা এ পদ্ধতিতে নেই।
- যেহেতু ইউরিয়া ও মোলাসেস খড়ের সাথে ধীরে ধীরে খাচ্ছে, অতএব বিষক্রিয়া হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।
- সকল বয়সের গরু ও মহিষ যথেচ্ছা পরিমাণ এই খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।
- গর্ভবতী প্রাণীও এই খাদ্য খেতে পারে।
- কৃষক তার দৈনিক চাহিদা অনুযায়ী খড় প্রস্তুত করে প্রতিদিন খাওয়াতে পারেন।

অসুবিধা

- ইউ এম এস পদ্ধতিতে ইউরিয়া মোলাসেস খাওয়ানোর তেমন কোনো অসুবিধা নেই। শুধু মাত্র ইহা তৈরি করে তিন দিনের বেশি সংরক্ষণ করে রাখা যায় না।

সাবধানতা

- অবশ্যই ইউ এম এস তৈরি করার সময় ইউরিয়া, মোলাসেস, খড় ও পানির অনুপাত ঠিক রাখতে হবে। ইউরিয়ার মাত্রা কোনো অবস্থাতেই বাড়ানো যাবে না। ইউ এম এস এর গঠন পরিবর্তন করলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না।

ইউ এম এস প্রযুক্তি ব্যবহারে গরু মোটাতাজাকরণ খাদ্য সূত্র

সূত্র নং-১

গরুর প্রতিদিনের খাদ্য = ইউ এম এস (গরুর ইচ্ছামতো) + দানাদার মিশ্রণ (ওজনের শতকরা ০.৮ - ১.০ ভাগ)।

ইউ এম এস ব্যবহারে দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্য সূত্র

সূত্র নং-২

দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ = ইউ এম এস (গাভীর ইচ্ছামতো) + দুধের উৎপাদনের ভিত্তিতে দানাদার মিশ্রণ।

ইউ এম এস ব্যবহারে বাছুরের (৬ মাস) খাদ্য সূত্র

সূত্র নং-৩

দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ = ইউ এম এস (বাছুরের ইচ্ছামত) + দানাদার মিশ্রণ (ওজনের শতকরা ১.০ ভাগ)।

দানাদার মিশ্রণ

১. গম, চাল বা ভুট্টা ভাংগা	=	১০ - ২০ কেজি
২. গমের ভুসি ও ধানের কুঁড়ার মিশ্রণ (১:১)	=	৪৫ - ৫৫ কেজি
৩. সরিষা, তিল বা নারিকেলের খৈল	=	২০ - ২৫ কেজি
৪. মাছের গুঁড়া	=	৪ - ৫ কেজি
৫. চুনাপাথর বা ঝিনুকের পাউডার	=	৩ - ৪ কেজি
৬. লবণ	=	০.৫ -১ কেজি

প্রযুক্তিটি সহজ, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ামুক্ত ও লাভজনক। ইউ এম এস গো-খাদ্য প্রযুক্তিটি গবাদি প্রাণীর পুষ্টি সরবরাহ করে এবং একই সাথে গবাদিপ্রাণী থেকে পরিবেশ দূষণ হ্রাস করে। দেশের দুধ ও মাংসের ঘাটতি পূরণ ও বর্ধিত জনসংখ্যার কর্মসংস্থান করতে বাণিজ্যিকভাবে গরু মোটাতাজাকরণ ও দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠায় ইউ এম এস প্রযুক্তিটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করি।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. খান শহীদুল হক

দুধেল গাভী উৎপাদনে বিদেশী উন্নত জাতের ষাঁড়ের সংকরায়ন সঠিক মাত্রা

ভূমিকা

একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন জাতের প্রাণীর মধ্যে প্রজননের ফলে যে মিশ্র জাতের সৃষ্টি হয় তাকে সংকরায়ন বলে। যেমন, বিদেশী ফিজিয়ান ষাঁড় ও দেশী গাভী প্রজননে সংকর জাত, শাহিওয়াল ষাড়ের সাথে সিন্ধি গাভীর মাধ্যমে সংকর জাত ইত্যাদি। সংকরায়নের ফলে উৎপন্ন মিশ্রজাত অধিক উৎপাদনক্ষম (মাংস ও দুধ) হয়। আমাদের দেশে খামারিদের নিকট সবচেয়ে বড় সমস্যা সংকরায়নের সঠিক মাত্রা নির্ধারণ অর্থাৎ শতকরা কতভাগ বিদেশী কৌলিক গুণাগুণ দেশী গাভীতে সন্নিবেশ করে সংকর জাতের গাভী তৈরি করা হবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্যই প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

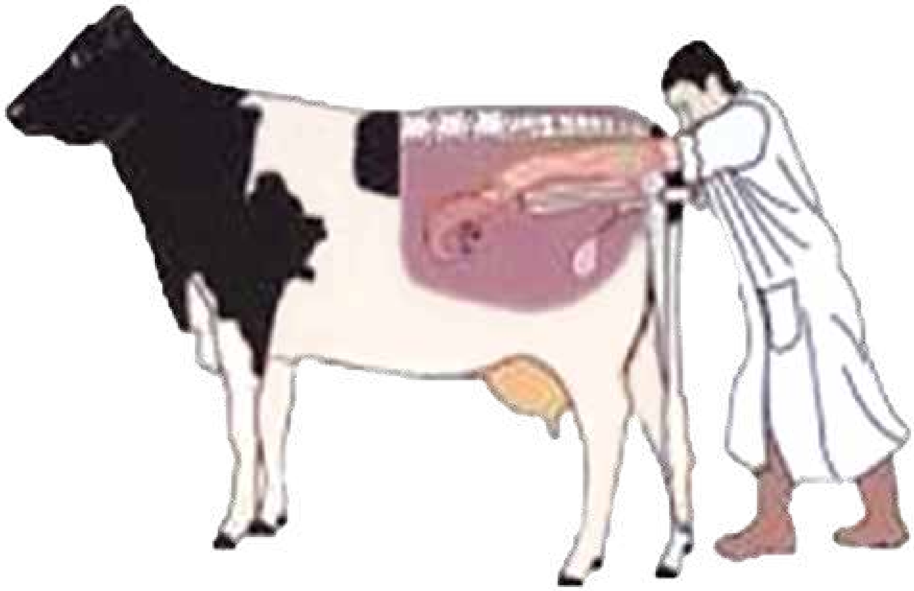

ব্যবহার পদ্ধতি

১. ১৯৭৮ সালে জাতীয় পর্যায়ে জার্মান কারিগরি সহায়তায় ঢাকার সাভারে কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন খামার (CCBS) স্থাপনের মাধ্যমে শুরু হয় দেশের সর্ববৃহৎ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম। সেই থেকে প্রজনন কার্যক্রম রেকডিং হয়ে আসছে, কিন্তু এ কার্যক্রমের অগ্রগতির মূল্যায়ন অথবা কোন জাতের সংকর কত মাত্রায় বাংলাদেশের আবহাওয়ায় ভালো উৎপাদনক্ষম তা কখনো বিশ্লেষণ করা হয়নি।

২. এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সংকর জাতের উদ্যোগে এ সমস্ত গাভীগুলোর মূল্যায়ন ও বাংলাদেশের দুগ্ধ খামারগুলোতে কোন ধরনের সংকর গাভী রাখা লাভজনক তা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে একটি কার্যক্রম হাতে নেয় এবং তা সম্পূর্ণ করে।

৩. সাভার জাতীয় দুগ্ধ খামারে সংরক্ষিত রেকর্ড বই/কার্ড থেকে প্রায় ২০০০ গাভীর উৎপাদন ও পুন:উৎপাদন সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ করে তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয়।

সংকরায়নের সঠিক মাত্রা

১. বিশ্লেষণের ফলাফলে দেখা যায় এ দেশের আবহাওয়া, খাদ্য, পরিচর্যা ইত্যাদি প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ১০০% ফ্রিজিয়ান জাতের গাভীর পারদর্শিতা অন্যান্য সকল জাতের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে ভালো। কিন্তু তা এ জাতের উৎপত্তি স্থলে যে উৎপাদন ছিল তার চেয়ে অনেক কম। সংকর জাতসমূহের মধ্যে দেশী (৫০%) × ফ্রিজিয়ান (৫০%) অথবা শাহিওয়াল (৫০%) × ফ্রিজিয়ান (৫০%) বৈশিষ্ট্য সম্বলিত প্রথম সংকর (F_1) গাভীগুলোর দুগ্ধ উৎপাদন ও পুন:উৎপাদন ক্ষমতাই উৎকৃষ্ট হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

২. এছাড়া দ্বিতীয় (F_2) বা তৃতীয় (F_3) প্রজন্মের মধ্যে ফ্রিজিয়ান বা অন্যান্য বিদেশী জাতের কৌলিকভাগ যে হারে বেড়েছে তাদের উৎপাদন সে হারে বৃদ্ধি হয়নি, বরং ক্ষেত্রবিশেষে উৎপাদন কমেও গেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফ্রিজিয়ান ষাঁড়ের শতকরা ৫০ ভাগ দেশী অথবা শাহিওয়াল জাতের গাভীতে সংমিশ্রণের ফলে উৎপাদিত ১ম সংকর গাভীই উৎপাদন ও পুন:উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট।

সঠিকভাবে সংকরায়নের উপকারিতা

- উন্নত গুণসম্পন্ন জাত নির্বাচন করা যায়,
- যৌন ব্যাধি বা অন্যান্য রোগ বালাই নিয়ন্ত্রন করা সহজ,
- সংকরায়নের ফলে গর্ভধারণের হার বৃদ্ধি পায়,
- সতর্কতার সাথে সংকরায়নের ফলে গাভীর সর্বাধিক উর্বরতা অর্জন সম্ভব।

সঠিক মাত্রায় সংকরায়নের মাধ্যমে গাভী উৎপাদিত হলে আশানুরূপ দুধ ও নিয়মিত বাচ্চা পাওয়া যায় ও তাদের ব্যবস্থাপনা ব্যয় অনেক কম হয়।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. টি. এন. নাহার, ড. এম. এ. মজিদ ও ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার

বর্ষাকালে তাজা ও ভিজা খড় সংরক্ষণ

ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ১.৮-২ কোটি টন ধানের খড় উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ উৎপাদিত হয় বর্ষা মৌসুমে। এ সময়ে বোরো ও আউস ধান থেকে উৎপাদিত প্রায় ৮০ লক্ষ টন খড় বৃষ্টি, জলাবদ্ধতা ও অন্যান্য কারণে শুকানো যায় না, ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়। এ পরিমাণ খড়ের বর্তমান বাজারদর কমপক্ষে ৮০ কোটি টাকা। একদিকে এত বিপুল পরিমাণ খড় প্রতিবছর নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে দেশের গো-খাদ্যের চাহিদা শতকরা ৪৪ ভাগই ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া আমন মৌসুমে উৎপাদিত খড়কে শুকাতে কৃষক ভাইদের প্রচুর শ্রম, অর্থ ও সময় ব্যয় করতে হয়। এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ধানের খড়কে কাঁচা ও ভিজা অবস্থায় সংরক্ষণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে।

প্রযুক্তির মূল বৈশিষ্ট্য

ভিজা খড়ে প্রায় শতকরা ৬০-৭০ ভাগ পানি থাকে। আমাদের দেশে পরিবেশের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ২০° থেকে ৪০° সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রায় পানিযুক্ত খড়কে স্তুপাকারে রেখে দিলে উপযুক্ত পি এইচ (প্রায় ৭) এ খড়ের পুষ্টি উপাদান ব্যবহার করে ব্যাক্টেরিয়া, ইস্ট, ফাঙ্গাস জন্মায়। এই জীবাণুগুলো এবং তাজা খড়ে বিদ্যমান বিশেষ ধরনের এনজাইম খড়কে দ্রুত পচনে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে খড় প্রথমে খুব গরম হয়। খড়ের স্তুপের ভেতরের তাপমাত্রা প্রায় ৬০° সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠে এবং পরে কালো নরম গোবরের মতো হয়ে যায়, যা কেবল কমপোস্ট বা জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

ব্যবহার পদ্ধতি

শুকিয়ে সংরক্ষণ

ভিজা খড়কে রোদে বা অন্য কোনো উপায়ে শুকিয়ে এর পানির পরিমাণ ১০% এর নিচে নামিয়ে আনলে খড়ের ওপর জীবাণু এবং এনজাইমের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এ অবস্থায় খড়কে সংরক্ষণ করলে খড় নষ্ট হয় না। আমাদের দেশে এ পদ্ধতিতেই খড় সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত বৃষ্টিতে খড় শুকানো প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া কৃষক ভাইয়েরা এ সময়ে ধান শুকানোতে ব্যস্ত থাকেন। তাই এই পদ্ধতি অন্তত বর্ষা মৌসুমে কার্যকর নয়।

ফ্রিজিং করে সংরক্ষণ

ভিজা খড়কে -১০° থেকে -২০° সেঃ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করলে খড় পচনের জন্য দায়ী জীবাণু এবং এনজাইমের কার্যকারিতা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এ অবস্থায় যতদিন খুশি খড়কে সংরক্ষণ করা যায়। তবে এই পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং এ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ আদৌ বাস্তব সম্মত নয়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ

এই পদ্ধতিতে খড়কে অতিমাত্রায় অম্লীয় বা ক্ষারীয় করে পচনকারী জীবাণু ও এনজাইমের কার্যক্রম রোধের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। খড়কে অম্লীয় (pH<4) করার জন্য বিভিন্ন ধরনের জৈব এসিড যেমন : এসিটিক এসিড, প্রোপায়োনিক এসিড ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে চিটাগুড় সহজলভ্য। চিটাগুড় দিয়ে খড়কে অবায়বীয় অবস্থায় সংরক্ষণ করলে চিটাগুড়ের সুগার থেকে লেকটিক এসিড তৈরি হয়। এই লেকটিক এসিড পচনকারী জীবাণু ও এনজাইমের কার্যকারিতা রোধের মাধ্যমে খড়কে সংরক্ষণ করে। তবে চিটাগুড় ব্যবহারের কয়েকটি অসুবিধা হচ্ছে : (ক) এটি ব্যয়বহুল, (খ) অবায়বীয় অবস্থায় খড়কে সংরক্ষণ করতে হয়, (গ) এ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণে খড়ের পুষ্টিমান বৃদ্ধি পায় না। খড়কে অতিমাত্রায় ক্ষারীয় (pH<8) করেও এর পচন রোধ করা যায়। খড় সংরক্ষণের বিভিন্ন অসুবিধার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ইউরিয়া দিয়ে ভিজা খড় সংরক্ষণের একটি সহজ ও সুলভ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে। এই পদ্ধতিতে খড় সংরক্ষণ সবচেয়ে সহজ এবং এর সুবিধাজনক দিক হচ্ছে :

১. ইউরিয়া খড়ের পুষ্টিমান বৃদ্ধি করে
২. ইউরিয়া সহজলভ্য ও তুলনামূলকভাবে দাম কম
৩. এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ ও নিরাপদ

ইউরিয়া ব্যবহারে সংরক্ষণ : সংরক্ষণ পূর্ব পদ্ধতি

খড়

ধানকাটা ও মাড়ানোর পর কাচা ও ভিজা অবস্থায় যে খড় পাওয়া যায় সে অবস্থাতেই খড়কে সংরক্ষণ করা হয়। তবে নিচু পানিবদ্ধ জমি থেকে কেটে আনা খড়ের অতিরিক্ত পানি ঝরিয়ে নেয়া উচিত। যে জমির ধান সম্পূর্ণ চিটা হয়ে গেছে তা এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা উচিত নয়।

খড় সংরক্ষণের স্থান

পানি জমে না এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা যুক্ত স্থানে খড়কে সংরক্ষণ করা উচিত। মোটামুটি ৬ ফুট চওড়া এবং ১২ ফুট লম্বা জায়গায় ৫-৬ টন কাঁচা ও ভিজা খড় সংরক্ষণ করা যায়। সাধারণত এ দেশে বৃত্ত করা স্থানের উপর গম্বুজের আকারে খড়ের গাদা তৈরি করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আনুভূমিক লম্বা খড়ের গাদা তৈরি করতে হবে।

পলিথিন

বাজারে যে ৮ হাত চওড়া এবং ০.০৮ মিঃ মিঃ পুরো পলিথিন পাওয়া যায় তা সংরক্ষণ কাজের উপযুক্ত। সাধারণত প্রতি টন ভিজা খড় সংরক্ষণ করতে ৩.৫ থেকে ৪.০ গজ পলিথিন প্রয়োজন হয়।

ইউরিয়া

খড়ে পানির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে প্রতি একশত কেজি ভিজা খড়ে ১.৫ থেকে ২.০ কেজি পরিমাণ ইউরিয়া প্রয়োজন হয়।

সংরক্ষণ পদ্ধতি

- যে স্থানে খড় সংরক্ষণ করা হবে প্রথমে সে স্থানে পুরানো খড়কুটা বা পুরানো পলিথিন বিছাতে হবে।
- এবার এক স্তর ভিজা খড় যেমন ২৫ কেজি খড় বিছাতে হবে। উক্ত পরিমাণ খড়ের জন্য ৩৫০-৫০০ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হবে।
- এভাবে স্তরে স্তরে খড় এবং ইউরিয়া ছিটিয়ে খড়ের গাদা তৈরি করতে হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে খড়ের গাদার আকার খাঁড়া গম্বুজাকার না হয়ে চওড়া হবে।
- যখন সম্পূর্ণ খড় শেষ হবে তখন খড়ের গাদাকে এমনভাবে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে খড়ের গাদায় কোনো বাতাস ঢুকতে বা বের হতে না পারে। পলিথিনের কিনারাগুলো মাটি দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিতে হবে। অধিক পরিমাণ খড়ের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যখন খড়ের গাদার চওড়া হয়, সে ক্ষেত্রে দুই টুকরা পলিথিনকে প্রস্থ বরাবর জোড়া (গলিয়ে) দিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে পলিথিনে যাতে কোনো বড় ধরনের ছিদ্র না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- অতিরিক্ত পানি যুক্ত খড়ের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে ৩/৪ স্তর পর পর এক স্তর শুকনো খড় দিলে খড়ের সংরক্ষণ ভালো হয়।
- সাধারণত বিভিন্ন জমির ধান সাধারণত বিভিন্ন সময়ে কাটা হয়। এ ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব এক সাথে সব খড় সংরক্ষণ সবচেয়ে উত্তম। তবে কিছু পরিমাণ খড় ইউরিয়া দিয়ে বায়ুরোধী (অর্থাৎ পলিথিনে ঢাকা) অবস্থায় সংরক্ষণের পর সেখানে নতুন ভিজা খড় যোগ করতে হলে গাদার পলিথিন সরিয়ে প্রথমে কিছু পরিমাণ (৩০০-৫০০ গ্রাম, গাদার আকারের ওপর নির্ভর করে) ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হবে এবং পরবর্তীতে পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুসারে খড় এবং ইউরিয়া দিতে হবে। সব শেষে পূর্বের ন্যায় খড়ের গাদাকে পলিথিন দিয়ে বায়ুরোধী অবস্থায় ঢেকে দিতে হবে।

সংরক্ষণকাল

সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত খড় এক বছরের অধিক সময় সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণের দুই সপ্তাহ পর থেকে যে কোনো সময় ইচ্ছা করলে এ খড় গাদা থেকে বের করে গরুকে খাওয়ানো যেতে পারে।

সংরক্ষিত খড় খাওয়ানো

গাদা থেকে বের করা সংরক্ষিত খড়ে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া থাকে। খোলা বাতাসে আধ ঘণ্টা পরিমাণ সময় রেখে দিলে অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া চলে যায়। এর পর উক্ত সংরক্ষিত খড়কে শুকনো খড় বা কাচা ঘাসের সাথে মিশিয়ে গরুকে খাওয়ানো যেতে পারে। গরু সাধারণত সংরক্ষিত খড় পছন্দ করে তাই খাওয়াতে অসুবিধা হয় না। কোনো ক্ষেত্রে গরু তা অপছন্দ করলে আস্তে আস্তে তাকে অভ্যস্ত করে তুলতে হয়। সংরক্ষিত ভিজা খড়কে পুনরায় শুকানোর কোনো প্রয়োজন নেই এবং এতে খড়ের পুষ্টিমান কমে যায়।

সংরক্ষিত খড়ের পুষ্টিমান

ইউরিয়া ভিজা খড়কে সংরক্ষণের পাশাপাশি এর পুষ্টিমানও বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের এক গবেষণায় দেখা যায় যে, সংরক্ষিত খড়ের প্রোটিন, বিপাকীয় শক্তি, পাচ্যতা এবং খাদ্য গ্রহণ শুকানো খড়ের তুলনায় অনেক বেশি (১নং সারণি দেখুন)। উক্ত গবেষণায় দেখা গেছে যে, শুধু শুকানো খড় খাওয়ালে একটি বাড়ন্ত গরু দৈনিক প্রায় ৩৭৯ গ্রাম ওজন হারায় কিন্তু শুধু সংরক্ষিত খড় খাওয়ালে দৈনিক প্রায় ২৮০ গ্রাম ওজন বৃদ্ধি পায়। উক্ত গবেষণায় দেখা যায় যে, সংরক্ষিত খড়ের পুষ্টিমান শুকানো খড়ের তুলনায় ১.৪ গুণ বেশি। অর্থাৎ একই পরিমাণ উৎপাদনের জন্য শুকানো খড়ের তুলনায় সংরক্ষিত ভেজা খড়ে কম খাদ্যের প্রয়োজন।

সারণি ১ : শুকানো ও ইউরিয়া সংরক্ষিত ভিজা খড়ের তুলনামূলক পুষ্টিমান

	শুকানো খড়	সংরক্ষিত খড়
১। প্রোটিন	৪-৫%	৯-১২%
২। রুমেন পাচ্যতা	২৭%	৪৫%
৩। বিপাকীয় শক্তি প্রতি কেজিতে	৭ মেগাজুল	১০ মেগাজুল
৪। প্রতি ১০০ কেজি গরুর ওজনে খাদ্য গ্রহণ	১.৭২ কেজি	২.৫ কেজি
৫। শুধু খড় খাওয়ালে দৈনিক ওজনের পরিবর্তন	-৩৭৯ গ্রাম	২৮৩ গ্রাম

সংরক্ষণ খরচ

এ ক্ষেত্রে ইউরিয়া এবং পলিথিনের খরচই প্রধান। নিচে বর্তমান বাজার দর হিসাবে ৫ টন খড়ের সংরক্ষণ খরচ দেয়া হলো :

পলিথিন : ১৬ গজ (প্রতি গজ ৩০ টাকা হিসাবে)	= ৪৮০ টাকা
ইউরিয়া : ৭৫ কেজি (প্রতি কেজি ৫ টাকা হিসাবে)	= ৩৭৫ টাকা
মোট	= ৮৫৫ টাকা

পাঁচ টন খড়ের বর্তমান বাজার মূল্য কমপক্ষে ৫,০০০ টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আমরা প্রায় সাড়ে আটশত টাকা খরচ করে মোটামুটি ৫,০০০ টাকার খড় রক্ষা করতে পারি। অর্থাৎ প্রতি ১০০ টাকার খড়ের সংরক্ষণ খরচ প্রায় ১৭.১০ টাকা। কিন্তু পুষ্টিমানের বিচারে প্রতি ১০০ টাকার খড়ের সংরক্ষণ খরচ ১২.২০ টাকা মাত্র।

সাবধানতা

১. এই সংরক্ষণ পদ্ধতিতে খড়ের গাদায় পর্যাপ্ত পরিমাণ অ্যামোনিয়া থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাই সংরক্ষণকালে পলিথিনের আবরণ যাতে কোনো ভাবে নষ্ট না হয় সে দিকে বিশেষ যত্নবান হতে হবে।
২. পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যে সব ক্ষেতের ধান পুরোপুরি চিটা হয়ে গেছে সেসব খড় এই প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করা উচিত নয়। কারণ এ ধরনের সংরক্ষিত খড়ে ইমিডেজল জাতীয় যৌগ উৎপাদন হয় যা খেলে গরুর অসুবিধা হতে পারে।

উপসংহার

উপরোক্ত সংরক্ষণ পদ্ধতিটি শুধু বর্ষা মৌসুমে উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ খড়ের পচন রোধই করে না, বরং খাদ্যমানও বৃদ্ধি করে। তাছাড়া সংরক্ষণ পদ্ধতিটি কৃষকের শ্রম, সময় এবং আর্থিক সাশ্রয় করবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক: ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী ও ড. মোঃ এবাদুল হক

ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক সংরক্ষণ প্রযুক্তি

ভূমিকা

ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক গো-খাদ্য প্রযুক্তিটি খামারিদের নিকট বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু ব্লক সংরক্ষণ সমস্যার জন্য খামারিগণ প্রায়ই অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। বিশেষ করে বৃষ্টির দিনে বা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে ব্লকের ওপর ছত্রাক পড়ায় ব্লক গরু খেতে চায় না।

চিত্র: প্রস্তুতকৃত ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক

প্রযুক্তি ব্যবহারের পদ্ধতি

- খাদ্য উপাদানগুলোর সাথে শতকরা ০.৫-১.০ ভাগ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত প্রোপিওনিক এসিড স্প্রে করে ব্লক উৎপাদন ও সংরক্ষণ করলে সারা বছরেও ছত্রাক ধরে না।
- প্রোপিনিক এসিড গরুর দেহের জন্য মোটেই ক্ষতিকর নয়। এ ধরনের এসিড গরুর পাকস্থলীতে খাদ্য হতে উৎপন্ন হয় এবং গরু বাছুরের দেহে গ্লুকোজ ও শক্তি সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হয়।

অতএব, প্রোপায়নিক এসিড দ্বারা সংরক্ষিত ব্লক কখনও নষ্ট হবে না এবং বাছুরের ক্ষতিও করবে না। ব্লক সংরক্ষণে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত প্রোপায়নিক এসিড ব্যবহার করে খামারিগণ উপকৃত হবেন।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক: ড. খান শহীদুল হক

গো-খাদ্য হিসেবে অ্যালজি উৎপাদন ও ব্যবহার

ভূমিকা

আদিমকাল থেকে মানুষ খাদ্যের বিকল্প উৎসের সন্ধান করে আসছে। প্রকৃতির ভান্ডারে খাদ্যের অফুরন্ত উৎসের অনেক খনিই আমাদের চোখের আড়ালে রয়ে গেছে। এ কথা মানুষের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, প্রাণীপাখির ক্ষেত্রেও তাই। প্রাণীপাখির ক্ষেত্রে মানুষকে সে উৎসের সন্ধান জানিয়ে দিতে হয়। অ্যালজি তেমনি প্রকৃতির ভান্ডারের একটি সম্ভাবনাময় খাদ্য যা আমরা প্রাণীখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

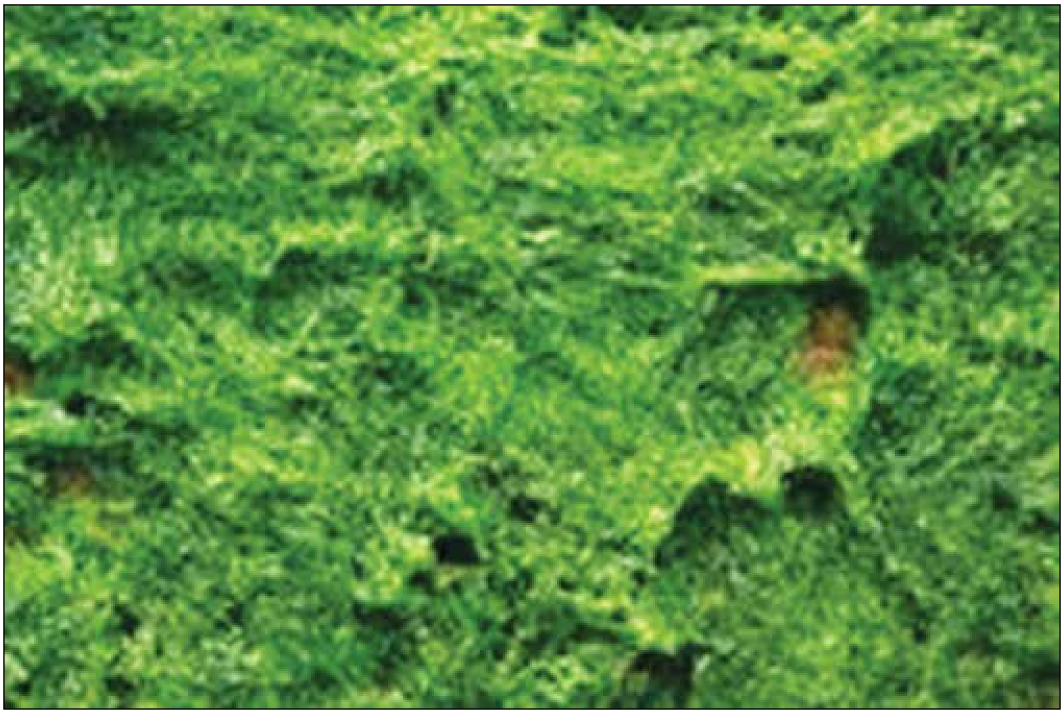

চিত্র: গো-খাদ্য হিসেবে অ্যালজি উৎপাদন

অ্যালজি কি

অ্যালজি এক ধরনের উদ্ভিদ যা আকারে এককোষী থেকে বহুকোষী বিশাল বৃক্ষের মতো হতে পারে। তবে আমরা এখানে দুটি বিশেষ প্রজাতির এককোষী অ্যালজির কথা উল্লেখ করবো, যা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এগুলো হলো ক্লোরেলা এবং সিনেডে সমাস। এরা সূর্যালোক, পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জৈব নাইট্রোজেন আহরণ করে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বেচে থাকে। এরা অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উষ্ণ জলবায়ুতে। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে জাপানে আমিষ এবং চর্বির উৎস হিসেবে এক কোষী অ্যালজির চাষ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শুরু হয়। পরবর্তীতে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। তবে এসব ক্ষেত্রে অ্যালজির উৎপাদন পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত ব্যয় বহুল। এ দেশে, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের (বি সি এস আই আর) বিজ্ঞানী মিসেস মোমেনা খাতুন ঢাকায় বিভিন্ন পুকুর থেকে পানি সংগ্রহ করে তা থেকে ক্লোরেলা ও সিনেডেসমাস আলাদা করেন। পরবর্তীতে তিনি ও তার সহযোগীরা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক মিডিয়াতে অ্যালজি উৎপাদনের পদ্ধতির ওপর গবেষণা চালান। এসব মিডিয়ায় অ্যালজির ভাল উৎপাদন হলেও এর উৎপাদন ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং মিডিয়া থেকে অ্যালজিকে আলাদা করে তারপর ব্যবহার করতে হতো। তাই তাঁরা বিভিন্ন ধরনের ডালের ভুসি, মোটরের ছোবড়া, কাউপি ইত্যাদি ব্যবহার করে গবেষণাগারে অ্যালজি উৎপাদনের চেষ্টা করেন। এতে দেখা যায় ডালের ভুসি ব্যবহার করে অ্যালজি উৎপাদন সম্ভব, যা সহজলভ্য এবং সরাসরি ব্যবহার করা যায়। এ পর্যায়ে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর বিজ্ঞানী এবং বিসিএসআইআর এর বিজ্ঞানীগণ যৌথভাবে গবেষণা চালিয়ে খামার পর্যায়ে অ্যালজির উৎপাদন এবং প্রাণীখাদ্য হিসেবে এর উপযোগিতা নির্ণয় করেন। উদ্ভাবিত উৎপাদন ও ব্যবহার পদ্ধতিগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

অ্যালজির পুষ্টিমান

বিভিন্ন ধরনের অপ্রচলিত খাদ্যের মধ্যে অ্যালজি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পুষ্টিকর খাদ্য যা বিভিন্ন ধরনের আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন- খৈল, শুঁটকি মাছের গুঁড়া ইত্যাদির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। শুষ্ক অ্যালজিতে শতকরা ৫০-৭০ ভাগ আমিষ বা প্রোটিন, ২০-২২ ভাগ চর্বি এবং ৮-২৬ ভাগ শর্করা থাকে। এছাড়াও অ্যালজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং বিভিন্ন ধরনের বি ভিটামিন থাকে। কেবলমাত্র "সিসটিন" ছাড়া অ্যালজির প্রোটিনে বিভিন্ন ধরনের অ্যামাইনো এসিডের অনুপাত প্রায় ডিমের প্রোটিনের সমান। রোমন্থনকারী প্রাণীতে (যেমন গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া) অ্যালজির প্রোটিনের পাচ্যতা ৭৩%।

অ্যালজির উৎপাদন পদ্ধতি ঃ নিম্নে উৎপাদন পদ্ধতিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

অ্যালজি চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ

অ্যালজির বীজ, কৃত্রিম অগভীর পুকুর, টিউবওয়েলের পরিষ্কার স্বচ্ছ পানি, মাষকালাই বা অন্যান্য ডালের ভুসি এবং ইউরিয়া।

- প্রথমে তৈরি করতে হবে সমতল, ছায়াযুক্ত জায়গায় একটি কৃত্রিম পুকুর। পুকুরটি লম্বায় ১০ ফুট, চওড়ায় ৪ ফুট এবং গভীরতায় ১/২ ফুট হতে পারে। পুকুরের পাড় ইট বা মাটির তৈরি হতে পারে। এবার ১১ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া একটি স্বচ্ছ পলিথিন বিছিয়ে কৃত্রিম পুকুরের তলা ও পাড় ঢেকে দিতে হবে। তবে পুকুরের আয়তন প্রয়োজন অনুসারে ছোট বা বড় হতে পারে। তাছাড়া মাটির বা সিমেন্টের চাড়িতেও অ্যালজি চাষ করা যায়।
- ১০০ গ্রাম মাসকালাই (বা অন্য ডালের) ভুসিকে ১ লিটার পানিতে সারারাত ভিজিয়ে কাপড় দিয়ে ছেঁকে পানিটুকু সংগ্রহ করতে হবে। একই ভুসিকে অন্তত তিনবার ব্যবহার করা যায়, যা পরবর্তীতে গরুকে খাওয়ানো যায়।
- এবার কৃত্রিম পুকুরে ২০০ লিটার পরিমাণ কলের পরিষ্কার পানি, ১৫-২০ লিটার পরিমাণ অ্যালজির বীজ, যা অ্যালজির ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে এবং মাষকালাই ভুসি ভেজানো পানি নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর ২-৩ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া নিয়ে উক্ত পুকুরের পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- এরপর প্রতিদিন সকাল, দুপুর, বিকেলে কমপক্ষে তিনবার উক্ত অ্যালজির কালচারকে নেড়ে দিতে হবে। পানির পরিমাণ কমে গেলে নতুন করে পরিমাণ মতো পরিষ্কার পানি যোগ করতে হবে। প্রতি ৩/৪ দিন পর পর পুকুর প্রতি ১-২ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া ছিটালে ফলন ভালো হবে।
- এভাবে উৎপাদনের ১২-১৫ দিনের মধ্যে অ্যালজির পানি গরুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। এ সময় অ্যালজির পানির রঙ গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়। অ্যালজির পানিকে পুকুর থেকে সংগ্রহ করে সরাসরি গরুকে খাওয়ানো যায়।
- একটি পুকুরের অ্যালজির পানি খাওয়ানোর পর উক্ত পুকুরে আগের নিয়ম অনুযায়ী পরিমাণ মতো পানি, সার এবং মাষকালাই ভুসি ভেজানো পানি দিয়ে নতুন করে অ্যালজি কালচার শুরু করা যায়, এ সময় নতুন করে অ্যালজি বীজ দিতে হয় না।
- যখন অ্যালজি পুকুরে পানির রঙ স্বাভাবিক গাঢ় সবুজ রঙ থেকে বাদামি রঙ হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে যে উক্ত কালচারটি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে নতুন করে কালচার শুরু করতে হবে। এ কারণে অ্যালজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিয়ে বর্ণিত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

সাবধানতা

১. অ্যালজির পুকুরটি সরাসরি সূর্যালোকের নিচে না করে ছায়াযুক্ত স্থানে করা উচিত। কারণ অতি আলোকে অ্যালজি কোষের "ফটো অক্সিডেটিভ ডেথ" হয়। অর্থাৎ অ্যালজি কোষের মৃত্যু হয়। এ জন্য কালচারটি নষ্ট হয়ে যায়।
২. কখনোই মাষকালাই ভুসি ভেজানো পানি বর্ণিত পরিমাণের চেয়ে বেশি দেয়া উচিত নয়, এতেও "নিউট্রেন্টসুপার সেচুরেশন" এর কারণে অ্যালজি কোষ মারা যেতে পারে।
৩. অ্যালজি পুকুরের পানিকে নাড়া না দিলে কোষের ওপর কোষ থিতিয়ে কালচারটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
৪. যদি কখনো অ্যালজি পুকুরের পানি গাঢ় সবুজ রঙের পরিবর্তে হালকা নীল রঙ ধারণ করে তখন তা ফেলে দিয়ে নতুন করে কালচার শুরু করতে হবে। কারণ নীলবর্ণের অ্যালজি ভিন্ন প্রজাতির বিষাক্ত অ্যালজি যা ক্লোরেলা ও সিনেডে সমাস থেকে ভিন্ন।

ফলন ও খরচ

উপরোক্ত নিয়মে অ্যালজি উৎপাদন করলে প্রতি ১০ বর্গ মিটার পুকুর থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫০ লিটার অ্যালজির পানি বা ১৫০ গ্রাম শুষ্ক অ্যালজি উৎপাদন সম্ভব। এ হিসাবে এক বছরে উপরোক্ত আয়তনের পুকর থেকে প্রায় ১৭.৫ টন অ্যালজির পানি উৎপাদন সম্ভব। উপাদান সামগ্রীর দাম অনুসারে প্রতি লিটার অ্যালজির উৎপাদন করতে সর্বোচ্চ পাঁচ পয়সা খরচ পড়তে পারে। নিম্নে অ্যালজি এবং প্রচলিত বিভিন্ন ঘাসের হেক্টর প্রতি উৎপাদন এবং খরচ দেখানো হলো।

সারণি ১ : অ্যালজি ও বিভিন্ন ঘাসের হেক্টর প্রতি বার্ষিক উৎপাদন ও খরচ

ঘাসের নাম	উৎপাদন (টন)	খরচ (টাকা, প্রতি কেজি)
ভুট্টা	৮০-৯০	০.৬৬
নেপিয়ার	২০০-২৫০	০.২৬
পারা (নিচু জমি)	১০০-১৫০	০.২৭
ওট	৫৪	০.২৪
অ্যালজি পানি	১৮২৫০	০.০৫

সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, অ্যালজি উৎপাদন করতে কোনো আবাদি জমির প্রয়োজন হয় না। বাড়িতে যে কোনো ছায়াযুক্ত সমতল স্থানে এমনকি ঘরের ভেতরে বা দালানের ছাদেও চাষ করা যায়।

গরুকে অ্যালজি খাওয়ানো

অ্যালজির পানি সব ধরনের এবং সব বয়সের গরুকে অর্থাৎ বাছুর, বাড়ন্ত গরু, দুধের বা গর্ভবতী গাভী, হালের বলদ সবাইকেই অ্যালজি খাওয়ানো যায়। অ্যালজি খাওয়ানোর কোনো ধরা বাধা নিয়ম নেই। এটাকে সাধারণ পানির পরিবর্তে সরাসরি খাওয়ানো যায়। এ ক্ষেত্রে গরুকে আলাদা করে পানি খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। দানাদার খাদ্য অথবা খড়ের সাথে মিশিয়েও খাওয়ানো যায়। সাধারণত দুই-এক দিনের মধ্যেই গরু এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। গরু সাধারণত তার ওজনের ৮ ভাগ অর্থাৎ ১৫০ কেজি ওজনের গরু ১২ কেজি পরিমাণ অ্যালজির পানি পান করে। তবে গরমের দিনে এর পরিমাণ বাড়তে পারে। অ্যালজির পানিকে গরম করে খাওয়ানো উচিত নয়, এতে অ্যালজির খাদ্যমান নষ্ট হতে পারে। যদি বেশি গরু থাকে (যেমন ধরুন ৫টি গরু আছে)। এ ক্ষেত্রে অন্তত পূর্বে বর্ণিত আকারের ৫টি কৃত্রিম পুকুরে অ্যালজি চাষ করা উচিত যাতে একটির অ্যালজির পানি শেষ হতে পরবর্তীটি খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়।

অ্যালজি খাওয়ানোর উপকারিতা

রোমন্থনকারী প্রাণী যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া যে খড় বা ঘাস ইত্যাদি খেয়ে থাকে তা পাকস্থলীর জীবাণু দ্বারা ভেঙ্গে হজম হয়। এই জীবাণুর পরিমাণ এবং কার্যক্রম খাদ্যের ওপর নির্ভর করে। যদি ভালোমানের খাদ্য অর্থাৎ পরিমাণ মতো প্রোটিন, সহজপাচ্য কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন এবং খনিজ যুক্ত খাবার খায় তাহলে এই জীবাণুর পরিমাণ ও কার্যক্রম বেড়ে যায় তথা গরুতে প্রোটিন এবং বিপাকীয় শক্তির সরবরাহ বেড়ে যায়। আবার যদি নিম্নমানের খাদ্য যেমন- খড় খায়, তবে গরু তার চাহিদা মত বিপাকীয় শক্তি ও প্রোটিন পায় না। তাই শুধু খড় খাওয়ালে গরুর উৎপাদন কমে যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অ্যালজিতে প্রচুর প্রোটিন, ভিটামিন, শর্করা রয়েছে। বিএলআরআই-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, খড়ের সাথে সাধারণ পানির পরিবর্তে অ্যালজির পানি খাওয়ালে বাড়ন্ত গরুর মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন সরবরাহ বেড়ে যায় এবং গরুর দৈহিক ওজন হ্রাস অনেক কমে যায়। আমাদের দেশে প্রায় সারা বছরই কাঁচা ঘাসের অভাব প্রকট। বিশেষ করে শহর এলাকায় এ সমস্যা তীব্র। এর ফলে গরুর ভিটামিন এবং খনিজের অভাবজনিত রোগ যেমন-অন্ধত্ব, রাতকানা, গাভীর অনুর্বরতা ইত্যাদি দেখা যায়। যেহেতু অ্যালজিতে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজ থাকে, তাই অ্যালজি খাওয়ানোর ফলে গরুকে এসব পুষ্টির অভাবজনিত রোগ থেকে রক্ষা করা যায়। বিএলআরআই-তে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, অ্যালজি খাওয়ানোর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।

উপসংহার

আমাদের দেশে গরুর প্রধান খাদ্য খড়। তাছাড়া প্রোটিন এবং ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবারের অপ্রতুলতা এবং দুর্মূল্যের কারণে সবাই এসব খাদ্য গরুকে খাওয়াতে পারেন না। ফলে গরুর উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় অ্যালজির পানি ব্যবহার করে গরুর মাংস এবং দুধ উৎপাদন সম্ভব, যা দারিদ্র্যবিমোচন এবং আত্মকর্মসংস্থানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়াও অ্যালজি বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে, প্রতি গ্রাম অ্যালজি প্রায় ১.৬ গ্রাম অক্সিজেন উৎপাদন করে। এভাবে অ্যালজি উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করাও সম্ভব।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী ও ড. খান শহীদুল হক

দেশীয় পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ

ভূমিকা

বাংলাদেশে বৃষ্টির মৌসুমে কোনো কোনো এলাকায় প্রচুর পরিমাণে ঘাস পাওয়া যায়। যেমন- দুর্বা, বাকসা, আরাইল, সেচি, দল, শস্য খেতের আগাছা ইত্যাদি। এ ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন গাছের পাতা যা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়, যেমনঃ ইপিল-ইপিল, ধৈঞ্চা ইত্যাদি। বৃষ্টির মৌসুমে গো-সম্পদের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতিও হয়। শুষ্ক মৌসুমে সবুজ ঘাসের অভাবে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। দেশীয় এ সমস্ত সবুজ ঘাস অথবা জমিতে চাষ করা নেপিয়ার, পারা, ভুট্টা, সরগম, ওট ইত্যাদি খুব সহজেই 'সাইলেজ' করে সংরক্ষণ করা যায়।

'সাইলেজ' একটি ইংরেজি শব্দ যা দ্বারা গো-খাদ্যের বেলায় সবুজ ঘাসের পুষ্টিমান অক্ষুণ্ন রেখে একটি নির্দিষ্ট অম্লতায় বা ক্ষারত্বে সংরক্ষিত ঘাসকে বুঝায়। সাধারণত খড় জাতীয় খাদ্য ব্যতীত সব ধরনের সবুজ ঘাসই অম্লতায় সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষণের পর বছরের যে কোনো সময় সংরক্ষিত ঘাস তুলে সরাসরি গরুকে খাওয়ানো যায়। সবুজ ঘাসের সাইলেজ করতে সাইলো (যেখানে সাইলেজ রাখা হয়) ও প্রিজারভেটিভ (যা ঘাসকে সংরক্ষণ করে) দরকার হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের পাকা সাইলোর ব্যবহার হয়ে থাকে। এমনকি ঘাসকে মেশিন দ্বারা পলিথিনে মুড়েও সাইলেজ তৈরি করা হয়। আমাদের দেশে কৃষক পর্যায়ে এ সমস্ত পদ্ধতিতে ঘাস সংরক্ষণ সম্ভব নয়। এজন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট স্বল্প ব্যয়ে মাটির গর্তে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। ঘাস সংরক্ষণের প্রিজারভেটিভ হিসেবে বাংলাদেশে সহজলভ্য চিটাগুড় ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশে বর্ষা মৌসুমে প্রাপ্ত সবুজ ঘাসে প্রচুর পরিমাণে জলীয়াংশ থাকে। এ জন্য এ ধরনের ঘাসের সাইলেজ তেমন ভালো হয় না। তবে এ সমস্ত সবুজ ঘাসের সঙ্গে শতকরা ১৫-২০ ভাগ শুকনো খড়ের স্তর দিলে একদিকে সাইলেজের গুণাগুণ ভালো থাকে অন্যদিকে সাইলেজের নির্যাস চুইয়ে খড়ের খাদ্যমানও বৃদ্ধি করে। এতে একটা বাড়তি সুবিধা হলো পরবর্তীতে শুকনো খড় আলাদা করে আর খাওয়ানো লাগে না। খড়ের অভাব থাকলে খড় না দিলেও সাইলেজ করা যাবে। ডাল বা লিগুম জাতীয় ঘাস যেমনঃ খেসারি, মাষকালাই, কাউপি বা হেলেন ডাল, ইপিল ইপিল ইত্যাদি ঘাসও সবুজ অবস্থায় সাইলেজ করে রাখা যায়।

চিত্র: সাইলেজ পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ

এ ধরনের ঘাসে অধিক পরিমাণে প্রোটিন বা আমিষ থাকে বিধায় শুধুমাত্র ডাল জাতীয় ঘাস দ্বারা সাইলেজ করলে ভালো সাইলেজ নাও হতে পারে। এজন্য এ ধরনের ঘাস অডাল বা নন-লিগুম জাতীয় ঘাসের (ভুট্টা, নেপিয়ার ইত্যাদি) সাথে সর্বোচ্চ ১:১ এবং সর্বনিম্ন ১:৩ অনুপাতে মিশিয়ে চিটাগুড় দিয়ে সাইলেজ করা ভালো। মিশ্রিত ঘাসের পরতে পরতে আগের নিয়মে খড় দেয়া ভালো। নন-লিগুমজাতীয় ঘাস না পাওয়া গেলে শুকনা খড়ের সাথে মিশিয়েও সাইলেজ তৈরি করা যায়। পূর্বের নিয়মেই ঘাসের সাথে খড় ব্যবহার করা যাবে।

মাটির গর্ত

একশ সিএফটি একটি মাটির গর্তে ২.৫০ থেকে ৩.০০ টন সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা যায়। গর্তটি অবশ্যই উঁচু জায়গায় (যেখানে পানি মোটেই গর্তে ঢুকতে পারবে না) হতে হবে। গর্তের গভীরতা ৩ ফুট, প্রস্থের তলায় ৩ ফুট, মাঝে ৮ ফুট ও ওপরে ১০ ফুট হবে। দৈর্ঘ্যের মাপ নির্ভর করবে ঘাসের পরিমাণের ওপর। গর্তটির তলা পাতিলের মতো সমভাবে বক্র থাকলে ঘাস চাপানো সহজ হবে।

পলিথিন

মাটির সাইলোর চারদিকে পলিথিন মুড়ে সাইলেজ করলে অবশ্যই ঘাস নিশ্চিন্তে রাখা যায়। কিন্তু পলিথিনের ব্যবহার ঘাসের সংরক্ষণ খরচ বাড়িয়ে দেয় এজন্য সাইলোর তলায় এবং চারদিকে শুকনো খড় দিয়ে মাটি ঢেকে দেয়া যায়। দুই গজ চওড়া ডাবল পলিথিনের ৮-৯ গজ হলেই ২০ ফুটের একটি সাইলোর শুধু ওপরের দিক বন্ধ করা যায়। চারিদিকে মুড়লে পলিথিনের পরিমাণ বেড়ে যাবে।

সাইলেজ তৈরি পদ্ধতি

সবুজ ঘাসের শতকরা ৩-৪ ভাগ চিটাগুড় মেপে একটি চাড়িতে নিতে হবে। তারপর ঘন চিটাগুড়ের মধ্যে ১:১ অথবা ৪:৩ পরিমাণে পানি মেশালে এটি ঘাসের ওপর ছিটানো উপযোগী হবে। ঝরণা বা হাত দ্বারা ছিটিয়ে এ মিশ্রণ ঘাসে সমভাবে মেশানো যাবে। সাইলোর তলায় পলিথিন দিলে আগে বিছিয়ে নিতে হবে। পলিথিন না দিলে পুরু করে খড় বিছাতে হবে। এরপর দুইপার্শ্বে পলিথিন না দিলে ঘাস সাজানোর সাথে সাথে খড়ের আস্তরণ দিতে হবে। এরপর পরতে পরতে সবুজ ঘাস এবং শুকনো খড় দিতে হবে। প্রতি পরতে ৩০০ কেজি সবুজ ঘাস এবং ১৫ কেজি শুকনো খড় দিতে হবে। ৩০০ কেজি ঘাসের পরতে পূর্বের হিসেবে ৯ থেকে ১২ কেজি চিটাগুড় ও ৮ থেকে ১০ কেজি পানির মিশ্রণ ঝরণা বা হাত দিয়ে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। খড়ের মধ্যে কোনো চিটাগুড় দিতে হবে না। এভাবে পরতে পরতে ঘাস ও খড় সাজাতে হবে এবং ভালোভাবে পাড়িয়ে ভেতরের বাতাস যথাসম্ভব বের করে দিতে হবে। যত এঁটে ঘাস সাজানো হবে তত সুন্দর সাইলেজ তৈরি হবে। এভাবে সাইলো ভর্তি করে মাটির উপরে ৪-৫ ফুট পর্যন্ত ঘাস সাজাতে হবে। ঘাস সাজানো শেষ হলে খড় দ্বারা পুরু করে আস্তরণ দিয়ে সুন্দর করে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সর্বশেষে ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে মাটি দিতে হবে। সম্পূর্ণ ঘাস এক দিনেই সাজানো যায়। তবে বৃষ্টি না থাকলে প্রতিদিন কিছু কিছু করেও কয়েক দিনব্যাপী সাইলেজ তৈরি করা যায়।

সাবধানতা

- নিচু জায়গায় সাইলো করা যাবে না। তাতে পানি জমে সাইলেজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে,
- উপরের পলিথিন সুন্দরভাবে এঁটে দিতে হবে যাতে কোনো পানি সাইলেজের ভেতরে প্রবেশ না করে,
- চিটাগুড় পাতলা হলে পরিমাণ বাড়িয়ে পানি কম করে মেশাতে হবে। বেশি পাতলা হলে ঘাস থেকে চুইয়ে নিচে চলে যাবে। এমনভাবে দ্রবণ তৈরি করতে হবে যাতে আঠার মতো ঘাসের গায়ে লেগে থাকে,
- ঘাস এবং খড় এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ফাকা জায়গাগুলো যথাসম্ভব বন্ধ হয়ে যায়,
- সাইলোর কোনাগুলো এবং পাশ সমূহ পা দিয়ে পাড়িয়ে ঘাস সাজাতে হবে যাতে ফাঁকা বন্ধ হয়ে যায়,
- ঘাসের সাথে খুব বেশি পানি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

খাদ্য গ্রহণ

এভাবে সংরক্ষিত ঘাস প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০ কেজি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। উক্ত বর্ণিত পদ্ধতিতে বর্ষা মৌসুমের প্রাপ্ত ঘাস সংরক্ষণ করলে শুষ্ক মৌসুমে গো-খাদ্যের অভাব হ্রাস করা সম্ভব হবে। ঘাস সংরক্ষণের এ প্রযুক্তিটি ব্যবহারে দেশের গো-খাদ্যের অভাব কিছুটা হলেও সমাধান হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক: ড. খান শহীদুল হক ও ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী

গো-খাদ্য হিসেবে চিটাগুড়ের ব্যবহার

ভূমিকা

মোলাসেস বা চিটাগুড় সুগার মিলের একটি উপজাত হিসেবে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রতিবছর এক লক্ষ টন মোলাসেস বিভিন্ন সুগার মিল থেকে উপজাত হিসেবে পাওয়া গেলেও এর খুব নগণ্য অংশই গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। যদিও গো-খাদ্য হিসেবে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুবই বেশি। মজার ব্যাপার হলো এত গুণগতমান এবং উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও শুধু মোলাসেস গরুকে খাওয়ানো ঝুঁকিপূর্ণ। মোলাসেস গরুকে খাওয়াতে হলে কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার পড়ে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সেই নিরীক্ষা ও গবেষণার কাজ সমাপ্তপূর্বক নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে মোলাসেস গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের সুপারিশ করছে।

মোলাসেস খাওয়ানোর নিয়মাবলি

- শুকানো খড়ের সাথে ১৫-২০% মোলাসেস ও ৩% ইউরিয়া পানি দ্বারা ভালোভাবে মিশিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (ইউ এম এস) তৈরি করে যে কোনো বয়সের গরুকে যত ইচ্ছা পরিমাণ খাওয়ানো যায়। এতে বিষক্রিয়া হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।
- সবুজ ঘাস ডাল (লিগুম) বা অডাল (নন লিগুম) জাতীয় অথবা চাষ করা উন্নত বা দেশীয় জাতের যে কোনো ধরনের ঘাসের সাথে ১০% পর্যন্ত মোলাসেস মিশিয়ে খাওয়ালে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ডাল ঘাস অথবা অডাল জাতীয় ঘাসে মোলাসেস মিশিয়ে দিলে খুবই ভালো ফল পাওয়া যায়।
- যে কোনো ধরনের সবুজ ঘাস বা ভুট্টার ফল সংগ্রহের পর সংরক্ষণ করার জন্য ৩-৫% মোলাসেস প্রিজারভেটিভস হিসেবে ব্যবহার করা যায়। উক্ত পরিমাণ মোলাসেস দিয়ে মাটির গর্তেও সাইলেজ পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা যায়।
- দানাদার খাদ্যের পিলেট তৈরি করার জন্য ৪-৫% মোলাসেস ব্যবহার করা যায়। হাঁস-মুরগির খাদ্যেও ৩-৫% পর্যন্ত মোলাসেস ব্যবহার করা যায়।

মোলাসেস / চিটাগুড় ব্যবহারের উপকারী দিক

- বাংলাদেশে মোলাসেস একমাত্র গো-খাদ্য যার মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণে পরিপাচ্য শক্তি বিদ্যমান। শুধু তাই নয় এতে খনিজ পদার্থের পরিমাণও বেশি। বিশেষ করে ক্যালসিয়াম, যা অন্যান্য দানাদার গো-খাদ্যে কম পরিমাণে থাকে।

খড়ের সাথে মোলাসেস খাওয়ালে গবাদিপ্রাণী থেকে মিথেন উৎপাদন কমপক্ষে ৩০-৩৫% কমে যায় যা পরিবেশ দুষণ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. খান শহীদুল হক ও ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার

গো-খাদ্য হিসেবে ইপিল ইপিলের চাষ ও ব্যবহার

ভূমিকা

ইপিল ইপিল হলো ডাল জাতীয় উদ্ভিদ। এর পাতাগুলো দেখতে ঠিক তেতুল গাছের পাতার মতো। এটি Leguminosae পরিবার এবং Mimosoideae উপ-পরিবারভূক্ত। এই পরিবার ও উপ-পরিবারে সব মিলিয়ে মোট ১৮০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ বিদ্যমান। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ইপিল ইপিল Leucaena leucocephala (Lam) dewit নামে পরিচিত। সব প্রজাতির ইপিল ইপিল উদ্ভিদকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

সাধারণ (হাইওয়ান শ্রেণী)

আকারে ছোট, ঘন ঝোপে পূর্ণ। উচ্চতা ৩-৮ মিটার পর্যন্ত। এরা ৩-৬ মাসের মধ্যে ফল দেয় এবং সারা বছরই ফল হয়। ফুল থেকে প্রচুর বীজ পাওয়া যায়। প্রাণী খাদ্য হিসেবে উক্ত জাতের ইপিল ইপিল খুবই উপযোগী। বন্যার ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার্থে বড় রাস্তার দুই পাশে, বাড়ির আংগিনায় ও বনায়নে হাইওয়ান বেশ উপযোগী।

মধ্যাকৃতি (পেরু শ্রেণী)

উচ্চতা ৫-১২ মিটার পর্যন্ত হয়। অনেক শাখা-প্রশাখা ও ঝোপে পরিপূর্ণ। গো-খাদ্য হিসেবে বেশ উন্নতমানের। চা বাগানে, রাস্তার পাশে বা বাড়ির আঙিনায় রোপণ করা যেতে পারে।

বৃহদাকার (সালভাদর শ্রেণী)

আকারে লম্বা, শাখা-প্রশাখা বেশ বিস্তৃত। উচ্চতা ২০ মিটার পর্যন্ত। যে সব গাছ ছায়ায় হয় তাদেরকে ছায়া দেয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন-চা বাগান, পানের বাগান ইত্যাদি। তাছাড়া সবুজ পাতা ও ডগা উৎকৃষ্ট গো-খাদ্য হিসেবে পরিচিত।

উৎপত্তি ও বিস্তৃতি

যতদূর জানা যায়, ইপিল ইপিলের উৎপত্তি মধ্য আমেরিকায় এবং মেক্সিকোতে। সেখান থেকে তারা নিচু এবং শুকনো এলাকায় বিস্তার লাভ করে। গুণাগুণ বিচারে কম বেশি সব দেশেই ইপিল ইপিল জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আঘাঢ়-শ্রাবণ মাসে চারা গাছ জমিতে ১×১ মিটার ফাঁকে ফাঁকে লাগানো যেতে পারে। বছরের অন্য সময় লাগালে পর্যাপ্ত পানি দিতে হবে। এ ছাড়া জমিতে সরাসরি বীজ বপণ করা যেতে পারে। প্রতি হেক্টরে ২০-২৫ কেজি বীজ প্রয়োজন। কিন্তু লাইনে লাগালে প্রতি হেক্টরে ১০-২০ কেজি বীজই যথেষ্ট।

আবহাওয়া

ইপিল ইপিল গ্রীষ্মমন্ডলীয় উদ্ভিদ। গরমে দ্রুত বৃদ্ধি পায় কিন্তু শীতে এদের বৃদ্ধি কমে যায়। সারা বছর গড়ে ৬০০ থেকে ১৭০০ মিলি লিটার বৃষ্টিপাতে উন্নত ফলন পাওয়া যায়। এছাড়া ২৫০ মিলি লিটার বৃষ্টিপাতেও ফলন ভালো হয়। খরায় এদের কোনো ক্ষতি হয় না, এমনকি বৃষ্টি ছাড়াও প্রায় ৮ মাস পর্যন্ত বাচতে পারে।

মাটি

ইপিল ইপিল সাধারণত দো-আশ জাতীয় মাটি, যেখানে পানি জমে থাকে না, সেখানে ভালো হয়। মাটির ক্ষারতা ৭.৫, অম্লতা ৬ এর মধ্যে থাকলে ফলন ভালো পাওয়া যাবে।

বীজ উৎপাদন

ইপিল ইপিলের ওপরের বীজের আবরণ বেশ শক্ত ও মোম জাতীয় আঠালো পদার্থ দিয়ে আবৃত। সেই জন্য অনেক সময় বীজের ভিতর পানি প্রবেশ করতে পারে না ও দেরিতে অঙ্কুরোদগম হয়। অনেক সময় অঙ্কুর ঠিক মতো বের হয় না। ভাল জাতের বীজ ৫ মিনিট পর্যন্ত ৮০ ডিগ্রি সেঃ গরম পানিতে রাখার পর ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে শুকিয়ে চারা উৎপাদন করলে অঙ্কুরোদগম ভালো হয় এবং বীজ ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

চারা উৎপাদন ও চাষাবাদ

মার্চ-এপ্রিল (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) মাসে বীজ বপণ করা প্রয়োজন। প্রক্রিয়াজাত বীজ, বীজ তলায় ৫ সেন্টিমিটার অন্তর অন্তর প্রতিটি বীজ ১.২ থেকে ১.৫ সেন্টিমিটার মাটির নিচে পুঁতে দিতে হয়। জুলাই-আগস্ট (আষাঢ়-শ্রাবণ) মাসে চারা রোপণ করতে হয়। পলিথিনের ব্যাগেও চারা তৈরি করা যায়। মাটি ও গোবর সার (২:১ ভাগ) ভালোভাবে মিশিয়ে দুইটি করে বীজ পলিথিনের ২২ × ১০ সেন্টিমিটার ব্যাগে ১.৫ সেন্টিমিটার মাটির নিচে পুঁতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অথবা বছরের যে কোনো সময় চারা গাছ তৈরি করা যায়। গাছটিকে কখনো লিউকেনা নামে ডাকা হয়। গাছটির মধ্যে বহুগুণের সমারোহ বলেই জন্মস্থান মধ্য আমেরিকা থেকে আজ পৃথিবীর সমস্ত গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। পেরু, হাওয়াই এবং সালভাদর এ তিন জাতের মধ্যে পেরু জাতটি প্রাণীখাদ্য হিসেবে বেশি ব্যবহার হচ্ছে। কারণ এটা ঝোপাকৃতির এবং কাঠের তুলনায় ডালপালা ও পাতা বেশি দেয়। অন্য দুটি কাঠ উৎপাদনে বেশি ব্যবহার হয়। আমাদের দেশে পেরু ও হাওয়াই দুপ্রকারের ইপিল ইপিল গাছই পাওয়া যায়।

অ্যালে পদ্ধতিতে চাষ

জমি ভালোভাবে চাষের পর আগাছামুক্ত করে গোবর সার (৩০০-৪০০ মণ/হেক্টর) দিলেই চাষের উপযুক্ত হবে। ১ মিঃ × ১ মিঃ দূরত্বে জমির লম্বায় অথবা প্রস্থে লাইন করে ইপিল ইপিল গাছ লাগানো যায়। ৩/৪ লাইনের পর ১০ ফুট পর্যন্ত ফাকা রেখে পুনরায় ৩/৪ লাইন ইপিল ইপিল লাগালে সহজে পরিচর্যা করা যায়। এ পদ্ধতিকে অ্যালে চাষ পদ্ধতি বলে। ফাকা জমিতে যে কেনো ফসল করা যায়। অ্যালে পদ্ধতিতে ইপিল ইপিল চাষ করা হলে একবার লাগানোর পর কমপক্ষে তিন বছর পর্যন্ত প্রাণীখাদ্য হিসেবে গাছের ডগা ও পাতা ব্যবহার করা যায়। অ্যালে পদ্ধতিতে মাঝের প্রায় দশ ফুট জায়গা না রেখে পুরো জমিতে ইপিল ইপিল চাষ করা হলে আগাছা দমন, মাটি আলগা ইত্যাদি পরিচর্যার অভাবে পাতার ফলন হ্রাস পেতে পারে।

প্রাণীখাদ্য সংগ্রহ

ইপিল ইপিল গাছ লাগানোর প্রথম বছরই ১.৫০ মিঃ উচ্চতায় একবার ডাল-পালাসহ পাতা সংগ্রহ করা যায়। পরবর্তী বছর থেকে একই উচ্চতায় বছরে কমপক্ষে চারবার কাটা যায়। শুষ্ক মৌসুমে সেচের সুবিধা থাকলে সেচ দেয়া যেতে পারে, তবে অত্যাবশ্যক নয়। উৎপাদন মাত্রা মাটির গুণাগুণ ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করবে।

উৎপাদন

বছরের মে মাস হতে অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি ৪৫ দিন (দেড় মাস) অন্তর ইপিল ইপিল পাতা ডগাসহ চার বার সংগ্রহ করা যায়। বাকি সময়ে কমপক্ষে একবার সংগ্রহ করা যায়। এভাবে সংগ্রহ করলে বছরে হেক্টর প্রতি ৪০ থেকে ৪৫ টন প্রাণীখাদ্য উৎপন্ন হবে। এর মধ্যে ৩৫ থেকে ৪০ টনই প্রাণীর নিকট গ্রহণযোগ্য এবং বাকি ৫ টন উচ্ছিষ্ট জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ইপিল ইপিলই একমাত্র গুটি উৎপাদনকারী গাছ যা হেক্টরপ্রতি বছরে সর্বোচ্চ ২.১ টন আমিষ উৎপাদন করতে পারে। অন্যান্য ঘাস চাষের তুলনায় উৎপাদন খরচও অনেক কম।

ইপিল ইপিলের রোগ

লিইকেনা সাইলিড জাতীয় পোকাই ইপিল ইপিলের একমাত্র শত্রু। তবে বাংলাদেশে এখনো এটা দেখা যায়নি। সাইলিডে আক্রান্ত হলেও খুব অল্প সময়ে সাইলিড রোগ হতে মুক্ত হয়।

প্রাণী খাদ্য হিসেবে ব্যবহার

ইপিল ইপিল গাছের ডালপালার নরম অংশে শতকরা ২৮-৩০ ভাগ শুষ্ক পদার্থ থাকে। উক্ত অংশের শুষ্ক পদার্থে শতকরা ৯০-৯২ ভাগ জৈব পদার্থ এবং ২৩-২৪ ভাগ আমিষ থাকে এবং ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত থাকে প্রায় ১৫:১। ঘাসটি খড় বা অন্যান্য অডাল জাতীয়

ঘাসের সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে ষাঁড় বাছুরের দৈহিক ওজন দৈনিক ৩০০ গ্রাম হারে বৃদ্ধি পায়। উক্ত মিশ্রণের সাথে শতকরা দশ ভাগ চিটাগুড় দিলে দৈহিক ওজন বৃদ্ধি ৪০০ গ্রামের ওপরে হবে। ছাগলের জন্য ইপিল ইপিল একটি উন্নতমানের খাবার হিসেবে পরিচিত। ইপিল ইপিলের পাতা রোদে শুকিয়ে গরু বাছুরকে অন্যান্য খাদ্যের সাথে শতকরা ৪০-৫০ ভাগ হারে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

সারণি ১ : ইপিল ইপিল প্রাণীখাদ্যের রাসায়নিক গঠন

সবুজ অবস্থায় শুষ্ক পদার্থ	জৈব পদার্থ (শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে)	আমিষ (শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে)	ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত
২৮-৩০%	৯০-৯২%	২৩-২৪%	১৫:১

সারণি ২ : প্রাণীখাদ্য হিসেবে ব্যবহার পদ্ধতি

খড় + ইপিল ইপিল	(ক) ১০০ কেজি + ৬০ কেজি (সর্বনিম্ন) (খ) ১০০ কেজি + ১৫০ কেজি (সর্বোচ্চ)
অড়াল জাতীয় সবুজ ঘাস + ইপিল ইপিল	(ক) ১০০ কেজি + ২০ কেজি (সর্বনিম্ন) (খ) ১০০ কেজি + ৪৫ কেজি (সর্বোচ্চ)
অড়াল জাতীয় সবুজ ঘাস + ইপিল ইপিল + চিটাগুড়	(ক) ১০০ কেজি + ২০ কেজি (সর্বনিম্ন) (খ) ১০০ কেজি + ৪৬ কেজি + ৪-৫ কেজি (সর্বোচ্চ)

সংরক্ষণ ব্যবস্থা

(ক) শুকিয়ে সংরক্ষণ

বৃষ্টির মৌসুমে ইপিল ইপিল খুব দ্রুত বাড়ে এবং প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা যায়। এ সময়ে ইপিল ইপিলের পাতা রোদে শুকিয়ে চটের বস্তায় সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

(খ) সবুজ অবস্থায় সংরক্ষণ

নরম ডালপালাসহ পূর্বের নিয়মে কেটে মাটির গর্তে শুধু ইপিল ইপিল ঘাস সংরক্ষণ করা যায়। ইপিল ইপিল সবুজ ঘাস খড়ের সাথে মিশিয়েও মাটির গর্তে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। প্রতি ১০০ কেজি সবুজ ঘাসের সাথে সর্বোচ্চ ১০ কেজি শুকনো খড় পরতে পরতে দিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। এরূপ সংরক্ষণ পদ্ধতিতে চিটাগুড় ব্যবহৃত হয়। সংরক্ষণ পদ্ধতিটি বিএলআরআই, সাভার থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। বৃষ্টির মৌসুমে এভাবে সংরক্ষণ করলে শুষ্ক মৌসুমে গর্ত থেকে তুলে গরুকে খাওয়ানো যায়।

বিষক্রিয়া

অনেক খামারি এমনকি সম্প্রসারণবিদগণের নিকট বড় আতঙ্ক হলো ইপিল ইপিল খাওয়ালে গরু বা ছাগলের বিষক্রিয়া হয়। এ আতঙ্ক কৃষককে আজও এত উৎকৃষ্টমানের একটি প্রাণীখাদ্য ব্যবহার হতে দূরে রেখেছে। অথচ গরুকে যথেচ্ছা পরিমাণ ইপিল ইপিল খাইয়েও অদ্যাবধি বিএলআরআইতে কোনো বিষক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায়নি। আসলে গরু বা ছাগলকে দীর্ঘদিন খাওয়ালে ইপিল ইপিলের কোনো বিষক্রিয়া হয় না। গরু বা ছাগলের পেটে এক ধরনের জীবাণু জন্মায় যা ইপিল ইপিলের বিষ জাতীয় পদার্থ মাইমোসিনকে ভেঙে ডাইহাইড্রোক্সি পিরাডিন জাতীয় পদার্থে পরিণত করে যা মোটেই বিষাক্ত নয়। এজন্য প্রথম অবস্থায় গরু বা ছাগলকে অল্প অল্প করে খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হয়। পরে বেশি খাওয়ালেও কোনো সমস্যা হয় না। ইপিল ইপিল ঘাসটি বাংলাদেশের খামারিগণ প্রাণীখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে উপকৃত হবেন বলে আমরা আশা করি।

ঝুঁকির সম্ভবনা

গবাদিপ্রাণীকে প্রথমেই একক খাদ্য হিসেবে যথেচ্ছা পরিমাণ ইপিল ইপিল খাওয়ানো উচিত নয়। নতুন খাদ্য হিসেবে ধীরে ধীরে প্রাণীকে অভ্যস্ত করতে হবে।

লাভের হার

উৎপাদন আয় ও ব্যয়: প্রথম চাষের সময় হেক্টরপ্রতি ৫ হাজার টাকা খরচ হয় কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোতে শুধুমাত্র ঘাস সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। উৎপাদন ব্যয় ও আয়ের (টাকা/হেক্টর/বছর) একটি হিসাব নিচের ছকে প্রদান করা হলো।

ব্যয়	১ বছর	২য় বছর	৩য় বছর
জমি চাষ	৫০০০.০০	-	-
অন্যান্য পরিচর্যা	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০
মোট ব্যয়	১০,০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০
আয়	১ বছর	২য় বছর	৩য় বছর
প্রাণী খাদ্য ৩৫.০ টন টাঃ ৫০০/ টন	৩৫০০.০০	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০
জ্বালানি ৫.০ টন টাঃ ২০০০/ টন	২০০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০
মোট আয়	৫৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০
সর্ব মোট আয় =	৪৫০০.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০

উৎপাদন আয় ও ব্যয়ের হিসাব বর্তমান বাজার দরের সাথে পরিবর্তিত হবে।

পরিবেশের ওপর প্রতিক্রিয়া

প্রযুক্তিটি ব্যবহারের কারণে পরিবেশ দূষণের কোনো আশঙ্কা নেই। বরং বৃক্ষ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং পাশাপাশি মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করবে।

উপসংহার : একই জমি থেকে প্রাণীখাদ্য ও জ্বালানি উৎপাদনে প্রযুক্তিটি ব্যবহারে খামারিবৃন্দ উপকৃত হবেন বলে আমরা আশা করি।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক : ড. খান শহীদুল হক

ভুট্টা ও কাউপি মিশ্র গো-খাদ্য চাষ ও ব্যবহার

ভূমিকা

ভুট্টা অধিক উৎপাদনশীল এবং সারা বছর চাষযোগ্য একটি ফসল। গো-খাদ্য হিসেবে ভুট্টার ব্যবহার বহুবিধ। বাংলাদেশে ভুট্টা চাষ একেবারে নতুন নয়। তবে বর্তমানে ভুট্টা চাষের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। গো-খাদ্য হিসেবে ভুট্টার বহুবিদ ব্যবহারের ওপর কৃষক পর্যায়ে সচেতনতার অভাব আছে। ভুট্টা একক ফসল হিসেবে চাষ করা যায়, অন্যদিকে গুটি জাতীয় ফসলের সাথে মিশ্র চাষও করা যায়। একক ফসল হিসেবে ভুট্টা চাষ পদ্ধতি আমাদের মোটামুটিভাবে জানা থাকলেও মিশ্র ফসল হিসেবে ভুট্টা ও গুটি জাতীয় ফসলের চাষ এবং উৎপন্ন ফসল গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার আমাদের অনেকেরণ অজানা।

চিত্র : ভুট্টা ও কাউপি মিশ্র চাষ

ভুট্টার মিশ্র চাষ পদ্ধতি

ভুট্টার সাথে ফসল হিসেবে কাউপি, মাষকালাই, খেসারি ও ধৈঞ্চা ব্যবহার করা যায়। এছাড়া অ্যালে ত্রপিং হিসেবে ভুট্টা ও ইপিল ইপিল চাষ করা যায়। যে কোনো প্রকারের ফসলই উৎপাদন করা হউক না কেন জমি প্রস্তুত প্রণালী মোটামুটি একই রকম। তবে ভুট্টা ও ইপিল ইপিল অ্যালে ক্রপিং পদ্ধতিতে ফসলের পরিচর্যা একটু ভিন্নতর।

জমি ও আবহাওয়া

পানি নিষ্কাশনের সুযোগসহ দো-আঁশ অথবা এঁটেল দো-আঁশ মাটিতে ভুট্টা উৎপাদন করা যায়। পরিমাণ মত সার প্রয়োগ করা হলে বেলে দো-আঁশ মাটিতেও ভুট্টা চাষ সম্ভব। মাটির পি এইচ ৬.৫০-৭.০ এর মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। মাটি ৩/৪ বার মই দিয়ে চাষ করে ছোট করতে হবে। চাষের সময় গোবর সার এবং প্রথম ডোজের ইউরিয়া, টিএসপি (ট্রিপল সুপার ফসফেট) ও এমপি (মিউরেট অব পটাশ) প্রয়োগ করতে হবে। সারা বছরে ভুট্টা ফডার হিসেবে চাষ পদ্ধতির জন্য সার ও সেচের মাত্রা সারণি-১ এ দেয়া হলো-

সারণি ১ : বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভুট্টা ফডার উৎপাদনে সার ও সেচের মাত্রা

উৎপাদন সময়	চাষ পদ্ধতি	গোবর সারের মাত্রা (টন/হেক্টর) চাষের সময়	রাসায়নিক সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর) ইউরিয়া, টিএসপি ও এমপি	সেচ	ফডার উৎপাদনের মোট দিন
শুষ্ক মৌসুমে (নভেম্বর-এপ্রিল)	ভুট্টা একক ফসল	২০-২৫	২২০-২৫০, ১০০ ও ৮০	৪ বার	১১০-১২০
	ভুট্টা + কাউপি মিশ্র ফসল	২০-২৫	১০০-১৫০, ১০০ ও ৮০	৪ বার	১১০-১২০
বর্ষা মৌসুমে (মে - অক্টোবর)	ভুট্টা একক ফসল	২০-২৫	২২০-২৫০, ১০০ ও ৮০	৪ বার	৬০-৬৫
	ভুট্টা + কাউপি মিশ্র ফসল	২০-২৫	১০০-১৫০, ১০০ ও ৮০	৪ বার	৬০-৬৫

চাষের সময় রাসায়নিক সার অর্ধেক এবং বাকি অর্ধেক শুষ্ক মৌসুমে ৪৫-৬০ দিনে এবং বর্ষা মৌসুমে ৩০-৪০ দিনে ফসলে প্রয়োগ করতে হবে। ফডার শস্য হিসেবে হেক্টর প্রতি ৫০-৫৫ কেজি ভুট্টা বীজ প্রয়োজন। ফডার শস্য হিসেবে বর্ণালী ও মোহর ভুট্টা বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয়। তবে হাইবিড ভুট্টার (প্যাসিফিক-১১) ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি প্রয়োজন।

প্রযুক্তি ব্যবহারের পদ্ধতি

উপরোক্ত নিয়মে জমি তৈরির পর হেক্টর প্রতি ৫০-৫৫ কেজি ভুট্টা ও ৩০-৩৫ কেজি কাউপির বীজ সমভাবে ছিটিয়ে জমিতে বুনতে হবে। সারণি-১ এ উল্লেখিত নিয়মে সেচ ও সার প্রয়োগ করলে বর্ষার দিনে ৬০/৬৫ দিনে এবং শুষ্ক মৌসুমে ১১০/১২০ দিনে ভুট্টা ও কাউপি গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী হয়। ভুট্টার মোঁচা র দানাগুলো যখন নরম থাকে তখন ভুট্টা কাউপি এক সাথে কেটে সাইলেজ করা যায় অথবা সরাসরি গরুকে খাওয়ানো যায়।

ভুট্টা ও ইপিল ইপিলের সারিতে চাষ

ভুট্টা একবর্ষী ফসল এবং ইপিল ইপিল বহুবর্ষী ফসল এ কারণে দুইয়ের পরিচর্যা ভিন্ন। একই জমিতে দুইভাবে পরিচর্যা করা একটু জটিল হলেও একবার ইপিল ইপিলের চারা রোপণ করা হলে ৩ বছর পর্যন্ত ফসল কাটা যায়। প্রথমে জমিকে কয়েকটি ব্যান্ডে ভাগ করা হয়। প্রতি দু'টি ভুট্টার ব্যান্ডের মাঝখানে ১.০ × ১.০ মিটার দূরত্বে ইপিল ইপিল গাছের একটি ব্যান্ড থাকবে। কৃষক ভাইদের মাঝে ইপিল ইপিলের বিষক্রিয়ার ভয় রয়েছে। ইপিল ইপিলের বিষক্রিয়া এতটা মারাত্বক নয়। গরু বা ছাগলকে দীর্ঘদিন ইপিল ইপিল খাওয়ানো হলে এর মধ্যে বিষক্রিয়া নষ্ট করার জন্য এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া রুমেনে সৃষ্টি হয়। ছাগল সবচেয়ে দক্ষতার সাথে ইপিল ইপিলকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এছাড়া খড় বা অন্যান্য খাদ্যের সাথে ইপিল ইপিল খাওয়ানো হলে বিষক্রিয়ার কোনো সমস্যাই থাকে না। অ্যালে পদ্ধতিতে ইপিল ইপিল ও ভুট্টা চাষের সুবিধা হলো, একই সাথে অধিক প্রোটিনসমৃদ্ধ ইপিল ইপিল ও শক্তির উৎস হিসেবে ভুট্টা পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে প্রতি ৪৫-৫০ দিন পর পর ইপিল ইপিল উপরে বর্ণিত নিয়মে সংগ্রহ করলে মোট ওজনের প্রায় ১৫ শতাংশ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অ্যালে পদ্ধতিতে চাষ করা হলে বছরে পাঁচ (৫) কাটিং এর মাধ্যমে হেক্টর প্রতি ৪২.০ টন ইপিল ইপিল উৎপাদন সম্ভব। উৎপাদিত ইপিল ইপিলের ৩৫-৩৬.০ টন গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বাকি ৫-৭ টন জ্বালানি হিসেবে পাওয়া যাবে।

সারণি ২ : ভুট্টা ও অন্যান্য গুটি জাতীয় ঘাসের পুষ্টিমান

ঘাসের নাম	শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ (%)	পুষ্টিমান (%)					
		অজৈব পদার্থ	আমিষ	এডিএফ	খনিজ	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস
ভুট্টা (মোঁচা র নরম দানা সহ)	২৯.৮	৯২.৮	৬.২০	৪৩.৫	৭.২০	০.৪৯	০.১৯
কাউপি	৩১.২	৯০.২	১০.৫	৩৪.৪	৯.৮০	-	-
মাষকালাই	২৪.৯	৮৮.৬	১০.৫	৩৬.০	১১.৪	-	-
ধৈঞ্চা	৩৫.১	৯৪.০	১০.১	৬৬.৭	৬.০	-	-
ইপিল ইপিল	২৫.৪	৮৯.৩	২১.৩	৩৫.২	১০.৭	২.৮৫	০.১৮

উৎপাদন ও পুষ্টিমান

সারণি ২ এ ভুট্টাসহ বিভিন্ন গুটি জাতীয় ঘাসের পুষ্টিমান দেখানো হয়েছে। গরুকে খাওয়ানোর পর বিভিন্ন প্রকার ফডার এর গ্রহণ মাত্রা সারণি ৩ এ দেয়া হল।

সারণি ৩ : ভুট্টা সহ বিভিন্ন প্রকারের ঘাসের বাৎসরিক উৎপাদন ও গ্রহণ মাত্রা।

আইটেম	ঘাসের নাম			
	ভুট্টা	কাউপি	ভুট্টা + কাউপি	ইপিল ইপিল
মোট ঘাস উৎপাদন (টন/হেক্টর)	৬৫.০	২৫.০	৮১.০	৪১.৮
প্রাণীর গ্রহণের মোট পরিমাণ (টন/হেক্টর)	৪৩.৬	২১.৩	৬২.৪	৩৫.৫
আমিষের উৎপাদন (টন/হেক্টর)	০.৮১	০.৭০	১.৪০	২.১১

সারণি ৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভুট্টার সাথে কাউপি মিশ্র ফসল হিসেবে চাষ করলে উৎপাদন ও প্রাণীর নিকট খাদ্যের গ্রহণ মাত্রাও বৃদ্ধি পায়।

সংরক্ষণ

ভুট্টা অথবা এর সাথে মিশ্র ফসল কাউপি, মাষকালাই, ধৈঞ্চা অথবা ইপিল ইপিল সাইলেজ করে মাটির গর্তে সংরক্ষণ করা যায়। বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশীয় ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তির মাধ্যমে মিশ্র ঘাস সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। ভুট্টা ও গুটি জাতীয় ফসল মিশ্র চাষ করে কৃষক ভাইয়েরা একই জমিতে অধিক ঘাস উৎপাদন করে প্রাণীকে বেশি মাত্রায় পুষ্টি সরবরাহ করতে সক্ষম হবেন বলে আমরা মনে করি। একই সাথে গুটিজাতীয় ফসল চাষের মাধ্যমে মাটির গুণাগুণ উন্নয়নে সহায়তা করবে।

ঝুঁকির আশঙ্কা

জমিতে পানি জমে থাকলে ফলন এবং খাদ্যের গুণগতমান হ্রাস পাবে।

সারণি ৪ : দুধ উৎপাদনে ভুট্টা ও কাউপি মিশ্রিত খাবারের প্রভাব

খাদ্য	দিনে গড় দুধ উৎপাদন
(ক) ভুট্টা + কাউপি	৩.১১ লিটার
(খ) ভুট্টা + কাউপি + ২.৫০ কেজি দানাদার মিশ্রণ	৪.৬২ লিটার
(গ) শুকানো খড় + ৫.০ কেজি দানাদার মিশ্রণ	৪.৪৮ লিটার

সারণি ৪ থেকে দেখা যাচ্ছে শুধু ভুট্টা ও কাউপি মিশ্রণ দুধালো গাভীকে খাওয়ালে গড়ে প্রতিদিন একটি গাভী ৩.১১ লিটার দুধ উৎপাদন করতে সক্ষম। উক্ত খাদ্যের সাথে দৈনিক মাথাপিছু ২.৫০ কেজি দানাদার মিশ্রণ সরবরাহ করা হলে দৈনিক দুধ উৎপাদন ৪.৬২ লিটারে উন্নীত হয়। একই জাতের গাভীকে শুকনো খড় যথেচ্ছা পরিমাণ এবং এর সাথে দৈনিক গড়ে ৫.০ কেজি দানাদার মিশ্রণ সরবরাহ করা হলে গাভী প্রতি দৈনিক দুধ উৎপাদন পাওয়া যায় ৪.৪৮ লিটার। খড়ের পরিবর্তে ভুট্টা ও কাউপি মিশ্রণ গাভীকে খাওয়ালে দৈনিক ৫০% দানাদার মিশ্রণ কম সরবরাহ করা হলেও দুধের উৎপাদন হ্রাস পায় না। অর্থাৎ, খড়ের পরিবর্তে ভুট্টা ও কাউপি ফডার সরবরাহ করা হলে প্রতি গাভীতে দৈনিক ২.৫০ কেজি দানাদার মিশ্রণ সরবরাহ হ্রাস করা যেতে পারে। যার মূল্য বর্তমান বাজার দরে কমপক্ষে ১৫.০০ (পনের) টাকা।

পরিবেশের ওপর প্রতিক্রিয়া

প্রযুক্তিটি ব্যবহারের কারণে পরিবেশের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই। বরং, মাটির স্বাস্থ্য ও গুণাগুণ উন্নত হবে।

উপসংহার

ভুট্টা এককভাবে ফডার ক্রপ হিসেবে উৎপাদনের তুলনায় ডাল জাতীয় ঘাসের সাথে মিশ্র চাষ করা হলে খামারিবৃন্দ একই জমি থেকে অধিক পরিমাণ ও গুণগত মানসম্পন্ন প্রাণীখাদ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. খান শহীদুল হক, ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী ও ড. মোঃ এবাদুল হক

গো-খাদ্য হিসেবে কলাগাছের সংরক্ষণ ও ব্যবহার

ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রতিবছর কলা সংগ্রহের পর প্রায় ২৪.০ লাখ মেট্রিক টন কলাগাছ পাওয়া গেলেও এর খুব নগণ্য অংশই গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সারা বছরের মধ্যে বর্ষা মৌসুমেই কলা উৎপাদনের পরিমাণ বেশি। উৎপন্ন কলাগাছ বৃষ্টির কারণে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। গো-খাদ্য হিসেবে এর উপযোগিতা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক। "গো-খাদ্য হিসেবে কলাগাছ সংরক্ষণ ও ব্যবহার"প্রযুক্তিটি কলা সংগ্রহের পর প্রাপ্ত কলাগাছ বিভিন্ন পদ্ধতিতে গবাদিপ্রাণীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য/সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গরুকে কলাগাছ খাওয়ানো নতুন কিছু নয়। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে কলা চাষের ফলে প্রাপ্ত কলাগাছ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োজন। প্রতিবছর ২৪.০ লক্ষ মেট্রিক টন কলাগাছ খামারিবৃন্দ সাধারণত ফেলে দেন। প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে গো-খাদ্যের অভাব কিছুটা হলেও হ্রাস করা সম্ভব।

ব্যবহার পদ্ধতি

কলাগাছ গো-খাদ্য হিসেবে দুইভাবে ব্যবহার করা যায় (ক) সাইলেজ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার এবং (খ) সরাসরি মিশ্র খাদ্য হিসেবে ব্যবহার।

(ক) সাইলেজ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার

এ পদ্ধতিতে কলাগাছে শুকনো খড় ব্যবহার করে অথবা না করেও সাইলেজ তৈরি করা যায়। সাইলেজ তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ গুলো হলো- উঁচু জায়গায় মাটির গর্ত, খড়কুটা, পলিথিন, চিটাগুড়, পানি এবং টুকরো কলাগাছ।

শুকনো খড় ব্যবহার না করে কলাগাছ সংরক্ষণ

কলাগাছ সংরক্ষণ মাটির গর্ত অথবা পাকা সাইলোতে করা যায়। তবে পাকা সাইলো খুব ব্যয়বহুল। এ জন্য উচু জায়গায় লম্বালম্বি মাটির গর্ত খুঁড়ে কলাগাছ সংরক্ষণ করা যায়। মাটির গর্তটির উপরিভাগের প্রস্থে ৩.১ মিটার, মাঝামাঝি গভীরতায় ২.৫ মিটার এবং তলায় ১.৫ মিটার হবে। এর ফলে গর্তটি কোনাকৃতি না হয়ে পাতিলের তলার ন্যায় বাঁকানো হবে। গর্তটির গভীরতা ৯২ সেন্টিমিটার হবে। দৈর্ঘ্য নির্ভর করবে কলাগাছের পরিমাণের ওপর। কলা সংগ্রহ করার পর কলাগাছ চপার মেশিন বা কাস্তে দ্বারা ছোট ছোট (দৈর্ঘ্য ২-৩ সে.মি.) করে কাটতে হবে। তারপর উক্ত গর্তে টুকরো টুকরো কলাগাছ স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। পানির সাথে চিটাগুড়ের ১:১ অনুপাতের দ্রবণ সমভাবে ছিটিয়ে ভালোভাবে মেশাতে হবে। প্রতি ১০০ কেজি কলাগাছের সাথে ২.০-২.৫ কেজি চিটাগুড়ের দ্রবণ মেশাতে হবে। চিটাগুড়ের দ্রবণটি আস্তে আস্তে ঝরণা বা হাত দিয়ে বিছানো কলাগাছের ওপর ছিটিয়ে দিতে হবে। একশ ঘনফুট একটি মাটির গর্তে ৮.০-১০.০ মেট্রিক টন কলাগাছ সংরক্ষণ করা যায়। গর্তটি অবশ্যই উচু জায়গায় হতে হবে। গর্তের তলায় ও চারদিকে পুরু করে শকনো খড়কুটা বা পলিথিন বিছাতে হবে। পরতে পরতে

চিটাগুড় মিশ্রিত কলাগাছ গর্তে সাজাতে হবে এবং পা দিয়ে চেপে ভেতরের বাতাস যথা সম্ভব বের করে দিতে হবে। যত এঁটে সাজানো যাবে তত ভালো সাইলেজ তৈরি হবে। এভাবে ভর্তি করে মাটির ওপরে প্রায় ৯০-১২২ সে.মি. পর্যন্ত কলাগাছ সাজাতে হবে। সাজানো শেষ হলে খড় দ্বারা পুরু করে আস্তরণ দিয়ে সুন্দর করে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সবশেষে ৮-১০ সে.মি.পুরু করে মাটি দিতে হবে। সম্পূর্ণ কলাগাছ একদিনেই সাজানো যায়। তবে বৃষ্টি না থাকলে প্রতিদিন কিছু কিছু করেও কয়েক দিনব্যাপী সাইলেজ তৈরি করা যায়। এভাবে উন্নতমানের কলাগাছের সাইলেজের বৈশিষ্ট্যাবলি ও কলাগাছের বিভিন্ন অংশের পুষ্টিমান যথাক্রমে সারণি-১ ও ২ এ দেয়া হলো-

সারণি-১ : উন্নত সাইলেজের (কলাগাছ) বৈশিষ্ট্যাবলি

সাইলেজের ধরন	পিএইচ	গন্ধ	রঙ	বাহ্যিক গঠন
চিটাগুড় মিশ্রিত কলাগাছের সাইলেজ	৪.৪	অম্লীয়	হলুদাভ সবুজ	টুকরো কলাগাছ অবিকৃত থাকে
খড়সহ চিটাগুড় মিশ্রিত কলাগাছের সাইলেজ	৪.৩	অম্লীয়	হলুদাভ সবুজ	টুকরো কলাগাছ অবিকৃত থাকে
চিটাগুড় ছাড়া কলাগাছের সাইলেজ	৭.০	দুর্গন্ধ	কালচে	টুকরো কলাগাছ বিকৃত হয়ে যায়

সারণি ২ : কলাগাছের বিভিন্ন অংশের পুষ্টিমান (%, শুষ্ক পদার্থ)

উপাদান	কলাগাছের কান্ড	কলাগাছের পাতা	
		সবুজ পাতা	পাতার ডগা
শুষ্ক পদার্থ	৫.৯	২১.০	৯.৪
জৈব পদার্থ	৮৯.৫	৯০.২	৯১.৬
আমিষ	৭.৩	৮.৮	৪.৬
এডিএফ	৪৮.৪	৩৯.২	৪৩.৭

গরুকে কলাগাছের সাইলেজ খাওয়ানোর পদ্ধতি

প্রতি একশত (১০০) কেজি কলাগাছের সাইলেজের সাথে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া পরিষ্কার জায়গায় মিশ্রণ প্রক্রিয়া শেষে গরুকে সরবরাহ করা যেতে পারে।

শুকনো খড় ব্যবহার করে সংরক্ষণ

কলাগাছের সাইলেজে শুকনো খড় ব্যবহারের জন্য প্রতি ১০০ কেজি কলাগাছের স্তর সাজানো শেষ হলে এক স্তর শুকনো খড় (৫-১০ কেজি) ওপরের নিয়মে ব্যবহার করতে হবে। পরতে পরতে কলাগাছ ও খড় সাজাতে হবে এবং পা দিয়ে মাড়িয়ে গর্ত ভর্তি করে খড় দ্বারা পুরু করে আস্তরন দিয়ে সুন্দর করে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সবশেষে ৮-১০ সে-মি. পুরু করে মাটি দিতে হবে। এখানে শুধু স্মরণ রাখতে হবে খড়ের স্তরে কোনো প্রকার চিটাগুড় ছিটানোর প্রয়োজন নেই। উল্লেখিত নিয়মে ৬ মাস পর্যন্ত কলাগাছ সংরক্ষণ করা যায়। তবে পানি ঢুকলে কলাগাছের সাইলেজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। সংমিশ্রিত কলাগাছ (কলাগাছ+চিটাগুড়) ও সাইলেজের (কলাগাছ+চিটাগুড়) পুষ্টিমান সারণি ৩ এ দেয়া হলো-

সারণি ৩ : সংমিশ্রিত কলাগাছ (কলাগাছ+চিটাগুড়) ও সাইলেজের (কলাগাছ+চিটাগুড়) পুষ্টিমান

খাদ্যের নাম	শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ (%)	পুষ্টিমান (%)				
		জৈব পদার্থ	আমিষ	এডিএফ	খনিজ	ক্রুড ফাইবার
খড় ছাড়া কলাগাছের সাইলেজ	১৪.৬	৮৯.৫	১৫.৮	৪১.২	১০.৫	৩৩.৮
খড়যুক্ত কলাগাছের সাইলেজ	২৮.২	৯১.১	১৬.৭	৩৯.৬	৮.৯	৩৩.৭
সংমিশ্রিত কলাগাছ সরাসরিভাবে	১০.১	৯০.৩	১৬.৭	৩৬.৪	৯.৭	২৮.৮

গরুকে সরবরাহ করার পূর্বে উপরে বর্ণিত খাদ্যে ২% ইউরিয়া মেশানো হয়েছে

খড়যুক্ত কলাগাছের সাইলেজ খাওয়ানোর পদ্ধতি : একশত (১০০) কেজি খড়যুক্ত কলাগাছের সাইলেজের সাথে ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া পরিষ্কার জায়গায় ভালোভাবে মিশ্রণ প্রক্রিয়া শেষে গরুকে সরবরাহ করা যেতে পারে।

(খ) সরাসরি কলাগাছ খাওয়ানোর পদ্ধতি

- কলা সংগ্রহ করার পর কলাগাছ চাপার মেশিন বা কাস্তে দ্বারা ছোট ছোট করে কেটে পলিথিন বা পাকা মেঝেতে বিছাতে হবে।
- প্রতি ১০০ কেজি কলাগাছের জন্য ২-২.৫ কেজি চিটাগুড় একটি পাত্রে মেপে নিয়ে ২-২.৫ কেজি পানি এবং ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ভালোভাবে মেশাতে হবে। চিটাগুড় ও ইউরিয়া মিশ্রিত দ্রবণটি ঝরণা বা হাত দিয়ে কলাগাছের টুকরোয় ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে করে ইউরিয়া ও চিটাগুড়ের দ্রবণটি কলাগাছের সাথে ভালভাবে মিশে যায়।
- উক্ত মিশ্রিত খাদ্যটি সরাসরি গরুকে যথেচ্ছা পরিমাণ খাওয়ানো যায়। কলাগাছের সাইলেজ ও সংমিশ্রিত কলাগাছ সরাসরিভাবে গরুকে খাওয়ানোর পর এদের গ্রহণ মাত্রা ও পরিপাচ্যতা সারণি ৪ এ দেয়া হলো-

সারণি ৪ : গো-খাদ্য হিসেবে সংমিশ্রিত কলাগাছ (কলাগাছ+চিটাগুড়) ও সাইলেজের (কলাগাছ+চিটাগুড়) দৈনিক খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাচ্যতা

খাদ্যের নাম	প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের গরুর খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ (কেজি/দিন)	পরিপাচ্যতা (%)	দৈহিক ওজন বৃদ্ধি (গ্রাম/দিন)
খড়ছাড়া কলাগাছের সাইলেজ	১৩.০	৫৯.০	৪১০.০
খড়যুক্ত কলাগাছের সাইলেজ	১৩.০	৭৮.০	৩৩১.০
সংমিশ্রিত কলাগাছ সরাসরিভাবে	৮.০	৬৫.০	৩৪৫.০

আয়ব্যয়

- শ্রমিক খরচ, ইউরিয়া ও মোলাসেস ক্রয় ব্যতীত অন্য কোনো খরচ নেই।
- প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের একটি গরু প্রতিদিন ১৩ কেজি প্রক্রিয়াজাতকৃত কলাগাছ অথবা খড় মিশ্রিত সাইলেজের ৮ কেজি খেতে পারে, যার দ্বারা প্রাণীর শরীরের রক্ষণাবেক্ষণসহ দৈহিক ওজনও বৃদ্ধি পায়।
- যেহেতু ইউরিয়া ও চিটাগুড় কলাগাছের সাথে ধীরে ধীরে খাচ্ছে অতএব বিষক্রিয়া হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।
- কলা উৎপাদনের পাশাপাশি কলাগাছকে প্রক্রিয়াজাত করে গরুকে সরাসরি খাওয়ানো যায় অথবা পরবর্তী সময়ে খাওয়ানোর জন্য সাইলেজ করে রাখা যায়।

ব্যবহারের সম্ভাবনা

বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কলাগাছ জন্মায়। বিশেষ করে বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম ইত্যাদি জেলায় যে সমস্ত অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে কলাচাষ হয় সে সমস্ত অঞ্চলে প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণ অধিক উপযোগী।

প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা / বিশেষ পরামর্শ

প্রযুক্তিটি ব্যবহারের ফলে প্রাণীস্বাস্থ্যের ওপর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। তবে কোনো অবস্থাতেই ইউরিয়া সরাসরি গরুকে খাওয়ানো যাবে না।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. খান শহীদুল হক ও ড. মোঃ মিজানুর রহমান

আঁখের উপজাত সংরক্ষণ ও গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য/সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আঁখ একটি উচ্চফলনশীল ফসল। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় আবাদ করলে ফসলটি প্রতি হেক্টর জমি থেকে মোট উৎপাদন পাওয়া যায় প্রায় ১৫৫.০ মেট্রিক টন। এর প্রায় ৮৬.০ মেট্রিক টন গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। চিনিশিল্প থেকে প্রতি বছর ২০ লক্ষ মেট্রিক টন আঁখের ছোবড়া, ১৬ লক্ষ মেট্রিক উন আখের অগ্রভাগ (Ucm) এবং ২.৫ লক্ষ মেট্রিক টন চিটাগুড় উপজাত হিসাবে পাওয়া যায়। এর মধ্যে আঁখের ছোবড়া চিনিকলে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আঁখ এমন একটি ফসল যা লাগানোর ৩ মাস পর থেকে কাটার পূর্ব পর্যন্ত মাঠে সবুজ অবস্থায় থাকে এবং গাছের গোড়ার অংশ হতে হেক্টর প্রতি প্রায় ৫ মেট্রিক টন পাতা সংগ্রহ করে গরুকে সবুজ ঘাস হিসেবে সারা বছরই খাওয়ানো যায়।

ব্যবহারের পদ্ধতি

আখ চাষের সাথে তিনটি পর্যায়ে গো-খাদ্য পাওয়া যায়

- সাথী ফসল হিসেবে উৎপাদিত মাষকালাই বা কাউপি,
- সারা বছর আঁখের গোড়ার সবুজ পাতা,
- আঁখ কাটার মৌসুমে আঁখের ডগা ও ছোবড়া।

(ক) আখের সাথে মাষকালাই বা কাউপি উৎপাদন

আঁখের কাটিং লাগানোর কয়েক দিনের মধ্যেই মাষকালাই বা কাউপির বীজ বপণ করা যায় অথবা আঁখ কাটা শেষ হলে জমির মাটি আলগা করে বীজ বপণ করা যেতে পারে। বীজ বপণের ৩ মাসের মধ্যেই মাষকালাই বা কাউপি কাটা যায়। হেক্টর প্রতি এর উৎপাদন ২০-২৫ মেট্রিক টন, যা গবাদিপ্রাণীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

(খ) গরুকে আঁখের সবুজ পাতা খাওয়ানোর পদ্ধতি

আঁখ গাছ একটু বড় হলে গোড়ার দিকের পরিপক্ক সবুজ পাতাগুলো সংগ্রহ করে গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এ ধরনের পাতা আঁখ কাটার পূর্ব পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। আঁখের সবুজ পাতা, ডগা ও ছোবড়ার পুষ্টিমান সারণি ১ এ দেয়া হলো-

সারণি ১ : আঁখের সবুজ পাতা, ডগা ও ছোবড়ার পুষ্টিমান

খাদ্যের নাম	শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ (%)	পুষ্টিমান (%)			
		জৈব পদার্থ	আমিষ	এডিএফ	খনিজ
আঁখের সবুজ পাতা	৩৮.৮	৮১.৬	৬.৭	৩৭.৭	১৮.৪
আঁখের ডগা	২২.২	৯৩.৪	৭.১	৪২.৯	৬.৬
আঁখের ছোবড়া	৩৭.৬	৯৭.৫	৫.৮	৩৪.৪	২.৫

সবুজ পাতা সংগ্রহের পর কেটে টুকরো টুকরো করে গরুর সামনে দিতে হবে এবং প্রতি ১০০ কেজি সবুজ আঁখের পাতার সাথে ৪-৫ কেজি চিটাগুড়, ১ কেজি ইউরিয়া এবং ৪-৫ কেজি পানির দ্রবণ ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। পাতার সাথে এভাবে মিশিয়ে খাওয়ালে প্রাণীর ক্ষতির কোনো আশঙ্কা থাকে না। আঁখের সবুজ পাতা খাওয়ানোর পাশাপাশি দৈহিক ওজনের শতকরা ১.০ ভাগ দানাদার মিশ্রণ উক্ত গরুকে সরবরাহ করতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এভাবে চিটাগুড় এবং ইউরিয়া মিশ্রিত আঁখের পাতা খাওয়ালে একটি বাড়ন্ত ষাঁড় দৈনিক ৫০০ গ্রাম বৃদ্ধি পায়।

(গ) আঁখের ডগা ও ছোবড়া সংরক্ষণ ও খাওয়ানোর পদ্ধতি

আঁখ কাটার মৌসুমে প্রচুর আঁখের ডগা ও ছোবড়া পাওয়া যায়।

(১) আঁখের ডগা সংরক্ষণ পদ্ধতি

- আঁখ কাটার পর এর ডগাকে চপার মেশিন বা কাঁচি দিয়ে ছোট ছোট করে কাটতে হবে।
- পানি জমে না এমন স্থানে একটি গর্ত করে প্রথমে পুরানো খড়কুটা বা পুরানো পলিথিন বিছাতে হবে।
- এবার উক্ত গর্তে চপ করা আঁখের ডগা স্তরে স্তরে বিছাতে হবে। ১০০ কেজি আঁখের ডগার স্তরে ৩.০-৪.০ কেজি চিটাগুড় এবং ৩.০-৪.০ কেজি পানির মিশ্রণ সমভাবে ছিটাতে হবে। একই সাথে পা দিয়ে ভালোভাবে পাড়াতে হবে, যাতে চপকৃত ডগাগুলো খুব গাদানো হয়।
- এভাবে স্তরে স্তরে আঁখের ডগা এবং চিটাগুড় ছিটিয়ে আঁখের ডগার গাদা তৈরি করতে হবে। গাদার আকার খাঁড়া গম্বুজাকার না হয়ে চওড়া লম্বাটে হবে।
- যখন সম্পূর্ণ আঁখের ডগা শেষ হবে তখন আঁখের ডগার গাদাকে এমন ভাবে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে বাতাস বা পানি ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। পলিথিনের কিনারাগুলো মাটি দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিতে হবে। সংরক্ষিত অবস্থায় আখের ডগা কমপক্ষে ৩ থেকে ৬ মাস রেখে দেয়া যায়। তবে প্রয়োজনে যে কোনো সময় উঠিয়ে গরুকে খাওয়ানো যায়। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের একটি গরু দৈনিক ৬.০ কেজি আঁখের ডগার সাইলেজ খেতে পারে। উক্ত সংরক্ষণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে করার জন্য বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তির বুকলেটের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। আঁখের সবুজ পাতা, ডগা ও ছোবড়া গরুকে খাওয়ানোর পর এদের গ্রহণ মাত্রা ও পরিপাচ্যতা সারণি ২ এ দেয়া হলো-

সারণি ২ : গো-খাদ্য হিসেবে আঁখের সবুজ পাতা, ডগা ও ছোবড়ার দৈনিক খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাচ্যতা

খাদ্যের নাম	প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের গরুর খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ (কেজি/দিন)	পরিপাচ্যতা (%)	দৈহিক ওজন বৃদ্ধি (গ্রাম/দিন)
আঁখের সবুজ পাতা	৬.০	৬৬.০	৫০০
আঁখের ডগা	৬.০	৬৬.০	-
আঁখের ছোবড়া	৫.০	৫০.০	৪৯০

আঁখের ডগা গ্রহণের ক্ষেত্রে গরুর দৈহিক ওজন বৃদ্ধি নির্ণয় করা হয়নি। আঁখের সবুজ পাতা ও ছোবড়া খাওয়ানোর পাশাপাশি দৈহিক ওজনের শতকরা ১.০ ভাগ দানাদার মিশ্রণ গরুকে সরবরাহ করা হয়েছে।

আঁখের ছোবড়া সংরক্ষণ ও খাওয়ানোর পদ্ধতি

দুই ধরনের আঁখের ছোবড়া পাওয়া যায়। চিনিকল থেকে উৎপাদিত আঁখের ছোবড়াতে শক্তির পরিমাণ কম থাকে এবং সাধারণত গো-খাদ্য হিসেবে পাওয়া যায় না। কারণ এগুলো চিনিকলে জ্বালানি এবং পেপার মিলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গুড় উৎপাদন এলাকায় রস নিঃসরণের পর যে ছোবড়া পাওয়া যায় এগুলোও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অতিরিক্ত আঁখের ছোবড়া সংরক্ষণ ও গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

- আঁখের ছোবড়া দা অথবা মেশিন দিয়ে ছোট ছোট করে কাটতে হবে। এরপর প্রতি ১০০ কেজি ছোবড়ার সহিত ১.০-১.৫ কেজি ইউরিয়া মিশিয়ে সরাসরি গরুকে খাওয়ানো যায়।
- তবে উপরোল্লেখিত সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করেও আঁখের ছোবড়া সংরক্ষণ করা যায়। এ পদ্ধতিতে প্রতি ১০০ কেজি আঁখের ছোবড়ার সাথে ৩.০ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হবে। অন্যান্য নিয়ম সবুজ ঘাস সংরক্ষণ পদ্ধতির ন্যায়। তবে আঁখের ছোবড়ার সাথে কোনো খড় ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।
- প্রক্রিয়াজাতকৃত আঁখের ছোবড়া ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের একটি বাড়ন্ত ষাঁড় দৈনিক ৫.০ কেজি খেতে পারে এবং দৈহিক ওজন দৈনিক ৪৯০ গ্রাম বৃদ্ধি পায়। আঁখের ছোবড়ার পাশাপাশি দৈহিক ওজনের শতকরা ১.০ ভাগ দানাদার মিশ্রণ উক্ত গরুকে সরবরাহ করতে হবে।

আয়-ব্যয়

- শ্রমিক বাবদ খরচ ও ইউরিয়া ক্রয় ব্যতীত অন্য কোনো খরচ নেই,
- আঁখ কাটার পর প্রাপ্ত উপজাত সংরক্ষণ করলে বছরের যে কোনো সময়ে ব্যবহার করা যায়,
- আঁখের মধ্যে সর্বোচ্চ পরিপাচ্যতা বিদ্যমান। শুধু তাই নয় এতে খনিজ পদার্থের পরিমাণও বেশি,
- আঁখ থেকে বয়স্ক পাতা সংগ্রহ করে সারা বছরই সবুজ ঘাস হিসেবে গরুকে খাওয়ানো যায়।

ব্যবহারের সম্ভাবনা

যে সমস্ত এলাকায় আঁখ চাষ করা হয় সেই সমস্ত এলাকায় আঁখের উপজাতকে সংরক্ষণ ও গবাদি প্রাণীর খাদ্য হিসেবে সারা বছরব্যাপী ব্যবহার করা যায়।

প্রযুক্তি ব্যবহারের সতর্কতা/বিশেষ পরামর্শ

প্রযুক্তিটি ব্যবহারের ফলে প্রাণীস্বাস্থ্যের ওপর কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. খান শহীদুল হক এবং ড. মোঃ মিজানুর রহমান

লবণাক্ত, বন্যাকবলিত ও মধুপুর গড় এলাকার জন্য ঘাস উৎপাদন

ভূমিকা

দেশের মোট ১২টি জেলার (কৃষি পরিবেশ গত জোন ১৭, ১৮ ও ২৩) সমুদ্র উপকূলবর্তী জমির পরিমাণ প্রায় ১.৫ মিলিয়ন হেক্টর। জেলাগুলো হচ্ছে নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, সাতক্ষীরা, বরগুনা, পিরোজপুর, কক্সবাজার, বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও ভোলা। এ জেলাগুলোতে লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এসব ঘাস চাষ করা যেতে পারে। সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধার পূর্বাঞ্চল (কৃষি পরিবেশগত জোন ৭) বন্যা কবলিত এলাকার অন্তর্গত। তাছাড়া দেশের হাওড় এলাকাতেও এ প্রযুক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে বন্যার পানি সরে যাওয়ার সময় থেকে পানি আসার পূর্ব পর্যন্ত সময়ই এ প্রযুক্তি ব্যবহারের সময়। ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ মধুপুর গড়ের অন্তর্ভুক্ত (কৃষি পরিবেশগত জোন ২৮) এসব উচু অঞ্চলে এ প্রযুক্তি দেয়া যেতে পারে। এসব অঞ্চলে যে ঘাসগুলো চাষ করা যায় সেগুলো হচ্ছে : নেপিয়ার, স্প্লেনডিডা, এন্ড্রোপোগোন, পারা ইত্যাদি।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য/সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- ঘাসগুলো দ্রুত বর্ধনশীল ও অধিক উৎপাদনশীল (১৫০-১৮৩ টন/হেক্টর/বছর),
- প্রত্যেক ভ্যারাইটি থেকে বছরে প্রায় ১২ (বার) ঘাস কাটা (কাটিং) যায়,
- বছরের যে কোনো সময় কাটিং নেয়া যায়, ফলে সারা বছরই ঘাসের উৎপাদন সম্ভব,
- কাটিং থেকেই নতুন জমিতে আবাদ করা সম্ভব, আলাদাভাবে বীজের দরকার হয় না,
- একবার রোপণ করলে ৫ বছর ফলন পাওয়া যায়,
- কোনো আগাছা দমন বা তেমন পরিচর্যার দরকার হয় না,
- সারা বছরই সবুজ ঘাস উৎপাদন সম্ভব যা দুগ্ধবতী গাভীর জন্য খুবই দরকারি,
- সর্বোপরি প্রাণী উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ঘাস চাষ করলে দারিদ্র্যবিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ব্যবহার পদ্ধতি

লবণাক্ত ও মধুপুর গড় এলাকায় ঘাস চাষ

- যেখান থেকে পানি সহজেই নিচে নামতে পারে এমন জমি নির্বাচন করে তাতে চাষ ও মই দিতে হবে।
- সারা বছরই ঘাস লাগানো যেতে পারে। তবে মে-জুলাই মাসে যখন বর্ষার মৌসুম শুরু হয় তখন ঘাস লাগানো ভালো।
- নেপিয়ার, বাজরা, অ্যারোসা এবং স্প্লেনডিডার কাটিং (২-৩টি কুশিযুক্ত) জমিতে বা লবণাক্ত এলাকাতে সারিবদ্বভাবে লাগাতে হবে। একটি কাটিং হতে অন্য কাটিং এর দূরত্ব হবে ৫০ সেঃ মিঃ।
- ডাল জাতীয় ফসল যেমন কাউপি, সীম এবং খেসারি ঘাসের মধ্যে বপণ করা যেতে পারে।
- প্রথম বার বপণের ৬০-৮০ দিন পর এবং পরবর্তীতে প্রথম কাটিং এর ৩০-৭৫ দিন পরপর ঘাস কাটা যেতে পারে।
- ঘাস কাটার পর ৫-৭ সেঃ মিঃ লম্বা টুকরো করে অথবা আস্ত ঘাসই গরুকে খাওয়ানো যেতে পারে।
- অতিরিক্ত সবুজ ঘাস টুকরো করে অথবা আস্ত ঘাসই গর্তে সাইলেজ করে সংরক্ষণ করা যায়। ১০০ ঘনফুট মাপের একটি গর্তে ২.৫-৩.০ টন ঘাস সংরক্ষণ করা যায়। তবে গর্তটি অবশ্যই একটু উচু জায়গায় করতে হবে যেখান থেকে পানি নিচের দিকে নেমে যেতে পারে। গর্তটি গভীরতায় ৩ ফুট, চওড়ায় গর্তের তলায় ৩ ফুট, মাঝামাঝি জায়গায় ৪ ফুট এবং মুখে বা উপরের দিকের প্রশস্ততা ১০ ফুট হওয়া বাঞ্ছনীয়। গর্তের দৈর্ঘ্য ঘাসের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল।
- সাইলেজ খুবই আটসাটভাবে রাখতে হবে যাতে করে এর ভেতর কোনো পানি বা বাতাস ঢুকতে না পারে। গর্তের সকল পার্শ্ব পলিথিন দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।

জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে ঘাস চাষের উপযোগী করতে হবে। জমি তৈরির সময় গোবর সার প্রয়োগ করে ভালোভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। অতপর নেপিয়ার বা স্প্লেনডিডা ঘাসের কাটিং সংগ্রহ করতে হবে। এমন কাটিং বাছাই করতে হবে যাতে কান্ডের মাথায় কমপক্ষে ২-৩টি গিট থাকে।

কাটিং লাইনের মাঝে হেলিয়ে সারিবদ্ধভাবে লাগাতে হবে। প্রতি কাটিং এর মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে ১ মিটার। সব ঘাস সারি করে লাগাতে হবে। প্রতিটি সারির মধ্যবর্তী দূরত্ব থাকবে ১ মিটার। চারা বা কাটিং সাধারণত ১০-১৫ সেঃ মিঃ মাটির গভীরে রোপণ করতে হয়। প্রতি হেক্টরে ২০০০০-২৫০০০ কাটিং প্রয়োজন। তাছাড়া নিম্নলিখিত হারে সার দিতে হবে।

ইউরিয়া	: হেক্টর প্রতি ২২০ কেজি
ফসফেট (TSP)	: হেক্টর প্রতি ১২৫ কেজি
পটাশ (MP)	: হেক্টর প্রতি ১২৫ কেজি
গোবর সার	: হেক্টর প্রতি ৫ টন

এগুলোর মধ্যে গোবর সার জমি তৈরির সময় দিতে হবে। আর ফসফেট ও পটাশ জমি তৈরির পর কাটিং লাগানোর ঠিক পূর্বে দিতে হবে। অতপর প্রতিবার কাটিং এর ১০-১৫ দিন পর দিতে হবে ইউরিয়া। তাছাড়া ঘাসের জমিতে অতিরিক্ত খরার সময় অবশ্যই সেচ দিতে হবে। প্রথম কাটিং লাগানোর ৬০-৮০ দিনের মধ্যে ঘাস কাটা যায়। ঘাসের ফুল ফোটার পূর্বেই ঘাস কেটে গরুকে সরাসরি খাওয়াতে হবে। মৌসুমের সময় প্রতি হেক্টরে প্রায় ১৫০ হতে ১৯০ টন ঘাস পাওয়া যায়।

ঘাস চাষে তেমন কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। তবে যেসব জমিতে পানি জমে থাকে সেখানে ঘাস চাষ তেমন ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। পারা ও জার্মান ঘাস ছাড়া অন্য ঘাস জলাবদ্ধতায় বাঁচে না।

বন্যাকবলিত এলাকায় ঘাস চাষ

- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরপরই (অক্টোবর-নভেম্বর মাসে) কর্দমাক্ত জমি ঘাস চাষের জন্য নির্বাচন করা যায়। আলাদাভাবে জমিতে চাষ দেয়া বা জমি তৈরি করার দরকার হয় না। উক্ত কর্দমাক্ত জমিতে সরাসরি ঘাসের কাটিং লাগানো যায়।
- বপণ পদ্ধতি, সার প্রয়োগ এবং কাটিং এর পরিমাণ উপরের বর্ণনা মতোই।
- প্রথম চাষের সময় ঘাসের সাথে ডাল জাতীয় ফসলের আবাদ করা যেতে পারে।
- লাগানোর ৪৫ থেকে ৬৫ দিন পর প্রথম কাটিং এবং অতঃপর প্রতি ৩০ দিন পর ঘাস কাটা যায়।
- এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত ঘাস পাওয়া যায়। তবে অবশ্যই বন্যার পানি আসার পূর্বেই শেষ কাটিং নিতে হবে কেননা এই ঘাস বন্যার পানিতে বেঁচে থাকতে পারে না।

- অতিরিক্ত ঘাস পূর্বে বর্ণিত উপায়ে সংরক্ষণ করা যায়।
- পরবর্তী সময়ে বপণের জন্য কাটিং উচু জায়গায় সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

প্রতি হেক্টরে ঘাস উৎপাদনে ৩২৭২৮/= (বত্রিশ হাজার সাতশত আটাশ) টাকা খরচ হয়। এই ঘাস বিক্রয় করে পাওয়া যায় ৫৯২৮০/= (ঊনষাট হাজার দুইশত আশি) টাকা। ফলে মোট আয় হয় হেক্টর প্রতি ২৬৫৫২/= (ছাব্বিশ হাজার পাঁচশত বায়ান্ন) টাকা। পক্ষান্তরে, প্রতি হেক্টরে ধান উৎপাদনে খরচ হয় ৩৮০৬৩/= (আটত্রিশ হাজার তেষট্টি) টাকা এবং এই ধান বিক্রি করে পাওয়া যায় ৪৪১৫২/= (চুয়াল্লিশ হাজার একশত বায়ান্ন) টাকা। তাই ধান উৎপাদনে হেক্টর প্রতি আয় হয় মাত্র ৬০৮৯/= (ছয় হাজার ঊননব্বই) টাকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ঘাস চাষ করলে লাভ হয় ধান চাষের চারগুণ। ঘাস চাষে পরিবেশের ওপর কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলে না বরং পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষা তথা সবুজ বনায়নের জন্য ঘাস চাষ বেশ গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এতে একদিকে যেমন গবাদিপ্রাণীর খাদ্যের চাহিদা মিটে অপরদিকে তেমনি পরিবেশকে মানুষের বাসের উপযোগী করে রাখতে সহায়তা করে।

উচ্চ ফলনশীল ঘাস যেমন- নেপিয়ার অ্যারোসা, নেপিয়ার বাজরা, স্প্লেনডিডা প্রভৃতির আবাদ অত্যন্ত লাভজনক। এসব ঘাস থেকে একদিকে যেমন অধিক ফলন পাওয়া যাবে অন্যদিকে এদের সারাবছর উৎপাদন বৈশিষ্ট্যের জন্য বছরের সব সময়ই গবাদিপ্রাণীকে কাঁচা সবুজ ঘাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে, যা একটি দুগ্ধবতী গাভীর জন্য খুব জরুরি। উপরোক্ত ঘাসসমূহের কাটিং এর জন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা-১৩৪১-এ যোগাযোগ করতে হবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. খান শহীদুল হক ও ড. রফিকুল ইসলাম এবং ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী

পাহাড়ি জমিতে সবুজ ঘাস উৎপাদন ও ব্যবহার

ভূমিকা

বাংলাদেশে মোট পাহাড়ি জমির পরিমাণ প্রায় ১.৮১ মিলিয়ন হেক্টর। পাহাড়ি জেলা বিশেষ করে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, বৃহত্তম সিলেটের উত্তরাংশ এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত (কৃষি পরিবেশগত জোন ২৯) অঞ্চলের পাহাড়ের ঢালে এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সবুজ ঘাস চাষ করা সম্ভব। মূলত পাহাড়ি অঞ্চলে দুই ধরনের জমি বিদ্যমান-পাহাড়ি ঢাল এবং পাদদেশের সমতল জমি। পাহাড়ের পাদদেশের সমতল জমিতে সাধারণত ধানচাষ করা হয়। এছাড়াও নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত এ ধরনের জমিতে রবি শস্য চাষ করা সম্ভব। রবিশস্য হিসেবে দানাদার ফসল অথবা ভুট্টাও কাউপির মিশ্র চাষ বা অন্য ঘাসের চাষ করা যেতে পারে।

এ ঘাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নেপিয়ার, পারা, স্প্লেনডিডা, এন্ড্রোপোগন ইত্যাদি। পাহাড়ি এলাকার উপজাতীয় গোষ্ঠী পাহাড়ের ঢালগুলোতে জুম চাষ করার কারণে পাহাড়গুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই গাছপালা নেই, বরং আগাছায় পূর্ণ। এতে করে জমিগুলো থেকে কোনো ফসলও হচ্ছে না, উপরন্তু মৌসুমি বৃষ্টির পানিতে মাটি ও বালি ক্ষয় হয়ে পরিবেশের ভারসাম্যতা নষ্ট করছে। সাধারণত পাহাড়ি ঢালে ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত পানির অভাবে কোন ফসল ফলানো সম্ভব নয়। তবে বাকি মাসগুলোতে বৃষ্টির পানিতে এই প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগে প্রচুর ঘাস উৎপাদন করার মাধ্যমে একদিকে যেমন এই সমস্ত ঘাসের বিস্তৃত গুচ্ছমূল পাহাড়ি জমির উপরিভাগ এবং গভীরে বিস্তৃতি লাভ করে মাটিকে শক্তভাবে ধরে রাখে যা মাটি ও বালির ক্ষয়রোধ করে পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষা করবে, অন্যদিকে গো-খাদ্যেরও যোগান দেবে।

ব্যবহার পদ্ধতি

পাহাড়ের ঢালে আগাছা পরিষ্কার করে পুড়িয়ে দিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে কনট্যুর পদ্ধতিতে ঘাস চাষ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পাহাড়ের চূড়ার দিক থেকে আড়া আড়িভাবে সারি করে ঘাস লাগাতে হবে এবং এভাবে আস্তে আস্তে পাহাড়ের নিচের দিকে যেতে হবে। পাহাড়ের পাদদেশে ঘাসগুলোর মধ্যকার দূরত্ব ২০-২৫ সেঃ মিঃ, মাঝামাঝি অঞ্চলে ২৫-৩০ সেঃ মিঃ এবং চূড়ার দিকে ৩০-৩৫ সেঃ মিঃ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

- ঘাসের কান্ডের দুই মাথায় ২-৩টি গিট রেখে চারা বা কাটিং লাইনের মধ্যে হেলিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে লাগাতে হবে।
- এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব হবে ৪০ সেঃ মিঃ, এক চারা থেকে অন্য চারার ব্যবধান হবে ৩০ সেঃ মিঃ এবং ১০-১৫ সেঃ মিঃ গভীরে রোপণ করতে হবে।
- প্রতি হেক্টর জমিতে ২০-২৫ হাজার চারা বা কাটিং প্রয়োজন।
- সারির মধ্যবর্তী খালি জায়গাগুলো আগাছামুক্ত রাখতে হবে। সেই সাথে সার দেয়া বিশেষ প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত হারে সার দিতে হবে-

- ইউরিয়া : হেক্টরপ্রতি ২২০ কেজি
- ফসফেট (TSP) : হেক্টরপ্রতি ১২৫ কেজি পটাশ
- পটাশ (MP) : হেক্টরপ্রতি ১২৫ কেজি
- গোবর সার : হেক্টরপ্রতি ৫ টন

১. দুই সারির মাঝের ফাঁকা জায়গায় লিগুমিনাস জাতীয় ঘাস; যেমন- কাউপি, মাটিকালাই ইত্যাদি চাষ করা সম্ভব।
২. চারা বা কাটিং লাগানোর ২০-৩০ দিন পর হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া এবং প্রত্যেক কাটিং এর পর হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া দিতে হবে।
৩. প্রথম কাটিং লাগানোর ৬০-৮০ দিনের মধ্যে ঘাস কাটতে হবে।
৪. পাহাড়ের ঢালুতে ঘাস শুধুমাত্র আর্দ্র মৌসুমেই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়।

পাহাড়ি ঢালুর বিন্যাস অনুযায়ী প্রতি কাটিং-এ ঘাসের গড় এবং মোট উৎপাদন (মে-অক্টোবর) নিম্নরূপ

ঘাসের নাম	উঁচু (পাহাড়ের চূড়া) (টন/হেক্টর)	মধ্যম (টন/হেক্টর)	নিচু (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (টন/হেক্টর)
নেপিয়ার	৩২	২৮	৩৬	১২৯
পারা	১৪	২৯	১৭	৮০
এন্ড্রোপোগন	৩২	২৫	২৪	১০৮

শুষ্ক মৌসুমে (নভেম্বর-এপ্রিল) পাহাড়ের পাদদেশের সমতল জমিতে একক ফসল হিসাবে ভুট্টা ও কাউপি অথবা মিশ্র ফসল হিসেবে ভুট্টা ও কাউপির উৎপাদন।

শস্য	মোট উৎপাদন (টন/হেক্টর)
ভুট্টা	২১
কাউপি	২৫
ভুট্টা+কাউপি	৪৭

জমি থেকে ঘাস কাটার পর পরই ঘাস কাটা মেশিন বা কাঁচি দ্বারা ছোট ছোট করে (৫/৭ সেঃমিঃ পরিমাণ লম্বা) কেটে গরুকে খাওয়াতে হবে। এই ঘাস নিম্নমানের খাদ্য অথবা খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণ কাঁচা সবুজ ঘাস ছোট ছোট খন্ড করে সাইলেজ হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। ১০০ ঘনফুট একটি মাটির গর্তে প্রায় ২.৫-৩.০ টন সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা যায়। গর্তটি অবশ্যই উঁচু জায়গায় হতে হবে, গর্তের গভীরতা ৩ ফুট, প্রস্থের তলায় ৩ ফুট, মাঝে ৮ ফুট ও উপরে ১০ ফুট হতে হবে। দৈর্ঘ্যের মাপ নির্ভর করবে ঘাসের পরিমাণের ওপর। সাইলেজের ভিতর বাতাস ও পানি প্রতিরোধের জন্য মাটির সাইলোর চারদিকে পলিথিন মুড়ে দেয়া যেতে পারে। পাহাড়ি জমিতে ঘাস উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

বছরে (মে-অক্টোবর) প্রতি হেক্টর পাহাড়ি জমিতে ঘাস উৎপাদনের ব্যয়সমূহ

উপাদানসমূহ	প্রয়োজনীয় পরিমাণ	একক প্রতি ব্যয় (টা:)	মোট ব্যয় (টা:)
আগাছা পরিষ্কার	৫০ জন শ্রমিক	৮০	৪,০০০
চারা বা কাটিং	২৫ হাজার	৫০	১,২৫০
চারা বা কাটিং রোপণ	২৫ জন শ্রমিক	৮০	২,০০০
ইউরিয়া সার	২২০ কেজি	৫.৬	১,২৩২
ফসফেট (এঝচ)	১২৫ কেজি	১৩	১,৬২৫
পটাশ (গচ)	১২৫ কেজি	১৪	১,৭৫০
গোবর	৫ টন	৫০০	২,৫০০
ঘাসকাটা ও পরিবহন	-	-	১৮,৫২৫
মোট ব্যয়			৩২,৮৮২

বছরে (মে-অক্টোবর) প্রতি হেক্টর জমিতে উপত্যকায় উৎপাদিত ঘাসের পরিমাণ ও বিক্রয় মূল্য

ঘাসের নাম	উৎপাদন (টন)	প্রতি একরের মূল্য (টাকা)	মোট বিক্রয় মূল্য (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)	মোট আয় (টাকা)
নেপিয়ার	১২৯	৫০০	৬৪,৫০০	৩২,৮৮২	৩১,৬১৮
পারা	৮০	৫০০	৪০,০০০	৩২,৮৮২	৭,১১৮
এন্ড্রোপোগন	১০৮	৫০০	৫৪,০০০	৩২,৮৮২	২১,১১৮

পাহাড়ি এলাকায় ঘাস চাষের ফলে পরিবেশের ওপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না বরং মৌসুমি বৃষ্টিপাতের কারণে মাটি ও বালির ক্ষয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে। এছাড়াও সবুজ বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষায় এই প্রযুক্তির প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে পাহাড়ের ঢালু জমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে উন্নত জাতের ঘাস যেমনঃ নেপিয়ার, পারা, এন্ড্রোপোগন ইত্যাদি সহজেই চাষ করা যায়, যার মাধ্যমে পাহাড়ি এলাকার গো-খাদ্যের চাহিদা অনেকটা পূরণ করা সম্ভব। অধিকন্তু, বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ি ঢালে উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ ঘাস সংরক্ষণ করলে শুকনো মৌসুমে গো-খাদ্যের সঙ্কট মোকাবেলা করা সহজ হবে। ফলে গরুর মাংস এবং দুধ উৎপদান বৃদ্ধি পাবে, যা দারিদ্র্যবিমোচন এবং আত্মকর্মসংস্থানে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। ঘাসসমূহের কাটিং বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা-১৩৪১ অথবা বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যাংছড়ি, বান্দরবানে পাওয়া যাবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. খান শহীদুল হক, ড. রফিকুল ইসলাম এবং ড. আজহারুল ইসলাম তালুকদার

খামারের বর্জ্য থেকে ডাকউইড উৎপাদন ও গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার

ভূমিকা

ডাকউইড এক ধরনের ক্ষুদ্রাকৃতির ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ যা বদ্ধ স্রোতহীন জলাশয়ের উপরে দলবদ্ধভাবে ভেসে থাকে। ডাকউইডকে ভ্রমবশত অনেকে 'শেওলা' মনে করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা সপুষ্পক উদ্ভিদ অর্থাৎ এদের ফুল হয়। সপুষ্পক উদ্ভিদ হলেও প্রকৃতিতে ডাকউইড প্রধানত 'কুঁড়ি' উৎপাদনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে এবং এই প্রক্রিয়া এতো দ্রুত বিভাজন হয় যে, আদর্শ পরিবেশে ৮-১৬ ঘণ্টার মধ্যে এক কেজি তাজা ডাকউইড দুই কেজিতে পরিণত হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ডাকউইডের পুষ্টিমানও যথেষ্ট। ডাকউইডে ৬-৪৫% (শুষ্ক ওজনের) আমিষ থাকতে পারে। মানবদেহে ও প্রাণী-পাখির জন্য আবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড গুলোর মধ্যে অধিকাংশ ডাকউইডে আছে। এছাড়া ডাকউইডে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' বিদ্যমান। এজন্য ডাকউইডকে মাছ ও প্রাণী-পাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণী

গবাদিপ্রাণী ও হাঁস-মুরগি ইত্যাদির খাদ্যে সরবরাহকৃত পুষ্টির ৫০-৬০% মল ও মূত্র হিসেবে বেরিয়ে আসে যা বর্তমানে আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে নষ্ট বা অপচয় হয়। অথচ এই মূল্যবান পুষ্টি উপাদান সমূহকে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাণীপাখির পুষ্টি চাহিদা বহুলাংশে পূরণ সম্ভব। খামারে উৎপাদিত বিভিন্ন বর্জ্যের মধ্যে গোবর, মুরগির বিষ্ঠা ও গোয়াল ধোয়া পানি অন্যতম। এই গোবর বা বিষ্ঠাকে আবার অ-বায়বীয় ফার্মেন্টশন করেও ব্যবহার করা যেতে পারে। ১নং টেবিলে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যের গড় পুষ্টিমান দেয়া হলো-

টেবিল ১ : খামারে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যের গড় পুষ্টিমান

বর্জ্যের নাম	শুষ্ক পদার্থ (%)	জৈব পদার্থ (%)	নাইট্রোজেন (%)	অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন (গ্রাম/কেজি)
গোবর	২১.৬০	৭৯.১৯	১.৮৩	০.১৮৪
মুরগির বিষ্ঠা	৩৪.৬৪	৬০.৫৩	৫.২৮	১.৪৬৩
ফার্মেন্টেড গোবর	৬.৪৭	৭৯.৬০	২.৭৯	০.৪৬৬
ফার্মেন্টেড মুরগরি বিষ্ঠা	৭.৯৮	৭০.৬৮	৫.২৪	৪.২৯৮
গোয়াল ধোয়া পানি	-	-	০.০০৫	০.০২৪ (গ্রাম/লিটার)
হাসের বিষ্ঠা মিশ্রিত পানি	-	-	-	০.১০২ (গ্রাম/লিটার)

ছোট আকারের কৃত্রিম পুকুরে ডাকউইড চাষ

পলিথিনের কৃত্রিম পুকুর

এ ধরনের পুকুর সমতল জায়গায় মাটি বা ইটের দেয়ালের তৈরি হতে পারে। যা ৮ মিটার লম্বা, ২ মিটার প্রশস্ত এবং ০.৫ মিটার গভীর হতে পারে। এভাবে তৈরি আয়তকার দেয়ালের ওপর পলিথিন বিছিয়ে কৃত্রিম পুকুর তৈরি করা হয়। পুকুরে ৩০-৩৫ সেঃ মিঃ (প্রায় ১ ফুট) পর্যন্ত পানি দিয়ে ডাকউইড উৎপাদন করা হয়। ১৬ বর্গমিটার আয়তন এবং ০.৩৫ মিটার গভীরতা বিশিষ্ট পুকুরে প্রায় ৫৬০০ লিটার পানির প্রয়োজন হয়।

ডাকউইভ উৎপাদনে বিভিন্ন খামার বর্জ্যের মাত্রা

১ নং টেবিলে দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন ধরনের খামার বর্জ্যের পুষ্টিমান, বিশেষত, মোট নাইট্রোজেন ও অ্যামোনিয়া-নাইট্রোজেনের পরিমাণ ভিন্ন। ফলে ডাকউইড উৎপাদনে এদের ব্যবহারের মাত্রাও ভিন্ন। ২ নং টেবিলে ১৬ বর্গ মিটার আয়তন ও ০.৩৫ মিটার পানির গভীরতা সম্পন্ন কৃত্রিম পলিথিনের পুকুরে ডাকউইড উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের খামার বর্জ্য কী পরিমাণ ব্যবহার করা হবে তা দেয়া হলো। টেবিল-২ : ১৬ বর্গ মিটার আয়তন ও ০.৩৫ মিটার পানির গভীরতা সম্পন্ন কৃত্রিম পলিথিনের পুকুরে ডাকউইড উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য ব্যবহারের মাত্রা এবং মিডিয়াতে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ এক্ষেত্রে গোয়াল ধোয়া বা বিষ্ঠা মিশ্রিত পানিতে ডাকউইড চাষ করা হয়।

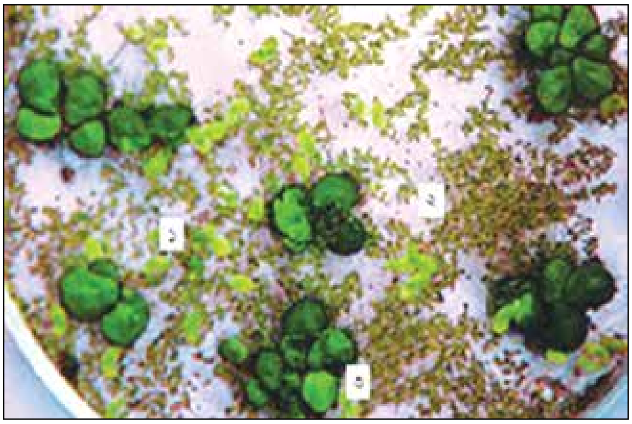

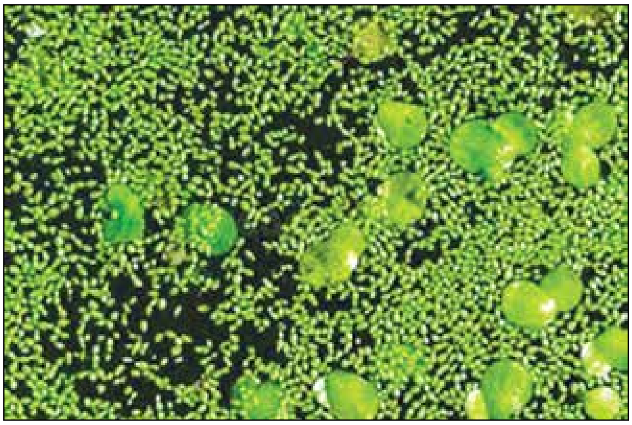

বর্জ্যের নাম	প্রাথমিক বর্জ্যের মাত্রা (কেজি)	দৈনিক বর্জ্যের মাত্রা (কেজি)	মিডিয়া অ্যামোনিয়া (মিঃ গ্রাঃ/লিঃ)
তাজা গোবর	৫০	১৩	৭.৭৭
তাজা মুরগির বিষ্ঠা	১১	১	৮.৩৯
ফার্মেন্টেড গোবর	১০৮	২৯	৭.৪৬
ফার্মেন্টেড মুরগির বিষ্ঠা	৪৭	৪	৯.২২
গোয়াল ধোয়া পানি	সম্পূর্ণ পানি	সম্পূর্ণ পানি	২৪
হাঁসের বিষ্ঠা মিশ্রিত পানি	সম্পূর্ণ পানি	সম্পূর্ণ পানি	১০০

তবে হাঁসের বিষ্ঠায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি হওয়ায় উল্লেখিত আয়তনের পুকুরে ১৬টি হাঁসের বিষ্ঠা ব্যবহার করা যেতে পারে, যার পরিমাণ প্রায় ২-২.২৫ কেজি (ফ্রেস)।

বর্জ্যের প্রয়োগ

ডাকউইড পুকুরে পুষ্টির উপাদান একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখার জন্য প্রথমে বেশি পরিমাণে (২নং টেবিল দেখুন) বর্জ্য উপাদান দিতে হয়। যেহেতু ডাকউইড বৃদ্ধির সাথে সাথে পানিতে দ্রবীভূত পুষ্টির পরিমাণ কমতে থাকে, এ অবস্থায় ডাকউইডের উৎপাদন আশানুরূপ রাখার জন্য প্রতিদিন ২নং টেবিল অনুসারে বর্জ্য দিতে হবে।

ডাকউইড চাষের বীজের মাত্রা

বিভিন্ন ধরনের ডাকউইড চাষে ভিন্ন মাত্রার বীজ দিতে হয়। যেমন: লেমনা, উলফিয়া ও স্পাইরোডেলার বীজের মাত্রা যথাক্রমে প্রতি বর্গ মিটারে ৪০০, ৫০০ এবং ৬০০ গ্রাম।

দৈনন্দিন পরিচর্যা

১. পুকুরে ডাকউইড প্রতিদিন অন্তত একবার নেড়ে দিতে হয় যা ডাকউইডের মূল এবং পাতার ময়লা দূর করে এর পুষ্টি সংগ্রহ সহজ করে। তাজা গোবর এবং মুরগির বিষ্ঠা পুকুরের তলদেশে অবায়বীয় ফার্মেন্টেশনের মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মিথেন উৎপাদন করে যা বর্জ্যসহ সরের মতো পুকুরের উপর ভেসে ওঠে যা ডাকউইডের পুষ্টি শোষণে ব্যাঘাত ঘটায়। এই সরকে ভেঙে না দিলে ডাকউইড পুষ্টির অভাবে মারা যেতে পারে। তাছাড়া নাড়াচড়া ডাকউইডের অঙ্গজ প্রজননেও সহায়তা করে।

২. স্পাইরোডেলা বিভিন্ন ধরনের পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিঃ লিঃ মেলাথিয়ন ব্যবহার করতে হবে। তবে লেমনাও উলফিয়াতে এ ধরনের কোনো সমস্যা সাধারণত দেখা যায় না।

৩. জৈব বর্জ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দীর্ঘ দিন ধরে একটি পুকুরে নির্ধারিত পরিমাণ বর্জ্য ব্যবহার করা সত্ত্বেও ৩০-৩৫ দিন পর ডাকউইড উৎপাদন কমতে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রতি এক মাস পর পর পানি পরিবর্তন করে নতুন করে আবার ডাকউইড উৎপাদন শুরু করতে হবে।

ডাকউইডের সংগ্রহ

প্রতি বর্গ মিটারে ৮০-১০০ গ্রাম হিসাবে ১৬ বর্গ মিটার পুকুর থেকে দৈনিক ১.২৮-১.৩২ কেজি ডাকউইড হার্ভেস্ট করা যায়।

গোবর/বিষ্ঠা ব্যবহারে কৃত্রিম পুকুরে ডাকউইডের ফলন

খামার বর্জ্য থেকে উৎপাদিত ডাকউইডের মধ্যে কাঁচা অবস্থায় উৎপাদন সবচেয়ে বেশি উলফিয়া প্রজাতির (১৭৫০কেজি/হেঃ দিন) এরপর লেমনা (৮২০ কেজি/হেঃ দিন) ও স্পাইরোডেলার (৭২০ কেজি/হেঃ/দিন)। কিন্তু শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন লেমনাতে এরপর উলফিয়া ও স্পাইরোডেলার। ৩ নং টেবিলে বিভিন্ন বর্জ্য থেকে উৎপাদিত স্পাইরোডেলার পুষ্টিমান দেয়া হলো।

টেবিল ৩ : বিভিন্ন খামার বর্জ্য ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত ডাকউইডের (স্পাইরোডেলার) পুষ্টিমান।

ব্যবহৃত বর্জ্যের নাম	ডাকউইডের পুষ্টিমান		
	শুষ্ক পদার্থ (%)	জৈব পদার্থ (%)	প্রোটিন (%)
কাঁচা গোবর	১০	৮৮	৩৩
কাঁচা মুরগির বিষ্ঠা	৭	৯৬	৩৭
ফার্মেন্টেড গোবর	৮	৯৮	৪১
ফার্মেন্টেড মুরগির বিষ্ঠা	৮	৯৮	৪০

বৃহদাকার গবাদিপ্রাণীর খামারে ডাকউইড উৎপাদন

গোয়াল ধোয়া পানিতে ডাকউইডের ফলন

একশত পঞ্চাশ থেকে দুইশত গরুবিশিষ্ট গবাদিপ্রাণীর খামারে দৈনিক প্রায় ১৫০০০-২০০০০ লিটার পানি গোয়াল ধোয়া, খাওয়ানো এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। এই পানিতে মলমূত্র মিশে বিভিন্ন জৈব পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ হয় যা ডাকউইডের পুষ্টি সরবরাহ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে গোয়াল ধোয়া পানি প্রথমে একটি পুকুরে জমিয়ে মিনারালাইজড করা হয়। পরবর্তীতে সেই পানিতেই ডাকউইড উৎপাদন করা হয়। এ ধরনের বর্জ্য থেকে উৎপাদিত ডাকউইডের (লেমনার) ফলন ও গুণগত মান ৪নং টেবিলে দেয়া হলো।

টেবিল-৪ : গোয়াল ধোয়া পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ডেইরি লেগুনে ডাকউইডের (লেমনার) গড় ফলন ও পুষ্টিমান

ডাকউইড	কাঁচা ফলন (কেজি/হেঃ/ডে)	শুষ্ক পদার্থ (%)	জৈব পদার্থ (%)	প্রোটিন (%)
লেমনা	৫২০	৫.৪৩	৭২.৫৬	৩১.৫৪

প্রাণীখাদ্য হিসেবে ডাকউইডের ব্যবহার

(ক) হাঁস উৎপাদনে ডাকউইডের ব্যবহার

ডাকউইড হাঁসের একটি প্রিয় খাদ্য। একটি হাঁস দৈনিক ১৪০-১৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য গ্রহণ করে। হাঁস দৈনিক ১.৫ কেজি পর্যন্ত কাঁচা ডাকউইড খেতে পারে। তবে বিএলআরআই-এর গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রতিটি হাঁসের খাদ্যে ৬০০-৬৫০ গ্রাম হারে ডাকউইড দিলে মোট ডিমের উৎপাদন, ডিমের ওজন, ডিমের প্রোটিন ও কেরোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সাধারণভাবে হাঁসের মোট খাদ্যের ২৫-৩০% (শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে) ডাকউইড দেয়া যায়।

(খ) ব্রয়লারে ডাকউইডের ব্যবহার

ব্রয়লারের খাদ্যে শুষ্ক গুঁড়া করা ডাকউইড ব্যবহার করা যায়। বিএলআরআই-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, একটি ব্রয়লারের খাদ্যে দৈনিক সর্বোচ্চ ১৫ গ্রাম শুষ্ক ডাকউইডের গুঁড়া ব্যবহার করা যায়।

(গ) গরুতে ডাকউইডের ব্যবহার

সবুজ ঘাসের বিকল্প হিসেবে গরুর খাদ্যে ডাকউইড ব্যবহার করা যায়। একটি গরু দৈনিক ১০-১২ কেজি কাঁচা ডাকউইড খেতে পারে। এ ক্ষেত্রে কুঁড়া বা ভুসির সাথে প্রতি কেজি ডাকউইডের ১০০ গ্রাম পরিমাণ মোলাসেস মেশাতে হয়। এতে গরুর মাংস এবং দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

আয়-ব্যয়

ছোট আকারে ডাকউইড উৎপাদনে কেবল পলিথিনের খরচই আসে। সুতরাং প্রতি কেজি ডাকউইড উৎপাদন খরচ নির্ভর করে পুকুরের আকারের ওপর। বিএলআরআই-এর গবেষণায় দেখা গেছে যে, একটি ১৬ বর্গ মিটার পলিথিন পুকুরে ডাকউইড উৎপাদন খরচ কেজিতে ১০ পয়সা।

পরিবেশের ওপর প্রভাব

প্রযুক্তিটি পরিবেশ সহায়ক।

ব্যবহারের সম্ভাবনা

খামারে উৎপাদিত বর্জ্য ব্যবহারে ডাকউইডের উৎপাদন এবং প্রাণীখাদ্য হিসেবে এর ব্যবহার খাদ্য খরচকে বহুলাংশে কমিয়ে দিতে পারে। বর্জ্য ব্যবহার করে সারা বছর ডাকউইড উৎপাদনের এই সহজ ও সস্তা পদ্ধতি ব্যবহার করে আশা করি খামারিগণ উপকৃত হবেন।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. খান শহীদুল হক এবং ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী

কৃত্রিম প্রজনন ও বাছাই এর মাধ্যমে গাভীর জাত উন্নয়ন

প্রযুক্তির মূল বিষয়সমূহ

কৃত্রিম প্রজনন, প্রজননের ফলাফল, উহার সমস্যাসমূহ এবং প্রতিকার।

উৎপাদন নির্দেশিকা সরঞ্জাম এবং পদ্ধতি

বাংলাদেশের গরুর কৃত্রিম প্রজননের অবস্থা, এর প্রয়োগ এবং ফলাফলের ওপর বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং ব্র্যাকের সমন্বয়ে জানুয়ারি ১৯৯৭ খ্রি: থেকে আগস্ট/১৯৯৮ খ্রি: পর্যন্ত ১টি গবেষণা কাজ পরিচালনা করা হয়। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৯৩০ খ্রি: পর বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কৃত্রিম প্রজননের মূল্যায়ন করা। সে উদ্দেশ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের চারটি বিভাগের ৪টি বৃহত্তম জেলা, ১২টি সাব সেন্টার এবং ১৬টি এআই পয়েন্ট এবং ব্র্যাকের আওতাধীন ৭টি এআই পয়েন্টে কৃত্রিম প্রজননের অবস্থা, সংকর জাত গরুর উৎপাদন ও পুনঃউৎপাদন ক্ষমতা এবং এর সাথে জড়িত কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থা ইত্যাদির ওপর গবেষণা কাজ পরিচালনা করা হয় এবং ফলাফল নিম্নে দেয়া হলো :

- সরকারের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমে বিদেশী জাতের বীজ দেশীয় জাতের গরুতে সংকরায়নের ফলে দেশীয় জাতের গরুতে কৌলিক মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- গরুর প্রজননে উৎপাদিত সংকরজাত অন্যান্য জাতের সাথে প্রজননের ফলে উৎপাদিত দেশীয় জাতের গরুর সাথে ফ্রিজিয়ান জাতের সংকরজাত অপেক্ষা খুবই ভালো হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে।
- জার্সি জাতের গরুর সাথে দেশীয় জাতের সংকরায়নের হার খুবই কম। তবে তাদের দুধ উৎপাদন এবং পুন:উৎপাদন ক্ষমতা ভালো।

টেবিল ১ : সংকর জাতের গরুর দুধ উৎপাদন এবং জন্ম ওজন

জাত	দুধ উৎপাদন/ প্রতিদিন (কেজি)	দুধ উৎপাদন ১ম ১০০ দিন (কেজি)	জন্ম ওজন (কেজি)
দেশী × ফ্রিজিয়ান	৩.৭২ ± ৩২ (৪৭৯)	৩৯৫.০৩ ± ০.২৫ (২১৮)	১৯.৫ ± ০.২৫ (১৮৯)
দেশী × শাহিওয়াল	২.৯৫ ± ০.৪৩ (১৪৭)	৩৩৫.৭৮ ± ২৬.৫ (২৯)	১৭.২ ± ১.১৬ (১৮)
দেশী × জার্সি	২.৯১ ± ০.৩৭ (৫৭)	৩২৩.৩৪ ± ২৫ (২৪)	-
দেশী × সিন্দি	-	৩৩৫.৭৮ ± ৩৩.৮ (৫২)	১৮.৩৩ ± ৬.৬০ (৪২)

টেবিল ২ : সংকর জাতের গরুর পুন:উৎপাদন ক্ষমতা

জাত	বয়ঃপ্রাপ্তি কাল (দিন)	গর্ভধারণ কাল (দিন)	বাচ্চা প্রসবের পর ১ম গরম হওয়া (দিন)	গর্ভধারণের শতকরা হার (%)
দেশী × ফ্রিজিয়ান	১০২২ ± ৩১.৩১ (১৫৫)	২৭৫.৬ ± ২.৫৫ (১৯২)	১৫৫.৮৭ ± ১২.১০ (৪১)	৪১.৬৬ (২৪)
দেশী × শাহিওয়াল	১০০৭.৩৭ ± ৩১.৭৬ (৮০)	২৭৬.০ ± ১.৩৬ (৯০)	১১৬.৮৮ ± ৯.২৯ (২৩)	৩৩.৩৩ (৬)
দেশী × জার্সি	১১০১.৫ ± ৫১.২৯ (১৭)	২৭৫.৯ ± ৩.৮৬ (১৯)	২৩৮.৭৮ ± ২০.৬ (১২)	-
দেশী	১১২৬.৬ ± ৪৯.৪৫ (৫৭).	২৭৭.১ ± ০.৭৭ (৪৩)	১৬২.৭৮ ± ১৭.১৪ (১৪)	-
দেশী × সিন্দি	১২২৪.৩৬ ± ৪৬.৮১ (৪১)	২৭৯.৭ ± ১.০৩ (৪০)	২০২.৭৭ ± ১৩.০১ (১০)	৪৪.২৮ (৭০)

কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের সমস্যাসমূহ

- চলমান কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সন্তোষজনক তবে বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা, প্রজনন ষাঁড়ের প্রাপ্যতা, ষাঁড় ব্যবস্থাপনার সুযোগ-সুবিধা, আধুনিক বীজ মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা, সুদক্ষ কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ান এবং মাঠপর্যায়ে ল্যাবরেটরিতে সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে।
- ভালো মাইক্রোস্কোপ, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য সমস্যার কারণে সাব সেন্টারে কৃত্রিম প্রজনন বীজের গুণাগুণ পরীক্ষা করা সব সময় সম্ভব হয় না।
- বেশিরভাগ সময় বীজ সরবরাহ করা হয় বাইসাইকেল, রিক্সা এবং পায়ে হেটে।
- কৃত্রিম প্রজননের প্রচার খুবই সীমিত।
- কোনো কোনো এলাকায় অনিয়মিতভাবে সিমেন সরবরাহ করা হয়।
- জেনারেশন বাড়ার সাথে সাথে ৫০% বেশি বিদেশী সংকর জাতের দুধ উৎপাদন এবং পুন:উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়।
- কৃত্রিম প্রজননের সুর্নিদিষ্ট জাতীয় নীতি নির্দিষ্ট না থাকায় প্রজনন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

প্রতিকার

- অঞ্চল বিশেষে স্থানীয় গরুর উন্নয়নের জন্য ফ্রিজিয়ান জাতের ষাঁড়কে প্রজননের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ভাল কৌলিক গুণ সম্পন্ন দেশী × ফ্রিজিয়ান এবং শাহিওয়াল × ফ্রিজিয়ান জাতের ষাঁড় পৌর, গ্রামীণ এবং মিল্ক পকেট এলাকায় যেখানে সংকর জাতের গরু পালার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- স্থানীয় গরুর উন্নয়ন এবং দুধ উৎপাদন জন্য জার্সি জাতের গরু ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সিমেন উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং প্রতিনিয়তই পরিদর্শন করা উচিত।
- তরলীকৃত সিমেন পরিবহনের ক্ষেত্রে অসুবিধার কারণে উহার পরিবর্তে তরল নাইট্রোজেন স্ট্র (Straw) সিমেনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কৃত্রিম প্রজনন করার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রজনন করার পূর্বে সিমেনের গুণগতমান ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা করে নেয়া প্রয়োজন।
- কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশে রেডিও, টিভি, পোস্টার, লিফলেট, পত্র এবং পত্রিকা ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রত্যেক এলাকায় সিমেন সরবরাহ নিয়মিতভাবে করা উচিত।
- জেনারেশন বাড়ার সাথে সাথে ৫০% এর বেশি বিদেশী সংকর জাতের দুধ উৎপাদন কমে যাওয়ায় কারণ ৫০% এর বেশি বিদেশী সংকর সেমি ট্রপিক্যাল আবহাওয়া খাপ খাওয়াতে পারে না। দুই বা ততোধিক লাইন সংকরায়নের মাধ্যমে তৈরি করে (৫০% বিদেশী) উল্লেখিত লাইনে ভালো প্রাণীগুলো বাছাই করে তাদের মধ্যে সংকরায়নের ফলে ভালো ফলাফল আশা করা যায়।
- অনতিবিলম্বে কৃত্রিম প্রজননের সুর্নিদিষ্ট জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা উচিত।
- প্রজনন ষাঁড়ের বাছাই ও ছাটাই পদ্ধতি প্রজনন মানের (Estimated breeding value) ভিত্তিতে করা উচিত।
- কৃত্রিম প্রজননে ভাল ফলাফল পাওয়ার জন্যে হাইজেনিক সতর্কতা অবশ্যই মেনে চলতে হবে।
- প্রতিযোগিতামূলক ফলাফল পাওয়ার জন্য সরকারি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের পাশাপাশি অধিকসংখ্যক বেসরকারি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন।
- কৃত্রিম প্রজনন এবং উহার পরবর্তী উর্বরতার ফলাফল পর্যবেক্ষণের জন্য কমপক্ষে প্রতি ১০ (দশ) টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের জন্য একজন প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিয়োগ করা যেতে পারে।
- কৃত্রিম প্রজনন এবং এর উর্বরতা বৃদ্ধির অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সুবিধা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কৃত্রিম প্রজনন সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন।

ঝুঁকিপূর্ণ দিক

প্রযুক্তিটি ব্যবহারে তেমন কোনো ঝুঁকিপূর্ণ দিক নেই তবে কৃত্রিম প্রজননের সমস্যাগুলো শনাক্ত করে তা সমাধানে সদা তৎপর থাকা প্রয়োজন।

প্রযুক্তিটি ব্যবহারের ফলাফল ও লাভ

প্রযুক্তিটিতে দেশের দুগ্ধ খামারিগণ কোন জাতের গরু ও সংকর ষাঁড় ব্যবহার করবেন তার দিক নির্দেশনা পাবেন। প্রযুক্তিটির যথোপযুক্ত ব্যবহারের ফলে দেশীয় জাতের গরুর কৌলিক মান বৃদ্ধি পাবে এবং দুগ্ধ উৎপাদন বাড়বে। গুঁড়ো দুধ আমদানি কমে যাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

পরিবেশের ওপর প্রতিক্রিয়া

এই প্রযুক্তিটির ব্যবহার পরিবেশের ওপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।

সম্প্রসারণ পদ্ধতি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে তা মাঠপর্যায়ে স্থানান্তর করা যাবে।

উপসংহার

প্রযুক্তিটি ব্যবহারের ফলে দেশীয় গরুর কৌলিক মান বাড়বে। ভালো দুগ্ধ উৎপাদনশীল জাতের গরু সৃষ্টি হবে, যা দেশীয় প্রতিকূল আবহাওয়াতেও খাপ খাওয়াতে পারবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. এম. এ. মজিদ, ড. টি এন নাহার, ড. খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন এবং ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার

অষ্টগ্রাম পনির উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ

ভূমিকা

অষ্টগ্রামের ফুলক্রিম পনির

পনির দুগ্ধজাত পণ্যের মধ্যে একটি অন্যতম পণ্য, যা দুগ্ধ জমাট এনজাইম রেনিন দুধে যোগ করে তৈরি করা হয়। আমাদের দেশীয় পনির মূলত কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে, যা আন্তর্জাতিকভাবে ঢাকা পনির নামে পরিচিত। অষ্টগ্রামবাসীরা জানান যে, ৩০০-৩৫০ বছর আগে থেকে অষ্টগ্রামে পনির উৎপন্ন শুরু হয়। স্থানীয় বৃদ্ধদের সাথে আলোচনায় অষ্টগ্রামের পনির তৈরির ইতিহাস সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হলো পূর্বে এ এলাকায় প্রচুর মহিষের দুধ হতো।

কিন্তু অনুন্নত যোগাযোগ, দুর্বল বাজার ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ভোক্তা চাহিদা না থাকায় এই দুধ বাজারে বিক্রি হতো না। অপর দিকে দুধের সংরক্ষণকাল কম বিধায় দুধ বাইরে পাঠানো যেত না ফলে প্রচুর পরিমাণ দুধ নষ্ট হয়ে যেত। উক্ত দুধ সংরক্ষণের উপায় হিসেবেই প্রথমত অষ্টগ্রামে পনির উৎপাদন শুরু হয়। কারণ দুধের চেয়ে দুধের তৈরি পনির বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায়। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত দেশীয় দুগ্ধজাত দ্রবাদি তৈরির কৌশল সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হয়। পনির উৎপাদনের অষ্টগ্রাম প্রযুক্তিটি সংশোধিত আকারে খামারিদের ব্যবহারের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য/সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- দুধ উত্তম পানীয় ও পুষ্টিকর খাদ্য হলেও অতি অল্প সময়েই নষ্ট হয়ে যায়।
- দুগ্ধজাত দ্রব্য পনির সংরক্ষণ সমস্যা কম এবং একটি লাভজনক পণ্য।
- পনিরকে সাধারণ তাপমাত্রায় ১০-২০ দিন রাখা যায়।
- অনুন্নত স্থানে সহজ উপায়ে এবং কোন খরচ ছাড়াই দুগ্ধ সংরক্ষণের অন্যতম ও প্রধান উপায় হচ্ছে পনির উৎপাদন।
- প্রাকৃতিক তাপমাত্রায় এর সংরক্ষণকাল অধিক হওয়ায় পনিরকে সুবিধাজনক সময়ে বাজারজাত করা যায় যা দুধের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।
- অধিক সংরক্ষণকাল থাকায় পনিরকে দূর দূরান্তে বাজারজাত করাও সম্ভব।
- পনির দুগ্ধ আমিষ জাতীয় খাদ্যের অতি উত্তম উৎস যা বাচ্চা ও বৃদ্ধদের আমিষ পুষ্টি চাহিদা মেটাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম।
- স্বল্প বিনিয়োগে প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা যায়।

প্রতিদিন মাত্র ৭০০-৮০০ টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি পরিবার সহজেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে বিধায় পনিরের প্রযুক্তিটি দুগ্ধ উৎপাদন এলাকায় দারিদ্র্যবিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে।

ব্যবহার পদ্ধতি

পনির তৈরির উপকরণ

গরু, মহিষ বা ছাগলের দুধ, মাওয়া (প্রক্রিয়াজাত পাকস্থলী), মাওয়ার পানি, অ্যালুমিনিয়াম পাত্র (৫০ লিটার), স্টেইনলেস স্টীলের ধারালো ছুরি, বাঁশের তৈরি ছুরি, বাঁশের তৈরি ঝুড়ি বা টুকরি, খাদ্য লবণ এবং পনির ছিদ্র করার জন্য চোখা কাঠি (পরিধি প্রায় ২.৫-৩ সে. মি.)।

মাওয়া তৈরি

সাধারণভাবে মাওয়া হলো লবণ দ্বারা বিশেষভাবে প্রক্রিয়াকৃত গরু বা ছাগলের পাকস্থলী যা রোদে শুকিয়ে তৈরি করা হয়। গরু বা ছাগলের পাকস্থলী চারটি অংশে বিভক্ত যথা : রুমেন, রেটিকুলাম, ওমেসাম ও অ্যাবোমেসাম বা প্রকৃত পাকস্থলী (পাকস্থলীর শেষাংশ)। এই অ্যাবোমাসাম

বা প্রকৃত পাকস্থলী দিয়েই মাওয়া তৈরি করা হয়। বাহ্যিকভাবে যা দেখতে অনেকটা বাংলা অক্ষর ৫ এর মত। কসাই খানা হতে বাড়ন্ত গরুর এই পাকস্থলী ১০-১৫ টাকা দরে ক্রয় করা হয়। পাকস্থলীর ভিতরের বর্জ্য অপসারণের জন্য ধারালো চাকু দিয়ে কেটে টিউব ওয়েলের পানি দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ধুতে হবে যাতে পাকস্থলীর ভেতরের পিচ্ছিল (মিউকাস) অংশ পানির সাথে ধুয়ে না যায়। এবার বাঁশের চাটাই এর উপর পাকস্থলী এমনভাবে বিছানো হয় যাতে পাকস্থলীর ভিতরের অংশ উপরে থাকে। অতপর ২৫০-৫০০ গ্রাম পরিমাণ খাদ্য লবণ পাকস্থলীতে সমভাবে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে পাকস্থলী ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে টুকরা টুকরা করে কেটে মাওয়া তৈরি করা হয়। মাওয়াকে সাধারণত ঠান্ডা জায়গায় যে কোন পাত্রে রেখে প্রায় ৩০ দিন পর্যন্ত ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

পনিরের জন্য মাওয়ার পানি প্রস্তুতকরণ (৪০ কেজি দুধের হিসাব)

গ্রীষ্মকালে একটি গরুর প্রক্রিয়াকৃত প্রকৃত পাকস্থলী বা মাওয়ার ১/৪ অংশ বা ২৫ শতাংশ এবং শীতকালে ১/৩ অংশ বা ৩৩ শতাংশ পরিমাণ মাওয়া একটি পাত্রে নিয়ে তাতে ২-৩ কেজি পরিমাণ পানি ও ১ কেজি পরিমাণ কাঁচা দুধ মিশিয়ে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। ব্যবহারের পূর্বে মাওয়ার টুকরোগুলো দুধ এবং পানির দ্রবণে ভালোভাবে মিশ্রিত করতে হবে। পনির তৈরির পূর্বে মাওয়ার পানি অবশ্যই পাতলা পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে। স্থানীয় ভাষায় এই পানিই 'মাওয়ার পানি' নামে পরিচিত।

দুধ থেকে পনির তৈরি

- দুগ্ধ দোহনের ৩-৪ ঘণ্টা পর ৪০ কেজি কাঁচা দুধ ছেকে একটি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে নিতে হবে। ২-৩ কেজি পরিমাণ মাওয়ার পানি ধীরে ধীরে দুধে যোগ করতে হবে এবং ভালোভাবে নাড়তে হবে। দুধ জমাট বাঁধার জন্য ১০-৩০ মিনিট সময় স্থিরভাবে রেখে দিতে হবে। দুধ জমাট হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য বাশের তৈরি পাতলা ছুরি দুধে প্রবেশ করিয়ে দেখতে হবে। যদি ছুরিটি সোজা দণ্ডায়মান থাকে তবে বুঝতে হবে দুধ জমাট সঠিক হয়েছে।
- জমাট বাধার ১০ মি. পর বাশের তৈরি ছুরি দ্বারা জমাট দুধকে আড়াআড়ি ভাবে কেটে দিতে হবে।
- কাটার ফলে কাটা জায়গা থেকে নীলাভ বর্ণের পানি বের হয়ে এলে এর ১০ মিনিট পর কাটা জমাট দুধকে হাত দিয়ে আলতোভাবে ভেঙে দিতে হবে।
- ছানাকে উত্তম রূপে থিতানোর জন্য ৫-১০ মিনিট সময় রেখে দুই হাত দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে খুব ধীরে ধীরে পাত্রের একপার্শ্বে জমা করতে হবে। এমনভাবে চাপ প্রয়োগ করতে হবে যাতে ছানার ভেতর খুব বেশি পানি না থাকে এবং চাপা (Compact mass) অবস্থায় থাকে।
- এবার ছানাকে স্টেইনলেস স্টিলের ধারালো ছুরি দ্বারা টুকরো টুকরো (thin slices) করে কাটতে হবে।
- অতপর ছানার টুকরাকে বাঁশের তৈরি ঝুঁড়িতে (প্রতিটি ঝুঁড়ির ব্যাস হবে প্রায় ১৬ সেমি. এবং উচ্চতা হবে প্রায় ৬-৭ সেমি) হাত দ্বারা ঠেসে ভরতে হবে। ৪০ কেজি দুধের ছানা দিয়ে ৫টি ঝুঁড়ি (প্রতিটি ঝুঁড়িতে পনিরের ওজন হবে ১ কেজি) পূর্ণ করা সম্ভব।
- নির্দিষ্ট আকার আকৃতির (ঝুঁড়ির ছাপ) জন্য ১৫ মিনিট পর ঝুঁড়ির ছানা পিন্ডকে প্রথম উল্টিয়ে দিতে হবে।
- পানি নিষ্কাশনের জন্য ছানার পিন্ডসহ ঝুঁড়ি একটি পাত্রে প্রায় ১৫ ঘণ্টা রাখতে হবে এবং সেই সাথে ঝুঁড়িটি অন্য একটি পাত্র দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে, যাতে বাইরের ময়লা বা পোকামাকড় না পড়ে।
- ১৫ ঘণ্টা পর ঝুঁড়ির পনির পিন্ডকে দ্বিতীয় বার উল্টিয়ে চোখা (pointed) কাঠি দ্বারা (ব্যাস প্রায় ২.৫-৩ সে.মি.) কেন্দ্র বা মাঝ বরাবর তিনটি ছিদ্র করে (ত্রিভূজাকৃতির) তাতে ৫০ গ্রাম খাবার লবণ ঢুকিয়ে দিতে হবে।
- বাড়তি লবণ পনির পিন্ডের চারপার্শ্বে মেখে দিতে হবে। এতে লবণ ধীরে ধীরে গলে সমস্ত পনির পিন্ডে বিস্তার লাভ করবে। এভাবে ৩ দিন পর্যন্ত রাখতে হবে।

পনির উৎপাদন

গরুর দুধ

শীতকালে প্রতি ৮ কেজি দুধ থেকে ১ কেজি পনির (১ মণ দুধে ৫ কেজি পনির) এবং গ্রীষ্মকালে ৯ কেজি দুধ থেকে ১ কেজি পনির (১ মন দুধে ৪.৫ কেজি পনির) উৎপাদিত হয়ে থাকে।

মহিষের দুধ

গড়ে প্রতি ৭ কেজি দুধ থেকে ১ কেজি অর্থাৎ প্রতি মণ দুধ থেকে প্রায় ৬ কেজি পনির উৎপাদিত হয়।

পনির সংরক্ষণ

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে স্বাভাবিক পরিবেশ/তাপমাত্রায় অষ্টগ্রামে পনিরকে ৭-১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু শীতকালে ১৫-২০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। পনির বেশি দিন সংরক্ষণ করতে হলে ২ দিন পর পর লবণ পানি দিয়ে ঘষে দিতে হবে। তবে কোনো কোনো প্রস্তুতকারক পনিরের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি এবং বিশেষ আস্বাদের জন্য উন্মুক্ত আগুনের চুলার ধোঁয়ায় রেখে ধোয়ায়িত (smoking) করে থাকেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পনিরকে ১ মাস থেকে ২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

বাজারজাতকরণ

অষ্টগ্রামের পনির প্রস্তুতকারক সাধারণত হবিগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী এলাকার খুচরা বাজারে প্রতি কেজি পনির ২১০ এবং ঢাকাতে পাইকারি বাজারে ১৬০ টাকা হিসেবে বিক্রি করে থাকেন। খুচরা বাজারে পনিরকে অনেক সময় ভোক্তার চাহিদামাফিক কেটে কেটে বিক্রি করা হয়। এ ছাড়াও কিছু প্রস্তুতকারক তাদের উৎপাদিত পনির বাড়িতে বসে বিক্রি করে থাকেন।

ছানার পানির ব্যবহার

প্রতি ৪০ কেজি দুধ থেকে পনির তৈরির সময় উপজাত হিসেবে প্রায় ৩৫-৩৬ লিটার ছানার পানি পাওয়া যায়। এই পানির ২-৩ লিটারে প্রথম দিনের ভিজানো মাওয়া যোগ করে মাওয়ার পানি তৈরি করা যায়। এভাবে ভিজানো মাওয়া ৩ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও ছানার পানি মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

আয়-ব্যয়

সারণি : প্রতি দিন ৪০ লিটার দুধের পনির তৈরি খরচ

৪০ লিটার দুধের ক্রয় মূল্যে প্রতি লিটার ১৬ টাকা হিসাবে	= ৬৪০ টাকা
মাওয়াসহ মাওয়ার পানি তৈরিতে খরচ	= ৭.৫০ টাকা
লবণ ২৫০ গ্রাম এর মূল্যে	= ২.৫০ টাকা
শ্রমিকসহ বিবিধ খরচ	= ১০.০ টাকা
মোট খরচ	= ৬৬০ টাকা

উল্লেখিত সারণিতে প্রস্তুতকারকদের দেয়া তথ্যমতে, প্রতি কেজি দুধের দাম ১৬ টাকা হলে ৪০ লিটার দুধের পনির তৈরি করতে মোট খরচ পড়বে ৬৬০ টাকা।প্রতিমণ দুধ থেকে সাধারণত শীতকালে ৫ কেজি এবং গ্রীষ্মকালে ৪.৫ কেজি পনির উৎপাদিত হয়। সেমতে, প্রতি কেজি পনিরের খরচ পড়ে যথাক্রমে ১৩২ টাকা এবং ১৪৬ টাকা। প্রতি কেজি পনির খুচরা (স্থানীয় বাজার) এবং পাইকারি (ঢাকাতে) বাজারে যথাক্রমে গড়ে ২১০ টাকা এবং ১৬০ টাকায় বিক্রি হলে একজন প্রস্তুতকারক পনির উৎপাদনে প্রতিদিন মাত্র ৬৬০ টাকা বিনিয়োগ করে খুচরা বাজার থেকে শীতকালে ৩৯০ টাকা, গ্রীষ্মকালে ২৮৫ টাকা এবং পাইকারি বাজার থেকে ১৪০ টাকা আয় করতে পারেন। এছাড়াও গবেষণাতে দেখা যায় অষ্টগ্রামে প্রায় ৫৭ শতাংশ মহিলা সরাসরি পনির তৈরি করে থাকেন এবং উক্ত পরিমাণ দুধের পনির তৈরি করতে সময় লাগে মাত্র ১.৫ ঘণ্টা।

ব্যবহারের সম্ভাবনা

বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে অধিক দুধ উৎপাদন হয়। কিন্তু ন্যায্য মূল্যে বাজারজাত করতে পারে না সেসব অঞ্চলে প্রযুক্তিটি প্রযোজ্য। সব ঋতুতেই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সতর্কতা

যে সকল অঞ্চলে দুধের দাম খুব বেশি সেখানে পনির তৈরি না করাই শ্রেয়। কারণ এতে করে পনিরের উৎপাদন খরচ বেশি পড়বে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. বিপ্লব কুমার রায় এবং ড. খান শহীদুল হক

দুধ উৎপাদনে উচ্চ ফলনশীল দেশী ঘাস বাকসা

ভূমিকা

বাকসা একটি দেশী ঘাস। এই ঘাস একবার বপণ করলে ৪-৫ বছর ফলন পাওয়া যায়। সারা দেশে বিভিন্ন ধরনের বাকসা ঘাস আছে। তন্মধ্যে মুন্সিগঞ্জের বাকসার ফলন সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও ঢাকা জেলার সাভার এলাকায়, নাটোরের চৌহালী থানায়, সুনামগঞ্জ জেলায়, টেকেরহাট, মিল্ক ভিটার পারিপার্শ্বিক এলাকাসহ বাঘাবাড়ি ও সিরাজগঞ্জ অববাহিকায় এবং নেত্রকোনার হাওড় এলাকায় বাকসা ঘাস পাওয়া যায়।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য/সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাকসা একটি অধিক উৎপাদনশীল, সম্ভাবনাময় দেশী ঘাস। এ ঘাসটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘাসও বটে কারণ :

- এটি শীত এবং বর্ষা উভয় ঋতুতেই জন্মে,
- বর্ষা ঋতুতে এ ঘাসটি পানির সাথে বাড়ে বিধায় যখন সমস্ত ঘাস পানিতে ডুবে যায় তখন বাকসা ঘাসই গো-খাদ্যের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে,
- এ ঘাসের পুষ্টিমান ও গ্রামিণী গোত্রের অন্যান্য বিদেশী ঘাসের চেয়ে বেশি অথবা সমান।

ব্যবহার পদ্ধতি

চাষ প্রণালী

জমির ধরন

বাংলাদেশে অনেক জায়গা রয়েছে যেগুলো এক ফসলি দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ জমি, বছরে প্রায় ৫-৬ মাস বর্ষায় ডুবে থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে পলি পড়ে এরূপ জমিই বাকসা চাষের উপযোগী। তাছাড়া নিচু ও স্যাঁতস্যাঁতে জমি যেখানে অন্য ফসল কম হয় সেসব জমিতে বাকসা ঘাস চাষ করা যায়।

জমি তৈরি

প্রথম পদ্ধতি (প্রচলিত পদ্ধতি/ জিরো টিলেজ)

কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জমি থেকে বন্যার আবদ্ধ পানি সরে যাওয়ার পর কিছুটা পানি থাকা অবস্থায় আগাছা পরিষ্কার করে কর্দমাক্ত মাটিতে কাটিং ছড়িয়ে পা দিয়ে এক প্রান্ত পুঁতে দিতে হয়। নরম পলিমাটি থাকার দরুন এ ক্ষেত্রে জমি চাষ করার প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয় পদ্ধতি (উন্নত পদ্ধতি)

কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জমিতে ৭-১০ সে. মি. পানি থাকা অবস্থায় জমি চাষ করতে হয়। জমিতে এ সময় ২-৩ টি চাষ দিয়ে জমির আগাছা পুরোপুরি পরিষ্কার করতে হয়। তবেই সেটা বাকসা ঘাস চাষের উপযোগী হয়। জমি চূড়ান্তভাবে তৈরির সময় প্রতি একরে ৩০ কেজি ফসফেট (টিএসপি) এবং ৩০ কেজি পটাশ (এম পি) সার ছিটিয়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে যেসব জায়গায় মাটির উর্বরতা কম, সেসব জায়গায় গোবর সার দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

কাটিং তৈরি ও রোপণ

প্রচলিত নিয়মে দানা জাতীয় বীজ হতে বাকসা বপণ করা হয় না। সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে বাকসা বপণ করা হয়। প্রথমত বাকসার মুথা বপণ করে; দ্বিতীয়ত বাকসার কান্ড থেকে কাটিং তৈরি করে। ঘাস কেটে নেয়ার পর যে মুথা বা মূল থাকে সেখান থেকে প্রতিটি মুথাই এক একটি বীজ হিসেবে রোপণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে বাকসা রোপণ করলে প্রায় প্রতিটি মুথা থেকে ঘাস হয় এবং কুশি গজায়। কান্ড থেকে বীজ বা কাটিং করলে ঘাসকে অবশ্যই পরিপক্ব হতে হবে কারণ অপরিপক্ব ঘাস হতে কাটিং তৈরি করলে কাটিং মারা যাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই পরিপক্ক কান্ড থেকে সাধারণত ২০-২৫ সে. মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কাটিং তৈরি করতে হয়। লক্ষ্য রাখা দরকার যে, একটি কাটিং এ যেন কমপক্ষে দুইটি গিঁট থাকে। প্রতি একরে প্রায় ২০০০০ কাটিং ছিটিয়ে দিতে হয়। কাটিং সারিবদ্ধভাবে অথবা সারি ছাড়া ছিটিয়েও রোপণ করা যায়। কাটিং ছিটানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রতি কাটিং এর মধ্যবর্তী দূরত্ব যাতে ১৫-২৫ সে. মি. এর মধ্যে থাকে। কাটিং ছিটানোর পর সেগুলোর একপ্রান্ত ১.০-২.৫ সে. মি. কাদার নিচে পুঁতে দিতে হয়; অথবা কাটিং ছিটানোর পর মই দিয়ে সেগুলোকে কাদাতে সামান্য পুঁতে দিতে হয়।

পরিচর্যা

বাকসা ঘাসের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়না। কাটিং বা মুথা লাগানোর ১০/১২ দিন পরই কাটিং হতে কুশি গজানো শুরু হয়। কুশি ১০-১৫ সে. মি. লম্বা হলেই সেখানে একর প্রতি ৩০ কেজি ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিতে হয়। জমিতে পানি শুকিয়ে গেলে প্রয়োজনে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। আগাছা পরিষ্কার করলে ফলন ভালো হয়।

ঘাস কাটার নিয়ম ও ফলন

সাধারণত রোপণের ৫০-৬০ দিনে বাকসা ঘাস কাটার উপযোগী হয়। এই সময় ঘাস মোটামুটি ১.৫-২.০ মিটার লম্বা হয়। তখন ঘাস কেটে এনে প্রাণীকে খাওয়ানো হয়। প্রতি কাটিং এর পর জমিতে একর প্রতি ৩০-৪০ কেজি ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিতে হয়। পৌষের প্রথম দিকে ঘাস লাগালে তার প্রথম কাটিং পাওয়া যাবে মাঘ মাসের শেষের দিকে। অতপর ২মাস পর পর অর্থাৎ চৈত্রের শেষে ২য় কাটিং এবং জ্যৈষ্ঠের শেষে অথবা আষাঢ়ের শুরুতে পাওয়া যায় ৩য় কাটিং। প্রথম কাটিং-এ একর প্রতি ৫ টন ঘাস পাওয়া যায় এবং পরবর্তী কাটিংগুলোতে একর প্রতি ৮-১০ টন হিসেবে ফলন পাওয়া যায়। এভাবে এক একর জমি হতে বছরে প্রায় ৪০-৫০ টন কাঁচা ঘাস পাওয়া যায়।

সাইলেজ তৈরি ও ঘাস সংরক্ষণ

একশ ঘনফুট একটি মাটির গর্তে ২.৫০ থেকে ৩.০০ টন বাকসা ঘাস সংরক্ষণ করা যায়। গর্তটি অবশ্যই উচু জায়গায় হতে হবে। গর্তের গভীরতা ৩ ফুট এবং প্রস্থে তলায় ৩ ফুট, মাঝে ৮ ফুট ও উপরে ১০ ফুট হবে। দৈর্ঘ্যের মাপ নির্ভর করবে ঘাসের পরিমাণের ওপর। গর্তটির তলা পাতিলের মত সমভাবে বক্র থাকলে ঘাস চাপানো সহজ হবে। সাইলো পিটের নিচে ও চারপাশে ভালোমতো খড় বিছিয়ে তার মধ্যে বাকসা ঘাস (সম্ভব হলে ছোট ছোট টুকরা করে) দিতে হবে। প্রতি পরতে ঘাস সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। এভাবে পরতে পরতে বাকসা ঘাস বিছিয়ে সুন্দর করে পাড়িয়ে ভিতরের বাতাস যথা সম্ভব বের করে দিতে হবে। যত এঁটে ঘাস সাজানো হবে তত সুন্দর সাইলেজ তৈরি হবে। এভাবে গর্ত ভর্তি করে ৪-৫ ফুট পর্যন্ত ঘাস সাজাতে হবে। অতপর খড় দ্বারা পুরু করে আস্তরণ দিয়ে সুন্দর করে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সবশেষে ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে মাটি দিতে হবে। এভাবে সম্পূর্ণ ঘাস একদিনে বা বৃষ্টি না থাকলে প্রতিদিন কিছু কিছু করেও কয়েক দিনব্যাপী সাইলেজ তৈরি করা যায়।

বীজের জন্য বাকসা ঘাসের কাটিং সংরক্ষণ

বাকসা ঘাসের শেষ কাটিং পাওয়া যাবে জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে। অতপর আষাঢ় হতে পরবর্তী ৪-৫ মাস সব ঘাস পানির নিচে থাকে। জমি হতে পানি নেমে যাওয়ার পর ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে যে জমিতে কোথাও ঘাসের ঘাটতি আছে কি না। কোথাও ঘাস নষ্ট হয়ে গেলে সেগুলো আবার পুনরোপণ করতে হয়। তাছাড়া আগাছা থাকলে তা পরিষ্কার করতে হয়। ঘাস হতে কুঁশি গজানোর সঙ্গে সঙ্গেই একর প্রতি ৩০-৪৫ কেজি ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিলেই ঘাস আবার তর তর করে বেড়ে উঠে। অতপর পূর্বের মতোই ঘাসের ব্যবস্থাপনা করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

বাকসা ঘাসের পুষ্টিমান

সবুজ অবস্থায় বাকসা ঘাসের আমিষ নেপিয়ার বা গ্রামিণী গোত্রের প্রায় সকল ঘাস অপেক্ষা অধিক। তাছাড়া এ ঘাসের আঁশের পরিমাণও কম এবং পরিপাচ্যতা ও বিপাকীয় শক্তিও বেশি। কিন্ত পাতাবিহীন ঘাস যেগুলো খামারিগণ পানি হতে তুলে স্তুপীকৃত অবস্থায় রাখেন সেগুলোর পাতা না থাকার দরুন আমিষের পরিমাণ প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কমে যায়। তাছাড়া সবুজ ঘাসের তুলনায় আঁশের পরিমাণও ৮ শতাংশ বেড়ে যায় এবং পরিপাচ্যতা ৮ শতাংশ কমে যায় (সারণি ১)।

সারণি ১ : বাকসা ঘাসের পুষ্টিমান

ঘাসের অবস্থা	শুষ্ক পদার্থ (গ্রাম/কেজি)	শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে ১ কেজি ঘাসের পুষ্টিমান (গ্রাম/কেজি অথবা যেভাবে বর্ণিত)				
		জৈব পদার্থ	আমিষ	ফাইবার	পরিপাচ্যতা	বিপাকীয় শক্তি
সবুজ ঘাস	২৫৪	৯১০	৯০	৩২০	৬৮০	৮.৮
পাতাবিহীন স্তুপীকৃত ঘাস	৩১২	৯৫৫	২৮	৪০০	৬০০	-

আয় ব্যয়

বাকসা চাষে একর প্রতি ৭,৬৪৬ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। ঘাস চাষ করে বিক্রি করা হলে একর প্রতি ১৭,৩৫৩ টাকা (সতের হাজার তিনশত তিপ্পান্ন টাকা) পর্যন্ত আয় হতে পারে। দেখা গেছে যে, ইরি ধানের তুলনায় বাকসা ঘাস চাষে ৪-৬ গুণ বেশি লাভ হতে পারে। আর যদি ঘাস চাষ করে গাভীকে খাওয়ানো হয় তাহলে একর প্রতি ঘাস চাষ করে ১১টি গাভী পালনের মাধ্যমে একজন খামারি বছরে ১১ টি বাছুর সহ অতিরিক্ত আরো ৪৩,৫৩০ টাকা আয় করে থাকে।

সারণি ২ : বাকসা ঘাস চাষের আয়-ব্যয় (টাকা/বছর)

খরচের খাত	টাকা/একর	আয়ের খাত	টাকা/একর	আয়-খরচ=লাভ
জমি তৈরি	২৩৪৩.২০	সরাসরি ঘাস বিক্রয় টাকা ৫০০০/কাটিং; ৫ কাটিং/বছর	২৫০০০	২৫০০০.০০-৭৬৪৬.৫০= ১৭৩৫৩.৫০
কাটিং তৈরি	২০০.০০			
রোপণ	১০০০.০০			
সেচ	৫৩৫.৪০			
সার	১০৬৭.৯০			
পরিচর্যা	৫০০.০০			
কর্তন	২০০০.০০			
মোট	৭৬৪৬.৫০		২৫০০০	১৭,৩৫৩.৫০
দানাদার খাদ্য টা. ৯.৯৮/ গাভী/ দিন: ১১টা গাভী	৪০০৬৯.৭০	প্রাণীকে খাওয়ানোর ক্ষেত্রে: বার্ষিক ঘাস উৎপাদন/ একর = ৫০ মে.টন/ বছর ৪.৫ মে.টন/গাভী/ বছর হিসেবে ৯টি গাভীকে খাওয়ানো যাবে; দুধ উৎপাদন ৬.০ লি. ১১ গাভী, ২৪০ দিন = ১৫৮৪০ ১৫.০০	২৩৭৬০০	২৩৭৬০০-৪০০৬৯.৭০= ১৯৭৫৩০.৩০
ব্যবস্থাপনা ব্যয়	১,৬০,৬০০.০০	গোবর উৎপাদন	৬৬০০	৬৬০০ +
		বাছুর ১১টি (২২২০০)	২৪৪২০০	২৪৪২০০
মোট	২০০৬৬৯.৭০	লাভ		৪৬৫৬৮৩.৮-২০০৬৬৯.৭০ = ২৬৫০১৪

ব্যবহারের সম্ভাবনা

বর্ষা ও শীত উভয় ঋতুতে এই প্রযুক্তিটি উপযোগী। নদ-নদী বিধৌত পলিমাটি পড়ে এরূপ অঞ্চল ও দেশের বিভিন্ন হাওড়-বাওড় এলাকায় এ ঘাস জন্মিয়ে দেশীয় সম্পদ রক্ষা করে দেশের দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

প্রযুক্তি ব্যবহারের সতর্কতা / বিশেষ পরামর্শ

উঁচু জমি যেখানে সেচের সুবিধা কম সেখানে বাকসা ভালো হয় না। জমিতে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিনের মধ্যে এবং জমি হতে পানি নেমে যাওয়ার পর থেকে প্রথম ২০ দিনের মধ্যে জমি থেকে ঘাস কাটা যাবে না এবং জমিতে গরু চরানো যাবে না।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. রফিকুল ইসলাম এবং মোঃ হাসানুজ্জামান

ভুট্টা খড়ের সংরক্ষণ ও ব্যবহার

ভূমিকা

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও ঢাকা বিভাগে প্রচুর ভুট্টা চাষ হয়। শুধুমাত্র রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগে ২২,১১০ হেক্টর জমিতে ভুট্টা চাষ করা হয়। মোট উৎপাদনের প্রায় এক চতুর্থাংশ জায়গার ভুট্টার খড়ও যদি সাইলেজ করা হয় তা থেকে মোট সাইলেজ উৎপাদন হতে পারে ৮৮,৪৪০০ টন। এই বিপুল পরিমাণ উচ্ছিষ্ট সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করে প্রাণী খাদ্যের অভাব দূরীকরণসহ প্রাণীজাত উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন খরচ বহুলাংশে কমানোর জন্য এই প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- অধিক উৎপাদনশীল। ভুট্টা দানা এবং খড় একই সংগে আহরণ করা যায়। তাছাড়া হাইব্রিড ভুট্টার খড় ভুট্টা দানা সংগ্রহ করার পরও সবুজ ও সতেজ থাকে। ফলে খড়ের পুষ্টিমানও ভাল থাকে;
- ভুট্টা রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি)) ও খরিপ (মার্চ-অক্টোবর) উভয় মৌসুমেই জন্মে। তাই ভুট্টার খড় হতে বছরে দু'বার সাইলেজ করা যায় এবং সারা বছর প্রাণীখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়; হাইব্রিড ভুট্টা হতে রবি ও খরিপ মৌসুমে প্রতি হেক্টরে দানা উৎপন্ন হয় যথাক্রমে ৬-১০ টন ও ৪-৫ টন। তাছাড়া প্রতি ঋতুতে প্রতি হেক্টরে ভুট্টার খড় উৎপন্ন হয় ২৫-৫০ টন। এই খড় সাধারণত জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি ব্যবহার করে উৎকৃষ্ট প্রাণীখাদ্য তৈরি করা যায়;
- কোনো রকম দ্রব্যাদি যোগ করা ছাড়াই ভুট্টা খড়ের সাইলেজ তৈরি করা যায় তবে মোলাসেস অথবা ইউরিয়া যোগ করে সাইলেজ তৈরি করলে সাইলেজের পুষ্টিমান বাড়ে এবং সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পায়;
- দেশের মোট ভুট্টা উৎপাদন এলাকার যথাক্রমে ৫৪ শতাংশ (১৫ লক্ষ হেক্টর) এবং ২৫ শতাংশ (৭ লক্ষ হেক্টর) এলাকা রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত/অন্তর্গত। তাই এ সমস্ত এলাকায় সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভুট্টা দানা ও খড় ব্যবহার করে ডেইরী, বিফ, লেয়ার, ব্রয়লার ও ছাগল উৎপাদন সম্ভব।

ব্যবহারের পদ্ধতি

- খামারিগণ হাইব্রিড বা প্রচলিত যে কোনো ভুট্টা যেমন বর্ণালী, মোহর, শুভ্র, প্যাসিফিক ১১, প্যাসিফিক ৬০, প্যাসিফিক ৩৯৩, বারি ৫ ইত্যাদি রবি অথবা খরিপ যে কোনো মৌসুমে চাষ করতে পারেন।

বপণ পদ্ধতি

বপণ পদ্ধতি	প্রায়োগিক দিক
ভ্যারাইটি	বর্ণালী, মোহর, শুভ্র, প্যাসিফিক ১১, প্যাসিফিক ৬০, বারী ৫ ইত্যাদি
বীজের হার	২৫-৩০ কেজি/হেক্টর
বপণের সময়	রবি মৌসুম (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী) নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ
	খরিফ মৌসুম (মার্চ-অক্টোবর) মার্চের ১ম সপ্তাহ
বীজ বপণ	লাইনে বপণ। লাইন হতে লাইনের দুরত্ব ৫০ সে.মি. এবং গাছ হতে গাছের দূরত্ব ২৫ সে.মি. এভাবে লাগাতে হবে। বীজ মাটির ২.৫ সেমি. গভীরে বপণ হবে।
সার প্রয়োগ (কেজি/হেক্টর)	ইউরিয়া: ২০০, টিএসপি: ১৫০, এমপি: ১৫০, জিঙ্ক: ১০
গোবর	৫ টন/হেক্টর
সার প্রয়োগের (কেজি/হেক্টর) সময়	ইউরিয়া : জমি তৈরির সময় : ৫০; ১ম উপরি প্রয়োগ : ১০০ (চারা গজানোর ৩০ দিন পর) ২য় উপরি প্রয়োগ: ৫০ (চারা গজানোর ৬০ দিন পর) টিএসপি : জমি তৈরির সময়: ৫০; ১ম উপরি প্রয়োগ: ১০০ (চারা গজানোর ৩০ দিন পর) এমপি : জমি তৈরির সময়: ১৫০ জিঙ্ক : জমি তৈরির সময়: ১০
সেচ প্রয়োগ	১ম সেচ: চারা গজানোর ৩০ দিন পর, ২য় সেচ: চারা গজানোর ৬০ দিন পর ৩য় সেচ: চারা গজানোর ৯০ দিন পর
নিড়ানি	১ম সেচের পর
মালচিং	নিড়ানির পর
রোগ বালাই	পাতা সাদা হয়ে যাওয়া বা কুঁকড়ে যাওয়া, মূল পচে যাওয়া ইত্যাদি হলে আক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলতে হবে।
কর্তন	দানা পুরোপুরি পরিপক্ক হলে। রবি মৌসুম (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী) : বপণের ১৪০-১৫০ দিন পর। খরিপ মৌসুম (মার্চ-অক্টোবর): বপণের ৯৫-১০২ দিন পর।

- ভুট্টা গাছ হতে পরিপক্ক ভুট্টার মোঁচা উঠানোর পর সাইলেজ করার জন্য ভুট্টা গাছ কর্তন করা হয়।
- ভুট্টা গাছ কর্তনের পর ভালভাবে সাইলেজ করার জন্য ভুট্টা গাছকে ট্রাক্টর চালিত চপার মেশিন বা দা দিয়ে ৭-১০ সেঃমিঃ সাইজে টুকরো করা হয়।
- টুকরাকৃত এ গাছকে সাইলো পিটে সংরক্ষণ করা হয়।
- একটি সাইলো পিটের আকৃতি হতে পারে এরূপ যেমন- ৩ ফুট গভীর তলদেশে ৩ ফুট প্রশস্ত, মধ্যভাগে ৮ ফুট প্রশস্ত এবং উপরিভাগে ১০ ফুট প্রশস্ত। এভাবে তৈরিকৃত ১০০ বর্গফুটের একটি সাইলো পিটে ২৫-৩০ টন ঘাস সাইলেজ হিসাবে সংরক্ষণ করা যায়

আয়-ব্যয়

প্রতি হেক্টর জমিতে ভুট্টার খড় উৎপাদন সাধারণত ২৫-৩০ টন। প্রতি হেক্টর জায়গার ভুট্টার খড় কাটা, টুকরো করা, সাইলো পিট এবং সাইলেজ তৈরি করতে শ্রমিকের প্রয়োজন হয় ২৪-৩০ জন। শ্রমিক ও সাইলেজ তৈরির পলিথিন বাবদ মোট খরচ হয় ৩৪৬০ টাকা। সুতরাং প্রতি কেজি ভুট্টা ১০ টি গাভীর ৪-৫ মাসের রাফেজ (খড় বা ঘাস) জাতীয় খাবারের পুরো চাহিদা মেটানো যায়। তাই এক হেক্টর জায়গার ভুট্টার খড় যেগুলো হয়তো অব্যবহৃতই থাকতো তা দিয়ে ৩০,০০০ টাকার অধিক গো-খাদ্য উৎপাদন করা যায়। সুতরাং ভুট্টা দানা হতে আয় ছাড়াও শুধুমাত্র ভুট্টার খড় সাইলেজ হিসেবে ব্যবহার করলে প্রতি হেক্টরে ২৬৫৪০ টাকা নীট আয় সম্ভব।

ব্যবহারের সম্ভাবনা

রবি ও খরিপ মৌসুমে বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চল বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চল ও ঢাকা বিভাগের এলাকাসমূহে প্রযুক্তিটি প্রয়োগ করে স্বল্প খরচে দুগ্ধ ও গরু মোটাতাজা করণ খামার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

প্রযুক্তি ব্যবহারের সতর্কতা

সাইলো পিট উঁচু জায়গায় করতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি জমা হতে না পারে এবং পানি গড়িয়ে চলে যেতে পারে। তাছাড়া পিটের ভেতর সাইলেজ যেন আঁটশাট অবস্থায় থাকে এবং বাতাস ও পানি প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক: ড. খান শহীদুল হক এবং ড. রফিকুল ইসলাম

কর্ণস্ট্র প্যালেট ফিড

পূর্বকথা

গোখাদ্য দু'প্রকার। (ক) রাফেজ -আঁশ জাতীয় খাদ্য (সকল প্রকার খড় ও সবুজ ঘাস) (খ) দানাদার খাদ্য (সকল প্রকার শস্যদানা, কুঁড়া, খৈল, খনিজ ইত্যাদি)। বাংলাদেশে উক্ত দু'প্রকার গোখাদ্যের পরিমাণগত ও গুনগত সমস্যা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএলআরআই) এক হিসাব মতে দেখা যায় যে, দেশে বিদ্যমান গবাদিপ্রাণীর জন্য বছরে রাফেজ শুষ্ক পদার্থ দরকার প্রায় ২৭.০ মিলিয়ন টন। বিভিন্ন উৎস্য হতে উৎপাদন হয় ৩২.৮ মিলিয়ন টন। কিন্তু, উৎপাদিত রাফেজের প্রায় ৫০% ভাগ নষ্ট ও খাদ্যভিন্ন অন্যভাবে ব্যবহার হয়। ফলে গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহারে হয় প্রায় ১৬.৪ মিলিয়ন টন। অতএব, বাৎসরিক ঘাটতি থাকে প্রয়োজনের শতকরা ৩৯.৩ ভাগ। গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত রাফেজের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগই ধানের খড়; যার পুষ্টিমান অনেক কম। অতএব, উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার রাফেজ খামারিদের নিকট সরবরাহ ও পুষ্টিগুন বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার প্রয়োজন।

দেশে বাৎসরিক দানাদার খাদ্য (প্রাণী ও মৎস্য খাদ্য) প্রয়োজন ১২.৬ মিলিয়ন টন; সরবরাহ হয় মাত্র ২.৭৬ মিলিয়ন টন; যা মোট প্রয়োজনের শতকরা ২১.৯ ভাগ। দানাদার খাদ্যে ভেজাল ব্যতিত পুষ্টিমানের তেমন সমস্যা না থাকলেও উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাছাড়া, প্রাণীর ব্যালেন্সড পুষ্টিপূরণে খণিজ পদার্থের সংমিশ্রণ অপরিহার্য্য।

- দৈনিক রশদে খণিজ পদার্থে সরবরাহের ঘাটতি থাকলে নানা প্রকার পুষ্টিরোগ যথা দুধজ্বর, কিটোসিস, উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন দক্ষতা হ্রাস ইত্যাদি সমস্যাগুলো প্রকট আকারে দেখা দেয়, এবং খামারির চিকিৎসা খরচ বেড়ে যায়। বিষয়টিকে আরো জটিল করে তুলে ভেজাল গোখাদ্য। ইদানিং খামারিগণও ভেজালের বিষয়টি নিয়ে বেশ বিব্রত। ভেজাল গোখাদ্যের রেসিডুয়াল প্রতিক্রিয়া মানুষের শরীরে নানা প্রকার রোগ সৃষ্টি করে।
- ব্যক্তি পর্যায়ে উৎপাদিত মিশ্র খাদ্য বা খাদ্য উপাদানে বালি, তুষ, কাঠের গুড়া, পোড়া মবিল ও বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থের ভেজালের কথা খামারিগণ বলে থাকেন। শিল্প কারখানায় পূর্ণাঙ্গ গোখাদ্যের বাণিজ্যিক উৎপাদন ও বাজারজাত করা প্রযুক্তি ব্যবহার হলে ভেজাল প্রতিরোধসহ খামারিদের নিকট উন্নতমানের প্রাণিখাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, পোল্ট্রিখাদ্য শিল্পের কথা বলা যায়।

কর্ণস্ট্র প্যালেট ফিড

উল্লেখিত বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্ণস্ট্র প্যালেট ফিড প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করেছে। কর্ণস্ট্র এর বাংলা হচ্ছে ভুট্টার খড় (চিত্র-১)। অর্থাৎ, ভুট্টার দানা সংগ্রহের পর যে গাছটি থাকে সেটাই কর্ণস্ট্র। ইহার সহিত অন্যান্য খাদ্য উপাদান মিশ্রণে গরুর জন্য প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টিগুন সমৃদ্ধ প্যালেট আকারে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত গোখাদ্যই হচ্ছে কণস্ট্র প্যালেট ফিড। উক্ত খাদ্যটি খাওয়ানো হলে গরুকে অন্য কোন খাদ্য সরবরাহ করার প্রয়োজন নেই। এজন্যই এটা একটি পূর্ণাংগ গোখাদ্য শিল্প প্রযুক্তি। বিএলআরআই খাদ্য প্রযুক্তিটি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে দেশজ কাঁচামাল হিসেবে কর্ণস্ট্র ব্যবহার করেছে, যার অংশ বিশেষ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার হয় অথবা চাষীদের ক্ষেতে পচে যায়। কর্ণস্ট্রর শিল্প ব্যবহার হওয়ার পর একদিকে দেশে গোখাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, ভুট্টাচাষ আরো লাভজনক হবে, স্বল্প মূল্যে ভুট্টা পাওয়া গেলে পোল্ট্রিখাদ্য মূল্যসাশ্রয়ী হবে, এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ গোখাদ্য খামারিদের নিকট সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে।

কর্ণস্ট্রর উৎপাদন ও পুষ্টিগুন

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষায় (২০১১) প্রকাশিত তথ্যানুসারে দেশে যে পরিমাণ ভুট্টা দানা উৎপাদন হয় সে হিসার মতে গত ২০১০ সালে দেশে নূন্যতম ৮.৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন কর্ণস্ট্র উৎপাদন হয়, এবং যার পরিমাণ চলতি ২০১১ বছরে অন্তত প্রায় দ্বিগুন হবে। উক্ত কর্ণস্ট্র এর প্রায় ৫৪ শতাংশ উৎপাদন হয় রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে। অতএব, কর্ণস্ট্র ব্যবহারে যে কোন গোখাদ্য প্রযুক্তি ব্যবহার টেকসই হবে। তবে, ক্ষুদ্রখামারিদের নিকট হতে কর্ণস্ট্র সংগ্রহ কিছুটা হলেও ব্যয় বহুল হবে।

টেবিল-১: প্রাণীকে ভুট্টা খড়ে উৎপাদন এবং সরবরাহ, নেপিয়ার ও ধানের খড়ের সহিত তুলনামুলক পুষ্টিমান

পুষ্টিগুণ	ভুট্টা খড় সাইলেজ	নেপিয়ারঘাস	ধানের খড়
দৈনিক খাদ্য গ্রহণ কেজি/১০০ কেজি ওজন	১.৬৭	১.৬৫	১.৬৬
শুস্ক পদার্থের পাচ্যতা %	৬১.৫	৪৮.৫	৪৫.৪
আমিষের পরিমাণ %	৭.৮০	৬.৩০	৫.১৫

কর্ণস্ট্র একটি পুষ্টিকর গোখাদ্য। ইহা নেপিয়ার বা ধানের খড়ের তুলনায় প্রাণির দেহের জন্য অধিক পুষ্টিকর (টেবিল-১)। বিএলআরআই এর এক গবেষণা হতে দেখা যায় যে, নেপিয়ার ঘাসের পাচ্যতা ক্ষেত্র ভেদে যেখানে কখনও শতকরা ৫০ ভাগের বেশী হয়না সেখানে কর্ণস্ট্র এর পচ্যতার হার ৬০.০ ভাগেরও বেশী। নেপিয়ার ঘাসের আমিষের গড় শতকরা হার ৬.৩০, কর্ণস্ট্র এর ক্ষেত্রে তা ৭.৮০ ভাগ। দু'টো খাদ্যের মধ্যে আঁশ বা আমিষের বড় ধরণের তেমন কোন পার্থক্য না থাকলেও শুস্ক পদার্থের পাচ্যতায় যে পার্থক্য আছে তার কারনে ভুট্টা খড়ের পুষ্টিমান উন্নত। আনুপাতিকভাবে ধানের খড়ের পাচ্যতা কম, এবং এর মধ্যে সিলিকন ও অক্সালেট জাতীয় অপুষ্টিকর উপাদানগুলো থাকে।

কর্ণস্ট্র প্যালেট ফিডের পুষ্টিমান

লালমনি এগ্রো লি: দুধালো গাভীর জন্য উৎপাদিত দু'টো প্যালেট খাদ্য শতাব্দি ডেইরী প্যালেট ফিড হিসেবে বাজারজাত করছে। প্যালেট ফিডগুলো ব্যবহারকারী খামারিগণ যে তথ্যাদি দিচ্ছেন, সেগুলোর ভিত্তিতে লালমনি এগ্রো লি: জানিয়েছে যে, উৎপাদিত প্যালেট ফিড খাওয়ানোর পর প্রতি গাভীতে দৈনিক দুধ উৎপাদন সর্বোচ্চ ৪.০ কেজি এবং ফ্যাটের পরিমাণ গড়ে শতকরা ০.৪০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসংগক্রমে খামারিদের জন্য বলে রাখা প্রয়োজন যে, প্রাণীর খাদ্যভ্যাস সবসময়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। যে সকল গাভী চাড়ির পানিতে ডুবানো রাফেজ বা দানাদার খাদ্য খেতে অভ্যস্থ সেগুলোকে শুকনো প্যালেট ফিড খাওয়ানোর অভ্যাস করতে ২১ সপ্তাহ সময় প্রয়োজন হতে পারে। অন্যদিকে দুধ বা মাংস উৎপাদনের উপর একটি নতুন ফিডের প্রভাব পেতেও অনেক সময় ২/৩ সপ্তাহ প্রয়োজন হয়।

ডেইরী প্যালেট-১	ডেইরী প্যালেট-২
শতকরা হারে জলীয়াংশ সর্বোচ্চ ১২.০, আমিষ-১১.৬, খনিজ-১০.২, আশ-১৬.০, ক্যালসিয়াম-১.৪৮, এবং ফসফরাস-০.৩৬ ভাগ; এবং প্রতিকেজি ফিডে মেগাজুল শক্তি-৮.৭২।	শতকরা হারে জলীয়াংশ সর্বোচ্চ ১২.০, আমিষ-১১.৬, খনিজ-১০.৩, আশ-১৫.৫, ক্যালসিয়াম-১.৩৮, এবং ফসফরাস-০.৩২ ভাগ; এবং প্রতিকেজি ফিডে মেগাজুল শক্তি-৮.৬০।

দেশের প্রাণিসম্পদ খাতে বিজ্ঞানীদের এ ধরণের উদ্যোগ এটাই প্রথম। দেশে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ভিত্তিক এধরনের গোখাদ্য শিল্পে বিনিয়োগ করার জন্য লালমনি এগ্রো লি: এর প্রতি বিএলআরআই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। সংস্থাটিকে সরকারী পর্যায়ের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা উচিত বলে আমরা মনে করি।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. খান শহীদুল হক ও ড. রফিকুল ইসলাম

বহুবর্ষজীবি উচ্চ ফলনশীল ঘাস বিএলআরআই নেপিয়ার -১

বিএলআরআই নেপিয়ার-১ (Pennisetum pur-purium)

নেপিয়ারবাজরা জাতের উন্নত এ্যাক্সেশন সিলেকশন করে বিএলআরআই নেপিয়ার-১ ঘাসটি তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস কাটা যায়। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়, তবে ফাল্গুন হতে আষাঢ় মাস উত্তম সময়। কার্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সংগে সংগে কাটিং বিছিয়ে দিলে নেপিয়ার ঘাস সহজেই উৎপন্ন করা যায়। এ সময়ে একই সাথে মিশ্র ফসল হিসেবে মাসকালাই বা খেসারীর বীজ বুনানো যেতে পারে। মাসকালাই বা খেসারী ঘাস কাটার পর মাটি কোদাল দিয়ে একটু আলগা করে সার ও পানি প্রয়োগ করলে অধিক ফলন আশা করা যায়। বাংলাদেশের প্রায় সব ধরনের মাটি এমনকি পাহাড়ী ঢাল এবং সীমিত লবনাক্ত জমিতেও এ ঘাস জন্মে। জলাবদ্ধ জমি এ ঘাসের জন্য অনুপযোগী।

বিএলআরআই নেপিয়ার-১

নেপিয়ার ঘাসের চাষ পদ্ধতি

নেপিয়ারের বিভিন্ন প্রকারের কালটিভারের (উপজাত) চাষাবাদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে যেটির উৎপাদন বেশি সেটির লাইন-টু-লাইন স্পেস একটু বেশি দিতে হবে, কারণ সেটি অনেক জায়গা ব্যাপী ছড়িয়ে পরে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার নেপিয়ারের সাধারণ চাষাবাদ প্রাণালী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হ'ল।

নেপিয়ার রোপণের সময়ঃ বছরের যে কোন সময়ই নেপিয়ার রোপণ করা যায়। তবে অঞ্চল ভেদে (বাথান এলাকায়) অক্টোবর-নভেম্বরে এবং খরিপ মৌসুম (অন্যান্য এলাকায়) মার্চ-এপ্রিল (বৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত) মাসে রোপণ করা যায়।

জমি চাষ

প্রচলিত পদ্ধতিতে উত্তমরুপে জমি চাষ দিতে হবে। জমিতে আগাছা থাকলে আগাছা সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিতে হবে। চাষ দেয়ার সময় পরিমাণ মত জৈব সার এবং রাসায়নিক সার দিতে, হবে যাতে সারগুলো মাটির সব জায়গায় ভালোভাবে মিশে যায়। চাষ দেয়ার পর মাটি ভালোভাবে

ঝুরঝুর করে মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট দূরত্বে আইল তৈরি করে নিতে হবে, যাতে দুই আইলের মাঝে একটু ড্রেনের মত হয়, যেখানে সেচ দিয়ে পানি প্রবেশ অথবা অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশিত হতে পারে। আইলের মাঝে আগাছা উঠলেও মেশিন দিয়ে অথবা লাঙ্গল দিয়ে আগাছা দূর করা সহজ হবে। তবে আইল তৈরি না করে চাষকৃত সমান জমিতেও নির্দিষ্ট দূরত্বে সারিবদ্ধভাবে নেপিয়ারের কাটিং লাগানো যেতে পারে। বন্যা পরবর্তীতে কাদামাটিতে চাষ ছাড়াই নেপিয়ারের কাটিং রোপণ করা যায়।

জমিতে সার প্রয়োগঃ জমি প্রস্তুতকালীন: প্রতি হেক্টরে জৈব/গোবর সার ২০-২৫ টন, ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি ও এমপি ৩০ কেজি। এছাড়াও কাটিং রোপণের ৩০ দিন পর টপ ড্রেসিং হিসাবে ইউরিয়া ৫০ কেজি দিতে হবে এবং প্রত্যেকবার ফসল কর্তনের পরও একই মাত্রায় ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। ৩-৪ বছর পরে আবার জৈব/গোবর সার, ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমনঃ কাটিং রোপণের ১ মাস পরে এবং প্রত্যেকবার ফসল কর্তনের পরে সার প্রয়োগের পূর্বে ভালভাবে আগাছা দমন করতে হবে।

কাটিং প্রয়োজনঃ হেক্টর (হেঃ) প্রতি ২৫-২৬ হাজার কাটিং/মোথা প্রয়োজন।

কাটিং রোপণের দূরত্বঃ এক লাইন থেকে আর এক লাইন ৭০ সে.মি (প্রায় ২ ফুট) ও এক কাটিং থেকে আর এক কাটিং এর দূরত্ব ৩৫ সে.মি. (প্রায় ১ ফুট)। তবে পাকচং এবং নেপিয়ার হাইব্রিড এর ক্ষেত্রে লাইন টু লাইন ৩ ফুট এবং কাটিং টু কাটিং দূরত্ব ১.৫ ফুট (কিংবা ২ ফুট বাই ২ ফুট) দিলে গাছ ভালভাবে ছড়াতে পারে। কাটিং ৪৫ ডিগ্রী কোণে রোপণ করতে হবে।

সেচঃ খরা মৌসুমে মাটির আর্দ্রতা বুঝে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দিতে হয়।

ফসল (ঘাস) কর্তনের সময়ঃ অঞ্চলভেদে গ্রীষ্ম কালঃ ৩৫-৪৫ দিন, শীতকালঃ ৬০-৭০ দিন (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)।

বছরে ফলন কর্তনের সংখ্যাঃ অঞ্চলভেদে ১ম বছরঃ ৪-৫ বার। পরবর্তী বছর গুলোতে ৬-৭ বার

বছরে মোট উৎপাদনঃ ১৫০-২৫০ টন/হেঃ

নেপিয়ারের বিভিন্ন প্রকারের ঘাসের উৎপাদন ও পুষ্টি গুণাগুণ

বিভিন্ন ঘাসের বয়স, পরিচর্যা, মাটির গুণাগুন ও জাতের পার্থক্যের উপর এগুলোর উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান নির্ভর করে। নীচে বিএলআরআই কর্তৃক উন্নীত নেপিয়ার ঘাসের বিভিন্ন জাতের আনুপাতিক উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান উপস্থাপন করা হল।

টেবিল ১: বিএলআরআই কর্তৃক উন্নীত বিভিন্ন জাতের নেপিয়ার ঘাসের আনুপাতিক উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান (৫০ দিন বয়সে)

	বৈশিষ্ট্যাবলী	নেপিয়ার-১
ক)	উৎপাদন ও রাসায়নিক গঠন	
	ঘাস উৎপাদন, টন (প্রতি হেক্টর প্রতি বছরে)	১২০-১৫০
	ঘাসে জলীয়াংশের পরিমাণ (কেজি/১০০ কেজি)	৭৫-৮০
	আমিষ (কেজি/১০০ কেজি)	১.১৫-১.২০
	আঁশের পরিমাণ (এডিএফ, কেজি/১০০ কেজি)	১০.২-১০.৫
খ)	খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাচ্যতা	
	প্রতি ১০০ কেজি গরুর ওজনের জন্য দৈনিক গ্রহণ (কেজি)	৮.০-৮.৫০
	ঘাসের পাচ্যতা (কেজি/১০০ কেজি)	৪৯.০-৫০.০
	পাকস্থলীতে পাচ্যতা (কেজি/১০০ কেজি)	৩৫.০-৪০.০
গ)	উৎপাদন দক্ষতা (মাংস ও দুধ উৎপাদন)	
	দানাদার না খাইয়ে দৈহিক ওজন বৃদ্ধি (গ্রাম/দিন/ষাঁড়)	২৯৬.০
	দানাদার সহ দেশী গরুতে দুধ উৎপাদন (কেজি)	৩.৫০-৪.০০

প্রযুক্তির উদ্ভাবক: ড. নাথু রাম সরকার এবং ড. রফিকুল ইসলাম

বহুবর্ষজীবি উচ্চ ফলনশীল ঘাস বিএলআরআই নেপিয়ার-২

বিএলআরআই নেপিয়ার-২ (Pennisetum pur-purium)

বিভিন্ন উৎস্য হতে প্রাপ্ত নেপিয়ার জাত সিলেকশনের মাধ্যমে বিএলআরআই নেপিয়ার-২ উদ্ভাবিত হয়েছে। উদ্ভাবিত জাতটির চাষাবাদ প্রক্রিয়া, সার প্রয়োগ এবং উৎপাদন বৈশিষ্ট্য বিএলআরআই নেপিয়ার-১ এর অনুরূপ। উক্ত জাতটির কান্ড ও পাতা অন্যান্য জাতগুলোর তুলনায় একটু শক্ত এবং ধারালো। এর পুষ্টিগুণ অন্য দুটি জাতের সমতুল্য।

বিএলআরআই নেপিয়ার-২

নেপিয়ার ঘাসের চাষ পদ্ধতি

নেপিয়ারের বিভিন্ন প্রকারের কালটিভারের (উপজাত) চাষাবাদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে যেটির উৎপাদন বেশি সেটির লাইন-টু-লাইন স্পেস একটু বেশি দিতে হবে, কারণ সেটি অনেক জায়গা ব্যাপী ছড়িয়ে পরে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার নেপিয়ারের সাধারন চাষাবাদ প্রাণালী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হ'ল।

নেপিয়ার রোপণের সময়: বছরের যে কোন সময়ই নেপিয়ার রোপণ করা যায়। তবে অঞ্চল ভেদে (বাথান এলাকায়) অক্টোবর-নভেম্বরে এবং খরিপ মৌসুম (অন্যান্য এলাকায়) মার্চ -এপ্রিল (বৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত) মাসে রোপণ করা যায়।

জমি চাষ

প্রচলিত পদ্ধতিতে উত্তমরূপে জমি চাষ দিতে হবে। জমিতে আগাছা থাকলে আগাছা সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিতে হবে। চাষ দেয়ার সময় পরিমাণ মত জৈব সার এবং রাসায়নিক সার দিতে হবে যাতে সারগুলো মাটির সব জায়গায় ভালভাবে মিশে যায়। চাষ দেয়ার পর মাটি ভালভাবে ঝুরঝুর করে মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট দূরত্বে আইল তৈরি করে নিতে হবে, যাতে দুই আইলের মাঝে একটু ড্রেনের মত হয়, যেখানে সেচ দিয়ে পানি প্রবেশ অথবা অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশিত হতে পারে। আইলের মাঝে আগাছা উঠলেও মেশিন দিয়ে অথবা লাঙ্গল দিয়ে আগাছা দূর করা সহজ হবে। তবে আইল তৈরি না করে চাষকৃত সমান জমিতেও নির্দিষ্ট দূরত্বে সারিবদ্ধভাবে নেপিয়ারের কাটিং লাগানো যেতে পারে। বন্যা পরবর্তীতে কাদামাটিতে চাষ ছাড়াই নেপিয়ারের কাটিং রোপণ করা যায়।

জমিতে সার প্রয়োগঃ জমি প্রস্তুতকালীন: প্রতি হেক্টরে জৈব/গোবর সার ২০-২৫ টন, ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি ও এমপি ৩০ কেজি। এছাড়াও কাটিং রোপণের ৩০ দিন পর টপ ড্রেসিং হিসাবে ইউরিয়া ৫০ কেজি দিতে হবে এবং প্রত্যেকবার ফসল কর্তনের পরও একই মাত্রায় ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। ৩-৪ বছর পরে আবার জৈব/গোবর সার, ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমনঃ কাটিং রোপণের ১ মাস পরে এবং প্রত্যেকবার ফসল কর্তনের পরে সার প্রয়োগের পূর্বে ভালভাবে আগাছা দমন করতে হবে।

কাটিং প্রয়োজনঃ হেক্টর (হেঃ) প্রতি ২৫-২৬ হাজার কাটিং/মোথা প্রয়োজন।

কাটিং রোপণের দূরত্বঃ এক লাইন থেকে আর এক লাইন ৭০ সে.মি (প্রায় ২ ফুট) ও এক কাটিং থেকে আর এক কাটিং এর দূরত্ব ৩৫ সে.মি. (প্রায় ১ ফুট)। তবে পাকচং এবং নেপিয়ার হাইব্রিড এর ক্ষেত্রে লাইন টু লাইন ৩ ফুট এবং কাটিং টু কাটিং দূরত্ব ১.৫ ফুট (কিংবা ২ ফুট বাই ২ ফুট) দিলে গাছ ভালভাবে ছড়াতে পারে। কাটিং ৪৫ ডিগ্রী কোণে রোপণ করতে হবে।

সেচঃ খরা মৌসুমে মাটির আর্দ্রতা বুঝে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দিতে হয়।

ফসল (ঘাস) কর্তনের সময়ঃ অঞ্চলভেদে গ্রীষ্ম কালঃ ৩৫-৪৫ দিন, শীতকালঃ ৬০-৭০ দিন (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)।

বছরে ফলন কর্তনের সংখ্যাঃ অঞ্চলভেদে ১ম বছরঃ ৪-৫ বার। পরবর্তী বছর গুলোতে ৬-৭ বার

বছরে মোট উৎপাদনঃ ১৫০-২৫০ টন/হেঃ

নেপিয়ারের বিভিন্ন প্রকারের ঘাসের উৎপাদন ও পুষ্টি গুণাগুণ

বিভিন্ন ঘাসের বয়স, পরিচর্যা, মাটির গুণাগুন ও জাতের পার্থক্যের উপর এগুলোর উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান নির্ভর করে। নীচে বিএলআরআই কর্তৃক উন্নীত নেপিয়ার ঘাসের বিভিন্ন জাতের আনুপাতিক উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান উপস্থাপন করা হল।

টেবিল ১ঃ বিএলআরআই কর্তৃক উন্নীত বিভিন্ন জাতের নেপিয়ার ঘাসের আনুপাতিক উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান (৫০ দিন বয়সে)

বৈশিষ্ট্যাবলী		নেপিয়ার-২
ক)	**উৎপাদন ও রাসায়নিক গঠন**	
	ঘাস উৎপাদন, টন (প্রতি হেক্টর প্রতি বছরে)	১২০-১৬০
	ঘাসে জলীয়াংশের পরিমাণ (কেজি/১০০ কেজি)	৭৫-৮০
	আমিষ (কেজি/১০০ কেজি)	১.২০-১.২৫
	আঁশের পরিমাণ (এডিএফ, কেজি/১০০ কেজি)	৯.৫-১০.৫
খ)	**খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাচ্যতা**	
	প্রতি ১০০ কেজি গরুর ওজনের জন্য দৈনিক গ্রহণ (কেজি)	৬.০-৭.০
	ঘাসের পাচ্যতা (কেজি/১০০ কেজি)	৩৮.০-৪০.০
	পাকস্থলীতে পাচ্যতা (কেজি/১০০ কেজি)	২০.০-২৫.০
গ)	**উৎপাদন দক্ষতা (মাংস ও দুধ উৎপাদন)**	
	দানাদার না খাইয়ে দৈহিক ওজন বৃদ্ধি (গ্রাম/দিন/ষাঁড়)	১৪০.০
	দানাদার সহ দেশী গরুতে দুধ উৎপাদন (কেজি)	২.৫০-৩.০০

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. নাথু রাম সরকার এবং ড. রফিকুল ইসলাম

বহুবর্ষজীবী উচ্চ ফলনশীল ঘাস বিএলআরআই নেপিয়ার -৩

বিএলআরআই নেপিয়ার-৩ (Pennisetum pur-purium)

বিভিন্ন উৎস্য হতে প্রাপ্ত নেপিয়ার জাতের উন্নত এ্যাক্সেশনসমূহ সিলেকশনের মাধ্যমে বিএলআরআই নেপিয়ার-৩ উদ্ভাবিত হয়েছে। উদ্ভাবিত জাতটির চাষাবাদ প্রক্রিয়া, সার প্রয়োগ এবং উৎপাদন বৈশিষ্ট্য বিএলআরআই নেপিয়ার-১ এবং বিএলআরআই নেপিয়ার-২ এর অনুরূপ। কান্ডের তুলনায় অধিক পাতা উৎপাদন উক্ত জাতটির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর পুষ্টিগুণ অন্য দুটি জাতের সমতুল্য। যে কোন ঘাসের উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান বিভিন্ন কারণে পরিবর্তন হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হচ্ছে- ঘাসের বয়স, পরিচর্যা, মাটির গুণাগুন ও জাতের পার্থক্য।

বিএলআরআই নেপিয়ার-৩

নেপিয়ার ঘাসের চাষ পদ্ধতি

নেপিয়ারের বিভিন্ন প্রকারের কালটিভারের (উপজাত) চাষাবাদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে যেটির উৎপাদন বেশি সেটির লাইন-টু-লাইন স্পেস একটু বেশি দিতে হবে, কারণ সেটি অনেক জায়গাব্যাপী ছড়িয়ে পরে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার নেপিয়ারের সাধারণ চাষাবাদ প্রাণালী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো।

নেপিয়ার রোপণের সময়ঃ বছরের যে কোন সময়ই নেপিয়ার রোপণ করা যায়। তবে অঞ্চল ভেদে (বাথান এলাকায়) অক্টোবর-নভেম্বরে এবং খরিপ মৌসুম (অন্যান্য এলাকায়) মার্চ-এপ্রিল (বৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত) মাসে রোপণ করা যায়।

জমি চাষ

প্রচলিত পদ্ধতিতে উত্তমরূপে জমি চাষ দিতে হবে। জমিতে আগাছা থাকলে আগাছা সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিতে হবে। চাষ দেয়ার সময় পরিমাণ মত জৈব সার এবং রাসায়নিক সার দিতে, হবে যাতে সারগুলো মাটির সব জায়গায় ভালভাবে মিশে যায়। চাষ দেয়ার পর মাটি ভালভাবে ঝুরঝুর করে মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট দূরত্বে আইল তৈরি করে নিতে হবে, যাতে দুই আইলের মাঝে একটু ড্রেনের

মত হয়, যেখানে সেচ দিয়ে পানি প্রবেশ অথবা অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশিত হতে পারে। আইলের মাঝে আগাছা উঠলেও মেশিন দিয়ে অথবা লাঙ্গল দিয়ে আগাছা দূর করা সহজ হবে। তবে আইল তৈরি না করে চাষকৃত সমান জমিতেও নির্দিষ্ট দূরত্বে সারিবদ্ধভাবে নেপিয়ারের কাটিং লাগানো যেতে পারে। বন্যা পরবর্তীতে কাদামাটিতে চাষ ছাড়াই নেপিয়ারের কাটিং রোপণ করা যায়।

জমিতে সার প্রয়োগঃ জমি প্রস্তুতকালীন: প্রতি হেক্টরে জৈব/গোবর সার ২০-২৫ টন, ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি ও এমপি ৩০ কেজি। এছাড়াও কাটিং রোপণের ৩০ দিন পর টপ ড্রেসিং হিসাবে ইউরিয়া ৫০ কেজি দিতে হবে এবং প্রত্যেকবার ফসল কর্তনের পরও একই মাত্রায় ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। ৩-৪ বছর পরে আবার জৈব/গোবর সার, ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমনঃ কাটিং রোপণের ১ মাস পরে এবং প্রত্যেকবার ফসল কর্তনের পরে সার প্রয়োগের পূর্বে ভালোভাবে আগাছা দমন করতে হবে।

কাটিং প্রয়োজনঃ হেক্টর (হেঃ) প্রতি ২৫-২৬ হাজার কাটিং/মোথা প্রয়োজন।

কাটিং রোপণের দূরত্বঃ এক লাইন থেকে আর এক লাইন ৭০ সে.মি (প্রায় ২ ফুট) ও এক কাটিং থেকে আর এক কাটিং এর দূরত্ব ৩৫ সে.মি. (প্রায় ১ ফুট)। তবে পাকচং এবং নেপিয়ার হাইব্রিড এর ক্ষেত্রে লাইন টু লাইন ৩ ফুট এবং কাটিং টু কাটিং দূরত্ব ১.৫ ফুট (কিংবা ২ ফুট বাই ২ ফুট) দিলে গাছ ভালোভাবে ছড়াতে পারে। কাটিং ৪৫ ডিগ্রী কোণে রোপণ করতে হবে।

সেচঃ খরা মৌসুমে মাটির আর্দ্রতা বুঝে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দিতে হয়।

ফসল (ঘাস) কর্তনের সময়ঃ অঞ্চলভেদে গ্রীষ্ম কালঃ ৩৫-৪৫ দিন, শীতকালঃ ৬০-৭০ দিন (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)।

বছরে ফলন কর্তনের সংখ্যাঃ অঞ্চলভেদে ১ম বছরঃ ৪-৫ বার। পরবর্তী বছর গুলোতে ৬-৭ বার

বছরে মোট উৎপাদনঃ ১৫০-২৫০ টন/হেঃ

নেপিয়ারের বিভিন্ন প্রকারের ঘাসের উৎপাদন ও পুষ্টি গুণাগুণ

বিভিন্ন ঘাসের বয়স, পরিচর্যা, মাটির গুণাগুণ ও জাতের পার্থক্যের উপর এগুলোর উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান নির্ভর করে। নীচে বিএলআরআই কর্তৃক উন্নীত নেপিয়ার ঘাসের বিভিন্ন জাতের আনুপাতিক উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান উপস্থাপন করা হল।

টেবিল ১ঃ বিএলআরআই কর্তৃক উন্নীত বিভিন্ন জাতের নেপিয়ার ঘাসের আনুপাতিক উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান (৫০ দিন বয়সে)

বৈশিষ্ট্যাবলী		নেপিয়ার-৩
ক)	উৎপাদন ও রাসায়নিক গঠন	
	ঘাস উৎপাদন, টন (প্রতি হেক্টর প্রতি বছরে)	১২০-১৬০
	ঘাসে জলীয়াংশের পরিমাণ (কেজি/১০০ কেজি)	৭৫-৮০
	আমিষ (কেজি/১০০ কেজি)	১.৮০-২.০
	আঁশের পরিমাণ (এডিএফ, কেজি/১০০ কেজি)	৯.৫-১০.৫
খ)	খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাচ্যতা	
	প্রতি ১০০ কেজি গরুর ওজনের জন্য দৈনিক গ্রহণ (কেজি)	৭.০-৮.০
	ঘাসের পাচ্যতা (কেজি/১০০ কেজি)	৪৫.০-৫০.০
	পাকস্থলীতে পাচ্যতা (কেজি/১০০ কেজি)	৩০.০-৩২.০
গ)	উৎপাদন দক্ষতা (মাংস ও দুধ উৎপাদন)	
	দানাদার না খাইয়ে দৈহিক ওজন বৃদ্ধি (গ্রাম/দিন/ষাঁড়)	১৭২.০
	দানাদারসহ দেশী গরুতে দুধ উৎপাদন (কেজি)	৩.৫০-৪.০০

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. নাথু রাম সরকার এবং ড. রফিকুল ইসলাম

বহুবর্ষজীবী উচ্চ ফলনশীল ঘাস বিএলআরআই নেপিয়ার - ৪

পটভূমি

লাভজনক গবাদিপ্রাণীর খামারের জন্য ঘাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পূর্বে আমাদের দেশে যে প্রাকৃতিক চারণভূমি ছিল সেখানে চরে বেড়িয়ে গবাদিপ্রাণী তার প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের চাহিদা মেটাত। বর্তমানে সে সুযোগ অত্যন্ত সীমিত, তাই গাভীর তথা ছাগল প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের চাহিদা মেটাতে খামারিদের অবশ্যই গবাদি প্রাণী থেকে আশানুরূপ উৎপাদন পেতে উচ্চফলনশীল ঘাসের আবাদ করতে হবে। বাংলাদেশে ঘাসের প্রাপ্যতা এলাকা ও ঋতুভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। নীচু এলাকায় বর্ষা মৌসুমে সবুজ ঘাসের প্রাপ্যতা বেশী। তবে কোথাও সারা বছর ঘাসের প্রাপ্যতা একই রকম হয় না। অথচ লাভজনক দুধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য সারা বছর ঘাস সরবরাহ প্রয়োজন। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন ফডার জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উপর গবেষণা কাজ করে আসছে। যে সকল সংস্থা থেকে প্রাথমিক ভাবে ফডার জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয় তন্মধ্যে International Livestock Research Institute (ILRI) এবং Center for Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) এর নাম উল্লেখযোগ্য। তৎপরবর্তীকালে কয়েক দফায় নেপিয়ার ঘাসের কয়েকটি জাত সংগ্রহ, আঞ্চলিক আবহাওয়ায় চাষ, বাছাই ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় নেপিয়ার জার্মপ্লাজমগুলোকে ধীরে ধীরে উৎপাদন, এবং বছর বছর Accession নির্বাচন, এবং বাছাই ও উন্নয়ন কাজের আলোকে বিএলআরআই থেকে তিনটি উন্নত জাতের নেপিয়ার ঘাসের উন্নয়ন করা হয়। সেগুলো হচ্ছে, বিএলআরআই নেপিয়ার-১ (নেপিয়ারবাজরা), বিএলআরআই নেপিয়ার-২ (নেপিয়ার এ্যারোসা), বিএলআরআই নেপিয়ার-৩ (হাইব্রিড নেপিয়ার), বিএলআরআই নেপিয়ার-৪ সহ মোট ১২ ভ্যারাইটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিএলআরআই নেপিয়ার-৪

বিএলআরআই নেপিয়ার-৪ জাতের পুষ্টি ও উৎপাদন তথ্যাদি

বিভিন্ন ঘাসের বয়স, পরিচর্যা, মাটির গুণাগুণ ও জাতের পার্থক্যের উপর এগুলোর উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান নির্ভর করে। নীচে বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত নেপিয়ার-৪ জাতের ঘাসের আনুপাতিক উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান উপস্থাপন করা হল।

বিএলআরআই নেপিয়ার-৪ জাতের ঘাস উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান

বৈশিষ্ট্যাবলী		বিএলআরআই নেপিয়ার-৪
ক	রাসায়নিক গঠন	
	ঘাস উৎপাদন, টন (প্রতি হেক্টর প্রতি বছরে)	২২০-২৫০
	ঘাসের জলীয়াংশের পরিমাণ (কেজি/১০০ কেজি)	৭৫-৮০
	আমিষ/প্রোটিন (কেজি /১০০ কেজি)	১.১৫-১.২০
	আশের পরিমাণ (এডিএফ, কেজি /১০০ কেজি)	
খ	পুষ্টিমান	
	প্রতি ১০০ কেজি গরুর ওজনের জন্য দৈনিক গ্রহণ (কেজি)	৮.০-৮.৫০
	ঘাসের পরিপাচ্যতা (কেজি /১০০ কেজি)	৪৯.০-৫০.০
	পাকস্থলীতে পরিপাচ্যতা (কেজি /১০০ কেজি)	৩৫.০-৪০.০
গ	উৎপাদন দক্ষতা	
	দানাদার না খাইয়ে দৈহিক ওজন বৃদ্ধি (গ্রাম/দিন/ষাঁড়)	২৯৬.০
	দানাদার সহ দেশী গরুতে দুধ উৎপাদন	৩.৫০-৪.০০

বিএলআরআই নেপিয়ার-৪

নেপিয়ার জাতের উন্নত এ্যাক্সেশন সিলেকশন করে বিএলআরআই নেপিয়ার-৪ ঘাসটি তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস কাটা যায়। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়, তবে ফাল্গুন হতে আষাঢ় মাস উত্তম। কার্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সংগে সংগে কাটিং বিছিয়ে দিলে নেপিয়ার ঘাস সহজেই উৎপন্ন করা যায়। এ সময়ে একই সাথে মিশ্র ফসল হিসেবে মাসকালাই বা খেসারীর বীজ বুনানো যেতে পারে। মাসকালাই বা খেসারী ঘাস কাটার পর মাটি কোদাল দিয়ে একটু আলগা করে সার ও পানি প্রয়োগ করলে অধিক ফলন আশা করা যায়। বাংলাদেশের প্রায় সব ধরনের মাটি এমনকি পাহাড়ী ঢাল এবং সীমিত লবনাক্ত জমিতেও এ ঘাস জন্মে। জলবদ্ধ জমি এ ঘাসের জন্য অনুপযোগী।

চাষ পদ্ধতি

রোপণ পদ্ধতি রোপণ	প্রয়োগিক দিক
ঘাসের জাত	বিএলআরআই নেপিয়ার-৪
চাষ পদ্ধতি	প্রচলিত পদ্ধতিতে জমি চাষ দিতে হবে। বন্যা পরবর্তীতে কাদামাটিতেও চাষ ছাড়াই রোপণ করা যায়।
মুথা/কাটিং	২৫-২৬ হাজার হেক্টর
বপণের সময়	অঞ্চল ভেদে (বাথান এলাকায়) অক্টোবর-নভেম্বর খরা মৌসুম (অনান্য এলাকায়) মার্চ-এপ্রিল (বৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত)
মুথা/কাটিং রোপণ	লাইনে রোপণ। এক লাইন হতে লাইনের দূরত্ব ৫০ সে.মি. এবং কাটিং হতে কাটিং এর দূরত্ব ২৫ সে.মি.। কাটিং ৪৫ ডিগ্রী কোণে রোপণ করতে হবে।
সার প্রয়োগ (কেজি/হেক্টর) সময়	জমি প্রস্তুতকালীন সময়ে ইউরিয়া-৫০, টিএসপি-৭০, এমপি-৩০।
গোবর	৬-৭ টন/হেক্টর
পরবর্তী সার প্রয়োগের (কেজি/হেক্টর) সময়	ইউরিয়া কাটিং রোপণের ১ মাস পর - ৫০ কেজি ১ম কাটিং এর পর - ৫০ কেজি উপরি প্রয়োগ।
সেচ প্রয়োগ	খড়া মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
নিড়ানী	রোপণের ১ মাসের মধ্যে
ঘাস কাটার সময়	অঞ্চলভেদে গ্রীষ্ম কালঃ ৩৫-৪০ দিন, শীতকালঃ ৪০-৫০ দিন (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
কাটিং সংখ্যা/বৎসর	অঞ্চলভেদে ১ম বছরঃ ৪-৫ বার; পরবর্তী বছরগুলোতে ৬-৭ বার
ঘাস উৎপাদন	২২০-২৫০ টন/হেক্টর

খাওয়ানোর নিয়ম

ঘাস কাটার পর টুকরো টুকরো করে গবাদি প্রাণীকে খাওয়ানো যায়। এছাড়া ২-৩ ইঞ্চি করে কেটে খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। নেপিয়ার ঘাস শুকিয়ে সংরক্ষণ করলে পুষ্টিমান কমে যায়। সাইলেজ (কাঁচা ঘাস প্রক্রিয়াজাতকরণ) আকারে সংরক্ষণ করা হলে পুষ্টিমান অটুট থাকে।

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তিটির আর্থ-সামাজিক উপযোগিতা

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রাণী খাদ্যর অপ্রতুলতা একটি প্রধান সমস্যা। আমাদের দেশে প্রাণিসম্পদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত দ্রব্যের মধ্যে শস্য উপজাতই প্রধান। শস্য উপজাত হিসেবে আমরা প্রধান ফসল যেমন- ধানের খড়, ভুট্টার খড়, ডালের ভুসি প্রভৃতিকে পেয়ে থাকি এবং এগুলো গবাদি প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ সমস্ত উপজাতের খাদ্যমান খুবই কম, যা গবাদিপ্রাণীর দৈহিক ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট নয়। এমতাবস্থায়, প্রাণিসম্পদ থেকে দুধ, মাংস উৎপাদনের জন্য কাঁচা ঘাসের কোন বিকল্প নাই। প্রাপ্য তথ্য ও উপাত্ত অনুসারে দেখা যায় যে, আমাদের দেশের গবাদিপ্রাণীর জন্য কাঁচা ঘাসের প্রাপ্যতা মাত্র ১.৫ কেজির মত; যা বিভিন্ন উৎস থেকে যেমন- রাস্তার পার, অনাবাদি জমি, বাড়ীর আশপাশ, বাঁধ প্রভৃতি থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। উপরোক্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে আমাদের দেশে প্রাণী খাদ্য বিশেষ করে কাঁচা ঘাসের ব্যাপক অভাব রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে বাংলাদেশের যে সকল অঞ্চলে গবাদি প্রাণীর আধিক্য বিদ্যমান সে সকল এলাকার খামারিবৃন্দ লাভজনক ফসল হিসেবে ঘাস চাষ করে প্রতি বিঘা জমি থেকে প্রতি বছর ১৮,০০০.০০ (আঠারো হাজার) টাকা থেকে ২০,০০০.০০ (বিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত আয় করতে সক্ষম হচ্ছে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. নাথু রাম সরকার, ড. নাসরিন সুলতানা এবং ড.বিপ্লব কুমার রায়

সবজি বর্জ্য থেকে প্রাণিখাদ্য উৎপাদন প্রযুক্তি

ভূমিকা

লাভজনক প্রাণী খামার পরিচালনার জন্য প্রয়োজন খামারে সাশ্রয়ী মূল্যে প্রয়োজনীয় প্রাণিখাদ্য সরবরাহ। কিন্তু বাংলাদেশে চাহিদার তুলনায় বার্ষিক প্রায় ৫৬% প্রাণিখাদ্যের ঘাটতি রয়েছে। আবার এদেশে আবাদি জমিরও ঘাটতি রয়েছে (০.০৪৮ হেক্টর/ব্যক্তি), যা প্রতি বছর শহরায়ণ ও বিভিন্ন অকৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য ১% হারে কমছে। অন্যদিকে, গৃহস্থলিতে ও পাইকারি সবজি বাজারে উন্নত প্রাণিখাদ্য পুষ্টিমান সম্পন্ন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সবজি বর্জ্য অপচয় হয়। এই বর্জ্য পচে, জীবাণু ছড়ায়, পচন রস নিঃসৃত করে এবং গ্রীনহউস গাস নির্গত করে পরিবেশ দূষণ করে। বিশ্বে খাদ্য ও সবজি বর্জ্য থেকে এভাবে নির্গত গ্রীনহউস গ্যাসের পরিমাণ মানব সৃষ্ট মোট গ্রীনহউস গ্যাসের প্রায় ১১%, যার পরিমাণ প্রায় ৭৯৯ মিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড সমতুল্য। এই সবজি বর্জ্যকে প্রাণিখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারলে এর ফলে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ কিছুটা রোধ করা সম্ভব হবে। অধিকন্তু, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) লক্ষ্য অর্জনের জন্য খাদ্যশস্য ও সবজি অপচয় কমানো অথবা তাদের বিকল্প ব্যবহার নিশ্চিত করা **গুরুত্বপূর্ণঃ** এসডিজি - ২ (একটি ক্ষুধা মুক্ত পৃথিবী) এবং এসডিজি - ১২ (জবাবদিহিতামূলক ভোগ ও উৎপাদন)। উল্লেখিত বিষয়াদি বিবেচনা করে আমাদের দেশের সবজি বর্জ্যের গুণগতমান পরীক্ষা করে প্রাণিখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করার প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে যা নিম্নে বর্ণিত হলঃ

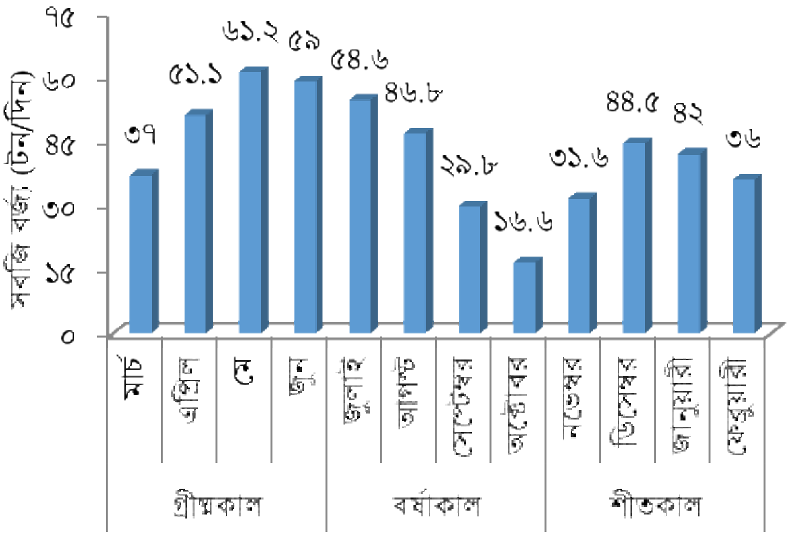

চিত্র-১: কাওরান বাজারে সবজি বর্জ্য উৎপাদন (২০১৬)

সবজি বর্জ্যের পরিমাণ

বিশ্বে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন হয় তার প্রায় এক তৃতীয়াংশ অপচয় হয়, যার পরিমাণ প্রায় ১.৬ বিলিয়ন টন। উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে বাৎসরিক মাথাপিছু এই অপচয়ের পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ৯৫-১১৫ এবং ৬-১১ কেজি। আমাদের দেশেও গৃহস্থলিতে ও সবজি বাজারে প্রচুর সবজি বর্জ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশে শহরাঞ্চলের গৃহস্থলিগুলোতে উৎপন্ন এরূপ বর্জ্যের পরিমাণ প্রায় ৩.৩ মিলিয়ন টন। গড়ে প্রতি গৃহস্থলিতে উৎপন্ন সবজি বর্জ্যের এই পরিমাণ প্রায় ১.৫ কেজি। অনুন্নত ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণের ফলে সবজি বাজারেও প্রচুর সবজি বর্জ্য উৎপন্ন হয়। উদাহরণ স্বরূপ, কাওরান বাজারে সারা বছরব্যাপী দৈনিক গড়ে প্রায় ৪২.৫ টন সবজি বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যা বাজারে দৈনিক সবজি সরবরাহের ০.৯%। এভাবে কাওরান বাজারে বছরে যে পরিমাণ সবজি অপচয় হয় (প্রায় ১৫,৫১২ টন) তার সমপরিমাণ নেপিয়ার, ভুট্টা অথবা জার্মান ঘাস উৎপাদন করতে যথাক্রমে প্রায় ৬২, ৭৫ অথবা ৭৯ হেক্টর আবাদি জমি প্রয়োজন। কাওরান বাজারে বছরে বিভিন্ন মৌসুমে উৎপন্ন দৈনিক সবজি বর্জ্যের পরিমাণ চিত্র - ১ এ দেখানো হয়েছে।

সবজি বর্জ্যের প্রাণিখাদ্য পুষ্টিমান

বিভিন্ন মৌসুমে প্রাপ্ত বিভিন্ন সবজি বর্জ্যর নমুনা গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এগুলোতে শুষ্ক পদার্থেরভিত্তেতে ক্রুড প্রোটিন ও টিডিএন এর পরিমাণ যথাক্রমে ৯-২২% ও ৫৮-৮১%। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই সবজি বর্জ্যগুলো হেভি মেটাল, মাইকোটক্সিন ও পেস্টিসাইড মুক্ত। বাজারে প্রাপ্ত বিভিন্ন বর্জ্যের প্রাণিখাদ্য পুষ্টিমান টেবিল - ১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

টেবিল ১: বিভিন্ন সবজি বর্জ্যের প্রাণিখাদ্য পুষ্টিমান

সবজি বর্জ্য	শুষ্ক পদার্থ (% ফ্রেশ)	সবজি বর্জ্যের প্রাণিখাদ্য পুষ্টিমান (% শুষ্ক পদার্থ)				
		অরগানিক মেটার	ক্রুড প্রোটিন	এনডিএফ	এডিএফ	টিডিএন
সিম	৯.৩°০.২	৯২.০°০.৩	২২.৩°৪.১	৪৫.১°১৭.৪	৩৫.৮°৫.৬	৬২.৯°৩.৯
করলা	৬.০°১.৪	৮৭.৬°৫.৩	১৮.৮°১.৭	৫৪.১°৫.৫	৪১.১°৬.৫	৫৮.৯°৪.২
কালো বেগুন	৭.৯°১.৪	৯০.৬°৩.৪	১৭.২°০.৯	৪৭.২°৮.০	৪২.১°৪.৮	৫৮.৪°৩.৪
পাতাকপি	৯.৯°২.৮	৮৬.৪°২.২	১৭.৩°০.৭	৩৩.৭°১৫.৫	২০.৯°১.৬	৭৩.২°১.১
শসা	৪.০°০.৮	৯০.১°২.৫	২০.১°১.৩	৪২.৭°৩.৭	৩৭.৫°৩.৮	৬১.৬°২.৬
ফুলকপি	১০.৪°৩.৬	৮৪.৬°৩.৯	২৭.০°১.০	৫৮.৪°০.৪	৩০.৪°৬.৩	৬৬.৬°৪.৪
গোল আলু	১৭.২°৩.২	৯০.৮°৬.৪	১০.৬°০.৫	৩৫.১°৮.৭	১০.০°০.৮	৮১.১°০.৯
চিচিঙ্গা	৪.৩°১.০	৯৫.১°১.১	১৮.৪°০.৯	৪৮.০°৬.৮	৩৭.৭°৪.৬	৬১.৪°৩.২
করলা	৭.৭°২.০	৯৪.৭°১.৬	১৯.৪°১.২	৬১.৩°১.৮	৩৫.৯°৯.৭	৬২.৬°৬.৩
মিষ্টি কুমরা	৫.৪°২.৩	৯৩.২°২.৬	৯.৪°১.২	৪৩.১°৯.২	৩১.২°৮.১	৬৬.০°৫.৬
টমেটো	৫.২°০.৪	৯১.৪°১.২	২০.০°১.১	৫০.৩°৩.০	৩৬.৯°৩.০	৬২.০°২.১

এনডিএফ (নিউট্রাল ডিটারজেন্ট ফাইবার); এডিএফ (এসিড ডিটারজেন্ট ফাইবার) ; টিডিএন (টোটাল ডাইজেস্টেবল নিউট্রিয়েন্ট)।

সবজি বর্জ্য থেকে প্রাণিখাদ্য তৈরি করা

সবজি বর্জ্যকে প্রাণিখাদ্যে রূপান্তর করে সংরক্ষণ করে খামারের প্রাণিকে খাওয়ানো যায়। সবজি বর্জ্যকে প্রাণিখদ্যে রূপান্তরের প্রধান অন্তরায় হল এর উচ্চ আর্দ্রতার পরিমাণ (৯২.১%; ৪-১৭%)। বিভিন্ন রকম আর্দ্রতা শোষক খাদ্যোপাদান যোগ করে আর্দ্রতার পরিমাণ নির্দিষ্ট মাত্রায় কমিয়ে সবজি বর্জ্যকে দানাদার ম্যাস, পিলেট, হে এবং সাইলেজ করে রেখে প্রাণিকে খাওয়ানো যেতে পারে।

ক) সবজি বর্জ্য থেকে দানাদার ম্যাস তৈরি করার পদ্ধতি

নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়ায় সবজি বর্জ্য থেকে দানাদার ম্যাস তৈরি করা হয়ঃ

- দানাদার ম্যাস তৈরি করে প্রাণিখাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য সবজি বর্জ্য যেমন করলা, পটল, কালো বেগুন, মিষ্টি কুমড়া, গোল আলু, টমেটো, ঢেঁরস বা ভেন্ডি, এবং চিচিঙ্গা ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়।
- সংগৃহীত সবজি বর্জ্য পরিস্কার পানি দিয়ে ধোয়া হয়। তারপর এগুলোর ওজনের ২০% ও ২% অনুসারে কুড়া ও খাদ্য লবণসহ একসাথে মিশিয়ে মেশিনে ব্লেন্ডিং করা হয়।
- এই সবজি বর্জ্য মিশ্রণকে রোদে শুকানো হয় যেন আদ্রতার পরিমাণ ১২% এর নিচে থাকে। শুকানোর পর গ্রাইন্ডিং করে ম্যাস করা হয়। রোদে শুকনোর পরিবর্তে বৈদ্যুতিক ড্রাইয়ার ব্যবহার করলে আরে ভাল হয়।

উপরোল্লেখিতভাবে তৈরি করা দানাদার ম্যাসের প্রাণিখাদ্য পুষ্টিমান গমের ভুসির সমতুল্য যা টেবিল-২ এ দেখানো হয়েছে। সবজি বর্জ্য থেকে দানাদার ম্যাস তৈরির প্রক্রিয়া চিত্র-২ এ বর্ণনা করা হয়েছে। ব্লেন্ডিং ও গ্রাইন্ডিং মেশিন চিত্র - ৩ এ দেখানো হয়েছে।

খ) সবজি বর্জ্য থেকে পিলেট তৈরি করার পদ্ধতি

নিম্নেবর্ণিত প্রক্রিয়ায় সবজি বর্জ্যকে পিলেট করে সংরক্ষণ করে গবাদিপ্রাণিকে খাওয়ানো যায়ঃ

চিত্র ২: সবজি বর্জ্য থেকে দানাদার ম্যাস ও পিলেট তৈরি

- পিলেট তৈরির জন্য সবজি বর্জ্যকে প্রথমে স্ক্রুপ্রেস গ্রেডিং ও ডিওয়াটারিং মেশিন (চিত্র-৪) দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয়।
- তারপর এর সাথে প্রয়োজন মতো অন্যান্য খাদ্যোপাদান যোগ করে (রেশনের প্রকার অনুসারে) ভালোভাবে মিশানো হয়।
- এই মিশ্রণটি পিলেটিং মেশিনের মাধ্যমে পিলেট করে শুকিয়ে রাখা হয়।

সবজি বর্জ্য থেকে তৈরি পিলেট খাদ্যের প্রাণিখাদ্য পুষ্টিমান এবং এতে ব্যবহৃত বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের শতকরা হার যথাক্রমে টেবিল - ২ ও টেবিল - ৩ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। সবজি বর্জ্য থেকে পিলেট তৈরির প্রক্রিয়া চিত্র - ২ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

চিত্র ৩: ব্লেন্ডি ও গ্রাইন্ডিং মেশিন

গ) সবজি বর্জ্য থেকে সাইলেজ ও হে তৈরি করার পদ্ধতি

নিম্নেবর্ণিত প্রক্রিয়ায় সবজি বর্জ্য থেকে সাইলেজ ও হে তৈরি করে সংরক্ষণ করে গবাদি প্রাণিকে খাওয়ানো যায়ঃ

- প্রথমে সবজি বর্জ্য থেকে বিভিন্ন অ-সবজি আবর্জনা যেমন প্লাস্টিক, দড়ি, পলিথিন, কাগজ ও অন্যান্য বেছে পরিস্কার করতে হবে। তারপর পরিস্কার পানি দিয়ে ধোয়া হবে।
- এই পরিস্কার সবজি বর্জ্য বৈদ্যুতিক স্ক্রুপ্রেস গ্রেডিং ও ডিওয়াটারিং মেশিনে প্রক্রিয়াজাত করা হয় (চিত্র - ৪)। এর ফলে সবজি বর্জ্য ভেঙ্গে চূর্ণ হয়, ভালোভাবে মিশ্রিত হয়, এবং পানি বের হওয়ার ফলে (১৫.৬° ৩.৪%) শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায় (গড়ে ২৪.৪%)।
- এভাবে প্রক্রিয়াজাত সবজি বর্জ্য রোদে শুঁকিয়ে হে তৈরি করা যায় যার শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ গড়ে ৮৮-৯২%। বৈদ্যুতিক ড্রাইয়ার ব্যবহার করলে আরে ভাল হয়।

চিত্র ৪: স্ক্রুপ্রেস গ্রেডিং ও ডিওয়াটারিং মেশিন

- সাইলেজ তৈরি করার জন্য প্রক্রিয়াজাত সবজি বর্জ্য, ২-৩ সেমি করে কুঁচিকুচি করে কাটা ধানের খড় ও মোলাসেস ৮৫ঃ১০ঃ৫ অনুপাতে যোগ করে ভালোভাবে মিশানো হয়।
- প্রথমে সবজি বর্জ্য ওজন করে নিতে হয় এবং পরিস্কার মেঝেতে সমান ভাবে ছড়াতে হয়। তারপর হিসাব অনুসারে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খড় ও মোলাসেস পর্যায়ক্রমে যোগ করে দুহাত দিয়ে ভালোভাবে মিশানো হয়।
- মিশ্রিত সবজি বর্জ্য প্লাস্টিক ড্রামের (৬০ - ৭০ কেজি) ভিতর পলিথিন ব্যাগ ঢুকিয়ে তার ভিতর ভর্তি করা হয়। ড্রাম ভর্তি করার সময় একটু পর পর হাত দিয়ে চাপ দিতে হয় যেন বাতাস বের হয়ে যায়। ড্রাম ভর্তি হয়ে গেলে পলিথিন ব্যাগের মুখ বাতাস শূন্য করে সুতলি দিয়ে ভালভাবে বেঁধে দেয়া হয় এবং ঢাকনা লাগিয়ে দেয়া হয় যেন বাতাস প্রবেশ করতে না পারে।
- ড্রামগুলো স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ঘরে ২১ দিন রেখে দিলে গরুকে খাওয়ানোর জন্য সাইলেজ তৈরি হয়ে যায়। ধানের খড়ের পরিবর্তে গমের ভুসি বা চালের কুড়া ব্যবহার করেও এরূপ সাইলেজ তৈরি করা যায়।

চিত্র ৫। সবজি বর্জ্য থেকে সাইলেজ ও হে তৈরি

সবজি বর্জ্য থেকে (ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা ও গাজর পাতা) তৈরি হে ও সাইলেজের পুষ্টিমান টেবিল - ২ এ দেয়া হয়েছে। সাইলেজ ও হে তৈরির ধাপগুলো চিত্র - ৫ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

টেবিল ২: সবজি বর্জ্য থেকে তৈরি বিভিন্ন প্রাণিখাদ্যের পুষ্টিমান

প্রাণিখাদ্য	প্রাণিখাদ্য পুষ্টিমান (% শুষ্ক পদার্থ)					
	শুষ্ক পদার্থ (% ফ্রেশ)	অরগানিক মেটার	ক্রুড প্রোটিন	এনডিএফ	এডিএফ	টিডিএন
সবজি বর্জ্য ম্যাস	৯০.১	৮৯.৪	১৩.৩	৪৫.২	৩৪.০	৬৪.২
সবজি বর্জ্য হে	১০.৪	৮৯.৩	১৮.৬	৫২.৭	২৪.৮	৭০.৫
সবজি বর্জ্য ও গমের ভুসির সাইলেজ	২৫.১	৮৭.৬	১৫.২	৪০.৬	৩১.৪	৬৫.৯
সবজি বর্জ্য ও চালের কুড়ার সাইলেজ	২৪.৮	৮৭.৪	১৩.৯	৪৫.৮	৩৩.৭	৬৪.২
সবজি বর্জ্য ও ধানের খড়ের সাইলেজ	২৪.২	৮৭.৪	১৩.৩	৪৬.৮	৩৪.৯	৬৩.৪
সবজি বর্জ্য পিলেট	১১.৩	৯০.৩	১৫.০	৩৫.৩	২০.৮	৭৩.৩

টেবিল ৩: পিলেট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদানের হার (% ফ্রেশ)

উপাদান	%
সবজি বর্জ্য (গ্রেডিং ও ডিওয়াটারিং করা)	৬০.০০
ধানের খড় (২-৩ সেমি করে কাটা)	১০.০০
চালের কুড়া	৭.০০
ভুট্টা ভাঙ্গা	৬.০০
সয়াবিন মিল	৮.০০
মোলাসেস	৫.০০
ডিসিপি	২.০০
খাবার লবণ	১.৫০
পিলেট বাইন্ডার	০.৫০
মোট	১০০.০০

উৎপাদন খরচ ও লাভ-ক্ষতির হিসাব

বর্ণিত প্রযুক্তি অনুসারে সবজি বর্জ্যকে ব্যবহার করে দানাদার ম্যাস, হে, সাইলেজ অথবা পিলেট তৈরি করতে প্রয়োজনীয় উৎপাদন ব্যয় এবং বর্তমান বাজারদরে বিক্রি করলে যে লাভ আসবে তার আনুমানিক হিসাব টেবিল - ৪ এ দেয়া হল। বর্তমান প্রযুক্তি অনুযায়ী এক কেজি দানাদার ম্যাস, হে, সাইলেজ ও পিলেটের উৎপাদন খরচ যথাক্রমে ২৪.৫, ২৮.৬, ৮.২ ও ১৮.৩ টাকা। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বড় আকারের কারখানায় সবজি বর্জ্য থেকে প্রাণিখাদ্য উৎপাদন করলে উল্লেখিত উৎপাদন খরচ অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

টেবিল ৪: সবজি বর্জ্য থেকে প্রাণিখাদ্য তৈরির উৎপাদন খরচ এবং লাভ ক্ষতির হিসাব (১০০ কেজি প্রাণিখাদ্য)

আইটেম	ম্যাস	হে	সাইলেজ	পিলেট
পরিবর্তনশীল খরচ				
প্রয়োজনীয় সবজি বর্জ্য, কেজি	৮০০	১০০০	১০০	১৩৫
সংগ্রহ খরচ (৭০০ টাকা/টন হিসেবে)	৫৬০	৭০০	৭০	৯৫
প্রক্রিয়াকরণ খরচ (পরিস্কার করা, গ্রেডিং ও ডিওয়াটারিং করা, শুকানো, ভাঙ্গানো, সাইলেজ করা অথবা পিলেট করা এবং অন্যান্য) (টাকা, থোক)	২০০	৩০০	২১৫	১৫০
প্রয়োজনীয় অন্যান্য খাদ্যোপাদানের দাম (গমের ভুসি চালের কুড়া, ধানের খড়, মোলাসেস, ভুট্টা ভাঙ্গা, সয়াবিন এবং অন্যান্য) (টাকা, থোক)	২০০	০০	২০০	৮৫০
শ্রমিক খরচ (টাকা, থোক)	৩০০	৪৫০	১০০	৪৫০
মোট =	**২০৬০**	**২৪৫০**	**৬৮৫**	**১৬৮০**
স্থায়ী খরচ				
ঘর ভাড়া (৩০,০০০ টাকা/ মাস)	২০০	২৫০	২৫	৩৪
মেশিনের দাম (ব্লেন্ডিং মেশিন, পেলেটিং মেশিন, গ্রেডিং ও ডিওয়াটারিং মেশিন; ৪,০০,০০০ টাকা প্রতিটি; দক্ষতা ৫০০ কেজি/ঘণ্টা; ৫ বছর নির্ভরপত্র)	৯০	৫৬	৬	১৫
মোট=	**২৯০**	**৩০৬**	**৩১**	**৪৯**
বিক্রয় কমিশন (১.০০ টাকা /কেজি)	১০০	১০০	১০০	১০০
সর্বমোট উৎপাদন খরচ (টাকা/১০০ কেজি)	২৪৫০	২৮৫৬	৮১৬	১৮২৯
উৎপাদন খরচ (টাকা/কেজি)	২৪.৫	২৮.৬	৮.২	১৮.৩
বাজার মূল্য (টাকা /১০০ কেজি)	৩৫০০	৩০০০	১০০০	৩০০০
নেট আয় (টাকা)	১০৫০	১৪৪	১৮৪	১১৭১

গবেষণা ফলাফল

- দেশীয় বাড়ন্ত ষাঁড়কে (৮৫±১৭ কেজি) দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে সবজি বর্জ্য ম্যাস রেশনের ৯.৭% হারে (শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে) অথবা ষাঁড়ের জীবন্ত ওজনের ০.৩% হারে ৮৯ দিন খাওয়ানো হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ষাঁড়গুলোর দৈনিক খাদ্য গ্রহণ, পরিপাচ্যতা, দৈনিক দৈহিক ওজন বৃদ্ধি, এবং স্বাস্থ্য যেসব ষাঁড় প্রচলিত খাবার খেয়েছে তাদের সমতুল্য। ষাঁড়গুলোর দৈনিক দৈহিক বৃদ্ধির হার ছিল ৩০০-৩৪৪ গ্রাম/ দিন।
- দেশীয় বাড়ন্ত ভেড়া শাবককে (৯.৯±১.২৫ কেজি) ধানের খড় দিয়ে তৈরি সবজি বর্জ্যের সাইলেজ ৯০ দিন পর্যাপ্ত পরিমাণে (ad libitum) খাওয়ানো হয়। এতে দেখা যায় যে, ভেড়া শাবকগুলোর রেশন গ্রহণ এবং দৈনিক দৈহিক বৃদ্ধি যেসব ভেড়া শাবক ভুট্টা সাইলেজ খেয়েছে তাদের থেকে বেশি। ভেড়া শাবকগুলোর দৈনিক দৈহিক ওজন বৃদ্ধি ছিল ১৪১ গ্রাম/দিন, অন্যদিকে যেগুলো ভুট্টা সাইলেজ খেয়েছে তাদের ছিল ১১০ গ্রাম/দিন।
- বাণিজ্যিক গরুর খামারের দেশীয় বাড়ন্ত ষাঁড়কে (২১৯±২৬ কেজি) ধানের খড় দিয়ে তৈরি সবজি বর্জ্যের সাইলেজ ও ভুট্টা সাইলেজ মিশ্রিত করে ৫৬ দিন পর্যাপ্ত পরিমাণে (ad libitum) খাওয়ানো হয়। দেখা গেছে যে ষাঁড়গুলোর দৈনিক খাদ্য গ্রহণ, পরিপাচ্যতা ও দৈনিক দৈহিক ওজন বৃদ্ধি যেসব ষাঁড় শুধু ভুট্টা সাইলেজ খেয়েছে তাদের সমতুল্য। ষাঁড়গুলোর দৈনিক দৈহিক ওজন বৃদ্ধির হার ছিল ৬৬৭-৬৭৩ গ্রাম/ দিন।
- কাওরান বাজারে বাৎসরিক যে পরিমাণ সবজি বর্জ্য উৎপন্ন হয় তা পচনের ফলে বছরে প্রায় ০.৪৯ গিগাগ্রাম মিথেন গ্যাস নির্গত হয়। যদি এই সবজি বর্জ্য ফেলে না দিয়ে গবাদি প্রাণিকে খাওয়ানো হয় তাহলে মিথেন গ্যাস নির্গমন ৮৭.৬% কমে যাবে (০.৪৩ গিগাগ্রাম) (১ গিগাগ্রাম = ১০০০ টন)।

প্রাণিকে সবজি বর্জ্য খাওয়ানোর পদ্ধতি

- সবজি বর্জ্য ম্যাস, দানাদার মিশ্রণের সাথে ৩০% হারে মিশিয়ে গবাদি প্রাণিকে খাওয়ানো যায়।
- সবজি বর্জ্যের সাইলেজ, হে, অথবা পিলেট গবাদি প্রাণিকে ইচ্ছামত খাওয়ানো যায়। সবজি বর্জ্যের সাইলেজ ও হে প্রচলিত অন্যান্য ঘাসের সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে ভাল হয়।

অন্যান্য উপকারিতা

- ভাগাড়ে সবজি বর্জ্য পচনের ফলে উৎপন্ন মিথেন গ্যাসের পরিমাণ কমবে এবং পরিবেশ দূষণ কমবে।
- সীমিত আবাদি জমির উপর খাদ্যশস্য ও প্রাণিখাদ্য উৎপাদন প্রতিযোগিতা হ্রাস পাবে।
- পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার খরচ কমবে।
- বাণিজ্যিকভাবে সবজি বর্জ্য থেকে প্রাণি খাদ্য উৎপাদন বাস্তবায়ন হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

উপসংহার

উক্ত গবেষণায় সবজি বর্জ্য সংগ্রহ করে প্রাণি খাদ্য উৎপাদন করে গরু ও ভেড়াকে খাওয়ানো হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে সবজি বর্জ্যকে প্রাণিখাদ্য উৎপাদনে ব্যবহার করলে এক দিকে যেমন: আবাদি জমিতে ঘাস চাসের চাপ কমবে, অন্যদিকে পরিবেশ দূষণও কমানো যাবে। এই গবেষণার ফলাফল কাজে লাগিয়ে প্রাণী খামারি, পৌরসভা অথবা সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, পেশাজীবী এবং উদ্যোক্তা উপকৃত হতে পারেন।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ননী গোপাল দাস, ড. খান শহীদুল হক, ড. নাসরিন সুলতানা, ড. সরদার মোহাম্মাদ আমানুল্লাহ এবং ড. বিপ্লব কুমার রায়

বিএলআরআই ঘাস-৫ (লবণ সহিষ্ণু)

ভূমিকা

উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি ও পানিতে লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ এদেশের জন্য অন্যতম একটি বড় পরিবেশগত সমস্যা। বাংলাদেশ একটি ক্রমবর্ধমান এবং উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের উন্নয়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের ঋতুচক্র বদলে যাচ্ছে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল মূলত: ১৯টি জেলা নিয়ে গঠিত, যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ৩২ শতাংশ এবং এ সকল অঞ্চলে প্রায় ৩৫ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ বসবাস করে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে লবণাক্ততা প্রভাবিত এলাকায় ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সময় কালে মাটি ও পানিতে লবণের পরিমাণ প্রায় ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে কৃষিসহ গবাদিপ্রাণি লালন-পালনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো প্রাণী খাদ্যের অভাব, খাদ্যাভাস ও খাদ্যের উচ্চমূল্য। মাটি ও পানিতে লবণের পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলের জমিতে ঘাসের উৎপাদন আশানুরূপ হয় না। গবাদিপ্রাণি পালনের জন্য খামারিকে শুধুমাত্র খড় এর উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে গবাদিপ্রাণি থেকে দুধ বা মাংসের প্রত্যাশিত উৎপাদন পাওয়া যায় না। দেশের উপকূলীয় এলাকায় গো-খাদ্য বিশেষ করে উচ্চফলনশীল সবুজ ঘাসের ঘাটতি দূর করতে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার (বিনা) যৌথভাবে গবেষণার মাধ্যমে পিআইইউ, এনএটিপি ফেজ-২, বিএআরসি এর অর্থায়ন, প্রাণিসম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকা এর সমন্বয় এবং মাঠ গবেষণা কার্যক্রমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে লবণ সহিষ্ণু নেপিয়ার ঘাসের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

বিএলআরআই ঘাস- ৫ (লবণ সহিষ্ণু)

প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

- **গবেষণায় ব্যবহৃত নেপিয়ার কালটিভার:** নেপিয়ার ঘাসের ৭টি কালটিভার ব্যবহার করা হয়। [নেপিয়ার-১, নেপিয়ার-২, নেপিয়ার-৩, নেপিয়ার-৪, পাকচং, মার্কইরন ও রোকোনা]
- **গামা রেডিয়েশন প্রয়োগ:** ঘাসের বাহ্যিক এবং কৌলিক উভয় বৈশিষ্ট্যের উন্নয়নের জন্য দুই গিট বিশিষ্ট নেপিয়ার এর ৭টি কালটিভারের কান্ডসমূহকে মোট ১০ টি ভিন্ন মাত্রার গামা বিকিরণ প্রয়োগ করা হয়।
- **মিউটেন্ট লাইনসমূহের ক্লোন উৎপাদন:** একই কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনায় গামা রেডিয়েশন ছাড়া এবং রেডিয়েশনকৃত ক্লোনসমূহের উৎপাদন দক্ষতা, পুষ্টি গুণাগুণ এবং বেঁচে থাকার হার ইত্যাদির ভিত্তিতে বেস্ট টু বেস্ট বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মিউটেন্ট লাইনসমূহের ক্লোন নির্বাচন করা হয়।
- **লবণের মাত্রা সহনশীলতা পরীক্ষা:** নির্বাচিত বিভিন্ন মাত্রার গামা রেডিয়েশনকৃত ঘাসের ক্লোনসমূহকে লবণের মাত্রার সহনশীলতা পরীক্ষার জন্য পট কালচার পরীক্ষার মাধ্যমে যথাক্রমে ০, ৮, ১০ এবং ১২ ডেসি সিমেন পার মিটার মাত্রার লবণ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়।
- **নির্বাচিত লবণ সহিষ্ণু নেপিয়ার ঘাসের মিউটেন্ট লাইন ভেলিডেশন:** মাঠ পর্যায়ে ভ্যালিডেশনের জন্য উপকূলীয় অঞ্চল সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলাকে নির্বাচন করা হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সার্বিক সহযোগিতা ও সরাসরি তদারকির মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত নেপিয়ার কালটিভার এর মিউটেন্ট লাইনসমূহের চাষাবাদ ও ভ্যালিডেশন কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়। বিএলআরআই সহ মাঠ পর্যায়ে ভ্যালিডেশন গবেষণার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নেপিয়ার ঘাসের ৫টি মিউটেন্ট লাইনকে লবণ সহিষ্ণু নেপিয়ার ঘাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদন পরিমাণ, উৎপাদন খরচ, বিক্রয় মূল্য, আয় -ব্যয় হিসাব এবং পুষ্টিগুনাগুণ বিবেচনায় বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে বিএলআরআই ঘাস-৫ (লবণ সহিষ্ণু) ঘাসকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তরের করা হয়।

লবণ সহিষ্ণু নেপিয়ার ঘাস চাষাবাদ পদ্ধতি

- **জমি চাষ ও রোপণের সময়:** সাধারণত মার্চ-জুন মাসের যে কোন সময় লবণ সহিষ্ণু নেপিয়ার ঘাসের এর চারা রোপণ করা উত্তম। তবে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসেও চারা রোপণ করা যেতে পারে। মাটি তুলনামুলকভাবে উচুঁ ও আলো বাতাস যুক্ত জমি নির্বাচিত করে (উল্লেখ্য জোয়ার/বন্যা/বৃষ্টির পানি দীর্ঘ সময় আটকে থাকে এমন নিচু জমি নির্বাচন না করা উত্তম) প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রথমে ২ বার উত্তমরূপে জমি চাষ দিতে হবে। প্রথমবার চাষ দেওয়ার পর জমি ৭-১০ দিন ফেলে রাখতে হয় যাতে করে জমির সকল আগাছা মাটিতে পচে যায়। ২য় বার চাষ দেয়ার সময় ভেজাল ডোজ হিসেবে পরিমাণমত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার ছিটিয়ে দিতে হবে। যাতে সারগুলো মাটির সব জায়গায় ভালভাবে মিশে যায়। চাষ দেয়ার পর মাটি ভালভাবে ঝুরঝুর করে মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে।
- **সার প্রয়োগ:** জমি তৈরিকালীন সময়ে প্রতি হেক্টর (২৪৭ শতাংশ বা ৭.৫ বিঘা জমি) জমিতে ব্যাজাল ডোজ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার যথা ইউরিয়া ২৯৭ কেজি, টিএসপি (ট্রিপল সুপার ফসফেট) ২১০ কেজি, এমওপি (মিউরেট অব পটাশ) ৫৫ কেজি এবং জিপসাম ৯৫ কেজি প্রয়োগ করতে হবে অথবা মাটির রাসায়নিক গুণাগুণ পরীক্ষা পূর্বক ব্যাজাল ডোজ হিসেবে রাসায়নিক সার নির্ধারণ করতে হবে। কাটিং রোপণের ৩০ দিন পর টপ ড্রেসিং হিসাবে ইউরিয়া ২৫০ কেজি/হেক্টর হিসেবে ছিটিয়ে দিতে হবে এছাড়াও প্রত্যেকবার ঘাস কর্তনের ১৫-২০ দিন পর ২৫০ কেজি/হেক্টর মাত্রায় ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।
- **কাটিং প্রয়োজন:** লবণ সহিষ্ণু নেপিয়ার ঘাস চাষাবাদের জন্য হেক্টর প্রতি ৪২ হাজার কাটিং/মোথার প্রয়োজন হবে।
- **কাটিং রোপণের দূরত্ব:** এক সারি থেকে অন্য সারি ৫০ সেমি. (প্রায় ২০ ইঞ্চি) ও এক কাটিং থেকে অন্য কাটিং ৫০ সেমি. (প্রায় ২০ ইঞ্চি)। দুই গিট বিশিষ্ট কাটিং জমিতে লাগানোর সময় ৪৫ ডিগ্রী কোনে এবং কুঁশিকে ঊর্দ্ধমুখীভাবে রোপণ করতে হয় এবং কাটিংগুলো ৮-১০ সেমি. মাটির গভীরে রোপণ করতে হয়।
- **সেচ প্রয়োগ:** সাধারণত খরা মৌসুমে (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি) ১৫-২০ দিন পর পর।
- **আগাছা পরিষ্কার:** প্রথমবার কাটিং রোপণের ২০-৩০ দিন পর এবং প্রত্যেকবার ঘাস কর্তনের পর সার প্রয়োগের পূর্বে (আগাছা হওয়া সাপেক্ষে) আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।
- **ঘাস কর্তনের সময়কাল:** প্রথম কাটিং ৬০-৮০ দিন পর এর পর প্রতি ৪৫-৬০ দিন পর পর ঘাস কর্তন করতে হয়। তবে গ্রীষ্মকালে ৩০-৩৫ দিন পর পরও ঘাস কাটা যেতে পারে। ঘাস কাটার সময় মাটির লেভেল থেকে ১০ সেমি. পর্যন্ত রেখে ঘাস কর্তন করা প্রয়োজন।

প্রযুক্তিটির উপযোগীতা

বছরে ৫ বার কর্তন করা হলে খামারি পর্যায়ে হেক্টর প্রতি বিএলআরআই ঘাস-৫ (লবণ সহিষ্ণু) এর মোট উৎপাদন হয় ২৬৪.০০, মেট্রিক টন। লবণ সহিষ্ণু জাতের ঘাস উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন খরচ যেমন কাটিং সংগ্রহ/ক্রয়, জমি চাষাবাদ, ঘাস রোপণ, বিভিন্ন ধরনের সার প্রয়োগ, আগাছা পরিষ্কার, সেচ প্রয়োগ, ঘাস কর্তন, জমি বর্গা ইত্যাদি বাবদ বছরে প্রতি হেক্টর জমির জন্য মোট খরচ হয় প্রায় ২,৩৯,৫৪৫.০০ টাকা। উৎপাদন বিবেচনায় নিলে উল্লেখিত লবণ সহিষ্ণু জাতের প্রতি মেট্রিক টন সবুজ ঘাসের উৎপাদন খরচ হয় যথাক্রমে ৯০৮.০০ টাকা। বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নেপিয়ার ঘাস ঋতু ভেদে গড়ে ২.৫০ টাকায় বিক্রয় হয়। এ হিসেবে উপকূলীয় অঞ্চলের খামারিগণ বছরে প্রতি হেক্টর জমিতে লবণ সহিষ্ণু উক্ত ঘাসের জাত চাষাবাদ করে সকল প্রকার উৎপাদন খরচ বাদে প্রায় ৪,১৯,৮৩০.০০ টাকা আয় করতে পারবেন।

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

প্রযুক্তিটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গামা রেডিয়েশনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত লবণ সহিষ্ণু নেপিয়ার ঘাস বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি (লবণাক্ততার মাত্রা ১.৭৫-৫.০ ডেসি সিমেন পার মিটার) ও পানি (লবণাক্ততার মাত্রা ৭.৫-১১.৫০ ডেসি সিমেন পার মিটার) সহনীয়।

পরিবেশগত প্রভাব

উদ্ভাবিত লবণ সহিষ্ণু নেপিয়ার ঘাস সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক খাদ্য বলে এটি গ্রহণে প্রাণীর রুমেনে কোন ক্ষতিকর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হয় না। এছাড়াও প্রযুক্তিটি পরিবেশ বান্ধব। কারণ নেপিয়ার ঘাস চাষাবাদের ফলে সমুদ্র তীরবর্তী উপকূলীয় অঞ্চলের মাটির ক্ষয়রোধ ও লবনাক্ততার মাত্রা হ্রাস করতে সাহায্য করবে।

উপসংহার

উদ্ভাবিত লবণ সহিষ্ণু নেপিয়ার ঘাস চাষাবাদের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘাসের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, গবাদিপ্রাণি লালন-পালন অর্থনৈতিকভাবে টেকসই হবে এবং খামারিরা আর্থিকভাবে লাভবান হবে ও তাদের জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটবে। সর্বোপরি, উপকূলীয় অঞ্চলের গবাদিপ্রাণির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. বিপ্লব কুমার রায়, ড. মোঃ ইমতিয়াজ উদ্দিন, ড. নাথু রাম সরকার, মোঃ রেদোয়ান আকন্দ সুমন, মোহাম্মদ খোরসেদ আলম, ড. নাসরিন সুলতানা এবং মোহাম্মদ খায়রুল বাশার

ডোল পদ্ধতিতে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তি

ভূমিকা

গবাদিপ্রাণী পালনের জন্য খাদ্য হিসাবে প্রাণীকে সাধারণতঃ ২ প্রকারের খাদ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে, যেমন, আঁশ জাতীয় বা রাফেজ (রসালো যেমন, কাঁচা ঘাস এবং শুষ্ক যেমন, খড়) এবং দানাদার মিশ্রণ (যেমনঃ ভুসি, কুড়া, খৈল, লবণ ইত্যাদি)। প্রাণীকে সুষম খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে রাফেজ ও দানাদার খাদ্য সরবরাহের অনুপাত হচ্ছে ৭০:৩০, অর্থাৎ শতভাগের ৭০ ভাগ রাফেজ এবং ৩০ ভাগ দানাদার। আমাদের দেশে যদিওবা গো-চারণ ভূমি নেই তবুও, গ্রামাঞ্চলে ফসল ওঠার পরে জমির আইল, রাস্তার ধার, নদী-নালা ও পুকুর পাড়, ঘড়-বাড়ীর উঠানে প্রাকৃতিক ভাবে গজানো দেশী কাঁচা ঘাস খেয়ে প্রাণী আঁশ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা আংশিকভাবে পূরণ করে থাকে। শহরাঞ্চলে গবাদি প্রাণীর জন্য কাচা ঘাস দুষ্প্রাপ্য তাই, শহরাঞ্চলের গবাদিপ্রাণী পালনকারী খামারিকে শুষ্ক রাফেজ বা শুকনা খড় খাওয়াতে হয়- যার মূল্য দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এমনিতেই প্রাণী পালনের সার্বিক খরচের প্রায় ৬০ থেকে ৭০ ভাগ খরচই বহন করতে হয় খাদ্যের জন্য। সুতরাং, লাভজনকভাবে গবাদিপ্রাণী উৎপাদনের জন্য খাদ্য খরচ কমানো অত্যাবশ্যকীয়। গবাদিপ্রাণীকে সারাবছরব্যাপী অধিক পরিমানে কাঁচাঘাস সরবরাহের মাধ্যমে খাদ্য খরচ অনেকটাই কমানো সম্ভব। সমস্যা হল সারাবছরব্যাপী কাঁচাঘাস পাওয়া যাবে কিভাবে? দু'টি উপায়ে তা নিশ্চিৎ করা সম্ভব। একটি হচ্ছে, সারাবছরব্যাপী উন্নতজাতের ঘাস চাষ করা এবং অপরাটি হচ্ছে মৌসুমে অধিক ঘাস উৎপাদন ও সংরক্ষণ করে সারাবছরব্যাপী গবাদিপ্রাণীকে সরবরাহ করা। আমাদের দেশে বছরব্যাপী পর্যাপ্ত ঘাস উৎপাদনের মত জমির অভাব থাকায় এটা সম্ভব নয়। বিশেষ বিশেষ মৌসুমে অথবা দুই ফসলের অন্তবর্তীকালিন সময়ে উপযুক্ত ঘাস উৎপাদন করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যাতে সারাবছর প্রাণীকে সরবরাহ করা যায়।

এজন্য ঘাস উৎপাদনকারী খামারিদের ঘাস সংরক্ষণের উপযোগী একটি লাগসই প্রযুক্তি খুবই জরুরি। কাঁচা ঘাস দিয়ে সাইলেজ তৈরির প্রযুক্তিটি ইতিমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু কম খরচে তা সংরক্ষণের যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন না হওয়ায় খামারিরা প্রযুক্তিটির শতভাগ সুফল থেকে এখনও বঞ্চিত। খামারিদের চাহিদার আলোকে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনাস্টিটিউট (বিএলআরআই) দীর্ঘদিন যাবৎ এই সমস্ত প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছে। সাইলেজ সংরক্ষণের অনেক পদ্ধতি নিয়ে গবেষণার পরে দেখা গেছে যে, গ্রামীণ পর্যায়ে সবচেয়ে সাশ্রয়ে যে প্রযুক্তির মাধ্যমে সাইলেজ সংরক্ষণ করা যায় সেটি হচ্ছে "ডোল সাইলেজ"। গ্রামীণ পর্যায়ে সাধারণতঃ কৃষকরা ধান সংরক্ষণের জন্য বাঁশের তৈরি যে ডোল ব্যবহার করে থাকে সেটি দিয়েই কম খরচে সাইলেজ সংরক্ষণ করা যায়।

সাইলেজ কী?

সাধারণভাবে বায়ুরোধক অবস্থায় সংরক্ষিত সবুজ ঘাসকে সাইলেজ বলা হয়ে থাকে। এছাড়া সাইলেজ হলো গাঁজনকৃত সবুজ ঘাস। উচ্চ আর্দ্রতাযুক্ত সবুজ ঘাসকে বায়ুহীন পরিবেশে সংরক্ষণ করা হয়। এই প্রক্রিয়াজাত ঘাসকে সাইলেজ বলে। বায়ুহীন পরিবেশে পর্যাপ্ত আদ্রর্তাযুক্ত (৬০-৬৫%) ফরেজ বা সবুজ ঘাসকে সংরক্ষণ করলে এতে কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং এই প্রক্রিয়া বা পরিবর্তন ঘটানোর প্রক্রিয়াকে এনসাইলিং বলে। সাইলেজ তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য হলো, যে মৌসুমে সবুজ ঘাসের আধিক্য থাকে, সে মৌসুমে সাইলেজ প্রস্তুত করা এবং সবুজ ঘাসের অভাবের সময় গবাদিপ্রাণীকে তা সরবরাহ নিশ্চিত করা। এতে কাচা ঘাসের অপচয় কম হয় এবং এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সাইলেজ তৈরির মূলনীতি হলো, যখন উদ্ভিদ কোষ অক্সিজেন (O_2) বিহীন অবস্থায় ফারমেন্টেট (গাজন) হয় তখন ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই ল্যাকটিক এসিড সবুজ ঘাস সংরক্ষণে সহায়তা করে থাকে।

সাইলেজের উপকারিতা

১। ঘাসের সাইলেজে ৮৫ % পুষ্টি পাওয়া যায়।
২। এখানে ঘাসের সমস্ত অংশই সংরক্ষণ করা যায়।
৩। বর্ষা মৌসুমে কাচা ঘাস সংরক্ষণ করা কঠিন কিন্তু সাইলেজ সহজেই করা সম্ভব।
৪। সাইলেজ অত্যন্ত সুস্বাদু ও ল্যাকটিক এসিড সমৃদ্ধ খাদ্য।
৫। এটা আমিষ ও ভিটামিনের উৎসও বটে।
৬। সাইলেজ ঘাসের নাইট্রেট বিষক্রিয়া প্রতিরোধে সহায়তা করে।

সাইলেজ তৈরির উপযোগী ফডার

বিভিন্ন ধরনের ঘাস হতে সাইলেজ তৈরি করা হয়ে থাকে। সাইলেজ তৈরি করার জন্য সাধরণতঃ নন-লিগিউম জাতীয় (কম নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ) ফডার বা সবুজ ঘাস সবচেয়ে বেশী উপযোগী। যেমন, ওট, ভুট্টা, যোয়ার, নেপিয়ার প্রভৃতি অন্যতম। লিগিউম জাতীয় ফডার (অধিক নাইট্রোজেন যুক্ত ডাল জাতীয়) দিয়েও সাইলেজ তৈরি করা যেতে পারে৷ লিগিউম জাতীয় ফডার যেমন, বারশিম, লুসার্ণ, কাউপি কিংবা মাটি

কালাই দিয়ে সাইলেজ তৈরি করতে হলে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। যেমন, বারশিমের সাথে ওট এবং কাউপির সাথে ভুট্টা মিশিয়ে অথবা খড় মিশিয়ে সাইলেজ করা যায়। এভাবে সাইলেজ তৈরি করলে লিগুমিনাস ফডারে যে কার্বহাইড্রেড কম থাকে তার অভাব পূরণ করে কার্বহাইড্রেড পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং পানির পরিমাণ কমে আসে। ফলে, সাইলেজ ভালোভাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে এবং খড় ব্যবহার করলে তার পুষ্টিমাণও বৃদ্ধি পায়।

আমাদের দেশের কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে, সহজে ও কম খরচে একজন কৃষক যাতে সাইলেজ তৈরি ও সংরক্ষণ করতে পারে সেজন্য ডোল সাইলো পদ্ধতির বর্ণনা করা হলো।

ডোল পদ্ধতিতে সাইলেজ তৈরির কৌশল

আমাদের দেশের যে সমস্ত কৃষক ক্ষুদ্র আকারের ডেইরি খামার পরিচালনা করেন তাদের জন্য ডোল পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এই পদ্ধতিতে একজন কৃষক তার প্রয়োজনের তাগিদে ৫০ কেজি থেকে ৭৫০ কেজি আকারের ডোল সাইলো তৈরি করতে পারেন। এ ধরণের ডোল সাইলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতি সহজেই স্থানান্তর করা যায়। এ পদ্ধতিতে কৃষকের নিজস্ব কোন গবাদিপ্রাণী না

থাকলেও তিনি তার নিজস্ব জমিতে শুধু ঘাস উৎপাদন এবং ডোল সাইলো করে সংরক্ষিত সাইলেজ বাজারে বিক্রি করতে পারবেন। কেননা, ডোল সাইলো অতি সহজেই পরিবহন করা যায়। মাটির গর্তে সাইলেজ তৈরির যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, ডোল পদ্ধতিতে ঠিক একই ধরণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ডোল পরিপূর্ণ করার পর ভালভাব মুখ বেঁধে রাখতে হবে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা করে দেখেছে যে, ডোল পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস এমনকি মেইজ স্টোভার (ভুট্টা গাছের কান্ড) সাইলেজ করে ৬ মাসের অধিককাল পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়। এখন আসা যাক, ডোল কিভাবে তৈরি করা যায়? এটা দু'ভাবে সংরক্ষণ করা যায়; যথাঃ (১) হাট-বাজারে বাশের তৈরি ধান রাখার যে গোলাকার ডোল পাওয়া যায় সেটির ভেতরে পলিথিন মুড়িয়ে বায়ুরোধক করে, (২) শুধু পলিথিনের ডোল তৈরি করে সংরক্ষণ। তবে, সাইলো তৈরির খরচ, ব্যবহারের স্থায়িত্ব কাল ও গুণগতমাণ বিবেচনা করে দেখা গেছে যে, প্রথমটিই গ্রামীণ খামারি পর্যায়ে সাশ্রয়ী পদ্ধতি। যে ঘাসের সাইলেজ প্রস্তুত করা হবে তা প্রথমে টুকরা টুকরা (প্রায় ২.০-২.৫ ইঞ্চি পরিমাণ) কেটে নিতে হবে। কম পরিমাণ ঘাস হলে হাতেই কাচি দ্বারা কাটা যায়। আর যারা অধিক পরিমাণে কিংবা বাণিজ্যিক ভাবে সাইলেজ করতে চান তারা ঘাস চপার মেশিন (নিচের ছবিতে দেখুন) ব্যবহার করতে পারেন। সাইলোতে (যেখানে সাইলেজ সংরক্ষণ করা হবে) ঘাস দেওয়ার পূর্বে সেটার তলায় পলিথিন দিয়ে ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে খড় বিছাতে হবে। এরপর টুকরা টুকরা করা সবুজ ঘাস সাইলোর মধ্যে স্তরে স্তরে সাজাত হবে; যেন, ভিতরে বাতাস না থাকে। ফডার বা ঘাস যত বেশী আটসাট করে সাইলোতে রাখা যাবে সাইলেজ তত বেশী উন্নত মানের হবে। সাইলেজ মোলাসেসসহ (লালীগুড়/চিটাগুড়) অথবা মোলাসেস ছাড়াও করা যেতে পারে। মোলাসেস ব্যবহার করলে, সুবজ ঘাসেরর শতকরা ৩-৪ ভাগ চিটাগুড় মেপে একটি চাড়িতে বা বালতিতে নিতে হবে। তারপর ঘন চিটাগুড়ের মধ্যে ১:১ অথবা ৪:৩ পরিমাণে পানি মিশালে এটি ঘাসের ওপর ছিটানোর উপযোগী হবে। ঝরনা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে এ মিশ্রণ ঘাসে সমভাবে মিশানো যাবে। প্রতি পরতে (স্তরে) পরতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘাসের জন্য পূর্বের হিসেবে যতটুকু চিটাগুড় লাগবে তা নিয়ে পানিতে মিশিয়ে ঝরনা বা হাত দিয়ে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। সবুজ ঘাসের সাথে শুকনো খড় ব্যবহার করলে এক স্তর কাচা ঘাস এবং এক স্তর খড় দিতে হবে। ওপরের নিয়মে প্রতি ১০০ কেজি সবুজ ঘাসের সাথে ৫ কেজি খড় দিতে হবে এবং ঘাস সাজানোর পর মোলাসেস দিতে হবে। খড়ের মধ্যে কোন মোলাসেস বা চিটাগুড় দিতে হবে না। যতোটা সম্ভব ভালোভাবে পা দিয়ে মাড়িয়ে ভালোভাবে আটসাট করে ভিতরের বাতাস বের করে দিতে হবে। সবুজ ঘাস যত এঁটে সাজানো খাবে সাইলেজ ততো সুন্দর হবে এবং বেশিদিন সংরক্ষণ করা যাবে। সাইলো ভর্তি হলে মুখের ওপরে ৪-৫ ইঞ্চি পর্যন্ত খড় সাজাতে হবে। সবশেষে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পলিথিন দিয়ে ঢাকার পর ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে মাটি দিতে হবে যাতে বাতাসে উড়ে না যায় বা অন্য কোন প্রাণী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, সাইলো একদিনেই সাজানো ভাল। বৃষ্টি অথবা অন্য কোন কারণে একদিনে সাজানো সম্ভব না হলে প্রতিদিন অল্প অল্প করেও ২-৩ দিনের মধ্যে ঘাস সাজিয়ে সাইলেজ তৈরি করা যায়।

এখন আসা যাক প্রথম পদ্ধতির ডোল সাইলেজের গুণগতমাণ নিয়ে আলোচনা। নীচে বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ন্যাপিয়ার ঘাসের একটি ভ্যারাইটির সাইলেজ তৈরির পূর্বের এবং ৩ ও ৬ মাস সংরক্ষণের পরের গুণগতমানের একটি তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো।

গুণগত বৈশিষ্ট্য	সাইলেজ তৈরির পূর্বে	সংরক্ষণের ৩ মাস পরে	সংরক্ষণের ৬ মাস পরে
শুষ্ক উপাদান (%)	১৭.০০	১৭.৮৩	২০.০৬
জৈব উপাদান (%)	৯০.১৪	৮৮.০০	৮৯.০০
অশোধিত আমিষ (%)	০৯.৩৫	১১.৫০	১১.৯২
মোট খনিজ (%)	০৯.৮৬	১১.০৮	১০.১৭

টেবিলে দেখা যাচ্ছে যে, গুণগতমানের সুচকগুলোর মধ্যে অধিকাংশই সাইলেজ তৈরি পরবর্তী পর্যায়েই উর্ধ্বমূখী। আরো লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, সাইলেজ সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি পেলেও গুণগতমানের কোন অবনতি ঘটে না; বরং সংরক্ষণে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কিছু গুণাবলী বৃদ্ধি পায়। নীচে সাইলেজ সংরক্ষণ পরবর্তি আরো কিছু বাহ্যিক গুণাবলী দেয়া হলো। টেবিলে দেখা যাচ্ছে যে, সাইলেজের বাহ্যিক গুণাবলী সংরক্ষণের পরেও ভালো থাকে। এমনকি সংরক্ষণের মেয়াদ দীর্ঘায়িত হলেও বাহ্যিক গুণাবলীর খুব একটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না; যদিও পঁচনক্রিয়া আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে।

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	সংরক্ষণের ৩ মাস পরে	সংরক্ষণের ৬ মাস পরে
বর্ণ	হলুদাভা	হলুদাভা
গন্ধ	মিষ্টি অম্লীয়	মিষ্টি অম্লীয়
পঁচনক্রিয়া	ওপরের দিকে সামান্য পরিমাণ (প্রায় ১-২%)	ওপরের দিকে সামান্য পরিমাণ (প্রায় ৫-৬%)
ইস্ট/মোল্ড	ওপরের দিকে সামান্য পরিমাণ	ওপরের দিকে সামান্য পরিমাণ
পি.এইচ (pH)	৬.৬৭ (সামান্য অম্লীয়)	৫.২৩ (অম্লীয়)
সার্বিক মন্তব্য (গ্রহণযোগ্যতা)	ভাল	ভাল

সাইলেজ সংরক্ষণের মূলনীতি

সাইলো পিটে অথবা অন্য যে কোন সাইলোতে সবুজ ঘাস টুকরা টুকরা করে কেটে পরতে পরতে সাজানোর পরও এর মধ্যে হাজার হাজার ছোট ছোট পকেটের ফাকে অক্সিজেন (O_2) থেকে যায়। যার ফলে উদ্ভিদ এনজাইমের এ্যারোবিক শ্বসন ক্রিয়া শুরু হয়। এ অবস্থায়, ঘাসে উপস্থিত শ্বেতসার এর এক অংশ জারণ ক্রিয়া দ্বারা তাপসহ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে, ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ব্যবহারিক ভাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) শেষ হয়ে যায় এবং যা মোল্ডের বৃদ্ধি ব্যহত করে, এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) এর উপস্থিতিতে উহার বৃদ্ধি ঘটতে পারে না। সাইলো পিটের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে বায়ু থাকলে বেশী তাপ উৎপন্ন হয়, ফলে, সাইলেজের ওপর গাঢ় বাদামী বা কালো রঙের দানা পড়ে। এতে দ্রবণীয় শ্বেতসার অধিক পরিমাণ নষ্ট হয় এবং আমিষের পরিপাচ্যতা কমে যায়। ফলে, সাইলেজের পুষ্টিমান খুবই নিম্নমানের হয়। এ্যারোবিক শ্বসনের পর মাইক্রোবিয়াল পরিবর্তন শুরু হয়। কোন কোন এসিড তৈরি ব্যাকটেরিয়া যেমন, Streptococcus lactis, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus faecalis, Pediococcus acidilacti, Lactobacillus copyneformis ইত্যাদি উদ্ভিদ কোষকে মিডিয়াম হিসেবে ব্যবহার করে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। অক্সিজেন অনুপস্থিতির কারণে তাদের বৃদ্ধির জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় সুগার পরিবর্তিত হয়ে প্রধানতঃ ল্যাকটিক এসিডে পরিণত হয় এবং পরে এটি অন্যান্য ফ্যাটি এসিড যেমন, ফরমিক এসিড, এ্যাসেটিক এসিড, প্রোপাওনিক ও বিউটারিক এসিডে পরিণত হয়। সাইলেজের মধ্যে এসিডের পরিমাণ কমে পিএইচ ৩.৭ হলে ব্যাকটেরিয়াল গাজন বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই এসিডগুলো অন্যান্য ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াকে নিধন করতে সহায়তা করে এবং সাইলেজকে দীর্ঘদিন সংক্ষরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে, এক্ষেত্রে সাইলেজের বায়ুহীন অবস্থা বজায় রাখতে হবে।

সাইলোক্রিয়ার সময় প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ প্রোটিন ভেঙ্গে এমাইনো এসিডে রূপান্তরিত হয়। প্রোটিনের পুষ্টিমানের ওপর প্রভাব বিস্তার না করলেও এটি সংক্ষরণের জন্য খারাপ পদার্থ। এমাইনো এসিড ভেঙ্গে বিভিন্ন এমাইন তেরী করে; যেমন, ট্রিপটামিন, ফিনাইল ইথায়লামিন, হিস্টামিন, বিউটেন ও পেন্টামিথাইলিন-ডাই-এমিন প্রভৃতি।

নিচে সংক্ষিপ্ত বিক্রিয়া দেয়া হলো :

সবুজ ঘাস + ৬ অনু পানি + ৬ অনু কার্বন ডাই অক্সাইড + ৬৭৩ ক্যালোরি
শক্তি -------------------------------- চিনি + অক্সিজেন
চিনি -------------------------------- ল্যাকটিক এসিড
ল্যাকটিক ---------------------------- বিউটারিক এসিড + পানি + কার্বন-ডাই-অক্সাইড

সাইলেজ তৈরির সময় যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখা উচিত

১। সাইলেজ তৈরির জন্য ঘাসে অবশ্যই ৩০-৩৫ শতাংশ শুস্কপদার্থ (ড্রাইমেটার) থাকা প্রয়োজন।
২। নীচু জায়গায় সাইলো করা যাবে না।
৩। উপরের পলিথিন সুন্দরভাবে এঁটে দিতে হবে যাতে কোন পানি "সাইলেজ" এর ভিতরে প্রবেশ না করে।
৪। চিটাগুড় পাতলা হলে পরিমাণ বাড়িয়ে পানি কম করে মিশাতে হবে অর্থাৎ এমনভাবে দ্রবণ তৈরি করতে হবে যাতে আঠার মত ঘাসের গায়ে লেগে থাকে।

৫। ঘাস এবং খড় এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ফাঁকা জায়গাগুলো যথাসম্ভব বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে, সাইলোর কোণাগুলো এবং পাশসমূহ পা দিয়ে মাড়িয়ে ঘাস সাজাতে হবে।

ভালো সাইলেজের বৈশিষ্ট্য

১। সাইলেজের রং হলুদাভ সবুজ

২। গন্ধ- আচারের ন্যায় অল্প সুগন্ধ

৩। পিএইচ ৩.৫-৪.৫

সাইলেজ খাওয়ানো

গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১০০ কেজি ওজনের একটি ষাঁড় দৈনিক গড়ে তার দৈহিক ওজনের ১.৯২ হারে সাইলেজ শুষ্ক পদার্থ গ্রহণ করে থাকে। দুধেল গাভী প্রতিদিন কি পরিমাণ দুধ উৎপাদন করে তার উপর ভিত্তি করে সাইলেজ সরবরাহ করতে হয়। গবেষণায় কোন কোন বিজ্ঞানী দেখেছেন যে, যেখানে সাইলেজকে একক রাফেজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেখানে একটি গাভী প্রতি ৫০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩ কেজি পরিমাণ সাইলেজ গ্রহণ করে থাকে। সাইলেজ এর সাথে কাঁচা ঘাস অথবা শুকনা খড়ও একত্রে গবাদিপ্রাণীকে খাওয়ানো যেতে পারে। সাধারণ নিয়মে দুই ভাগ সাইলেজ এর সাথে একভাগ কাঁচা ঘাস ও একভাগ খড় মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

ডোল সাইলেজের আর্থিক মূল্যায়ন

নীচে প্রায় ৭৫০ কেজি সাইলেজ সংরক্ষণ করা যায় এরকম একটি বাঁশের ডোলের আনুমানিক খরচের বিবরণ দেয়া হলো, যাতে সাধারণ খামারিরা ডোল সাইলেজ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারে।

পরিমাণ (কেজি)	ঘাসের উৎপাদন খরচ (প্রতি কেজি ০.৭৫ টাকা হিসাবে)	ডোলের মূল্য (টাকা)	পলিথিনের খরচ (টাকা)	শ্রমিক খরচ (টাকা)	মোট খরচ (টাকা)	প্রতি কেজি
৭৫০	৫৬০.৫	১২০০.০	৩২৫.০	৪০০.০	২৪৮৭.৫	৩.৩২*

*উল্লেখ্য যে, একবার ডোল ক্রয় করলে তা ৩ বছর ব্যবহার করা যাবে, সে হিসেবে প্রতি কেজি, সাইলেজের উৎপাদন খরচ কমে হবে প্রায় ২.২৫ টাকা।

এখন দেখা যাক, একটি খামারি সাইলেজের পরিবর্তে শুকনা খড় ব্যবহার করলে উৎপাদন খরচের কি পরিবর্তন হয়। ধরা যাক একটি খামারি একটি দেশী গাভী পালন করছেন, যেটি সবেমাত্র বাচ্চা দিয়েছে এবং প্রতিদিন ২ কেজি করে দুধ দিচ্ছে। কিন্তু তখন কাঁচা ঘাসের সংকটকালীন শুরু হওয়ায় তাকে সাইলেজ খাওয়াতে হচ্ছে। খামারির এক ডোল পরিমাণ সাইলেজ মজুত আছে যার পরিমাণ প্রায় ৭৫০ কেজি। প্রতিদিন গাভীর সঠিক চাহিদা মাফিক সাইলেজ সরবরাহ করলে গাভীটিকে দৈনিক ১৫ কেজি সাইলেজ সরবরাহ করতে হবে (সাথে পরিমাণ মত দানাদার মিশ্রণ), যার ফলে সে তার মজুতকৃত সাইলেজ প্রায় ৫০ দিন চালাতে পারবে এবং এই ৫০ দিনে তাকে শুধুমাত্র সাইলেজের জন্য প্রায় ১,৭০০.০০ টাকা খরচ করতে হবে। এখন যদি এ খামারি সাইলেজ না খাইয়ে শুকনা খড় (সাথে দানাদার মিশ্রণ পরিমাণ মত) খাওয়ায় তবে গাভীটির দৈনিক রাফেজের চাহিদা পূরণ করতে প্রতি দিন তাকে ৪ কেজি করে শুকনা খড় সরবরাহ করতে হবে এবং ৫০ দিনে মোট ২০০ কেজি খড় বাবদ প্রতি কেজি খড়ের বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১০ টাকা হিসাবে ২,০০০.০০ টাকা খরচ হবে। এছাড়াও আর একটি খরচ হবে যা হিসাবের মধ্যে যুক্ত হবে সেটি হচ্ছে দুধের উৎপাদন কমে যাওয়া। আমরা জানি শুকনা খড়ের মধ্যে পুষ্টি উপাদান খুবই কম। সেটি শুধু গরুর পেটেই ভরাই কিন্তু অনেক পুষ্টিরই ঘাটতি থাকে, যার ফলে কাংখিত দুধ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হয় না। দেখা যায় শুধুমাত্র খড়ভিত্তিক গবাদিপ্রাণী পালনে দুধের উৎপাদন সুষম খাদ্য যুক্ত গাভীর চেয়ে ২০-২৫ ভাগ কমে যায়। সে হিসাবে উক্ত খামারি প্রতিদিন আধা কেজি করে দুধ কম পেলে ৫০ দিনে ২৫ কেজি দুধ কম পাবে; যার বর্তমান মূল্য প্রতি কেজি ৬০ টাকা হিসেবে প্রায় ১,৫০০.০০ টাকা। সুতরাং, খামারির ৫০ দিনে মোট খরচ হবে প্রায় ৩,৫০০.০০ টাকা যা সাইলেজভিত্তিক খাদ্যের চেয়ে ১,৮০০.০০ টাকা বেশী এবং সেটা শুধুমাত্র ৫০ দিনের জন্য। কিন্তু, মোট দুধ উৎপাদন কাল ৬-৭ মাস হলে খড়ভিত্তিক খাদ্য খরচ অনেক বেড়ে যাবে, যা আমরা অনেকেই ভেবে দেখিনা। সুতরাং, লাভজনকভাবে গবাদি প্রাণী পালন করতে সাইলেজ খাওয়ানো অত্যাবশ্যক এবং ডোল সাইলেজ একটি খামারিবান্ধব খাদ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. নাথু রাম সরকার, ড. বিপ্লব কুমার রায়, ড. নাসরিন সুলতানা এবং ড. মোঃ জিল্লুর রহমান

বাছুরের জন্য সটি পাউডার ভিত্তিক মিল্ক রিপ্লেসার

একটি সুস্থ্য সবল বাছুরই আগামী দিনের ব্যবসা সফল দুগ্ধ খামারের হাতিয়ার। বাণিজ্যিক অথবা ক্ষুদ্র পরিসরে দুগ্ধ খামার লাভজনক করতে হলে বাছুরের সুস্বাস্থ্য এবং দৈহিক বৃদ্ধির জন্য জন্ম পরবর্তী প্রায় দুই মাস সময় পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের অধিকাংশ গাভী দেশী প্রজাতির হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে কম দুধ উৎপাদন করে থাকে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পুষ্টি সচেতনতা বা স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এদেশে দুধের উৎপাদন তেমন বাড়েনি। মানুষের খাবার হিসেবে দুধের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশী বাছুরের খাদ্য হিসেবে দুধ গ্রহণ ব্যয়বহুল হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় বাণিজ্যিক এমনকি ক্ষুদ্র দুগ্ধখামারিরা বাছুরকে দুধ খাওয়ানোর বিষয়টি অর্থের অপচয় হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। দেশীয় গাভীর কম দুধ উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির পাশাপাশি দুধের উচ্চ বাজারমূল্যের কারণেও অনেক খামারি বাছুরকে দুধ না খাইয়ে বা অভুক্ত রেখে প্রায় সবটুকু বাজারে বিক্রি করে দেন। এতে করে বাছুর তাঁর প্রয়োজনীয় পরিমাণ দুধ থেকে বঞ্চিত হয়ে পুষ্টিহীনতায় ভোগে। পুষ্টিহীনতাই পরবর্তীতে বাছুরের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী, রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে এবং বাছুরের বিভিন্ন ধরণের রোগ সংক্রমণ এবং মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এ সকল সমস্যাগুলো উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট বাছুরের খাদ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং মাঠপর্যায়ের দীর্ঘ গবেষণা শেষে "সটি পাউডার ভিত্তিক মিল্ক রিপ্লেসার" প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। প্রযুক্তিটির ব্যবহার যেমনি বাছুরের উৎপাদন দক্ষতা বাড়াতে সহায়ক হবে তেমনি প্রযুক্তিটির বাণিজ্যিকিকরণের মাধ্যমে খামারি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ আর্থিকভাবে লাভবান হবেন।

প্রযুক্তির বর্ণনা

সটি (Curcuma zedoaria) **সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ**

Zingiberaceae পরিবারভুক্ত বহুবর্ষজীবি মূল সৃষ্টিকারী (rhizomatous) একটি ঔষুধি উদ্ভিদ যার বৈজ্ঞানিক নাম Curcuma zedoaria; বাংলাদেশে সটি নামে পরিচিত। এ গাছটি বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলে জন্মে থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকায়, ছায়াযুক্ত স্থানে, রেল পথের আশেপাশে এবং লালমাটিতে এ গাছ গুলো খামারিরা চাষাবাদ করে থাকেন। সটিমূল খামারি অথবা বাজার থেকে সংগ্রহ/ক্রয় করে পানি দিয়ে মূলগুলো ভালোমতো পরিষ্কার করে নিতে হবে। পরিষ্কার করার পর মূলগুলো গরম পানিতে প্রায় ৬০ মিনিট সিদ্ধ করতে হবে। এরপর মূলগুলি ছোট ছোট করে কেটে রোদে ২-৩ দিন ভালোমত শুকিয়ে নিয়ে গ্রাভিং মেশিনের সাহায্যে (০.৫ মিলিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট চালুনি) গুড়ো করতে হবে।

মিল্ক রিপ্লেসার তৈরি, মিশ্রিতকরণ এবং প্যাকেজিং

মিল্ক রিপ্লোসার তৈরিতে ব্যবহৃত আরেকটি উপাদান 'সয়ামিল' একইভাবে গ্রাভিং মেশিনের সাহায্যে (০.৫ মিলিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট চালুনী) গুড়ো করতে হবে। সয়াবিন তেল ছাড়া অন্যান্য খাদ্য উপাদান সমূহ ছক নং-১ এ বর্ণিত মাত্রায় একটি খাদ্য মিশ্রণ মেশিনের সাহায্যে অথবা হাত দিয়ে ভালোভাবে মিশ্রিত করে সুবিধা পরিমাণ মিশ্রণ একটি বায়ুরুদ্ধ পলিথিন ব্যাগে প্যাকিং করতে হবে। বাছুরকে খাওয়ানোর ঠিক পূর্বে প্যাকেটের মিল্ক রিপ্লেসার পাউডার এর সহিত বর্ণিত মাত্রার সয়াবিন তেল মিশিয়ে নিতে হবে।

ছক ১: মিল্ক রিপ্লেসারের উপাদান

ক্রমিক নং	খাদ্য উপাদান	শতাংশ
১.০	সটি পাউডার	৩৯.০
২.০	সয়ামিল	৫০.০
৩.০	সয়াবিন তেল	০৯.০
৪.০	ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট	০১.০
৫.০	খাদ্য লবণ	০.০৫
৬.০	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.০৫

বাছুরকে খাওয়ানো

ছক-১ এ উল্লেখিত পরিমাণ সয়াবিন তেল (প্রতি কেজি মিল্ক রিপ্লেসার মিশ্রণের সাথে ৯.০ মিলি. সয়াবিন তেল) মিল্ক রিপ্লেসার এর সাথে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। অতঃপর ১ ভাগ মিল্ক রিপ্লেসার সাত ৭ ভাগ (মিল্ক রিপ্লেসার ও পানির অনুপাত ১:৭) ফুটন্ত (১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) পানির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশ্রণ কুসুম কুসুম গরমাবস্থায় (মিশ্রণের তাপমাত্রা ৩৭-৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস) বাছুরকে ফিডার অথবা বোতলের সাহায্যে খাওয়াতে হবে। বাছুর জন্মের ৫-৭ দিন পর থেকে ২ মাস বয়স পর্যন্ত দোহনকালীন সীমিত দুধ গ্রহণের পাশাপাশি বাছুরের দৈহিক ওজনের ১০ শতাংশ পরিমানে মিল্ক রিপ্লেসার মিশ্রণ খাওয়াতে হবে। পনের দিন বয়স থেকে বাছুরকে অল্প পরিমাণে দানাদার এবং সবুজ ঘাস খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে। এছাড়াও দুই মাস বয়স থেকে বাছুরকে মায়ের দুধের পাশাপাশি (দোহনকালীন সময় সীমিত পরিমাণ দুধ গ্রহন) পরিমাণমত কাফস্টার্টার (দানাদার মিশ্রণ) এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ সবুজ ঘাস সরবরাহ করতে হবে।

ছক ২: মিল্ক রিপ্লেসারের পুষ্টিমাণ (শতাংশ)

ড্রাই মেটার	৯২.৮৬
অর্গানিক মেটার	৯১.৬১
ক্রুড প্রোটিন	২৫.৫০
ইথার এক্সট্রাক্ট	১০.১১
টোটাল মিনারেল	৮.৩৯

বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত মিল্ক রিপ্লেসারের কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য ৬-১০ দিন বয়সী দেশী জাতের একদল বাছুরকে ২ মাস পর্যন্ত সটি বেসড মিল্ক রিপ্রেসার (রেস্ট্রিকটেড সাকলিং) এবং অন্য এক দল বাছুরকে শুধুমাত্র দুধ খাওয়ানো (রেস্ট্রিকটেড সাকলিং এবং বোতল ফিডিং) হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, মিল্ক রিপ্লেসার গ্রহণকাবী বাছুর প্রতিদিন গড়ে ২৯৮ গ্রাম হারে দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, দুধ গ্রহণকারী বাছুরের দৈহিক ওজন বৃদ্ধি কিছুটা বেশী হলেও (৩১২ গ্রাম), গ্রুপ দুটির মধ্যে দৈহিক বৃদ্ধির হারে পরিসংখ্যানগত কোন তাৎপর্য পাওয়া যায়নি। পক্ষান্তরে, খাদ্যরূপান্তর দক্ষতার (Feed Conversation Ratio) বিষয়টি বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, রিপ্লেসার গ্রহণকারী বাছুরের খাদ্য রূপান্তরের দক্ষতা হার (১.৯২) দুধ গ্রহণকারী দলের (২.৭৩) চেয়ে ভালো ছিল।

প্রযুক্তিটির আর্থ-সামাজিক উপযোগীতা

- কিছু পরিমাণ দুধের পাশাপাশি (দোহনকালীন সময়ে বাছুর কর্তৃক দুধ গ্রহণ) মিল্ক রিপ্লেসার খাওয়ালে বাছুরের দৈহিক বৃদ্ধি ভালো হয়।
- বাছুরকে শুধু দুধ খাওয়ানো খরচের চেয়ে মিল্ক রিপ্লেসার খাওয়ানোর খরচ তুলনামূলকভাবে অনেক কম।
- দুধ সাশ্রয়ের মাধ্যমে খামারিরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন এবং সাশ্রিত বা অতিরিক্ত দুধ মানুষের খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- বাছুরের পুষ্টিহীনতা দূর করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ এবং মৃত্যু ঝুঁকি কমায়।
- বাণিজ্যিকভাবে মিল্ক রিপ্লেসার প্রস্তুত করে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে খামারিরা/উদ্যোক্তাগণ আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন।

ব্যবহারের ক্ষেত্র এবং লাভ ক্ষতির হিসাব

বাণিজ্যিক দুগ্ধখামারি থেকে শুরু করে যে কোন পর্যায়ের বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে মিল্ক রিপ্লেসার তৈরি করতে পারেন। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি কেজি মিল্ক রিপ্লেসার এর উৎপাদন খরচ প্রায় ৯৪ টাকা। এই খরচ অনেকাংশে কমে যাবে যদি খামারি বা উদ্যোক্তাগণ নিজস্ব জমিতে সটি চাষাবাদ করেন। ছক-৩ এ বাছুরের প্রতিদিন খাবার খরচ দেখানো হলো-

ছক ৩: বাছুরকে খাওয়ানো খরচ (টাকা/দিন)

বিষয়	দুধ গ্রহনকারী	মিল্ক রিপ্লেসার গ্রহনকারী
দুধ গ্রহণ (ফিডারের মাধ্যমে)	৯৯.৬৫	-
দুধ গ্রহণ (রেস্ট্রিকটেড সাকলিং)	৩৯.৬৫	৬০.৬৫
মিল্ক রিপ্লেসার পাউডার	-	২২.২৩
দানাদার মিশ্রণ	৪.১৬	৩.০৯
সবুজ ঘাস	০.৩৭	০.২৯
জ্বালানী	২.০৮	২.০৮
মেডিসিন	০.৭০	০.৭০
আনুষঙ্গিক	০.৫০	০.৫০
মোট খরচ (টাকা/বাছুর/দিন)	১৪৭.৪২	৮৯.৫৫
দুধ গ্রহন (রেস্ট্রিকটেড সাকলিং) বাবদ খরচ বাদ দিলে মোট খরচ (টাকা/বাছুর/দিন)	১০৭.৭৭	২৮.৯০

উপসংহার

বিএলআরআই উদ্ভাবিত “সটি ভিত্তিক মিল্ক রিপ্লেসার” কম খরচে দক্ষতার সহিত বাছুরের দৈহিক বৃদ্ধি সাধন এবং রোগ বালাই এর ঝুঁকি কমাতে সক্ষম। ফলে ক্ষুদ্র দুগ্ধ খামারি থেকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে খামারিরা এটি ব্যবহার করে সফলতার সহিত বাছুর পালন করতে পারবেন প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে বাণিজ্যিকভাবে মিল্ক রিপ্লেসার উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ সামাজিক দায়িত্বপালনের পাশাপাশি আর্থিকভাবেও লাভবান হতে পারেন।

প্রযুক্তি উদ্ভাবক

ড. বিপ্লব কুমার রায়, ড. নাথু রাম সরকার, অনামিকা রায়, সরদার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ এবং ড. খান শহীদুল হক

সাজনা গাছের চাষ পদ্ধতি এবং গো-খাদ্য হিসেবে এর ব্যবহার

পটভূমি

বাংলাদেশের রোমন্থক (জাবরকাটা) প্রাণীর (গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া) খাদ্য ব্যবস্থা মূলতঃ আশঁ জাতীয় খাদ্য নির্ভর যা বিভিন্ন ফসলের উচ্ছিষ্ঠাংশসহ সকল উপজাত, সবুজ ঘাস, গাছের ও লতা পাতা। ঘাস জাতীয় খাদ্য হলো রোমন্থ্যক প্রাণীর প্রধান ও সহজলভ্য উৎস। প্রাণিসম্পদের অনুৎপাদনশীলতার মূল কারন পুষ্টিসম্পন্ন গুনগতমানের খাদ্যের অভাব। বর্তমানে দেশের প্রাণিখাদ্যের যথ াক্রমে ৪৪.৫% এবং ৭৯.৬% পরিমানে আঁশজাতীয় (রাফেজ) ও দানাদার খাদ্যের ঘাটতি রয়েছে, অর্থাৎ রাফেজ ও দানাদার খাদ্যের শুষ্ক পদার্থের মোট প্রয়োজনের যথাক্রমে ৪৯.২ ও ২৪.৬ মিলিয়ন টন। প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য, এই ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে, সহজলভ্য উন্নতমানের প্রাণিখাদ্য সরবরাহ বাড়ানো প্রয়োজন। জাবরকাটা প্রাণীর খাদ্যে শক্তি , আমিষ, খনিজ ও আঁশ অত্যবশ্যকীয়, যেখানে উন্নত পুষ্টিগুনাগুন সম্পন্ন ফরেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সেক্ষেত্রে, প্রাণিখাদ্যের ঘাটতি পূরণে ফডার টি« (Fodder tree) একটি বিকল্প কৌশল হতে পারে।

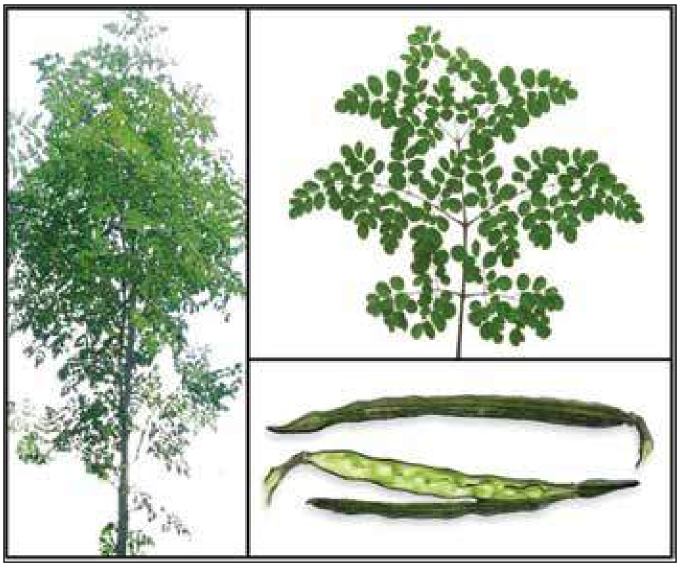

সাজনা গাছ যার বৈজ্ঞানিক নামঃ *Moringa oleifera* জাবরকাটা প্রাণীর জন্য একটি আদর্শ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা ০ যেতে পারে। ভারতীয় উপমহাদেশের এটি একটি স্থানীয় গাছ যা ড্রামস্টিক গাছ নামে পরিচিত। পৃথিবীতে ১৪ প্রজাতির সাজনার গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে, তম্মধ্যে *Moringa oleifera* এবং *Moringa stenopetala* উল্লেখযোগ্য। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্থানসহ সমগ্র গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে সাজনার চাষ হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের স্থানীয় এই গাছটি দ্রুত বর্ধনশীল, খরা প্রতিরোধী, ব্যাপক অভিযোজন ক্ষমতা, সহজে চাষযোগ্য ও উচ্চ পুষ্টি গুনাগুন সম্পন্ন, যার বহুমুখী ব্যবহার বিদ্যমান, যেমন; মানুষের খাদ্য (পাতা ও ফল), গবাদিপ্রাণির খাদ্য, ঔষধি গুনাগুন, রং, পানি পরিশোধন ইত্যাদি। সাজনা গাছ মধ্যম শক্ত ধরনের গাছ যা খরা সহিষ্ণু, বিভিন্ন মাত্রার তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, বিভিন্ন ধরণের মাটিতে জন্মায় এবং দ্রুত বর্ধনশীল। সাজনার পাতা উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ যাতে বিভিন্ন ধরনের অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড বিদ্যমান। এছাড়াও গাছটিতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খনিজ, রোগ নিরাময়কারী খাদ্য উপাদান এবং স্বাস্থ্যের জন্য উপকারি এন্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটমিন সমূহ বিদ্যমান। একটি একক গাছের মধ্যে এতোগুলো গুনাবলী একসাথে বিদ্যমান থাকায় মরিঙ্গাকে "অলৌকিক গাছ (Miracle tree)" নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই গাছের পাতা ও ফল মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও এই গাছের পাতাসহ শাখা প্রশাখা জাবরকাটা প্রাণীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সাজনার পাতাসহ কান্ড ও শাখা প্রশাখা উচ্চপুষ্টিমানের অধিকারী হওয়া সত্বেও প্রাণিখাদ্য হিসেবে সাজনাকে জনপ্রিয় করার প্রধান অন্তরায় হল প্রয়োজনীয় পরিমাণ বায়োমাস উৎপাদন। এ সমস্যা সমাধান ও খামারি পর্যায়ে সাজনাকে প্রাণিখাদ্য হিসেবে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সাজনার সমষ্টিগত উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এর বহুমুখী সম্প্রসারণের ওপর খামারি পর্যায়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। সাজনাকে খামারি পর্যায়ে সহজলভ্য করা ও এর বহুমূখী ব্যবহারের নিমিত্ত বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম, তথা- ডাল ও বীজ থেকে সাজনার চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও এর গুণগত ও পরিমাণগত উৎপাদনের সক্ষমতা যাচাই এবং চাষাবাদ কৌশলের বিভিন্ন জটিলতা নিরসনের জন্য নিবিড়ভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া, গবেষণার মাধ্যমে প্রাণিখাদ্য হিসেবে সাজনার চাষ করার জন্য চারা বা ডাল লাগানোর ঘনত্ব, প্রাণিখাদ্য হিসেবে সাজনার কাটিং এর উচ্চতা, প্রথম হারভেস্ট করার সময়, পরবর্তীতে বছরব্যাপী হারভেস্ট বিরতি ও সার প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছ। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের খামারিরা বিএলআরআই এর গবেষকদের পরামর্শ ক্রমে প্রাণিখাদ্য হিসেবে সাজনা চাষ করছে, যেখানে এর প্রানিখাদ্য ও নানাবিধ ব্যবহারের একটি ভ্যালু চেইন তৈরি হয়েছে।

সাজনার (পাতা, কান্ড, শাখা প্রশাখাসহ) পুষ্টিমান

পুষ্টি উপাদান	গ্রাম শুষ্ক উপাদান/কেজি
শুষ্ক উপাদান (ড্রাই মেটার)	১৮৬.০০-২৪২.৮৩
আশঁ	৬৬.০০-৯৫.৫০
ক্রুড প্রোটিন (সিপি)	১৮০.০০-২২৫.০০
এসিড ডিটারজেন্ট ফাইবার (এডিএফ)	২৬৮.৩০-৪১৪.০০
নিউট্রাল ডিটারজেন্ট ফাইবার (এনডিএফ)	৩৪৭.১১-৪৫০.০০
ইথার ইক্সট্রাক্ট (ক্রুড ফ্যাট)	২২.৬০-১০০.১০
এসিড ডিটারজেন্ট লিগনিং (এডিএল)	৯৯.৮৯-২০৯.০০
ক্যালসিয়াম	১৯.৮১-২১.৯৫
ফসফরাস	২.৩০-২.৩৯
মেটাবলাইজেবল শক্তি (মেগা জুল/কেজি শুষ্কবস্তু)	৯.৩০-১১.৫০

বিঃ দ্রঃ সাজনার পুষ্টিমান কাটিং বিরামকাল, কাটিং উচ্চতা এবং সর্বোপরি সাজনার পাতা ও শাখা প্রশাখার অনুপাতের ওপর নির্ভর করবে

সাজনার উৎপাদন ব্যবস্থা

মাটির ধরণ

জলাবদ্ধ স্থান ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের উঁচু জমি এমনকি পাহাড়ি ঢালু ও সমুদ্র তীরবর্তী লবণাক্ত জমিতে সাজনা জন্মায় তবে বেলে-দোআঁশ মাটিতে ভাল হয়।

তাপমাত্রা ও আদ্রর্তা

সাজনা এদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু সহিষ্ণু একটি গাছ। সাধারনভাবে এদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু সাজনা চাষের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও ২৫-৩১° সেঃ তাপমাত্রায় এর উৎপাদন বেশি হয়। আবার ছায়াযুক্ত স্থানে সাজনা চাষাবাদ করা হলে ৪৮° সেঃ তাপমাত্রা পর্যন্ত সহ্য করতে পারে এবং হালকা ঠান্ডায়ও বেঁচে থাকতে পারে। এ গাছটি খরা প্রবন এলাকাতেও চাষাবাদ করা যায়। পাশ ৩৫০-৪৬০ মিলি মিটার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত সাজনা চাষাবাদের জন্য উপযোগী। দীর্ঘায়িত বন্যা ও জমে থাকা পানি সাজনা গাছ সহ্য করতে পারে না। সাজনা গাছ চাষাবাদের জন্য বেলে-দোঁআশ মাটি উত্তম তবে এঁটেল মাটিতেও সাজনা গাছ চাষাবাদ করা যায়। এছাড়াও সাজনা গাছ চাষাবাদের জন্য মাটির অম্ল-ক্ষার মাত্রা (pH) ৫.০-৮.০ পর্যন্ত হওয়া বাঞ্চনীয়।

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

আমাদের দেশে সাধারণত দুইটি ভিন্ন জাতের সাজনার গাছ পাওয়া যায়। স্থানীয় ভাবে এর একটি জাতকে সাজনা বলা হয়। এর ড্রামস্টিক বা ফল দেখতে আকারে লম্বা হয়, পরিধি চিকন, ভিতরের বীজের রং সাদা এবং মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল আসে। অন্য জাতটি বাজনা হিসেবে পরিচিত। বাজনার ড্রামস্টিক বা ফল আকারে কিছুটা খাটো হয়। এর পরিধি কিছুটা মোটা, ভিতরে বীজ কালো রং এর হয়ে থাকে। বাজনা গাছে সাধারণত মে-জুন মাসে ফুল ধরে, উভয় জাতের গাছে ফুল আসার চার মাস পর থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয় এবং গাছ থেকে বীজ সংগ্রহের পর রোদে ভালভাবে শুকিয়ে (২-৩ দিন) ঠান্ডা করে সংরক্ষণ করতে হয়। এর পর বীজ যেকোন পাত্রে (প্লাস্টিক/টিনের কৌটা) অথবা পলিথিনে রেখে এর সাথে কিছু শুকনো নিমপাতা মিশিয়ে পাত্র বা পলিথিনের মুখ ভালোভাবে আটকিয়ে বায়ুরোধক অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হয়।

বাজনার বীজ

সাজনার বীজ

বীজের অঙ্কুরোদগম হার

একই কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনায় (Identical agronomic practices) দু'টি ভিন্ন জাতের মধ্যে কালো জাতের অর্থাৎ বাজনা বীজের অঙ্কুরোদগম হার ৮০-৯৫% এবং সাদা জাতের বীজের অঙ্কুরোদগম হার ৫৫-৬৫% যা কালো বীজের অঙ্কুরোদগম হার এর চেয়ে কম। এছাড়াও এজাতের সাজনার (বাজনা ফলসহ (ড্রামস্টিক) পাতা এবং কান্ডের উৎপাদন দক্ষতাও অনেক বেশি। তাই দেশীয় জাতের কালো বীজের সাজনা বাণিজ্যিক ভাবে চাষের মাধ্যমে একদিকে যেমন উন্নত পুষ্টিগুনগত সমৃদ্ধ গো-খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব অন্যদিকে গবাদি-শিল্পে এ খাদ্যের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দুধ এবং মাংসের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বীজতলা ও চারা তৈরি

সাজনার চারা উৎপাদনের জন্য প্রথমে বীজতলা তৈরি করতে হবে। ৩০ ফিট লম্বা ও ১২ ফিট চওড়া একটি বীজতলায় মোটামুটি ১২০০ থেকে ১৫০০ টি চারা উৎপাদন করা সম্ভব। ১০০ কেজি পরিমাণ বেলে দোঁ-আশ মাটিতে ৩০ কেজি শুকনো জৈব সার, ১০০ গ্রাম টিএসপি (ট্রিপল সুপার ফসফেট) এবং ৩০ গ্রাম পরিমাণ এমপি (মিউরেট অব পটাশ) সার ভালভাবে মিশিয়ে দুইদিন পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। এরপর অঙ্কুর গজানোর জন্য সাজনার বীজগুলো প্রথমে পানিতে ভিজিয়ে ছাঁয়াযুক্ত একটি স্থানে চটের বস্তার ভিতর রেখে দিতে হয়। বীজ তলার জন্য ব্যবহৃত মাটিতে পিঁপড়া অথবা অন্যকোন পোকামাকড় থাকলে ফুরাডন (২০ গ্রাম পরিমাণ প্রতি ১০০ কেজি মাটিতে) ব্যবহার করতে হবে। বীজতলা তৈরির জন্য ৬-৭ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং ৩-৪ ইঞ্চি প্রস্থ বিশিষ্ট পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার করা উত্তম। জৈব সার মিশ্রিত মাটি উক্ত পলিথিন ব্যাগে পূর্ণ করার পূর্বে ব্যাগের দুই পার্শ্ব দু'টি করে মোট চারটি ছিদ্র করে নিতে হবে। অতপর ব্যাগের উপরোক্ত মাটি থেকে নীচের দিকে প্রায় ১.৫-২.০ ইঞ্চি সমান হাত দিয়ে গর্ত করে উক্ত গর্তে বীজ বপণ করতে হবে।

জমি নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ

বাণিজ্যিকভাবে সাজনা গাছ চাষাবাদের জন্য জমি নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভেজা, স্যাঁতস্যাঁতে, বৃষ্টির পানি জমে থাকে এমনকি বন্যার পানি উঠে এমন মাটি বা জমি সাজনা চাষের জন্য উপযুক্ত নয়। সাধারণত সাজনা গাছ চাষাবাদের জন্য জমি প্রস্তুতকালীন প্রতি একর জমিতে ৫-৬ টন গোবর সার ৫০ কেজি ইউরিয়া, ৭০ কেজি টিএসপি ও ৩০ কেজি পরিমাণ এমপি সার প্রয়োগ করে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে মাটি ঝুর ঝুরে করতে হবে।

উল্লেখ্য, অঞ্চলভেদে মাটিতে বিদ্যমান পুষ্টিমাণের উপর নির্ভর করে জমিতে সারের প্রয়োগ মাত্রা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, জমিতে সাজনা গাছ লাগানোর পূর্বে মাটির পুষ্টিমাণ পরীক্ষা করে সার প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ করে নেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য, বেলে-দোঁআশ মাটির ক্ষেত্রে উপরেল্লিখিত সারের মাত্রা প্রয়োজ্য হবে। অন্যদিকে, লাল মাটির জন্য অন্যান্য সারের মাত্রা ঠিক রেখে কেবল ইউরিয়া সারের মাত্রা উপরে বর্ণিত মাত্রার চেয়ে প্রতি একরে ১৫ কেজি পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়াও সাজনা লাগানোর ২৫-৩০ দিন পর প্রতি একর জমিতে ৫০ কেজি ইউরিয়া এবং প্রতিবার সাজনা গাছ কাটার (প্রতি কাটিং) পরপর একই হারে অর্থ্যাৎ ৫০ কেজি পরিমাণ ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে

হবে। সাধারণত মার্চ থেকে অক্টোবর মাস সময় পর্যন্ত সাজনা গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় ফলে গাছের বায়োমাস উৎপাদন (Biomass production) বেশী হয়। শীত শুরু হওয়ার সাথে সাথে সাজনা গাছের বৃদ্ধি কমে যায় সেজন্য শীত কালে (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী) সাজনা গাছের বায়োমাস উৎপাদন কম হয়। একারণে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য মার্চ-মে মাসের মধ্যে সাজনার বীজতলা/ চারা তৈরি করা উত্তম।

সাজনার উৎপাদন ব্যবস্থা

বৈশিষ্ট্যাবলী	চাষ পদ্ধতি
চারা তৈরির সময়	শীত কাল ব্যতিত বছরের যেকোন সময় চারা তৈরি করা যায়, তবে উত্তম সময় হল ফালগুন-চৈত্র মাস (মার্চ-মে পর্যন্ত)।
রোপনের সময়	বছরের যেকোন সময় তবে উত্তম সময় হচ্ছে এপ্রিল-মে।
মাটির ধরন	জলাবদ্ধ স্থান ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরণের মাটি এমনকি পাহাড়ি ঢালু ও সমুদ্র তীরবর্তী লবনাক্ত জমি তবে বেলে- দোআঁশ মাটিতে ভাল হয়।
জমির তৈরি	উত্তম ভাবে চাষ করে জমি তৈরি করতে হবে।
চারা তৈরি	বীজতলা বীজ বপণের পর ৩৫ দিনের মধ্যে চারা জমিতে লাগানো উপযোগী হয়ে যায়।
চারার সংখ্যা	প্রতি একর জমিতে ৬,৫০০ টি চারা রোপণ করতে হবে।
চারা লাগানোর পদ্ধতি	বীজ লাগানোর ৩৫ দিন পর চারা গুলো সর্তকতার সহিত জমিতে লাগাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন মাটি ভেঙ্গে না যায। চারার পলিথিনের সমান করে গর্ত করে চারাটি সতর্কতার সাথে বপণ করতে হবে।
কাটিং উচ্চতা	মাটি থেকে ৬০ সে.মি. উপরে প্রথমে কাটতে হবে। পরে ৪০ দিন পর পর গাছ থেকে ৪-৫ ইঞ্চি রেখে সাজনার ডালগুলো কাটতে হবে।
চারার দুরত্ব	লাইন থেকে লাইন ৪৫ সে.মি. এবং চারা থেকে চারা ৩০ সে.মি.
সেচ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দিতে হবে।
সাজনার পাতাসহ ডাল সংগ্রহের সময়	৪০ দিন পরপর (গ্রীষ্ম, বর্ষা বা শরৎ কালে) ৬০ দিন পরপর (শীত কালে)
আগাছা দমন	অঞ্চলভেদে এর তারতম্য রয়েছে। প্রতি ১৫ দিন পর পর আগাছা পরিষ্কার করা ভাল।
বছরে কতবার কাটা যায়	চারা লাগানোর ১২০ দিন পর প্রথম কাটিং এভাবে প্রথম বছরে ৩-৪ বার। ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম বছরে ৫-৬ বার কাটা যায়।
পরিচর্যা ও রোগ দমন	অঞ্চলভেদে আগাছা দমনের তারতম্য রয়েছে। প্রতি ১৫ দিন পর পর আগাছা পরিষ্কার করা ভাল। ছত্রাকের আক্রমন সাজনা গাছের জন্য একটি বড় সমস্যা। রোগটি Moringa Di-bag নামে পরিচিত। ছত্রাক নিরোধক কীটণাশক যেমন- Bavistind ০.২% ব্যবহার করে এই ছত্রাকের আক্রমণ থেকে সাজনা গাছকে রক্ষা করা যায়।
মোট উৎপাদন (ফ্রেশ বায়োমাস)	তাজা সাজনা ফরেজ ২৬৪ টন/ হেঃ/বছর
	বছরে প্রতি হেক্টরে ৫২.৮ টন (৬ বার কাটিং; ২০% শুষ্ক বস্তু ধরে) শুষ্ক সাজনা খাবার তৈরি করা যায়।
খাবারের পদ্ধতি	● তাজা সাজনা ফরেজ কেঁটে চপিং করে সাথে সাথে খাওয়নো যেতে পারে ● সাজনা ফরেজ কেঁটে চপিং করে শুকিয়ে ম্যাশ করে খাওয়নো যেতে পারে। ● তাজা সাজনা ফরেজ কেঁটে চপিং করে তাজা অবস্থায় প্লাষ্টিক ব্যাগ বা ড্রাম এ বায়ুরোধ করে সংরক্ষণ (৭, ১৪, ২১, ২৮, ৩৫ দিনেরও বেশী) করে খাওয়নো যেতে পারে। ● শুকনা ম্যাশ সাজনা পিলেট তৈরি করে খাওয়ানো যেতে পারে। ● দানাদার খাদ্যের বিকল্প হিসাবে সাজনা খাবার গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রাণি খাদ্য হিসেবে প্রক্রিয়াজাতকরণ

ম্যাশ খাদ্য

প্রথমে সাজনার হারভেস্ট করার পর চপার মেশিন দিয়ে কুচিকুচি (২-৩ সে. মি.) করে কাটতে হবে। তারপর রোদে ৪৮-৭২ ঘণ্টা শুকাতে হবে যাতে তার আর্দ্রতার পরিমাণ ৮-১০% থাকে। ভাঙ্গানো শুষ্ক কাটিং গুলো পরে গ্রাইন্ডার মেশিনে গুড়া করে সাজনার ম্যাশ তৈরি করতে হবে। তৈরিকৃত ম্যাশ গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

প্যালেট

সাজনা গুড়ো ৬০ শতাংশ, গমের ভুসি ২৫ শতাংশ, গম ভাঙ্গা ১২ শতাংশ, ডিসিপি ১ শতাংশ, মিনারেল ১ শতাংশ, এবং লবণ ১ শতাংশ এর মাধ্যমে সাজনা পিলেট খাবার তৈরি করা হয়। অতিরিক্ত হিসেবে ০.৫% পেলেট বাইন্ডার এবং ১.৫% চিটাগুড় ব্যবহার করা হয়। তৈরিকৃত পিলেট দানাদার খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

সাইলেজ হিসেবে সংরক্ষণ

সাজনা পাতা ও শাখা প্রশাখাসহ হারভেস্ট করার পর চপার মেশিন দিয়ে কুচিকুচি (২-৩ সে. মি.) করে কাটতে হবে। অতঃপর প্লাস্টিক ব্যাগ অথবা ড্রামের মধ্যে বায়ুরোধী অবস্থায় ৩ দিন থেকে ৬৩ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে দুধাল গাভী, অথবা বাড়ন্ত গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াকে খাওয়ানো যেতে পারে।

গবেষণার ফলাফল

- গরু মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে অন্য খাদ্যের চেয়ে সাজনা খাদ্য খাওয়ালে প্রতিদিন প্রায় ২৫-৩৫% ওজন বৃদ্ধি পায়।
- সাজনা খাদ্য খাওয়ালে দুধের উৎপাদন ১০-২৫% বৃদ্ধিসহ দুধের ননির পরিমাণ ১% বৃদ্ধি পায়।
- অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় সাজনা খাদ্যের মাধ্যমে Blood cholesterol প্রায় ৫০% কমে যায়।
- ছাগলকে তাজা সাজনা বা শুকনা ম্যাশ করে সম্পূর্ণ খাদ্য (যার ক্রুড প্রোটিন ১৮.২৫%,এডিএফ ৩৪.৪৯% ও মেটাবলাইজেবল শক্তি ১০.৪২/কেজি শুষ্ক বস্তু) হিসেবে খাওয়ালে দৈনিক গড় দৈহিক ৬১.০০ গ্রাম ওজন বৃদ্ধি পায়।
- ছাগল ও ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনায় ৩০% ভেজষ খাদ্যের সাথে দানাদার জাতীয় খাদ্যকে সাজনার শুকনা ম্যাশ (যার ক্রুড প্রোটিন ২৩.৫% ও এডিএফ ২৫.৮০%, এনডিএফ ৩৮.৮৭ ও মেটাবলাইজেবল শক্তি ১১.৩৬) সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন সম্ভব এবং উভয় ক্ষেত্রে দৈহিক ওজন অপরিবর্তিত হারে বৃদ্ধি পায়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: গরু, ছাগল ও ভেড়ার ক্ষেত্রে খাদ্য হিসেবে সাজনা গাছের কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।

ফডার হিসাবে সাজনার চাষের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সার সংক্ষেপ

একজন খামারি বা উদ্যোক্তা যদি ১ (এক) হেক্টর জমি চাষ করে, তাহলে ১ম বৎসর প্রতি মাসে ১০৯৯০.০০ টাকা, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বৎসরে ৬৫২৮৩.৩৩ টাকা আয় হয় যার বিসিআর (BCR) ও আই আর আর (IRR) নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

বিসিআর	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর
	১.১১	২.৪৬	২.৪৬	২.৪৬	২.৪৬
আই আর আর (%)	৩৭.৫৮				

সাজনার মার্কেটিং মডেল/ সাজনার ভ্যালুচেইন

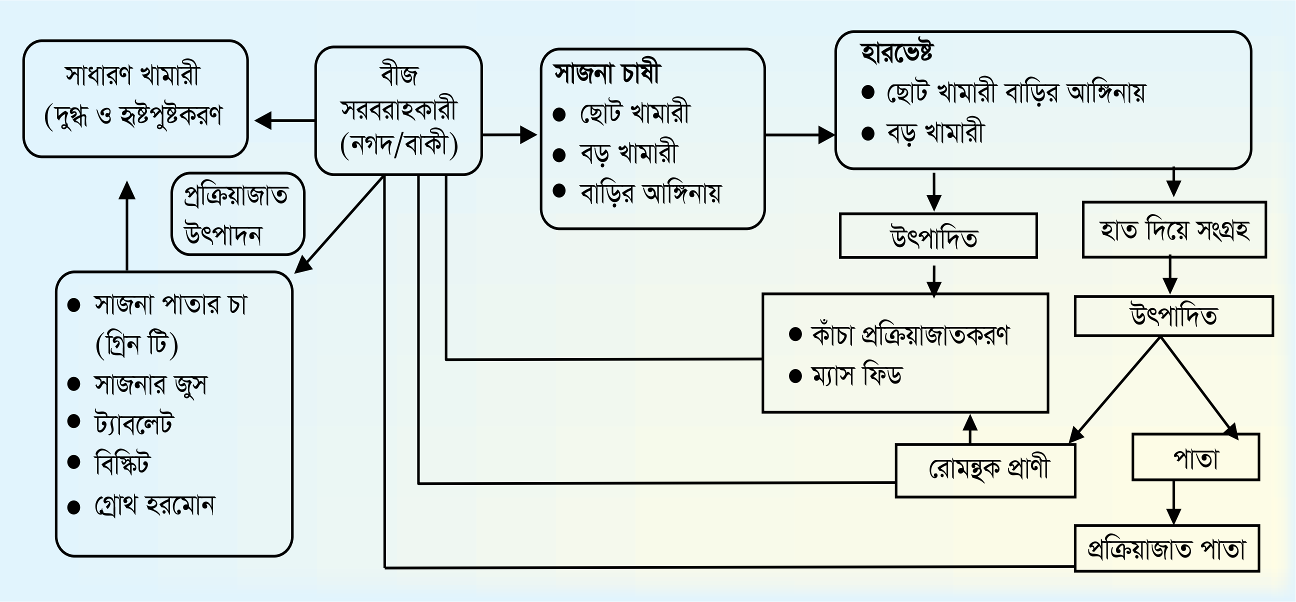

চিত্র: সাজনার মার্কেটিং মডেল / সাজনার ভ্যালুচেইন

উপসংহার: সাজনার গাছ অধিক পুষ্টিমান সমৃদ্ধ, দ্রুত বর্ধনশীল এবং অধিক বায়োমাস উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি অপার সম্ভাবনাময় গাছ। জলবায়ু ভেদে ভিন্ন অঞ্চল, অনুর্বর জমি এমনকি লবনাক্ত মাটিতেও সাজনা গাছ ভালো জন্মায়। খরা এলাকার প্রতি সাজনার সহনশীলতাও প্রশংসনীয়। ইতোমধ্যে বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে প্রমানিত হয়েছে যে, প্রাণী খাদ্য হিসেবে মরিঙ্গা বা সাজনার চাষ কৌশলগত ভাবে সম্ভব এবং অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক ও টেকসই। সুতরাং প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও প্রাণী খাদ্যের ঘাটতি পূরণে সাজনা গাছের চাষ পদ্ধতি এবং গো-খাদ্য হিসেবে এর ব্যবহার প্রযুক্তিটি মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে স্ব-বান্ধব ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

ফডার হিসাবে সাজনা চাষে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সার সংক্ষেপ (প্রযুক্তির-অর্থনৈতিক পরিমিতি)

ক্রমিক নং	একক	পরিমিতি
১.	জমির পরিমাণ	১ হেক্টর
২.	সাজনার ভ্যারাইটি	দেশী ব্লাক এন্ড হোয়াইট
৩.	গাছ থেকে গাছ এবং লাইন থেকে লাইন ব্যবধান	৩০ সেঃ মিঃ × ৪৫ সেঃ মিঃ
৪.	বীজের পরিমাণ (সংখ্যা/হেক্টর)	২২.০ কেজি
৫.	বীজের দাম (টাকা/কেজি)	৪০০০/=
৬.	শ্রমিক {৬৪০ ম্যান ডে (৩৬০+২৮০)}(৪০০.০০/দিন)	২,৫৬০০০.০০
৭.	জৈব সার (কেজি/হেক্টর)	৫০০০
৮.	মূল্য (টাকা/কেজি)	৫.০০
৯.	ইউরিয়া সার (কেজি/হেক্টর)	২৫০
১০.	মূল্য (টাকা/কেজি)	২০.০০
১১.	টিএসপি (কেজি/হেক্টর	১২৫
১২.	মূল্য (টাকা/কেজি)	১৫.০০
১৩.	সেচের সংখ্যা/বছর (অক্টোবর থেকে মার্চ, ৭ দিন পর পর হলে ২৬ দিন সেচ দিতে হবে, প্রতি সেচে খরচ ১৩৫০/বার	৩৫১০০.০০
১৪.	পানি সেচ খরচ (টাকা/হেক্টর/বছর)	১৩৫০.০০
১৫.	গড় ফ্রেশ বায়োমাস (কেজি/গাছ/কাটা)	৪.০০
১৬.	ফ্রেশ বায়োমাস (কাটিং সংখ্যা/বছর)	৬
১৭.	গড় ফ্রেশ বায়োমাস (টন/হেক্টর/বছর)	৪৪
১৮.	ফ্রেশ বায়োমাসের পরিমাণ (টন/হেক্টর/বছর)	২৬৪
১৯.	শুকনা বায়োমান (টন/হেক্টর/বছর)	৫২.৮
২০.	একবার লাগানোর পর জীবনকাল (বছর)	৫

ফডার হিসাবে সাজনা চাষের খরচের বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	১ হেক্টর জমিতে (১ম বছর)
ক)	**বিনিয়োগ খরচ**	
১.	নিজস্ব জমি	-
২.	জমি প্রস্তুতি	-
৩.	চারা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী (নেট, বাঁশ এবং প্লাস্টিক সামগ্রী) বা চারা প্রস্তুতের খরচ (৮ টাকা/চারা)	৫৩৩৫২০.০০
৪.	বীজ (২২ কেজি @ ৪০০০)	৮৮০০০.০০
৫.	চপিং মেশিন	৩০০০০.০০
খ)	**রক্ষণাবেক্ষণ খরচ**	
১.	শ্রমিক খরচ	২৫৬০০০.০০
২.	জৈব সারের খরচ	২৫০০০
৩.	সার খরচ	২০০০০
৪.	জৈব সার ও অজৈব সার প্রয়োগের খরচ	-
৫.	ফানজিসাইড/ছত্রাক নাশক	৫০০.০০
৬.	আন্তঃপরিচর্যা	-
৭.	সেচ বাবদ খরচ	৩৫১০০.০০
৮.	সাজনা হারভেষ্ট, চপিং এবং পরিমাণ	-
৯.	প্লাস্টিক ব্যাগ (৫০ কেজি প্রতি ব্যাগ হিসেবে ৭৫০০ @ ২০)	১৫০০০০
	মোট খরচ	১১৩৮১২০.০০

ফডার হিসাবে সাজনার চাষ: আয়-ব্যয়ের খরচের বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	বছর-১	বছর-২	বছর-৩	বছর-৪	বছর-৫
			বিনিয়োগ খরচ			
	নিজস্ব জমি	-	-	-	-	-
১.০	জমি প্রস্তুতি	-	-	-	-	-
২.০	চারা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী (নেট, বাঁশ এবং প্লাস্টিক সামগ্রী) বা চারা প্রস্তুতের খরচ (৮ টাকা/চারা)	৫৩৩৫২০.০০				
৩.০	বীজ (২২ কেজি @ ৪০০০)	৮৮০০০.০০	-	-	-	-
৪.০	চপিং মেশিন	৩০০০০.০০	-	-	-	-
৫.০	রক্ষণাবেক্ষণ খরচ	-	-	-	-	-
৬.০	শ্রমিক খরচ	২৫৬০০০.০০	২৫৬০০০.০০	২৫৬০০০.০০	২৫৬০০০.০০	২৫৬০০০.০০
৭.০	জৈব সারের খরচ	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০
৮.০	সার খরচ	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০
৯.০	জৈব সার ও অজৈব সার প্রয়োগের খরচ	-	-	-	-	-
১০.০	ফানজিসাইড/ছত্রাকনাশক	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০
১১.০	আন্তঃপরিচর্যা	-	-	-	-	-
১২.০	সেচ বাবদ খরচ	৩৫১০০.০০	৩৫১০০.০০	৩৫১০০.০০	৩৫১০০.০০	৩৫১০০.০০
১৩.০	সাজনা হারভেস্ট, চপিং এবং পরিবহন	-	-	-	-	-
১৪.০	প্লাস্টিক ব্যাগ (৫০ কেজি প্রতি ব্যাগ হিসেবে ৭৫০০ @ ২০)	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০
১৫.০	অন্যান্য	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০
	মোট খরচ	১১৮৮১২০.০০	৫৩৬৬০০.০০	৫৩৬৬০০.০০	৫৩৬৬০০.০০	৫৩৬৬০০.০০
	আয়					
	ফ্রেশ সাজনা উৎপাদন (টন/হেঃ/বছর)	২৬৪.০০	২৬৪.০০	২৬৪.০০	২৬৪.০০	২৬৪.০০
	ফ্রেশ সাজনার বিক্রয় মূল্য (টাকা/কেজি)	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০
	উৎপাদিত সাজনার মোট মূল্য (টাকা/বছর)	১৩২০০০০.০০	১৩২০০০০.০০	১৩২০০০০.০০	১৩২০০০০.০০	১৩২০০০০.০০
	আয়/হেক্টর/বছর	১৩১৮৮০.০০	৭৮৩৪০০.০০	৭৮৩৪০০.০০	৭৮৩৪০০.০০	৭৮৩৪০০.০০
	আয়/হেক্টর/মাস	১০৯৯০.০০	৬৫২৮৩.৩৩	৬৫২৮৩.৩৩	৬৫২৮৩.৩৩	৬৫২৮৩.৩৩
	বিসিআর	১.১১	২.৪৬	২.৪৬	২.৪৬	২.৪৬
	আই আর আর (%)	৩৭.৫৮				

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. নাসরিন সুলতানা, ড. খান শহীদুল হক, মোহাম্মদ খায়রুল বাসার, ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন এবং ড. বিপ্লব কুমার রায়

ফডারের বায়োমেট্রিক্যাল র‌্যাংকিং টুল

উচ্চ ফলনশীল ঘাসের চাষাবাদ টেকসই ও লাভজনক প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে খামার পর্যায়ে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে বিভিন্ন ধরণের ধানের খড়, বিভিন্ন জাতের দেশী ঘাসের পাশাপাশি ভুট্টা, নেপিয়ার, জার্মান, পারা, সরগম, ওটস ইত্যাদি ঘাসের চাষাবাদ হয়। বাংলাদেশে খামারিরা তাদের নিজস্ব খামারের জন্য অথবা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে চাষাবাদ করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে থাকেন। গবাদিপ্রাণী পালনের ক্ষেত্রে খামারিরা তাদের প্রচলিত খামার ব্যবস্থাপনা থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে উন্নত খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনার রূপান্তরের পাশাপাশি ক্ষুদ্র খামার থেকে বাণিজ্যিক খামারে রূপান্তর পদ্ধতির সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টার কারণে দেশে বিভিন্ন ধরণের ঘাসের উৎপাদন যেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে একইভাবে বিভিন্ন জাতের ঘাসের বীজের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘাসের বীজের বাজার চাহিদাকে পুজি করে বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন বীজ বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উৎস এবং বিদেশ থেকে ঘাসের নতুন নতুন বীজ আমদানিপূর্বক দেশের স্থানীয় বাজারে বিক্রি করছেন। আমদানিকৃত ঘাসের বার্ষিক উৎপাদন দক্ষতা, পুষ্টিমান, প্রাণীর উৎপাদন দক্ষতা, উৎপাদন খরচ, অর্থাৎ লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণ এবং ঘাস ব্যবহারে প্রাণীর আন্ত্রিক (রুমেন) মিথেন শক্তি অপচয় ইত্যাদি যাচাইয়ের মাধ্যমে ফডার বীজ বাজারজাত করা হলে খামারিগণ লাভবান হবেন। বর্তমানে উপযোগিতাগুলো যাচাই বা বিষয়ে পর্যাপ্ত ডেটাবেজগুলো বিবেচনা না করে বীজ আমদানি করা হচ্ছে এতে করে খামারিরা অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতির সম্মুখীন হন। উক্ত উপযোগিতাগুলো রেংকিং করার জন্য কোন পদ্ধতি/টুল/সূত্র নেই। বিএলআরআই ২০১৩ সাল থেকে অদ্যবধি ধারাবাহিক গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে খামার, সম্প্রসারণবিদ, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে ব্যবহার উপযোগী ঘাসের র‌্যাংকিং টুল হিসেবে নিম্নলিখিত সমীকরণগুলো উদ্ভাবন করা হয়েছে। উক্ত সমীকরণগুলোতে ভুট্টা ঘাসের সাইলেজকে পরিমাপক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ জন্য ভুট্টার সাইলেজের তুলনায় কোন ফডার কতটা দক্ষ তা মেইজ ইনডেক্স (Maize Index) দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে।

সমীকরণ-১: ঘাসের উৎপাদন ক্ষমতা, $X_{ddm} = \frac{\text{Yddm of a fodder}}{\text{Yddm of maize}}$ যেখানে, Yddm= (DMY-DMY*% HL)*% D kg/ha

সমীকরণ-২: প্রাণীর উৎপাদন দক্ষতা, $X_{ap} = \frac{\text{Yap of fodder}}{\text{Yap of maize}}$ যেখানে, $Y_{ap} = \frac{\text{LWG (kg)* DDM(kg}}{\text{DMI (kg)*D(\%}}$ kg/ha

সমীকরণ-৩: রুমেনে মিথেন শক্তি অপচয় নির্ণায়ক, $X_{CH4} = \frac{\text{YCH4 of Maize}}{\text{YCH4 of fodder}}$ যেখানে, $Y_{CH4} = \frac{\text{CH4 emission,kg/d}}{\text{LWG (kg/d}}$ kg/ha

সমীকরণ-৪: লাভ-ক্ষতির দক্ষতা, $X_{bc} = \frac{\text{Ybc of fodder}}{\text{Ybc of maize}}$ যেখানে, $Y_{bc} = \frac{GR_f}{GC_f}$

বিভিন্ন বছরে একাধিক ফিডিং ট্রায়াল পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন নির্ণায়ক সূচক তৈরি (সারণী-১) এবং সেগুলো ব্যবহারে উপরোক্ত সমীকরণগুলো উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা একটি ফডারের গুনগতমানগুলো নির্ণয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা যায়। উপরোক্ত চারটি (৪) সমীকরণ একত্রেও বিবেচনা করে ঘাসের বায়োমেট্রিক্যাল মেইজ ইনডেক্সটি (Mi; সমীকরণ-৫) উদ্ভাবন করা হয়েছে।

$M_i = \frac{Xddm + Xap + XCH4 + Xbc}{4}$ (সমীকরণ-৫) অথবা, M_i

$$\frac{\frac{y\text{ (Fodder DDM)}}{\text{Maize DDM}} + \frac{y\text{ (Kg LW of Fodder)}}{\text{Kg LW of Maize}} + \frac{\frac{KgCH_4}{\text{Kg LW gain}}\text{ of Maize}}{y} + \frac{y}{\frac{GR_f}{GC_f}\text{ of Maize}}}{\mathbf{4}}$$

মেইজ বা ভুট্টা ঘাস সারা বিশ্বে গবাদিপ্রাণীর জন্য উৎকৃষ্ট এবং একটি আদর্শ আঁশ জাতীয় খাবার (Roughage) হিসেবে স্বীকৃত। সে জন্য গবেষণায় মেইজ বা ভুট্টার পুষ্টিসহগ (Nutrient coefficient) একক (১) ধরে অন্যান্য ঘাসের পুষ্টিসহগ নির্ণয় করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, লোকাল ঘাস, ইউরিয়া চিটাগুড় মিশ্রিত খড় (আমন) ইউরিয়া চিটাগুড় মিশ্রিত খড় (আউশ), প্লিকাটুলুম, এন্ড্রোপোগান,

স্প্লেনডিডা, পারা, এবং জার্মান ঘাসের পুষ্টিসহগ যথাক্রমে ০.৩৫, ০.৩৯, ০.৪১, ০.৩৫, ০.৫০, ০.৪৩, ০.৪০ এবং ০.৭২। বিভিন্ন ধরণের নেপিয়ার যেমন নেপিয়ার বাজরা, নেপিয়ার এ্যারোসা এবং নেপিয়ার হাইব্রিড এর পুষ্টিসহগগুলো যথাক্রমে ০.৮২, ০.৫৭ এবং ০.৬৩। এছাড়াও জাম্বু ঘাসের (সরগম) বিভিন্ন কালটিভার এর পুষ্টিসহগ যথাক্রমে জাম্বু-গ্রীণ ০.৪২, সুগারগ্রেস জাম্বু ০.৪৫ এবং অস্ট্রেলিয়ান সুইট জাম্বু ০.৯৯। অন্যদিকে, গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত সাজনা ঘাসের পুষ্টিসহ পাওয়া যায় ১.৬৪। উল্লেখিত ডেটাবেজ সহ উদ্ভাবিত "ফডার‌্যাংকিং টুল" ব্যবহার করে প্রথমত খামারিরা গবাদিপ্রাণীর জন্য মূল্যসাশ্রয়ী রেশন তৈরির উপযোগী ঘাস নির্বাচন করার মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। একইভাবে বায়োমেট্রিক র‌্যাংকিং টুলগুলো ফডার বীজ আমদানি, প্রত্যয়ন, সম্প্রসারণ এবং শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হলে উন্নতমানের ঘাস এবং দেশে দুধ ও মাংসের উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সারণী- ১: গবাদিপ্রাণী প্রতিপালনের ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ঘাসের মেইজ ইনডেক্স (Mi)

ঘাসের নাম	X_{ddm}	X_{ap}	X_{CH4}	X_{bc}	M_i	D%	DMI, %LW
লোকাল ঘাস	০.১৭	০.১১	০.৫০	০.৬৩	০.৩৫	৪১.৫০	১.৫৭
প্লিকাটুলুম	০.৫৭	০.০৭	০.১৩	০.৬৩	০.৩৫	৫৫.৩০	১.৭০
নেপিয়ার-বাজরা	০.৯১	০.৮০	০.৮০	০.৭৯	০.৮২	৪৯.২০	১.৩২
নেপিয়ার-এ্যারোসা		০.৫৯	০.৪৪	০.৫৫	০.৬৯	০.৫৭	৩৯.০০
নেপিয়ার- হাইব্রিড	০.৯৮	০.৩২	০.৩১	০.৯১	০.৬৩	৫০.২০	২.০৮
এন্ডোপোগান	০.৬৭	০.২৯	০.৩৭	০.৬৯	০.৫০	৪৭.১০	১.৬২
স্প্লেনডিডা	০.৬০	০.২০	০.২৭	০.৬৬	০.৪৩	৪৪.৫০	১.৪৫
ভুট্টা/মেইজ	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	৫৯.২০	২.১৪
ইউএমএস (আমন ধানের খড়)	০.২৩	০.০৫	০.১৮	১.১০	০.৩৯	৪৫.৫০	১.৯২
ইউএমএস (আউশ ধানের খড়)	০.১৪	০.০৫	০.৩০	১.১৬	০.৪১	৪৪.৪০	২.০৮
সাজনা ঘাস (Moringafeed)	১.৮৩	২.১২	১.২১	১.৪০	১.৬৪	৬২.৭০	২.৮১
সুগারগ্রেজ-জাম্বু	০.৭৪	০.১৫	০.১৯	০.৭২	০.৪৫	৫৩.০০	১.৭৯
অস্ট্রেলিয়ান সুইট জাম্বু	০.৯৭	১.০৫	০.৯৬	০.৯৬	০.৯৯	৫১.০০	২.২৫
জাম্বু-গ্রীণ	০.৬৩	-০.৩৩	০.৫২	০.৮৬	০.৪২	৫৩.৮০	১.৯৪
পারা ঘাস	০.৬৭	-০.৪০	০.৬৬	০.৬৯	০.৪০	৫৪.২০	১.৫৫
জার্মান ঘাস	১.০৩	০.৩৬	০.৪৫	১.০৬	০.৭২	৬৪.২০	১.৭০

X_{ddm} = ঘাসের উৎপাদন ক্ষমতা; X_{ap} = প্রাণীর উৎপাদন দক্ষতা; X_{CH4} = রুমেনে মিথেন শর্ি অপচয় নির্ণায়ক; X_{bc} = লাভ-ক্ষতির দক্ষতা; D% = ঘাসের পরিপাচ্যতা (শতাংশ); DMI = শুষ্ক বস্তু গ্রহণ (ড্রাই মেটার ইনটেক); % LW = দৈহিক ওজন (শতাংশ)

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. বিপ্লব কুমার রায়, ননী গোপাল দাস, নাজমুল হুদা এবং ড. খান শহীদুল হক

শস্য-উপজাত ভিত্তিক প্রাণী খাদ্য হিসাবে টি.এম.আর. প্রযুক্তি

বাংলাদেশে গবাদি প্রাণী উৎপাদনে অনেকগুলো অন্তরায় বিদ্যমান। তন্মধ্যে গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য ঘাটতিই হচ্ছে অন্যতম প্রধান সমস্যা। বাংলাদেশের গবাদিপ্রাণীর অন্যতম প্রধান খাদ্য উপাদান হচ্ছে ধানের শুকনো খড় যা থেকে গবাদি প্রাণীর প্রয়োজনীয় ক্যালরীর ৯০ ভাগই পুরণ হয়ে থাকে। দেখা গেছে যে, দেশে গবাদি প্রাণীর মোট শুষ্ক খাদ্যের ঘাটতি প্রায় ৪০%, মোট পরিপাচ্য পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি প্রায় ৩৮%, পরিপাচ্য আমিষের ঘাটতি প্রায় ৬০% এবং বিপাকীয় শক্তির ঘাটতি প্রায় ৫৮%। অন্য একটি হিসাবে দেখা গেছে যে, দেশে আশজাতীয় খাদ্যের ঘাটতি প্রায় ৬৭% এবং দানাদার খাদ্যের ঘাটতি প্রায় ৯০%। দেশে যে সকল খাদ্য-শস্য উৎপাদিত হয়, সেখান থেকে শস্য-উপজাত হিসাবে শুকনা খড় বা নাড়া বের হয় যার বেশির ভাগই জ্বালানী কাজে ব্যবহার করা হয় কিংবা অপচয় করা হয় (ধানের খড় ছাড়া)।

আমাদের গবাদি প্রাণীর জন্য যে পরিমাণ শুকনা খড় প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি উৎপাদিত হয়, কিন্তু সেগুলোর সঠিক সংরক্ষণ ও ব্যবহারের অভাবে খাদ্য ঘাটতি দেখা যায়। এছাড়াও শস্য-উপজাত হিসাবে গম, সয়াবিন, ভুট্টা, ইক্ষু, ডাল জাতীয় উদ্ভিদ ইত্যাদিও সঠিকভাবে ব্যবহারের অভাবে অপচয় হয়। এ সমস্ত শস্য-উপজাতের অপচয় রোধ করে যদি তা যথাযথ কাজে লাগিয়ে গবাদি প্রাণীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় তবে খাদ্য ঘাটতি অনেকটাই কমে যাবে। শস্য-উপজাত ও দানাদার খাদ্যের ঘণীভূত সংমিশ্রণে গঠিত পরিপূর্ণ সুষম খাদ্য অর্থাৎ টি.এম.আর (টোটাল মিক্সড রেশন) এমন একটি নতুন ধারনা যা গবাদি প্রাণীর সকল পুষ্টি উপাদান প্রাপ্তি নিশ্চিত করে। টি.এম.আর দানাদার এবং আশজাতীয় খাদ্যের সমন্বয়ে গঠিত যা প্রাণীকে ২৪ ঘন্টাই সরবরাহ করা যায়, ফলে অন্য কোন বাড়তি খাবার দেয়ার প্রয়োজন নেই, কারন এতে প্রাণীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় সকল পুষ্টি উপাদানই (মাইক্রো ও ম্যাক্রো) সুষম আকারে সন্নিবেশিত থাকে।

টি.এম.আর কেন ব্যবহার করবেন?

প্রযুক্তিটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটি প্রানীর বাছাই করে খাওয়ার প্রবণতা দূর করে খাদ্য অপচয় রোধ করে প্রাণীর সুষম খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করে। অর্থাৎ, গবাদি প্রাণী কর্তৃক এর প্রতিটি কামড়েই রয়েছে সকল পুষ্টি উপাদান। এটি গবাদি প্রাণীর দেহের পাকস্থলির পারিপার্শিক পরিবেশ ঠিক রেখে পাকস্থলিতে খাদ্যের সঠিক গাঁজন নিশ্চিত করে পরিপাচ্যতা বৃদ্ধি, সঠিক অ্যামোনিয়া মুক্তকরণের মাধ্যমে নাইটোজেনের ভারসাম্য রক্ষা এবং কম মানের আশজাতীয় খাদ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। এর ফলে প্রাণীর দুধ ও মাংস উৎপাদন তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায় এবং খাদ্য খরচ কমে গিয়ে খামারের মুনাফা বেড়ে যায়। এটি তৈরি করে বেশ কিছুদিন সংরক্ষণ করা এবং সহজেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পরিবহন করা যায়। সুতরাং গবাদি প্রাণী পালনকারী খামারিদের জন্য এটি একটি চমকপ্রদ খাদ্য প্রযুক্তি।

টি.এম.আর পস্তুত প্রণালী

টি.এম.আর প্রস্তুত করতে দুই ধরনের খাদ্য উপাদান লাগে; আশজাতীয় খাদ্য যেমনঃ শুকনা খড় (ধান, গম, সয়াবিন, ইত্যাদি), মেইজ স্টোভার (ভুট্টা সংগ্রহ করার পরে অবশিষ্ট গাছের অংশ), "সাইলেজ বা "হে যে কোন একটি বা উভয়টি এবং দানাদার খাদ্য মিশ্রণ যেমনঃ গমের ভুসি, চালের কুড়া, ভুট্টা ভাঙ্গা, সয়াবিন মিল, খেসারি বা অন্য কোন ডালের ভুসি, তিল বা সরিষার খৈল, শুটকি মাছের গুঁড়া, লালীগুড়, ডিসিপি, লবণ, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে প্রাণীর জাত, প্রকার (মাংস বা দুধ উৎপাদনকারী), বয়স, এবং উৎপাদনের পর্যায় অনুসারে আশজাতীয় ও দানাদারের মিশ্রণে তারতম্য হয়ে থাকে। সাধারণতঃ আঁশ ও দানাদারের অনুপাত ৭০:৩০ বা ৬০:৪০ বা ৫০:৫০ হয়ে থাকে। তবে আমাদের দেশের জন্য ৬০:৪০ অনুপাতই হচ্ছে সবচেয়ে অর্থনৈতিক সাশ্রয়ী। টি.এম.আর প্রস্তুত করণের পূর্বে খামারিকে আগে খাদ্য উপাদান বাছাই করতে হবে। যে সকল খাদ্য উপাদান তাদের জন্য সহজলভ্য এবং মুল্য তুলনামূলকভাবে কম সেগুলো বাছাই করে উপাদান গুলোর রাসায়নিক মান তথা পুষ্টিমান কত তা জেনে নিতে হবে। সেটার জন্য প্রাণিপুষ্টি বিশেষজ্ঞের সরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে কিংবা কোন পুষ্টি গবেষণাগার থেকেও নমুনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে জেনে নেয়া যেতে পারে। গবেষণাগারে নমুনা বিশ্লেষণে প্রাপ্ত কিছু খাদ্য উপাদানের পুষ্টিমান নিম্নরূপঃ

সারণী-১: বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের পুষ্টি মান

খাদ্য উপাদান	শুষ্ক পদার্থ (%)	আমিষ (%)	বিপাকীয় শক্তি (মে.জুল /কেজি শুষ্ক পদার্থ)
গমের ভুসি	৮৭.৫	১৫.০	১০.৬
খেসারি ভুসি	৮৬.৫	১৩.০	৭.৭৫
চালের কুড়া	৯০.৫	১৪.০	১১.৮
ভুট্টার গুড়া	৯১.০	৯.৭	১২.৫
সয়াবিন মিল	৮৬.০	৪৪.০	১৩.৭
সরিষার খৈল	৮৬.০	৩৫.৭	১১.১১
তিলের খৈল	৯২.০	২৮.০	৮.৯১
লালীগুড়	৭৫.০	৫.০	১২.৫
মেইজ স্টোভার	৮৯.০	৫.৫	৮.৯
শুকনা খড়	৯২.০	৪.০	৫.৫
সাইলেজ	৩২.০	৭.২	৮.৫
ডাল জাতীয় হে	৮৯.০	১৫.২	৮.৫
নেপিয়ারঘাস	২০.০	৯.৪	৭.৫
জাম্বু ঘাস	১৬.০	১১.০	৭.৬
ভুট্টা ঘাস	২৫.০	৮.০	৯.৯

এরপর আঁশ এবং দানাদার খাদ্যের অনুপাত ঠিক রেখে শতকরা ১৫-১৬ ভাগ আমিষ এবং প্রতি কেজি শুষ্ক খাদ্যে ১০-১২ মেগাজুল বিপাকীয় শক্তি সম্পন্ন একটি সুষম খাদ্যের মিশ্রণ প্রস্তুত করতে হবে। নিম্নে এরকম একটি খাদ্য মিশ্রণ দেয়া হ'লঃ

সারণী-২: আঁশ ও দানাদারের অনুপাত ৬০: ৪০

খাদ্যের প্রকার	খাদ্য উপাদান	কেজি
আঁশজাতীয় শস্য-উপজাত (৬০%)	নেপিয়ার সাইলেজ	৪৮.০
	সয়াবিনের খড়	১২.০
দানাদার (৪০%)	গমের ভুসি	১০.৫
	খেসারীর ভুসি	১০.০
	সয়াবিন মিল	১৬.৫
	ডি.সি.পি.	২.৫
	লবণ	০.৫

সারণী-৩: আঁশ ও দানাদারের অনুপাত ৬০: ৪০

খাদ্যের প্রকার	খাদ্য উপাদান	কেজি
আঁশজাতীয় শস্য-উপজাত (৫০%)	ধানের খড় বা মেইজ স্টোভার	৫০.০
দানাদার (৫০%)	গমের ভুসি	০৮
	খেসারীর ভুসি	০৪
	সয়াবিন মিল	২৫
	লালীগুড়	১০
	ডি.সি.পি.	২.৫
	লবণ	০.৫

আঁশ ও দনাদার খাদ্যের অনুপাত অনুযায়ী আমিষ ও শর্করার মাত্রা ঠিক রেখে খাদ্য উপাদানের পরিমাণ নির্ধারণ করার পরে আঁশজাতীয় খাদ্যগুলোকে চপিং/গ্রাইন্ডিং করে নিতে হবে।

অতঃপর সকল উপাদানগুলোকে ভালভাবে মিশ্রিত করে নিতে হবে। মিক্সার মেশিন হলে ভাল হয়, নতুবা হাত দ্বারা মিশ্রণ করলেই ওটা গবাদিপ্রাণীর খাওয়ার উপযুক্ত একটি পরিপূর্ণ খাদ্য মিশ্রণ হয়ে গেল।

আর যদি তা ব্লক (টি.এম.আর.ব্লক) আকারে করা হয় তবে পূর্বে মিশ্রিত খাদ্য উপাদানের সাথে লালীগুড়ের সমপরিমাণ পানি মিশ্রিত করে (৯×৯×৯) সে.মি. মাপের একটি কাঠ বা লোহার ছাঁচে ঢেলে কিছুক্ষণ চাপ দিয়ে ইটের মত খাদ্য ব্লক তৈরি করা হয় যেটির ওজন মোটামুটি ৫ কেজির মত হবে। এর পর ব্লকটি কিছুটা শুকিয়ে পলিথিনে মুড়িয়ে কয়েক দিনের জন্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

টি.এম.আর. খাওয়ানোর ফলাফলঃ

গবেষণায় দেখা গেছে যে, টি.এম.আর. খাওয়ানোর ফলে গাভীর দুধ উৎপাদন ১২-১৫% এবং দুধে ননীর পরিমাণ ৭-১০% বৃদ্ধি পায়। বাড়ন্ত দেশি ষাঁড় বাছুরের প্রত্যহ মাংশ বৃদ্ধি যেখানে ৪০০-৫০০ গ্রাম, সেখানে টি.এম.আর. খাওয়ানোর ফলে তার প্রত্যহ দৈহিক বৃদ্ধি হয় ৮৫০-৯০০ গ্রাম। এছাড়াও গাভীর আর্থিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে টি.এম.আর. এর বি.সি.আর ১.৩৮, অর্থাৎ ১ টাকা খরচ করলে আয় হয় ১.৩৮ টাকা (মুনাফা শতকরা ৩৮ ভাগ) এবং মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে বি.সি.আর ২.৪, অর্থাৎ ১ টাকা খরচ করলে আয় হয় ২.৪০ টাকা।

উপসংহারঃ

টি.এম.আর. খাদ্য প্রযুক্তির সবচেয়ে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ শস্য-উপজাতের অপচয় রোধ করে তা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে এর পুষ্টিমান বৃদ্ধি করে গবাদি প্রাণীর বিশাল খাদ্য ঘাটতি পূরণে সহায়ক।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. নাথু রাম সরকার, ড. মোঃ আহসান হাবীব এবং দিলরুবা ইয়াসমিন

ক্ষুদ্র খামারিদের জন্য বাণিজ্যিক লেয়ার পালন

ভূমিকা

দারিদ্র্য বিমোচনে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা সকল মহলে সমাদৃত ও পরীক্ষিত। বর্তমানে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদিপ্রাণী, হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনে বেসরকারি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হলেও অনেক উদ্যোক্তা আধুনিক প্রযুক্তি ও পুঁজির অভাবে ঝরে পড়েছে। যদিও বেসরকারি খামার স্থাপনে বাণিজ্যিক খামারিরা সরকারের নিকট থেকে আর্থিক সহযোগিতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। কিন্তু ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের খামারিরা এ ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের দারিদ্র্য বিমোচন তথা আত্ম-কর্মসংস্থান ও পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি লাগসই যুগোপযোগী লেয়ার মডেল উদ্ভাবন করেছে।

এই মডেলের আওতায় একজন ক্ষুদ্র খামারি ২০০ টি লেয়ার মুরগি পালন করে তার পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা দৈনন্দিন সাংসারিক খরচাদি ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষাসহ যাবতীয় খরচ মিটিয়ে বৎসরে প্রায় ৮০০০ থেকে ৯০০০ টাকা সঞ্চয় করতে পারবে। (পূর্বের তথ্য) তাছাড়া, একজন খামারি তার নিজস্ব পারিবারিক শ্রমকে সঠিকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মে নিয়োজিত থেকে এ দেশের প্রোটিন ঘাটতি পূরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে। তাই, আত্ম-কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যমোচন এবং প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণসহ জাতীয় অর্থনীতিতে লেয়ার মডেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মডেলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

লেয়ার পালন মডেলটি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নে বর্ণিত অংগ (Component) গুলি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে হবে :

১. সঠিকভাবে সুফলভোগী/খামারি নির্বাচন
২. খামারি সংগঠন তৈরি
৩. পারিবারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ
৪. খামারের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে নির্ধারিত ডিজাইনে বায়োসিকিউরিটি রক্ষা মূলক মুরগির ঘর তৈরি
৫. বাচ্চার উপযুক্ত ব্রুডিং

৬. মুরগির সঠিক জাত বা স্ট্রেইন নির্বাচন
৭. গুণগত মান সম্পন্ন সুষম খাদ্য তৈরি এবং সঠিকভাবে ব্যবহার
৮. উপকরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা
৯. সংগঠনের মাধ্যমে সকল উপকরণ ক্রয় এবং খামারের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করা
১০. নিয়মিতভাবে সদস্যদের মতবিনিময় সভা করা
১১. সংগঠনের সদস্যদের জন্য আপদকালীন আর্থিক সংস্থান রাখার ব্যবস্থা করা

মডেল বাস্তবায়ন কৌশল

খামারি নির্বাচন ও সংগঠিতকরণ

বাংলাদেশের যে কোনো এলাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ১০-১২ জন উৎসাহী/আগ্রহী, স্বল্প শিক্ষিত পরিশ্রমী ও সৎ মহিলা/পুরুষ বা বেকার যুবককে খামারি হিসেবে নির্বাচন করত তাদেরকে সংগঠিত করা হয়। তবে নির্বাচিত খামারিদের যাতে লেয়ার খামার স্থাপনের জন্য নিজস্ব জমি থাকে এবং সেই স্থানটি লেয়ার পালনের জন্য অবশ্যই যথোপযোগী হতে হবে। নির্ধারিত খামারিদের সংগঠনের আওতায় আনলে খামারিরা দলগতভাবে খাদ্য, টিকা ও খাদ্য মিশ্রিত করণ প্রভৃতি কাজ মিলেমিশে করতে পারে। তাছাড়া, দলগতভাবে কাজ করলে খামারিরা তাদের খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে একে অপরের সাথে মতবিনিময়ের ফলে নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারে।

নির্বাচিত খামারির পারিবারিক প্রশিক্ষণ

নির্বাচিত খামারিকে লেয়ার পালনের ওপর এক সপ্তাহের একটি প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং এই প্রশিক্ষণে লেয়ার পালনের তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ যেমন, ঘর তৈরি, লেয়ার বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা, সুষম রেশন ফরমুলেশন, টিকাদান কর্মসূচি, খাদ্য সংরক্ষণ, লেয়ারের বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকার, বায়োসিকিউরিটি, আলোক ব্যবস্থাপনা, জীবাণুনাশকের ব্যবহারের গুরুত্ব, রেকর্ড সংরক্ষণের গুরুত্ব, বাজারজাতকরণ এবং খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাবের পাশাপাশি সকল বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। যাতে একজন নতুন খামারি "হাতে করে শিখে"বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিবারের দুইজন সদস্যকে অবশ্যই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। খামারের সকল প্রয়োজনে পারিবারিক সহযোগিতা নিশ্চিত হবে।

ফলোআপ প্রশিক্ষণ

দুই এক ব্যাচ মুরগি পালনের পর সমস্যাভিত্তিক ফলোআপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর।

খামারের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে নির্ধারিত ডিজাইনে মুরগির বায়োসিকিউরিটি রক্ষামূলক ঘর তৈরি :

খামারের স্থান নির্বাচন

তত্ত্বীয়ভাবে পোল্ট্রি খামারের জন্য যে সমস্ত শর্ত পালন করে স্থান নির্বাচন করার কথা তা পুরোপুরি সম্ভব না হলেও নিম্নলিখিত শর্ত পালনপূর্বক স্থান নির্বাচন করা দরকার। স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত শর্তসমূহ পালন করা দরকার তা নিম্নরূপঃ

১. উঁচু এবং ভালো নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ আবাসিক আবাসন হতে একটু দূরে হওয়া ভাল
২. আশপাশে খামার থাকলে তা নিরাপদ দূরত্বে থাকা বাঞ্ছনীয়
৩. লিটার সরিয়ে ফেলার ভালো ব্যবস্থা/সুযোগ থাকা প্রয়োজন
৪. আশপাশে পচা ডোবা ও নর্দমামুক্ত হতে হবে
৫. যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকতে হবে
৬. বিশুদ্ধ পানি ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকতে হবে
৭. খামার পরিচালনার জন্য পরিবারের সদস্যদের যথেষ্ট আগ্রহ থাকতে হবে
৮. বাজারজাতকরণের সুবিধা থাকতে হবে

বাসস্থান নির্মাণ

ডিমপাড়া মুরগি পালনের ক্ষেত্রে খামারের আকার অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়। একজন ক্ষুদ্র খামারির জন্য ২০০ টি মুরগি পালন উপযোগী ঘরের নকশা এবং নির্মাণ নিম্নে দেয়া হলো। ২০০ টি মুরগি পালনের জন্য সার্ভিস এরিয়াসহ (৫+২৫) × ১২ বর্গফুট জায়গাই যথেষ্ট। এতে প্রতিটি মুরগির জন্য প্রায় ১.৫২ বর্গফুট জায়গা দেয়া হয়েছে। ঘরটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে সূর্য্যের আলো ঘরের মধ্যে সরাসরি প্রবেশ করতে না পারে এবং বায়ু এক পাশ থেকে প্রবেশ করে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। এতে বিশুদ্ধ বায়ু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে এ্যামোনিয়াসহ অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস বিতারিত হয়ে মুরগির জন্য আরামদায়ক পরিবেশের সৃষ্টি করবে এবং যা লিটার শুষ্ক রাখতে সাহায্য করবে।

ঘরের বর্ণনা

মেঝে

মাঁচা পদ্ধতিতে মুরগি পালনের জন্য ঘরের নকশা উপরে দেয়া হয়েছে। এলাকাভিত্তিক প্রাপ্ত উপকরণের ভিত্তিতে বাঁশের অথবা সুপারি গাছের ফালি দিয়ে মাঁচা তৈরি করা যায়। মুরগির বিষ্ঠা ভালোভাবে নিচে পড়ে যাওয়ার জন্য এক ফালি থেকে অন্য ফালির দূরত্ব ১ ইঞ্চি রাখা হয়েছে। প্রতিটি ঘরে ৬০ বর্গফুটের একটি সার্ভিস এরিয়া রাখা হয়েছে, যা খাদ্য, ঔষধ পত্র এবং অন্যান্য পোল্ট্রি উপকরণ রাখতে সাহায্য করবে। মাঁচা ভূমি থেকে সাড়ে তিন ফুট উঁচুতে করা হয়েছে যাতে লিটার পরিষ্কারে সুবিধা হয় এবং লিটার সব সময় শুকনা থাকে।

পাশের বেড়া

সার্ভিস এরিয়া ছাড়া অন্য দিকের বেড়াগুলো বাশেঁর চটা দিয়ে ১ বর্গ ইঞ্চি তার জালি তৈরি করা যায় যাতে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল করতে পারে। তবে বাশেঁর পরিবর্তে বাজারে যে গ্যালভানাইজড তারের তারজালি পাওয়া যায় তাও ব্যবহার করা যায়।

চালা

স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সামগ্রী উপকরণ যেমন-ছন, গোলপাতা, বাশের চাটাই প্রভৃতি দিয়েই ঘরের চালা তৈরি করা যায়। তবে ছন এবং গোলপাতা দিয়ে তৈরি চালা পোল্ট্রি পালনের জন্য বিশেষ উপযোগী বলে গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাছাড়া অপেক্ষাকৃত সস্তা ঢেউটিন, পলিথিন প্রভৃতি চালা তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে টিন দিয়ে চালা তৈরি করলে অবশ্যই টিনের নিচে তাপ নিরোধক যেমন বাঁশের চাটাই ব্যবহার করতে হবে।

ঘর জীবাণুমুক্তকরণ

সঠিক স্বাস্থ্যবিধি পালন লাভজনক মুরগির খামারের পূর্বশর্ত। তাই ঘর তৈরির পর প্রথম কাজ হচ্ছে ঘর জীবাণুমুক্তকরণ। প্রথমে ঝাড়ু এবং পরে ব্রাশ দিয়ে ঘসে ধুলাবালি ও ময়লা পরিষ্কার করার পর পরিষ্কার পানি দিয়ে সম্পূর্ণ ঘর ধুয়ে দিতে হবে। অতপর জীবাণুনাশক দিয়ে সম্পূর্ণ ঘর ভিজিয়ে ১ দিন রেখে দিতে হবে। স্থানীয়ভাবে বাজারে অনেক জীবাণুনাশক পাওয়া গেলেও ক্লোরেক্স নামক তরল জীবাণুনাশক ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া গেছে। উৎপাদনকারী ব্যবহারবিধি অনুসারে মিশ্রণ অনুপাতে ১০ লিটার পানির সাথে এবং ৪০ মিলি ক্লোরেক্স মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে। নতুবা বাচ্চা অতি সহজেই রোগাক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে। ঘরে বাচ্চা সরবরাহের কমপক্ষে এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত। প্রথম দিন ঝাড়ু ও পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে এবং দ্বিতীয় দিন ঝাড়ু, ব্রাশ ও পানি দিয়ে পরিষ্কার, তৃতীয় ও চতুর্থ দিন সকালে জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে এবং সবশেষে পরিষ্কার পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলতে হবে।

বাচ্চা উঠানোর আগে মুরগির ঘর তৈরিকরণ

ধাপসমূহ

১. পরিষ্কার পানি দিয়ে মুরগির ঘর স্প্রে করে পরিষ্কার করা।
২. পানির সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ জীবাণুনাশক মিশিয়ে মুরগির ঘর স্প্রের মাধ্যমে জীবাণুনাশকরণ। (ক্লোরেক্স-৪০মি.লি./১০ লিটার পানি)।
৩. এয়ার টাইড ঘরের ক্ষেত্রে ধূমায়িতকরণের মাধ্যমে জীবাণুমুক্তকরণ ভালো।
৪. মুরগির ঘরে ক্যানপি এবং চিকগার্ড লাগানো।
৫. ঘরের তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা পরীক্ষাকরণ।
৬. খাবারের পাত্র এবং পানির পাত্র জীবাণুমুক্ত করা।
৭. ঘরে মুরগির বাচ্চা উঠানো।

বাচ্চার উপযুক্ত ব্রুডিং

প্রচলিত বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে অথবা বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বাঁশের তৈরি চিক ব্রুডার ব্যবহার করেও ব্রুডিং করা যায়। যদি বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চিক ব্রুডারের নির্মাণ ব্যয় একটু বেশি তথাপিও এর কার্যকারিতা অন্যান্য ব্রুডারের চেয়ে অনেক ভালো। ব্রুডিংকালীন সময়ে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। যে পদ্ধতিতেই ব্রুডিং করা হোক না কেন তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সঠিক রাখতে হবে তা না হলে বাচ্চার সঠিক বৃদ্ধি সম্ভব হবে না। ঋতুভেদে ব্রুডিং সময়কাল পরিবর্তন হতে পারে যেমন, গ্রীষ্মকালে ২-৩ সপ্তাহ আবার শীতকালে ৩-৪ সপ্তাহ ব্রুডিং করতে হতে পারে। ব্রুডিং-এর সময় যে তাপমাত্রা বজায় রাখতে হবে তা নিম্নে দেয়া হলো।

সপ্তাহ	তাপমাত্রা
১ম	৯৫০ সেঃ
২য়	৯০০ সেঃ
৩য়	৮৫০ সেঃ
৪র্থ	৮০০ সেঃ
৫ম	৭৫০ সেঃ
৬ষ্ঠ	৭০০ সেঃ

প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্রুডিং-এর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চিকগার্ড স্থাপন। সাধারণত ২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট চিকগার্ড হোভার থেকে ২.০- ২.৫ ফুট দূরে স্থাপন হরা হয়। চিকগার্ড হিসেবে হার্ডবোর্ড, বাঁশের চাটাই ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। তবে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত বাঁশের চাটাই অথবা ফ্রেমের মধ্যে পাতলা চট দিয়েও চিকগার্ড বানানো যায়। অবস্থা এবং সহজ লভ্যতার ওপর ভিত্তি করে চিকগার্ড বানাতে হবে এবং তা স্থাপনের পূর্বে, পূর্বের নিয়মে যথাযথভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

ব্রুডিং করার সময় ব্রুডারের ভেতরের বাচ্চার অবস্থা দেখে বুঝতে হবে তাপমাত্রা সঠিক আছে কি না? এ জন্য নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সাধারণত ব্রুডারের ভেতর বাচ্চার অবস্থান তিনটি অবস্থায় বিরাজ করতে পারে।

আরামদায়ক অবস্থা

বাচ্চা ব্রুডারের ভেতর ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় থাকবে। বাচ্চার অবস্থান, আরামদায়ক অবস্থা বিদ্যমান।

অতিরিক্ত গরম

এ অবস্থায় বাচ্চা ব্রুডারের ভেতর চিকগার্ডের গায়ের দিকে সরে থাকবে অর্থাৎ চিকগার্ড ঘেঁষে অবস্থান করবে।

অতিরিক্ত ঠান্ডাঃ এ অবস্থায় বাচ্চাগুলো হোভারের খুব কাছাকাছি চলে এসে গাদাগাদি করবে।

প্রতিকার

অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডায় তাপের উৎসের তাপমাত্রা যথাক্রমে কমিয়ে বা বাড়িয়ে সঠিক তাপমাত্রা সমন্বয় করতে হবে।

বাচ্চার প্রথম খাদ্য

লেয়ার বাচ্চা খামারে পৌছানোর পর পরই প্রথম গ্লুকোজ, ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন এবং ভিটামিন 'সি' মিশ্রিত পানি (প্রতি লিটারে ২৫ গ্রাম গ্লুকোজ, ১ গ্রাম ভিটামিন ডঝ, এবং ১ গ্রাম ভিটামিন 'সি') চিকগার্ডের পানির পাত্রে সরবরাহ করতে হবে। অতপর চিকগার্ডের ভেতরে বাচ্চা ছাড়তে হবে। প্রয়োজনে বাচ্চা ছাড়ার পূর্বে বাচ্চার ঠোঁট গ্লুকোজ ও ভিটামিন মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে পানি পান করাতে হবে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বাচ্চা ছাড়ার পর কমপক্ষে ৩ ঘন্টা বা বাচ্চার জন্য তৈরিকৃত খাদ্যের যোগান দেয়া যেতে পারে। তারপর লেয়ার স্টারটার সরবরাহ করা হয়। লেয়ার স্টারটারে শতকরা ১৬-১৭ ভাগ প্রোটিন ২৮০০-২৯০০ কেজি ক্যালরি বিপাকীয় শক্তি (ক্যালরি/কেজি) থাকে। প্রথম সপ্তাহে প্রতিটি বাচ্চার জন্য গড়ে ৬-৮ গ্রাম খাবার দরকার হয়।

মুরগির সঠিক জাত বা স্ট্রেইন নির্বাচন

মুরগির খামারে লাভ-ক্ষতির অনেক অংশ নির্ভর করে উপযুক্ত ও সঠিক মুরগির জাত বা স্ট্রেইন নির্বাচনের ওপর। আবহাওয়া, খাদ্যের গুণগতমান, ঘরের ধরন ও ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে সঠিক জাত বাঁ স্ট্রেইন নির্বাচন করতে হবে। খামারের জন্য এক দিনের বাচ্চা সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। গুণগত মানসম্পন্ন নিরোগ বাচ্চা ভালো উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য তৈরি এবং সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

গুণগত মান সম্পন্ন খাদ্য এবং তার সঠিক ব্যবহার মুরগি পালনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি মুরগি পালনে খাদ্যে প্রায় ৬০-৭০ ভাগ খরচ হয়। ভালো খাদ্য তৈরি বা ক্রয় এবং এর সুষ্ঠ ব্যবহার লাভজনক মুরগি পালনে অত্যাবশ্যক।

বাড়ন্ত বাচ্চা পালন

ব্রুডিং শেষে ১৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত সময় কালকে সাধারণত বাড়ন্ত অবস্থা বলা হয়। এ সময়টা ডিম পাড়া মুরগির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা বাড়ন্ত অবস্থার ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ ডিম উৎপাদন। বাড়ন্তকালীন সময়ে ঝাঁকের সমতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঝাঁকের সব মুরগি গুলোর দৈহিক ওজন কাছাকাছি না থাকলে সবল বাচ্চা প্রতিযোগিতা করে বেশি খাদ্য খেয়ে ফেলে আর দুর্বল বাচ্চাগুলো আরো দুর্বলতর হতে থাকে। তাই সকল বাচ্চার মধ্যে সমতা আনায়নের জন্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল বাচ্চার দিকে নিবিড় তদারকির বিশেষ প্রয়োজন। সমতা রক্ষার জন্য খাদ্য গ্রহণের স্থান অর্থাৎ খাদ্য পাত্রের সংখ্যা অধিক গুরত্বপূর্ণ। খাবার পাত্র ও পানির পাত্রের সংখ্যা কম হলে বাচ্চার দৈহিক ওজনের সমতা আনয়নে ব্যাঘাত ঘটে। বাংলাদেশে প্রচলিত খাদ্য পাত্রে সাধারণত ১৪টি বা ১৮টি মুরগির একত্রে খাদ্য গ্রহণের স্থান থাকে। তাই মোট মুরগির সংখ্যাকে ১৪ কিংবা ১৮ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তার পূর্ণ সংখ্যা হিসাব করে খাদ্য পাত্র স্থাপন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। পানির পাত্রের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা নিতে হবে। মুরগির বাড়ন্ত অবস্থায় ঠোট কাটলে ভালো ফল পাওয়া যায়। ঠোঁট না কাটলে প্রতিদিন মুরগির ঘরে শাক সবজি পরিষ্কার করে ঝুলিয়ে রাখলে ঠোকরা ঠুকরির মত বদ অভ্যাস অনেক কমে যাবে। তবে লেয়ার মুরগিকে দুই বার ঠোঁট কাটা উত্তম। এক বার ৬-১৪ দিনের মধ্যে এবং আর এক বার ১২-১৬ সপ্তাহ বয়সে। কোন কোন সময় তিন বারও ঠোঁট কাটার প্রয়োজন হয়ে থাকে।

প্রি- লেয়ার

সাধারণত ১৮-২০ অথবা ১৮-২২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত মুরগিকে প্রি-লেয়ার বলা হয়। এ সময় মুরগির ঝাঁকের গড় ওজন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি আছে কি না তা পরীক্ষা করা দরকার। এই সময় বাড়ন্ত রেশনের পরিবর্তে প্রি-লেয়ার রেশন সরবরাহ করা প্রয়োজন। ২০ সপ্তাহ বয়েসে ঝাঁকের ওজন লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি থাকলে দিনের আলোর সাথে অতিরিক্ত আলো সরবরাহের মাধ্যমে উদ্দীপনা দেয়া প্রয়োজন। এ সময় ডিম উৎপাদন শতকরা ৫ ভাগ অতিক্রম করলে প্রি-লেয়ার ফিডের পরিবর্তে লেয়ার ফিড সরবরাহ করতে হবে। পুলেট কালিন সময়ের শুরুতে মুরগির ঘরে ডিম পাড়ার বাক্স বসাতে হবে।

ডিমপাড়া মুরগি পালন

মুরগির যখন ডিম দেয়া শুরু করবে তখন থেকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোনো ধরনের বদ অভ্যাস সৃষ্টি হয় হয় কি না যেমন অনেক ক্ষেত্রে মুরগির ডিম ভেঙে ফেলে, মলদ্বার ঠোকরানো অথবা ডিম ভেঙে খাওয়া শুরু করা। এ সমস্ত বদঅভ্যাস যদি দেখা দেয় তবে শ্রীঘ্রই প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। বিভিন্ন কারণে এগুলো হতে পারে এ জন্য প্রথমেই কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞ পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। ডিমপাড়া কালিন সময়ে আলো প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গড়ে ১৬ ঘণ্টা আলোক প্রদান, আদর্শ ডিম উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন। খাদ্য ও পানি সরবরাহ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সরবরাহ করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে ডিম উৎপাদনের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই রুটিনমাফিক কাজ, লাভজনক পোল্ট্রির পালনের চাবিকাঠি। এ সময় মুরগির ডিমপাড়ার জন্য ডিমপাড়ার বাক্স ঘরের মধ্যে স্থাপন করতে হবে। প্রতি ৪-৫ টি মুরগির জন্য ১টি ডিমপাড়ার বক্স বরাদ্দ রাখতে হয়। ডিম পাড়া বাক্সের পরিমাপ ১ × ১ × ১.২৫ (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) ঘনফুট হলেই চলে। মুরগির ঘরের অন্ধকার যুক্তস্থানে যেখানে কম আলো এবং যেখানে মুরগি কম চলাফেরা করে সেই স্থানে মুরগির ডিম পাড়ার বাসা দিতে হবে। ডিম পাড়া বাসার সাথে পরিচিতির জন্য অন্তত ২ সপ্তাহ আগে থেকেই ডিম পাড়ার বাসা ঘরে স্থাপন করতে হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

খাদ্য প্রস্তুত এবং খাদ্য সংরক্ষণ খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান অংশ। খাদ্য উপাদান ক্রয়ের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ জন্য খাদ্য সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। খাদ্যের গুণগতমান অবশ্যই ভালো হতে হবে। নিম্নের চারটি রেশনের ফলাফল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এদের কার্যকারিতা অত্যন্ত ভালো।

স্টারটার রেশন

ক্রমিক নং	উপাদান	পরিমাণ (কেজি)
১।	গম	৩৫ কেজি
২।	ভুট্টা	১৬.৯ কেজি
৩।	সয়াবিন	২৭.০ কেজি
৪।	চালের কুঁড়া	১৪.৮ কেজি
৫।	ঝিনুক চূর্ণ	১.৫ কেজি
৬।	ডিসিপি	১.৫ কেজি
৭।	ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫ কেজি
৮।	লাইসিন	০.১৫ কেজি
৯।	মিথিওনিন	০.১৫ কেজি
১০।	সয়াবিন তেল	২.৫০ কেজি
১১।	খাবার লবণ	০.২৫ কেজি
	মোট	**১০০.০০ কেজি**
পুষ্টি		
	প্রোটিন	২১.৭৪ কেজি
	বিপাকীয় শক্তি (কেজিক্যালোরি/কেজি)	২৯৬০ কেজি
	লাইসিন (%)	১.২২ কেজি
	মিথিওনিন (%)	০.৪৩ কেজি
	ক্যালসিয়াম (%)	১.৫ কেজি
	ফসফরাস (%)	০.৮৬ কেজি

গ্রোয়ার রেশন

ক্রমিক নং	উপাদান	পরিমাণ (কেজি)
১।	গম	২২ কেজি
২।	ভুট্টা	৩০ কেজি
৩।	সয়াবিন	২৮ কেজি
৪।	চালের কুঁড়া	১৫ কেজি
৫।	ঝিনুক চূর্ণ	১.৫ কেজি
৬।	ডিসিপি	২.৫ কেজি
৭।	ভিটামিন প্রিমিক্স	০.৫ কেজি
৮।	লাইসিন	০.১২৫ কেজি
৯।	মিথিওনিন	০.১২৫ কেজি
১০।	খাবার লবণ	০.২৫ কেজি
	মোট	১০০.০০ কেজি
পুষ্টি		
	প্রোটিন	১৬.৭৯ কেজি
	বিপাকীয় শক্তি (কেজিক্যালোরি/কেজি)	৩১২৫ কেজি
	লাইসিন (%)	০.৮৫ কেজি
	মিথিওনিন (%)	০.৩৩ কেজি
	ক্যালসিয়াম (%)	১.৫ কেজি
	ফসফরাস (%)	০.৯০ কেজি

লেয়ার রেশন

ক্রমিক নং	উপাদান	পরিমাণ (কেজি)
১।	গম	১৬ কেজি
২।	ভুট্টা	৪০ কেজি
৩।	সয়াবিন	২২ কেজি
৪।	চালের কুঁড়া	১৪.৩ কেজি
৫।	ঝিনুক চূর্ণ	১.৫ কেজি
৬।	ডিসিপি	১.৫ কেজি
৭।	ক্যালসিয়াম কার্বনেট	৪.০ কেজি
৮।	ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫ কেজি
৯।	লাইসিন	০.১০ কেজি
১০।	মিথিওনিন	০.১০ কেজি
	মোট	১০০.০০ কেজি
পুষ্টি		
	প্রোটিন	১৭ কেজি
	বিপাকীয় শক্তি (কেজিক্যালোরি/কেজি)	৩০৪৫ কেজি
	লাইসিন (%)	০.৯৫ কেজি
	মিথিওনিন (%)	০.৩৪ কেজি
	ক্যালসিয়াম (%)	২.৫ কেজি
	ফসফরাস (%)	০.৮০ কেজি

তবে উপরোক্ত রেশনে যে সমস্ত উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে তা সময়, আবহাওয়া এবং ঋতু পরিবর্তন এবং সহজলভ্যতার ওপর নির্ভর করে। এছাড়াও খামারিগণ বাজারে প্রাপ্ত প্রস্তুতকৃত গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য বয়স অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারেন।

আলোক ব্যবস্থাপনা

আলোক ব্যবস্থাপনা ডিম পাড়া মুরগির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দিনের সুনির্দিষ্ট ঘণ্টা আলোর ব্যবস্থাপনার সাহায্যে মুরগির সর্বোচ্চ ডিম উৎপাদন পাওয়া সম্ভব।

লেয়ার মুরগির জন্য প্রস্তাবিত ভ্যাক্সিনেশন কর্মসূচি

মুরগির বাচ্চা থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত ভ্যাকসিন কর্মসূচি সাধারণত ঐও ট্রাইটার দেখে ভ্যাকসিন দেয়া উচিত। এতে মুরগি রোগাক্রান্ত হওয়ার আশংকা কম হবে এবং বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা করা সহজতর হয়। ভ্যাকসিন কর্মসূচি পোল্ট্রি ডিজিজ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে করা উচিত।

বয়স (দিন)	ভ্যাকসিনের নাম	মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি
১০	এন.ডি ক্লোন-৩০ (১০০০ ডোজ/ভায়াল)	জীবন্তঃ ১ চোখে ১ ফোটা
১৪	গামবোরো ডি-৭৮ (১০০০ ডোজ/ভায়াল)	জীবন্তঃ ১ চোখে ১ ফোটা
২১	গামবোরো ডি-৭৮ (১০০০ ডোজ/ভায়াল)	জীবন্তঃ ১ চোখে ১ ফোটা
২৪	এন.ডি ক্লোন-৩০ (ম্যানোভ্যালেন্ট) (১০০০ ডোজ/ভায়াল)	জীবন্তঃ ১ চোখে ১ ফোটা
২৮	গামবোরো কিল্ড ভয়েল অ্যাডজুভ্যান্ট (১০০০ ডোজ/ভায়াল)	চামড়ার নিচে অথবা মাংশপেশিতেঃ ০.২৫ মিঃলিঃ/মুরগি
৩৮	এন.ডি.কিল্ড ভয়েল অ্যাডজুভ্যান্ট (১০০০ ডোজ/ভায়াল) এন ডি. এইচ. আই টেস্ট	চামড়ার নিচে অথবা মাংশপেশিতেঃ ০.২৫ মিঃলিঃ/মুরগি
৪০	ফাউল পক্স (ওভো ডিপথেরিন) (১০০০ ডোজ/ভায়াল)	পাখার চামড়ায় সুচ ফুটানোর মাধ্যমে
৬৮	এন.ডি.এইচ.আই. এন্টিবডি টাইটার পর্যবেক্ষন	-
৭০	ফাউল পক্স (ওভো-ডিপথেরিন) (১০০০ ডোজ/ভায়াল)	পাখার চামড়ায় সুচ ফুটানোর মাধ্যমে
১২০	এন-ডি.কিল্ড ভয়েল অ্যাডজুভেন্ট (১০০০ ডোজ/ভায়াল)	
১২ মাস	ঐ	
১৮ মাস	ঐ	
২৪ মাস	ঐ	

উপরোক্ত ভ্যাকসিনগুলো যেহেতু ১০০০ ডোজ প্রতি ভায়ালে পাওয়া যায়, তাই ২০০টি মুরগি পালনকারী ৫ জন খামারি অনায়াসে ১টি ভায়াল ব্যবহার করতে পারেন। তবে খামারিদের সমিতিভুক্ত করে ভ্যাকসিন কর্মসূচি প্রয়োগ করলে আর্থিক খরচ কম হবে।

উপকরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা

দেশের গ্রামীণ অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষুদ্র ঋণ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঋণের সরবরাহ উপকরণের মাধ্যমে বিতরণ করলে সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকলে, সে ক্ষেত্রে খামারিদের সাথে একটি প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/এনজিও এই মর্মে চুক্তি করবে যে, প্রথম সপ্তাহ থেকে ২২ সপ্তাহ পর্যন্ত (ডিমপাড়া শুরু হওয়া পর্যন্ত) বাচ্চা লালন-পালন, খাদ্য ও ভ্যাকসিন, ইত্যাদি খরচ ক্রেডিট হিসেবে খামারিদের মাঝে সরবরাহ করবে এবং খামারিগণ মুরগির শতকরা ৫০ ভাগ ডিম পাড়া শুরু করলে উপরোক্ত উপকরণ বাবদ খরচ ডিম থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের মাধ্যমে সাপ্তাহিক কিস্তিতে সংগঠনকে পরিশোধ করবে। প্রতিষ্ঠানটি খামারিদের মাঝে নিম্নলিখিত উপকরণ প্রদানপূর্বক একটি চুক্তি করবে :

১. গুণগত মানসম্পন্ন মুরগির বাচ্চা
২. ভ্যাকসিন/টিকা
৩. গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য
৪. প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, ভিটামিন-প্রিমিক্স
৫. জীবাণুনাশক

খামারিগণ আর্থিকভাবে সমর্থ হলে নিজেরাও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজ খরচে লেয়ার পালন শুরু করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে মুরগি পালনের উপকরণসমূহ সঠিকভাবে বাছাই, সংগ্রহ, ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারেন। আর্থিক সহায়তার জন্য স্থানীয় ব্যাংকে সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন।

সংগঠনের মাধ্যমে সকল উপকরণ ক্রয় এবং খামারের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়

খামারের সকল সদস্যের প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে একত্রে সংগ্রহ করলে আর্থিক সুবিধা পাওয়া যাবে। খাদ্য, ভ্যাকসিন, জীবাণুনাশক ইত্যাদি সামগ্রী ক্ষুদ্র খামারি যৌথভাবে সমিতির মাধ্যমে ক্রয় করে অর্থের সাশ্রয় করতে পারে। একইভাবে উৎপাদিত পণ্য-ডিম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দলগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ফড়িয়ার অংশের লাভ সমিতি ভোগ করতে পারে।

ডিম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ডিমপাড়া শুরু করলে খামারিগণ প্রতিদিনই দুই বার ডিম সংগ্রহ করবে এবং ডিমের ট্রেতে রাখতে হবে। যে সমস্ত স্থানে আলো-বাতাস ভালভাবে চলাচল করে সে সমস্ত স্থানে ডিম সংরক্ষণ করা ভাল। সাধারণ তাপমাত্রায় ডিম ৭ দিনের বেশী সংরক্ষরণ না করাই উত্তম।

ডিম বাজারজাতকরণ

খামারিগণ সংগঠনের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পন্য বাজারজাত করতে পারেন। সংগঠনের আওতায় খামারিগণ প্রতি ৭ দিনের ডিম সংগ্রহ করে নিদিষ্ট স্থানে জমা রাখবেন এবং প্রতি ৭ দিন পর পর গ্রামীণ ফড়িয়াদের নিকট অথবা সরাসরি আড়ৎদারগণের নিকট বিক্রি করতে পারবেন। এই পদ্ধতিতে খামারিগণ আড়ৎদারদের সাথে দর কষাকষির মাধ্যমে তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। বাজারজাতকরণের ভালো সুযোগ-সুবিধা না থাকলে অনেক সময় খামারিগণ কম মূল্যে ডিম বিক্রি করতে বাধ্য হন। ছাটাইকৃত মুরগিও খামারিগণ সরাসরি আড়ৎদারের নিকট বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে পারেন। এ ছাড়া, মুরগির বিষ্ঠা মাছের খামারি ও অন্যান্য খামারিদের নিকট বিক্রি করে লাভবান হতে পারে।

খরচাদি ও লাভ

খরচাদি এবং লাভ : ২০০টি লেয়ার পালনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

আইটেম	ব্যয়	আয়
ঘর বাবদ খরচ	৪০০০.০০	
বাচ্চা	৪৮০০.০০	
ভ্যাকসিন মেডিসিন	৪৪২৯.০০	
খাদ্য বাবদ খরচ	১৪২৯২৯.০০	
ফিডার ড্রিংকার	৮০৪.০০	
মোট খরচ	১,৫৬,৯৬২.০০	
আয়		
ডিম		১৮১৪০৮.০০
নন লেইং বার্ড		১৮০০.০০
ছাটাইকৃত মুরগি		১৫৭৫০.০০
লিটার/ বিষ্টা	৮০×৫০	৪০০০.০০
মোট আয়		২,০২,৯৫৮.০০
নিট আয়	২,০২,৯৫৮.০০-১,৫৬,৯৬২.০০	৪৫৯৯৬.০০

খাদ্য ও ডিমের দামের ওঠা-নামার কারণে লাভ কম বা বেশি হতে পারে।

উপরোক্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, এই মডেলে ২০০টি মুরগি পালনকারীর সর্বমোট খরচ হয় ১৫৬,৯৬২ এবং মোট আয়ের পরিমাণ ২,০২,৯৫৮ টাকা। প্রকৃত আয় থেকে খরচ বাদ দিলে নিট লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫,৯৯৬ টাকা। বাংলাদেশ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের এক তথ্য থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের একজন মানুষের বার্ষিক জীবনধারণের জন্য যেমন, খাদ্য এবং অন্যান্যসহ খরচ হয় প্রায় ৯০০০ টাকা এবং ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের বাৎসরিক ব্যয় হয় ৩৬০০০/- টাকা। সুতরাং ২০০টি মুরগি পালনকারী ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবার সংসারের খরচাদি ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষাসহ যাবতীয় খরচ মিটিয়ে বছরে প্রায় ৯০০০ টাকা সঞ্চয় করতে পারেন। (পূর্বের তথ্য) এখানে উল্লেখ্য, ৪ সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের খরচ যথাক্রমে খাদ্য (৩৯%), শিক্ষা (২৮%), বিনোদন (১৭%), জামাকাপড় (১০%) ও অন্যান্য (৬%), যা লেয়ার পালন করে মেটানো সম্ভব।

নিয়মিতভাবে সদস্যদের মতবিনিময় সভা

মডেলটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য পোল্ট্রি উৎপাদন সমিতি গঠন বিশেষ কার্যকর। উক্ত সমিতি প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধার আলোকে একটি নিয়মিত বিরতিতে (সপ্তাহে/মাসে/প্রতি মাসে) আলোচনা সভা করবে। উক্ত আলোচনার মাধ্যমে মডেলের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন, খামার পরিচালনার সমস্যা ও অন্যান্য সকল বিষয় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বা নির্ধারণ করার সুযোগ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী সংগঠনের একটি গঠনতন্ত্র থাকা অত্যাবশ্যক।

সংগঠনের সদস্যদের জন্য আপদকালীন আর্থিক সংস্থান করা

সংগঠনের আয়ের অর্থ থেকে বা মাসিক চাঁদার ভিত্তিতে কিংবা লভ্যাংশের কিছু অর্থ থেকে নিয়মিতভাবে সংগঠনের জন্য ব্যাংক একাউন্টে অর্থ জমা করা প্রয়োজন। সদস্যভুক্ত খামারিরা খামারের জরুরি বা আপদকালীন প্রয়োজনে উক্ত অর্থ থেকে বিশেষ ঋণের সুযোগ গ্রহণ করবে।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা ও ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত লেয়ার মডেলটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিরা বসতবাড়িতে পালন করলে দারিদ্র্যবিমোচন, আত্ম-কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি, পারিবারিক পুষ্টিসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

প্যাকেজের উদ্ভাবক : ড. কাজী মোঃ ইমদাদুল হক, ড. মোঃ সালাহ উদ্দিন, ড. নাথু রাম সরকার, দুলাল চন্দ্র পাল, ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, ড. শামীম আহমেদ, ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন এবং ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

ক্ষুদ্র খামারিদের জন্য ব্রয়লার পালন

ভূমিকা

দেশের প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে ব্রয়লার পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়াও বেকার সমস্যার সমাধান ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, সর্বোপরি দেশের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্রয়লার পালনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও পর্যায়ে কিছু কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করলেও কোনো লাগসই পরিকল্পনা অদ্যাবধি তাদের জন্য হাতে নেয়া হয়নি। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর বসতবাড়ি ব্যতীত চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই সামান্য এবং যা দ্বারা তাদের সারা বছরের খাবারের সংস্থান হয় না। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ২০২৪ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমান জনসংখ্যার তুলনায় দ্বিগুণ হবে এবং চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ যা আছে তা থেকে প্রতি বছর ১ শতাংশ হারে কমে যাচ্ছে।

এমতাবস্থায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও পুষ্টিহীনতা দূর করার জন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রয়লার পালনের ওপর একটি লাগসই মডেল উদ্ভাবন করেছে। এ মডেলের আওতায় একজন ক্ষুদ্র অথবা মাঝারি আকারের খামারি প্রথমত ৫০০ টি ব্রয়লার পালন করে সাংসারিক খরচ চালানোর পাশাপাশি পারিবারিক পুষ্টি মিটিয়ে ধীরে ধীরে ব্রয়লার পালনকে আত্ম-কর্মসংস্থানের মূল চাবিকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হতে পারেন।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, একজন খামারি প্রতি বছর কমপক্ষে ৬ ব্যাচ ব্রয়লার পালন করতে পারেন, যা দ্বারা ৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি গ্রামীণ পরিবারের ভরণপোষণের ব্যয় মেটানো সম্ভব। ব্রয়লার পালন দারিদ্র্য বিমোচনে সক্রিয় ভূমিকার পাশাপাশি পারিবারিক পুষ্টি অভাব পূরণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ১ কেজি ব্রয়লার উৎপাদন করতে ২০-২৫ দিন সময় লাগে এবং এর জন্য মাত্র ১.৬৫ কেজি খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এত অল্পসময়ে অন্য কোনো খাত থেকে উন্নতমানের আমিষ জাতীয় খাদ্যের যোগান দেয়া ও স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব নয়।

ব্রয়লার মডেলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ব্রয়লার পালন মডেলটি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত অংগগুলো (Component) সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

১. খামারি বা সুফলভোগী নির্বাচন,
২. খামারদের সংগঠন তৈরি,
৩. খামারিদের পারিবারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে,
৪. বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মোতাবেক ঘর তৈরি/স্থান নির্বাচন,
৫. ব্রয়লার বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা,
৬. ব্রয়লারের জন্য জাত/স্ট্রেইন নির্বাচন,
৭. সুষম খাদ্য তৈরি করণ,
৮. ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা,
৯. খামারি সংগঠনের মাধ্যমে উপকরণ ক্রয় এবং উৎপাদিত ব্রয়লার বাজারজাতকরণ,
১০. খামারিদের মধ্যে মতবিনিময় সভা,
১১. সংগঠনের মাধ্যমে আপদকালীন আর্থিক সংস্থান।

খামারি/সুফলভোগী নির্বাচন

বাংলাদেশের যে কোনো এলাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ১০-১২ জন উৎসাহী/আগ্রহী, স্বল্প শিক্ষিত, পরিশ্রমী ও সৎ মহিলা বা বেকার যুবককে খামারি হিসেবে নির্বাচনপূর্বক সংগঠিত করতে হবে। তবে নির্বাচিত খামারিদের যাতে ব্রয়লার খামার করার জন্য নিজস্ব জমি থাকে এবং সেই স্থানটি ব্রয়লার পালনের জন্য অবশ্যই যথোপযোগী হতে হবে। নির্ধারিত খামারিদের সংগঠনের আওতায় আসলে খামারিরা দলগতভাবে খাদ্য, টিকা ও খাদ্য মিশ্রিতকরণ প্রভৃতি কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া, খামরিরা তাদের খামার বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে একে অপরের সাথে মত বিনিময় করতে পারে এবং নিজেদের সমস্যা নিজেরাই প্রাথমিকভাবে সমাধান করতে পারবে।

নির্বাচিত খামারির পারিবারিক প্রশিক্ষণ

নির্বাচিত খামারিদের ব্রয়লার পালনের ওপর তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক যেমন- ব্রয়লার বাচ্চা নির্বাচন, বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা, সুষম খাদ্য তৈরি, টিকাদান কর্মসূচি, খাদ্য সংরক্ষণ, ব্রয়লারের বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকার, বায়োসিকিউরিটি, আলোক ব্যবস্থাপনা, জীবাণুনাশকের ব্যবহারের গুরুত্ব, রেকর্ড সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং খামারের আয়-ব্যয়ের হিসাবের পাশাপাশি সকল বিষয়ে প্রশিণের ব্যবস্থা করা, যাতে একজন নতুন খামারি "হাতে কলমে শিখে"বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে পরিবারের দুইজন সদস্যকে অবশ্যই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে, যাতে একজন পারিবারিক সদস্যের অনুপস্থিতিতে অন্যজন খামারের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। খামারের সকল কার্যক্রমে পারিবারিক সহযোগিতা নিশ্চিত হবে।

ফলোআপ প্রশিক্ষণ

দুই এক ব্যাচ ব্রয়লার পালনের পরে পুনরায় সমস্যাভিত্তিক খামারিদের একত্রিত করে ফলোআপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর।

৪। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মোতাবেক ঘর তৈরি/স্থান নির্বাচন

(ক) খামারের জায়গা নির্বাচন

ব্রয়লার খামার স্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পালন করা অতীব প্রয়োজনঃ

১. খামার তৈরির জন্য নির্বাচিত স্থান আবাসিক আবাসন থেকে একটু দূরে হওয়া প্রয়োজন,
২. অন্য মুরগির খামার বা প্রাণীর ঘর থেকে নিরাপদ দূরত্বে হতে হবে,
৩. পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে,
৪. খামারের আশপাশে পচা ডোবা ও নর্দমামুক্ত হতে হবে,
৫. বিশুদ্ধ পানি ও বিদ্যুতের সুব্যবস্থা থাকতে হবে,
৬. বাজারজাতকরণের সুবিধা থাকতে হবে,
৭. ব্রয়লার সংশিষ্ট কাঁচামালের সহজলভ্যতা থাকতে হবে,
৮. খামার পরিচালনায় মালিকের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক।

(খ) ৫০০ ব্রয়লারের আদর্শ ঘর নির্মাণ

ব্রয়লারের জন্য অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় ঘর নির্মাণ করতে হয়। ঘরের চারপাশে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ৫০০ ব্রয়লারের জন্য (৪২+৫) × ১২ = ৫৬৪ বর্গফুট জায়গা যথেষ্ট। এই জায়গার মধ্যে ৪২×১২ = ৫০৪ বর্গফুট জায়গা ব্রয়লারের জন্য এবং ৫×১২ = ৬০ বর্গফুট সার্ভিস কক্ষ। মাঁচা পদ্ধতিতে ঘর তৈরি করতে হবে। ঘরের মাটি থেকে ৩ ফুট উঁচুতে মাঁচা থাকবে। মাটি থেকে মাঁচা পর্যন্ত ফাকা জায়গা তার জালি অথবা বাশেঁর জালি দিয়ে আটকিয়ে রাখতে হবে যাতে কুকুর, বিড়াল এবং অন্য কোন বন্য প্রাণী মাঁচা র নিচে প্রবেশ করতে না পারে। ঘরের সার্ভিস কক্ষ ছাড়া বাকি তিন দিকে বাশের বা তার জালির বেড়া থাকবে যাতে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল করতে পারে। ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হবে এবং ঘরের পশ্চিম প্রান্তে সার্ভিস কক্ষ থাকবে, যাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস এক দিকে ঢুকে অন্য দিকে বের হতে পারে।

ঘরের বর্ণনা

ঘরের চালা

ঘরের চালা দোচালা হবে। ঘরের চালা ছন, গোলপাতা বাশেঁর চাটাই দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। তবে ছন ও গোলপাতার পরিবর্তে করুগেটেট টিন ব্যবহার করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে টিনের নিচে অবশ্যই তাপ নিরোধক বা বাশের চাটাই দিতে হবে অথবা অন্য কোনো ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পাশের বেড়া

পাশে বাঁশের বাতা দ্বারা তৈরি ফাক বেড়া বা তার জালির বেড়া দেয়া যেতে পারে। তবে বেড়ার ফাঁকগুলো কোনো মতেই ১×১ বর্গ ইঞ্চির বেশি হওয়া চলবে না।

সার্ভিস কক্ষ

সার্ভিস কক্ষে (৫ × ১২ = ৬০ বঃ ফুট) ব্রয়লারের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, জীবাণুনাশকসহ অন্যান্য সরঞ্জাম থাকবে।

ব্রয়লার পালনে কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থাপনাঃ

১. ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ
২. ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা
৩. ব্রয়লার বাচ্চার প্রথম খাদ্য
৪. খাদ্য ব্যবস্থাপনা
* প্রয়োজনীয় পুষ্টি
* সুষম খাদ্য

মুরগির ঘর পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করণ

মুরগির ঘর তৈরির সকল কার্য শেষ হলে, ঘর পরিস্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ করা প্রয়োজন। প্রথমত ঝাড়ু দিয়ে মাঁচা ও মাঁচার নিচে, পাশের বেড়া ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর পরিষ্কার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে এবং সবশেষে জীবাণুনাশক (পভিসেপ, সুপারসেপ্ট, ক্লোরোক্স, আয়োসান, খায়োসান, ভিরকন এস) এর যে কোনো দ্রবণ দ্বারা ঘরের মাঁচা , পাশের বেড়া ও খামারের আশপাশ জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ঘরে মুরগির বাচ্চা উঠানোর ৩ (তিন) দিন পূর্বে পুনরায় জীবাণুমুক্তকরণ করতে হবে।

বাচ্চা ক্রয় ও ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

বাচ্চা ঘরে উঠানোর কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে ব্রুডিং-এর জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। খামারিদের জন্য ১০০০ বাচ্চা এক সাথে গ্রুপ করে ব্রুডিং করাই শ্রেয়; তাতে যেমন, অর্থের সাশ্রয় হয়, তেমনই পরিশ্রমও কম লাগে। এক দিনের ব্রয়লার বাচ্চা ভালো হ্যাচারি থেকে ক্রয় করতে হবে। ব্রয়লার হাইব্রিডগুলোর মধ্যে রয়েছে আরবর একর, হাবার্ড কাসিক, ভ্যানকব, হাইব্রো-পিএন ইত্যাদি। নির্বাচিত খামারিদের মধ্যে থেকে অধিক উদ্যোমী ভালো প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খামারি দ্বারা ব্রুডিং করানো ভালো। শীতকালে সাধারণত ৩-৪ সপ্তাহ এবং গরমকালে ২-৩ সপ্তাহ ব্রুডিং করানো হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথম সপ্তাহে ব্রুডিং তাপমাত্রা ৯৫° ফাঃ এ রাখা হয়, তারপর প্রতি সপ্তাহে ৫° ফাঃ করে কমাতে হবে। ইলেকট্রিক বাল্ব, গ্যাসের চুলা, কেরোসিনের চুলা ও বিএলআরআই উদ্ভাবিত চিক ব্রুডার দিয়েও ব্রুডিং করা যায়।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য ক্রয়, সুষম রেশন ফর্মুলেশন, খাদ্য উপাদানসমূহ সঠিকভাবে মিশ্রিত করণ এবং খাদ্য সংরক্ষণ খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান অংশ।

(ক) ব্রয়লার বাচ্চার প্রথম খাদ্য

ব্রয়লার বাচ্চা খামারে পৌছানোর পর পরই প্রথম গ্লুকোজ, ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন এবং ভিটামিন 'সি' মিশ্রিত পানি (প্রতি লিটারে ২৫ গ্রাম গ্লুকোজ, ১ গ্রাম ভিটামিন ডব্ল, এবং ১ গ্রাম ভিটামিন 'সি') চিকগার্ডের পানির পাত্রে সরবরাহ করতে হবে। অতপর চিকগার্ডের ভেতরে বাচ্চা ছাড়তে হবে। প্রয়োজনে বাচ্চা ছাড়ার পূর্বে বাচ্চার ঠোঁট গ্লুকোজ ও ভিটামিন মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে পানি পান করাতে হবে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বাচ্চা ছাড়ার কমপক্ষে ৩ ঘণ্টা ভিটামিন মিশ্রিত পানি পান করার পর বাচ্চার পরিপাকতন্ত্র সচল হলে প্রথম দিন গম বা ভুট্টার দানা বা বাচ্চার জন্য তৈরিকৃত খাদ্য যোগান দেয়া বা সরবরাহ করা যেতে পারে। তারপর ব্রয়লার স্টারটার সরবরাহ করা হয়। ব্রয়লার স্টারটারে শতকরা ২১-২২ ভাগ প্রোটিন ২৮০০-২৯০০ কেজি ক্যালরি বিপাকীয় শক্তি (ক্যালরি/কেজি) থাকে। প্রথম সপ্তাহে প্রতিটি বাচ্চার জন্য গড়ে ৮-১০ গ্রাম খাবার দরকার হয়।

খে) ব্রয়লার খাদ্য

ব্রয়লার খাদ্য তৈরি করার পূর্বে যে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করা দরকার তা নিম্নে দেয়া হলো।

- খাদ্যসামগ্রী ও উপকরণের সহজ প্রাপ্যতা,
- খাদ্য উপকরণের পুষ্টি মান,
- খাদ্য উপকরণের মূল্য,
- খাদ্যের পরিপাচ্যতা ও সুস্বাদুতা,
- পোল্ট্রি প্রজাতি, বয়স এবং উৎপাদন,
- খাদ্যের ফাংগাস এবং জীবাণুমুক্ততা,
- বিভিন্ন খাদ্য উপাদান ব্যবহার করার পরিমাণ বা মাত্রা,
- সুষম খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান বিবেচনা করতে হবে।

খামারিদের সুবিধার জন্য নিম্নে দুইটি সুষম খাদ্যের নমুনা প্রদান করা হলে

উপাদান	১ নং নমুনা খাদ্য		২ নং নমুনা খাদ্য	
	পরিমাণ (কেজি)			
	স্টার্টার (০-৪ সপ্তাহ)	ফিনিসার (৫-৬ সপ্তাহ)	স্টার্টার (০-৪ সপ্তাহ)	ফিনিসার (৫-৬ সপ্তাহ)
গম	২৫.০০	২৫.০০	১৩	১২
ভুট্টা	২৮.০০	৩৩.০০	৪২	৪৭
চালের কুড়া	১৩.৫০	২২.৫০	১৩	১৫
সয়াবিন মিল	১০.০০	৪.০০	২২	১৮
তিলের খৈল	১৩.০০	৬.০০	-	-
প্রোটিন কনসেনট্রেট	৫.০০	৫.০০	৮	৬
মিট এন্ড বোন মিল	৫.০০	৪.০০	-	-
ঔষধ	০.২৫০	০.২৫০	-	-
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০	০.২৫০
পুষ্টি				
বিপাকীয় শক্তি				
(কেজিক্যালরি /কেজি)	২৯০০	৩০০০	২৯১৮	২৯৯৬
প্রোটিন (%)	২৩	২০	২১.১৩	১৯.১০
ক্যালসিয়াম (%)	১.১১	০.৮৭	১.২৩	০.৯৭
প্রাপ্ত ফসফরাস (%)	০.৬৪	০.৪৭	০.৮৩	০.৬৬
লাইসিন (%)	১.০০	০.৮৫	১.০০	০.৮৫

(গ) আলোক ব্যবস্থাপনা

ব্রয়লার বাচ্চার অধিক হারে খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য সার্বক্ষণিক আলো প্রদান করা প্রয়োজন। আলোক ব্যবস্থা ব্রয়লার বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সুনির্দিষ্ট আলোক ব্যবস্থাপনার সাহায্যে ব্রয়লারের খাদ্য রূপান্তরের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব। প্রথম সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা এবং ২য় সপ্তাহ থেকে বাজারজাত করা পর্যন্ত ২৩ ঘণ্টা আলো এবং ১ ঘণ্টা অন্ধকারে রাখা প্রয়োজন। প্রথম সপ্তাহে ব্রুডার থেকে ৪-৫ ফুট উচুতে এবং দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ৭-৮ ফুট উঁচুতে ১০০ ওয়াটের ৪টি বাল্ব ঝুলিয়ে আলো দেয়া যেতে পারে। প্রথম থেকেই প্রতি রাতে আধ ঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টা আলো বন্ধ রেখে বাচ্চাদের অন্ধকারের সাথে পরিচয় করানো উচিত।

(ঘ) টিকা দান কর্মসূচি

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত যে টিকাদান কর্মসূচিটি মাঠ গবেষণার মাধ্যমে সক্ষম প্রমাণিত হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলো। তবে যে সমস্ত এলাকায় ব্রয়লার খামারের সংখ্যা খুবই নিবিড় সে সমস্ত এলাকায় গামবোরো ভ্যাকসিনের স্ট্রেইনের পরিবর্তন হতে পারে।

বয়স (দিন)	ভ্যাকসিনের নাম	ভ্যাকসিনের ধরন	প্রয়োগের পথ	ডোজ	রোগের নাম
৭	এনডি- ক্লোন ৩০	জীবন্ত	চোখে	১ ফোটা	রানীক্ষেত
১৪	গামবোরো ডি-৭৮	জীবন্ত	চোখে	১ ফোটা	গামবোরো
২১	এনডি-৩০	জীবন্ত	চোখে	১ ফোটা	রানীক্ষেত
২৮	গামবোরো ডি-৭৮	জীবন্ত	চোখে	১ ফোটা	গামবোরো

(ঙ) ব্রয়লার খামারে বায়োসিকিউরিটি

খামারকে রোগমুক্ত রাখতে এবং কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পেতে হলে বায়োসিকিউরিটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

১. রোগ চিকিৎসার চেয়ে প্রতিকার উত্তম। সুতরাং সেদিকে নজর দিতে হবে।
২. খামারের প্রবেশ পথে জীবাণুনাশক পাত্র বা স্প্রেয়ার রাখতে হবে।
৩. খামারে ব্যবহারের জন্য আলাদাভাবে পোষাক ও জুতার ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. মৃত ব্রয়লার গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে বা পুড়ে ফেলতে হবে।
৫. অন্যান্য মোরগ-মুরগির ঘরে যাতে পাখি, ইঁদুর, কুকুর বা বন্য বিড়াল প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।
৬. দর্শনার্থীদের খামার পরিদর্শনে নিরুৎসাহিত করতে হবে।
৭. সপ্তাহে ১ দিন খামারের মাঁচা , বেড়া, আশপাশ জীবাণুনাশক দ্বারা স্প্রে করতে হবে।

প্রতি ব্যাচ সম্পূর্ণ করার কম পক্ষে ১৫ দিন পর বাচ্চা উঠানো যাবে। বাচ্চা উঠানোর পূর্বে খামারের মাঁচা , বেড়া আশপাশ ভালভাবে জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।

১. ৫০০ বর্গফুট ঘরের খরচ ১২০০০.০০ টাকা
২. প্রতিটি বাচ্চা ১৯.০০ টাকা
৩. ৫ সপ্তাহ বয়সে গড় ওজন ১.৫ কেজি এবং বাজার মূল্য ৬০.০০ টাকা/কেজি
৪. মৃত্যহার ২% ধরা হয়েছে।
৫. পারিবারিক শ্রম ব্যবহারে ৫০০ ব্রয়লার পালন করা সম্ভব।
৬. বছর ৬টি ব্যাচ করা সম্ভব ৬ ব্যাচে মোট লাভ = ৬৭,৪৫২.০০ টাকা।

৫০০ ব্রয়লার পালনের হিসাব নিকাশের একটি নমুনা :

উপাদান	এক ব্যাচে খরচ (টাকা)	এক ব্যাচে আয় (টাকা)
ঘর	৮৫৭.০০	
ব্রয়লার বাচ্চা	১০০০০.০০	
খাদ্য পাত্র	৫৭.০০	
পানি পাত্র	৫০.০০	

উপাদান	এক ব্যাচে খরচ (টাকা)	এক ব্যাচে আয় (টাকা)
খাদ্য	১৯৫০০.০০	
ভ্যাকসিন	১০০০.০০	
ঔষধপত্র	৫০০.০০	
জীবাণুনাশক	১৫০.০০	
লিটার	১০০০.০০	
চিকগার্ড	১০০০.০০	
বিদ্যুৎ	৫০০.০০	
লিটার বিষ্ঠা (৩০ বস্তা)	-	১৫০০.০০
ব্রয়লার	-	৪২৭৫০.০০
	৩৪৬১৪.০০	৪৪২৫০.০০
প্রকৃত লাভ	৪৪২৫০.০০ - ৩৪৬১৪.০০ = ৯৬৩৬.০০	

ক্ষুদ্র ঋণের সংস্থান

ব্রয়লার পালনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষুদ্রঋণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কোনো প্রতিষ্ঠান সংগঠিত খামারিদের বাচ্চা, খাদ্য, ভ্যাকসিন এবং সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ক্ষুদ্র আয়ের ব্যবস্থা করলে খামারিরা প্রতি ব্যাচ ব্রয়লার বাজারজাতকরণের পর বাচ্চা,খাদ্য, টিকা, ঔষধপত্র, জীবাণুনাশক, খাবার পাত্র, পানির পাত্র ইত্যাদির মূল্য ক্রেডিট প্রদানকারী সংস্থাকে ধাপে ধাপে পরিশোধ করতে পারবে। ক্ষুদ্র ঋণের জন্য স্থানীয় ব্যাংকের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারেন। খামারিগণ নিজেরা আর্থিকভাবে সমর্থ হলে প্রশিক্ষণ গ্রহণপূর্বক নিজেরাই ব্রয়লার পালন করতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে ব্রয়লার পালনের উপকরণসমূহ সঠিকভাবে নির্বাচন, সংগ্রহ, ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

খামারি সংগঠনের মাধ্যমে উপকরণ সংগ্রহ ও ব্রয়লার বাজারজাতকরণ

খামারি সংগঠনের মাধ্যমে ব্রয়লার পালনের জন্য যে সমস্ত উপকরণ ক্রয় করা প্রয়োজন তা একত্রিতভাবে ক্রয় করলে আর্থিক সাশ্রয় হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে, এক সাথে সবাই মিলে ব্রয়লার পালন করলে এবং পরবর্তীতে একসাথে বিক্রি করলে ফড়িয়াদের সাথে দর কষাকষি পূর্বক ন্যায্য মূল্য পেতে পারে। তাছাড়া, খামারি সমিতির মাধ্যমে ভ্যাকসিন, জীবাণুনাশক প্রভৃতি উপকরণ ক্রয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

খামারিদের নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় সভা

ব্রয়লার মডেলটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য পোল্ট্রি উৎপাদন সমিতি গঠন অত্যন্ত কার্যকর। সমিতির আওতাভুক্ত খামারিগণ সময় সুযোগ অনুসারে নিয়মিতভাবে সপ্তাহে বা মাসিক সভা করবে। উক্ত আলোচনা সভায় খামারিগণ মডেল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদিসহ অন্যান্য বিষয় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে সক্ষম হবে। খামারি সংগঠনটি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একটি গঠনতন্ত্র থাকা আবশ্যক। মতবিনিময় সভায় এমন কোনো সমস্যা খামারিরা নিজেরা সমাধান করতে সক্ষম না হলে প্রয়োজনে পরবর্তীতে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে সমাধান করতে সক্ষম হবে।

আপদকালীন আর্থিক সংস্থান

খামারি সংগঠনের আয় থেকে অথবা সদস্যদের মাসিক চাদা থেকে প্রাপ্ত কিংবা খামারিগণ প্রতি ব্যাচ ব্রয়লার বাজারজাত করণের পর লভ্যাংশের কিছু পরিমাণ অর্থ নিয়মিতভাবে সংগঠনের একাউন্টে জমা করলে আপদকালীন সময় খামারিরা উক্ত অর্থ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে এবং এতে খামারিরা সংকট মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে।

উপসংহার

উপরোক্ত ব্যবস্থা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বেকার সমস্যা দূরীকরণ তথা আত্মকর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্রয়লার পালন নিঃসন্দেহে অগ্রণি ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ব্রয়লার পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ অবদান রাখা সম্ভব।

প্যাকেজের উদ্ভাবক

ড. কাজী মোঃ ইমদাদুল হক, ড. নাথু রাম সরকার, ড. মোঃ সালাহ উদ্দিন, ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, ড. শামীম আহমেদ, ওয়াহিদা পারভীন, ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন এবং ড. রেজিয়া খাতুন

ককরেল পালন

ভূমিকা

দেশের বিভিন্ন হ্যাচারি থেকে প্রতি মাসে অনেক লেয়ার মুরগির বাচ্চা উৎপাদন হয়। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী বাচ্চার শতকরা ৫০ ভাগ পুরুষ এবং ৫০ ভাগ স্ত্রী হয়। লেয়ার খামারিরা সাধারণত স্ত্রী বাচ্চাগুলো ক্রয় করে এবং প্রায় অর্ধেক সংখ্যক পুরুষ বা মোরগ বাচ্চা হ্যাচারিতে থাকে। বাজারজাতকরণের সুযোগ অত্যন্ত কম বা নেই বিধায় হ্যাচারিসমূহ মোরগ বাচ্চা সস্তায় বিক্রি করে বা কখনো কখনো মেরেও ফেলে। লেয়ার এর মোরগ বাচ্চাকেই ককরেল বলা হয়। বাংলাদেশে ককরেল মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, গ্রামীণ পরিবেশে যেখানে বিদ্যুৎসহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নেই সেখানেও ককরেল পালন করা যায়। ব্রয়লারের তুলনায় ককরেল পালন সহজ।

ককরেল পালন একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্পে সংযোজিত হয়েছে। এক দিন বয়সী মোরগ বাচ্চার কম দাম, সহজ প্রাপ্যতা, দৈহিক বৃদ্ধির গ্রহণ যোগ্যতা এবং সর্বোপরি সাধারণ হোটেল এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে রোস্ট হিসেবে ব্যবহারের উপযোগিতা ককরেল পালনকে লাভজনক ব্যবসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ককরেল পালনের সুবিধা

১. এক দিন বয়সের বাচ্চার দাম কম (২৫-৩০ টাকা)।
২. মোরগ বাচ্চা বিধায় দৈহিক বৃদ্ধির হার বেশি।
৩. ৫০-৫৫ দিন বয়সে ৬৫০-৭০০ গ্রাম ওজন হয়।
৪. মাংসের জন্য মোরগ বাচ্চার চাহিদা বেশি।
৫. এদের মৃত্যু হার অত্যন্ত কম।
৬. এরা অধিক মাত্রায় রোগ প্রতিরোধক্ষম।
৭. এদের মাংসে চর্বি নেই।
৮. মাংসের স্বাদ দেশী মুরগির মতো।

ককরেল উঠানোর পূর্ব প্রস্তুতি

ঘরে বাচ্চা উঠানোর পূর্বে ঘর, খাদ্যপাত্র, পানির পাত্র এবং ব্রুডিং-এর যন্ত্রপাতিসমূহ ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি দ্বারা জীবাণুমুক্ত করতে হবে। জীবাণুনাশক হিসেবে ডেটল, স্যাভলন বা পভিসেপ ব্যবহার করা যেতে পারে। ককরেল বাচ্চা ঘরে তোলার পূর্বে গ্লুকোজ, পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনস (ভিটামিন বি+সি), পরিষ্কার ঠান্ডা পানি ইত্যাদি জিনিসগুলো আগে থেকেই সংরক্ষণ করতে হবে। অনেক দূর থেকে পরিবহন করে বাচ্চা আনলে বাচ্চার শরীরে যে ধকল পড়ে, গ্লুকোজ এবং ভিটামিনস মিশ্রিত ঠান্ডা পানি সরবরাহের ফলে অনেকাংশ কাটানো সম্ভব। এ ছাড়া বাচ্চা আসার পূর্বে ঘর ব্রুডিং-এর জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

ব্রুডিং

ককরেল পালনের ক্ষেত্রে লেয়ার মুরগির ন্যায় ব্রুডিং করতে হয়। তবে মোরগ বাচ্চা বিধায় এরা প্রাকৃতিকভাবে শক্তিশালী, সবল এবং পালনে কম ঝুঁকিপূর্ণ। এদের ৩-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ব্রুডিং করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে প্রথম সপ্তাহে ব্রুডিং তাপমাত্রা ৯৫° ফাঃ এ রাখা হয় এবং প্রতি সপ্তাহে ৫° ফাঃ করে কমাতে হয়। গ্রীষ্মকালে ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত ব্রুডিং করলেই চলে। ব্রুডিং-এর সময় তাপমাত্রার পাশাপাশি আর্দ্রতা, বায়ু চলাচল, ঘরের স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থা, মেঝের বিস্তৃতি, খাদ্য ইত্যাদি বিষয় গুলোর প্রতিও ব্যবস্থা নিতে হবে।

জাত ও স্ট্রেইন নির্বাচন

বর্তমানে বাংলাদেশের হ্যাচারিগুলোতে বিভিন্ন জাতের ককরেল উৎপাদন হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে হাই-লাইন ব্রাউন, হাই-সেক্স ব্রাউন ,স্টার ক্রস ৫৭৯ এবং বিভি-৩০০ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাদামি বা কালো রংয়ের ককরেল ক্রেতারা বেশি পছন্দ করে তবে সাদা জাতের ককরেলের দৈহিক ওজন বৃদ্ধি বেশি এবং তুলনামূলক বেশি লাভজনক।

ককরেল লালন পালন পদ্ধতি

(ক) মেঝেতে জায়গা

সাধারণত ককরেলসমূহ ৭-৮ সপ্তাহ বয়সে বাজারজাত করা হয়। এ কারণে মাঁচা পদ্ধতিতে ককরেল পালন করলে প্রতিটির জন্য ৭০০ বর্গ সেন্টিমিটার জায়গা লাগে। তবে এটি লিটারেও পালন করা যায়। লিটারে বাচ্চা প্রতি ১ বর্গফুট জায়গা দিয়ে ককরেল পালন করা যায়।

(খ) খাদ্য

বাণিজ্যিক বা পারিবারিক পর্যায়ে লেয়ার বা ব্রয়লার মুরগি পালনের জন্য আলাদা আলাদা রেশন রয়েছে এবং এখন কিছু কিছু ফিড মিল কোম্পানি ককরেলের জন্য আলাদাভাবে প্রস্তুত করে বাজারজাত করছে। ইদানিং দু'একটি ফিড কোম্পানি ককরেলের জন্য মিক্সড ফিড তৈরি করছে। তবে এক দিন বয়স থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত ককরেলকে একই ধরনের সুষম খাদ্য সরবরাহ করাই ভালো। ককরেলের রেশনে ২০-২১% প্রোটিন এবং ২৮০০-২৯০০ কেজিক্যালরি/কেজি শক্তি থাকতে হবে। নিম্নে ককরেলের জন্য বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি রেশনের বিবরণ দেয়া হলোঃ

ছক -১ : ককরেলের জন্য বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত খাদ্য তালিকা

খাদ্য উপাদান	শতকরা (%)
ভুট্টা	৪২
গম	১৬
চালের কুঁড়া	১৩
সয়াবিন মিল	২১
প্রোটিন কনসেনট্রেট	৬
ডিসিপি	১.২৫
ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স	০.২৫০
লাইসিন	০.১০০
মিথিওনিন	০.১০০
খাদ্য লবণ	০.৩
মোট	১০০.০০

খাদ্য গ্রহণ ও দৈহিক ওজন

বিভিন্ন সপ্তাহে ককরেল কর্তৃক গৃহীত খাদ্য এবং তার দৈহিক ওজনের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো-

ছক - ২ : বিভিন্ন বয়সে খাদ্য গ্রহণ ও দৈহিক ওজনের তালিকা

বয়স (সপ্তাহ)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/ককরেল/দিন)	দৈহিক ওজন (গ্রাম/ককরেল)
১	৮	৭৪
২	১৪	১৩১
৩	২২	২১১
৪	৩৩	৩২২
৫	৩৬	৪১১
৬	৪০	৫২৪
৭	৪৩	৬৮২
৮	৪৬	৭২০

(গ) টিকা প্রদান

ককরেলের টিকা প্রদান কর্মসূচি নিম্নরূপঃ

ছক-৩ : বিভিন্ন বয়সে ককরেলের টিকা প্রদান কর্মসূচি

বাচ্চার বয়স (দিন)	ভ্যাকসিনের নাম	রোগের নাম	ভ্যাকসিনের ধরন	প্রয়োগের পথ	ডোজ
৭-১০	এনডি ক্লোন ৩০	রানীক্ষেত	জীবন্ত	চোখে	১ ফোটা
১৪	গামবোরো ডি ৭৮	গামবোরো	জীবন্ত	চোখে	১ ফোটা
২১-২৪	এনডি ক্লোন ৩০	রানীক্ষেত	জীবন্ত	চোখে	১ ফোটা
২৮	গামবোরো ডি ৭৮	গামবোরো	জীবন্ত	চোখে	১ ফোটা
৩৫	ফাউল পক্স	ফাউল পক্স	জীবন্ত	ডানায় খুঁচিয়ে	-

(ঘ) বায়োসিকিউরিটি

ককরেলের ঘরে নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো প্রবেশ করতে দেয়া উচিত নয়। যারা ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত তারাই কেবল ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হয়ে প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া অন্য কোনো প্রাণি যেগুলো রোগ জীবাণু ছড়ায় যেমন- কুকুর, শিয়াল, বিড়াল, ইঁদুর এগুলো যাতে ঘরে প্রবেশ না করতে পারে তার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

২০০ টি ককরেল পালনে আয়-ব্যয়ের হিসাব

(১) স্থায়ী খরচ

(ক) খামাররের জমি (নিজস্ব জমি থাকতে হবে),

(খ) ঘর নির্মাণ : ককরেলের ঘর প্রতি বর্গফুট ২৫০ টাকা হিসাবে ২০০ বর্গফুট ১ টি টিনের ঘরের মূল্য ২৫০ × ২০০ = ৫০,০০০/=

(গ) যন্ত্রপাতি বাবদ (বাল্ব/ ব্রুডার) = ৫০০/-

(ঘ) ছন বা চাটাই দিয়ে ঘর করলে খরচ কম হবে।

খাদ্য পাত্র

ক) ৩-৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত প্রতিটি বাচ্চার জন্য ২.০ সেঃ মিঃ জায়গা ধরে মোট ২০ টি খাদ্য পাত্রের মূল্য (প্রতিটি ৭০ টাকা) = ১,৪০০/=

খ) ৫-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিটি বাচ্চার জন্য ৮.০ সেঃমিঃ জায়গা ধরে ২৫ টি পাত্রের মূল্য (প্রতিটি ১০০ টাকা হিসাবে) = ২,৫০০/-

পানিরপাত্র

(ক) ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ৮টির মূল্য	=	২৪০/=
(খ) ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত ১২টির মূল্য	=	৬০০/=
	=	৫,২৪০/=

চলতি খরচ

(ক)	বাচ্চার মূল্য ৮ টাকা হিসেবে ২০০ টির মূল্য	=	১,৬০০/-
(খ)	পারিবারিক শ্রম (প্রতিদিন ৪ ঘঃ হিঃ) ১০৫০ প্রতি মাসে × ২ মাসে	=	২,১০০/-
(গ)	লিটার বাবদ (প্রতি বস্তা ৫০ টাকা হিসেবে)	=	১০০/-
(ঘ)	বিদ্যুৎ বাবদ	=	৩০০/-
(ড)	ভ্যাকসিন/টিকা বাবদ	=	২৫০/-
(চ)	পরিবহন বাবদ	=	৩০০/-
(ছ)	খাদ্য বাবদ (২.৫ কেজি/ককরেল হিসেবে (২.৫ × ২০০) = ৫০০ কেজি		
	খাদ্যের মূল্য (প্রতি কেজি ১১ টাকা দরে (৫০০ × ১১)	=	৫,৫০০/-
		=	১০,৩৫০/-

(৩) অপচয় (Depreciation) খরচ

(ক) ককরেলের ঘর বার্ষিক ৬% হার সুদে	=	৩০০০/-
(খ) যন্ত্রপাতি ৬% হার সুদে	=	৩১৪/-
১ বছরের অপচয় খরচ	=	৩৩১৪/-

বছরে কমপক্ষে ৬ ব্যাচ ককরেল পালন করা যাবে-অতএব

(ক) চলতি খরচ	=	১০৩৫০/-
(খ) অপচয় খরচ	=	৫৫২/-
	=	১০,৯০২/-
(ক) ৬৫০-৭০০ গ্রাম ওজনের প্রতিটি ককরেল ৭০ টাকা হিসাবে ককরেল বিক্রয় করলে ৭০ × ১৯৬ (শতকরা ২ ভাগ মৃত্যুহার ধরে)	=	১৩,৭২০/-
(খ) বিষ্ঠা বিক্রয় বাবদ (৪ বস্তা প্রতি বস্তা ৬০ টাঃ হিঃ)	=	২৪০/-
	=	১৩,৯৬০/

মোট আয়

অতএব, প্রথম ব্যাচের প্রকৃত লাভ = (১৩,৯৬০ - ১০,৯০২) = ৩০৫৮/-

বার্ষিক মোট লাভ = (৩০৫৮ × ৬) = ১৮,৩৪৮/-

উপসংহার

উন্নত এবং সঠিক যত্ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লেয়ার মোরগ বাচ্চা লাভজনকভাবে পালন করা যায়। ককরেল ৭-৮ সপ্তাহ বয়সে অর্থাৎ দৈনিক ওজন যখন ৬০০-৭০০ গ্রাম তখন এটি বাজারজাত করা যায়। বাজারজাতকরণের সুবিধা থাকলে ককরেল পালন ব্যবসা লাভজনক। ককরেল ব্রয়লারের ন্যায় কেজি হিসেবে বিক্রয় করলে লাভ কম হয়। ককরেল জীবন্ত (পিচ) হিসাবে বিক্রি করতে পারলে বেশি লাভজনক হয়। বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে ককরেল পালন করে বাজারজাতকরণে সুবিধা পেলে অধিক আয় করা সম্ভব। ক্ষুদ্র খামারিগণ স্বল্প পুঁজিতে অল্প সময়ে ককরেল পালন করে লাভবান হতে পারেন।

প্যাকেজের উদ্ভাবক

ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, ড. কাজী মোঃ ইমদাদুল হক, ড. পারভীন মোস্তারী ড. শাকিলা ফারুক এবং ড. মোঃ সালাহ উদ্দিন

কোয়েল পালন

ভূমিকা

কোয়েল পালন বাংলাদেশ পোল্ট্রি শিল্পে এক নতুন সংযোজন। কোয়েল ছোট আকারের গৃহপালিত পাখি। পোল্ট্রির অনেক প্রজাতির মধ্যে কোয়েল একটি। আমাদের দেশে স্বল্প পরিসরে বাণিজ্যিকভাবে কোয়েল প্রতিপালিত হয়। অন্যান্য পোল্ট্রির তুলনায় কোয়েলের মাংস এবং ডিম গুণগতভাবে শ্রেষ্ঠ। আনুপাতিক হারে কোয়েলের ডিমে কোলেস্টেরল কম এবং আমিষ বেশি। একটি মুরগির পরিবর্তে ৮টি কোয়েল পালন করা সম্ভব। বাড়ির আঙ্গিনায় ঘরের কোণে ২-১০টা কোয়েল সহজেই পালন করা যায়। কোয়েল পাখি প্রতিপালন করে পারিবারিক পুষ্টি যোগানের সাথে সাথে অতিরিক্ত কিছু আয় করা সম্ভব। স্বল্প মূল্যে অল্প জায়গায় অল্প খাদ্যে কোয়েল পালন করা যায়।

কোয়েল পালনের সুবিধা

১. কোয়েল দ্রুত বর্ধনশীল
২. অল্প বয়সে যৌন পরিপক্বতা লাভ করে। মাত্র ৬-৭ সপ্তাহে ডিমপাড়া শুরু করে
৩. সঠিক যত্ন এবং ব্যবস্থাপনায় বছরে ২৫০-২৬০ টি ডিম পাড়ে
৪. ডিমে কোলেস্টেরলর কম
৫. ডিমে প্রোটিনের ভাগ বেশি
৬. অন্যান্য পোল্ট্রির দৈহিক ওজনের তুলনায় কোয়েলের ডিমের শতকরা ওজন বেশি
৭. ৮-১০ টা কোয়েল একটি মুরগির জায়গায় পালন করা যায়
৮. মাত্র ১৭-১৮ দিনে কোয়েলের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়
৯. বাংলাদেশের আবহাওয়া কোয়েল পালনের উপযোগী
১০. রোগ বালাই খুব কম
১১. খাবার খুবই কম লাগে
১২. অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে অল্প দিনে বেশি লাভ করা যায়।

পরিচিতি

গবেষণা কাজের জন্য এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নব্বই এর দশকে কোয়েল পালন শুরু হয়। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশে কোয়েল পালনের পরিচয় ঘটায়। কোয়েল বাংলাদেশে নতুন আবির্ভূত হলেও এশিয়ার অনেক দেশ যেমন জাপান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, সৌদিআরবসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোয়েল পালন করা হয়। কোয়েল পৃথিবীর অনেক দেশেই অন্যতম সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে পরিচিত এবং এর ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে আমেরিকা, চীন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে। পৃথিবীতে বর্তমানে ১৭ থেকে ১৮ জাতের কোয়েল আছে। অন্যান্য পোল্ট্রির মতো এর মাংস এবং ডিম উৎপাদনের জন্য পৃথক পৃথক জাত আছে। পৃথিবীতে কোয়েলের বিভিন্ন জাতের মধ্যে“জাপানিজ কোয়েল” অন্যতম। উল্লেখ্য বিভিন্ন জাতের কোয়েলের প্রকৃত উৎস জাপানিজ কোয়েল।

স্ত্রী এবং পুরুষ কোয়েল চেনা

সাধারণত দুই সপ্তাহের পূর্বে স্ত্রী পুরুষ কোয়েল চিহ্নিত করা খুবই কঠিন, তবে এক দিনের বাচ্চার ভেন্ট পরীক্ষার মাধ্যমে সেক্সিং করা যায়। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী বাচ্চার ভেন্ট ডিম্বাকৃতির হবে। পুরুষ কোয়েলের ভেন্ট শুঙ্ক ও অপেক্ষাকৃত লম্বাকৃতির হবে। দুই সপ্তাহ বয়সের পর পুরুষ কোয়েলের বুকের দিকটা অপেক্ষাকৃত গাঢ় বাদামি এবং বড় পরিলক্ষিত হবে। অন্যদিকে স্ত্রী কোয়েলের বুকের দিকটা অপেক্ষাকৃত সাদা এবং সাদা ডোরা দেখা যাবে। আর বয়স্ক অবস্থায় স্ত্রী কোয়েলের পেট নরম এবং ডিম অনুভূত হবে। পক্ষান্তরে পুরুষ কোয়েলের পেটে হাত দিলে ভেন্ট দিয়ে সাদাফোমের মতো তরল পদার্থ নির্গত হয়। এটিই স্ত্রী এবং পুরুষ কোয়েল চেনার স্বাভাবিক নিয়ম।

পুনরুৎপাদন

কোয়েলের ডিম ৮-১০ সপ্তাহ বয়সে সকল ঋতুতেই পুনরুৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায়। শুধুমাত্র ডিম ফুটাতে চাইলে স্ত্রী এবং পুরুষ কোয়েল একত্রে রাখার প্রয়োজন। ডিমের জন্য স্ত্রী কোয়েল পালন অধিক লাভজনক। আশানুরূপ ডিমের উর্বরতা পেতে হলে ২:১, ৫:২ বা ৩:১ অনুপাতে স্ত্রী এবং পুরুষ কোয়েল একত্রে রাখতে হবে। তবে অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে ৩:১ অনুপাত অপেক্ষাকৃত ভালো। স্ত্রী কোয়েলের সাথে পুরুষ কোয়েল রাখার ৪ (চার) দিন পর থেকে বাচ্চা ফুটানোর জন্য ডিম সংগ্রহ করা উচিত। স্ত্রী কোয়েল থেকে পুরুষ কোয়েল আলাদা করার পর তৃতীয় দিন পর্যন্ত ফুটানোর ডিম সংগ্রহ করা যায়।

স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের আবহাওয়ায় কোয়েল ৬-৭ সপ্তাহ বয়সে ডিম পাড়া শুরু করে। ৮-১০ সপ্তাহ বয়সে ৫০% ডিম পাড়ে এবং ১২ সপ্তাহের পর থেকে ৮০% ডিম পাড়ে। উপযুক্ত পরিবেশে প্রথম বছর গড়ে ২৫০-৩০০ টি ডিম পাড়ে। কোয়েল ডিমের উর্বরতা স্বাভাবিক অবস্থায় শতকরা ৮২-৮৭ ভাগ। ডিমপাড়া শুরুর প্রথম দুই সপ্তাহের ডিম ফুটাতে বসানো উচিত নয়। ৫০ সপ্তাহের অধিক বয়সের কোয়েলের ডিমের উর্বরতা এবং ফোটার হার কম। ডিমের ওজন স্ত্রী কোয়েলের দৈহিক ওজনের ৮%। কোয়েল এক বাণিজ্যিক বছরের অধিককাল পালন করা উচিত নয়। আন্ত প্রজনন যাতে না হয় সে জন্য নিকট সম্পর্কযুক্ত কোয়েলের মধ্যে মিলন ঘটানো যাবে না।

ডিমের রঙ, আকার ও আকৃতি

শুধুমাত্র কিছু স্ট্রেইনের কোয়েল সাদা রঙের ডিম পাড়ে। তাছাড়া বেশিরভাগ কোয়েলের ডিম বাদামী এবং গায়ে ফোঁটা ফোঁটা দাগ আছে। কোয়েলের ডিমের গড় ওজন ১০-১২ গ্রাম।

ইনকিউবেটরে বসানোর পূর্বে ডিমের যত্ন

দিনে অন্তত দুইবার ফোটানোর ডিম সংগ্রহ করতে হবে এবং ১৫.৫০° সেঃ তাপমাত্রায় ৮০% আর্দ্রতায় ৭-১০ দিন সংরক্ষণের জন্য ২০ মিনিট ফরমালডিহাইড গ্যাসে রাখতে হবে। কোয়েলের ডিমের খোসা ভাঙার প্রবণতা বেশি থাকায় অত্যন্ত সাবধানে ডিম নাড়াচাড়া করতে হবে। ময়লাযুক্ত ইনকিউবেটর অথবা হ্যাচারি এলাকা ডিম দুষিত হওয়ার প্রধান উৎস এবং রোগেরও প্রধান উৎস। ব্যবহারের পর প্রতিটি হ্যাচিং ইউনিট ভালোভাবে ধৌত করে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। কোয়ার্টানারি অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ড বা বাজারে যে সমস্ত জীবাণুনাশক পাওয়া যায় সেগুলো ব্যবহার করে জীবাণু মুক্ত করা প্রয়োজন। ময়লাযুক্ত ডিম, রোগ ও জীবাণুর প্রধান উৎস। কাজেই সর্বদা ভালো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ডিম ফুটানোর জন্য বসাতে হবে। ফুটানোর ডিম ধোয়া উচিত নয়। ডিম সংগ্রহ করার পর ডিম ফিউমিগেশন করা অত্যাবশ্যক। ডিম ফুটানোর জন্য মুরগির ডিমের মতো ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

ইনকিউবেটরে ডিমের ব্যবস্থাপনা

স্বাভাবিক নিয়মে ১৭-১৮ দিনে কোয়েলের ডিম থেকে উপযুক্ত পরিবেশে বাচ্চা ফুটে। বাণিজ্যিক কোয়েল ডিমে তা'য় বসে না। কোয়েলের ডিম সাধারণত কৃত্রিম উপায়ে ইনকুবেটর দিয়ে ফোটানো হয়। সফলভাবে বাচ্চা ফোটানোর হার বেশি পেতে হলে ইনকিউবেটর নির্মাতার নির্দেশ সতর্কতার সাথে অবলম্বন করতে হবে। ইনকুবেটরের কিছু কিছু মডেল শুধুমাত্র কোয়েলের ডিম বসানোর জন্যই ডিজাইন করা হয়। জাপানিজ কোয়েলের ডিম মুরগির ডিম ফোটানোর জন্য ব্যবহৃত ইনকুবেটরে ফোটানো যেতে পারে। তবে ডিম বসানোর ট্রেগুলোতে কিছুটা পরিবর্তন আনা দরকার। ডিমের মোটা অংশ সেটিং ট্রেতে বসানো উচিত। নিয়মমাফিক কোয়েলের ডিম প্রথম ১৫ দিন সেটিং ট্রেতে এবং পরবর্তী ৩ দিন হ্যাচিং ট্রেতে দিতে হবে। তাপমাত্রা ৯৮-১০১° ফাঃ এবং প্রথম ১৫ দিন ৫০-৬০% আর্দ্রতা এবং পরবর্তীতে ৬০-৭০% আর্দ্রতা রাখা বাঞ্ছনীয় (ইনকুবেটর নির্মাতার নির্দেশ অনুসারে)। প্রতি ২ থেকে ৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ডিম ঘুরিয়ে (টার্নিং) দিতে হবে যাতে এমব্রায়ো খোসার সাথে লেগে না যায়। ১৫তম দিনে ডিম সেটিং ট্রে থেকে হ্যাচিং ট্রেতে স্থানান্তর করতে হবে এবং ডিম ঘুরানো বন্ধ করতে হবে। ডিম থেকে বের হওয়া বাচ্চা ২৪-২৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্রুডার ঘরে স্থানান্তরিত করতে হবে।

কোয়েলের বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা এবং যত্ন

সদ্য ফুটন্ত কোয়েলের বাচ্চা খুবই ছোট হয়। এক দিন বয়সের কোয়েলের বাচচার ওজন মাত্র ৫-৭ গ্রাম, তাই ঠান্ডা বা গরম কোনোটাই তারা সহ্য করতে পারে না। এমতাবস্থায় খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টিমান এবং কাম্য তাপমাত্রা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বজায় রাখতে হয়। এ সময় কোনো রকম ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা বা কোনো রকম পীড়ন হলে এর প্রভাব স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি, ডিম উৎপাদন এবং বেঁচে থাকার ওপর পড়ে। বাচ্চাকে তাপ দেয়া বা ব্রুডিং খাঁচায় বা কেইজে করা যায়। উভয় পদ্ধতিতেই তাপ দেয়া যায় এবং তাপমাত্রার প্রয়োজনীয়তা একই রকম। প্রথম সপ্তাহে সাধারণত ৩৫° সেঃ তাপমাত্রা দিয়ে ব্রুডিং আরম্ভ করা হয় এবং তাপমাত্রা প্রতি সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে ৩.৫° সেঃ কমিয়ে নিম্নলিখিত মাত্রায় আনতে হবে।

বাচচার বয়স	তাপমাত্রা
প্রথম সপ্তাহ	৩৫° সেঃ (৯৫° ফাঃ)
দ্বিতীয় সপ্তাহ	৩২.২° সেঃ (৯০° ফাঃ)
তৃতীয় সপ্তাহ	২৯.৫° (৮৫° ফাঃ)
চতুর্থ সপ্তাহ	২৭.৬° (৮০° ফাঃ)

থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা নিরূপণ করা যায়। থার্মোমিটার ছাড়াও ব্রুডারের তাপ সঠিক হয়েছে কি না তা ব্রুডারে বাচ্চার অবস্থান দেখে এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুঝা যায়। বাচ্চাগুলো যদি বাল্বের কাছে জড়োসড়ো অবস্থায় থাকে তবে বুঝতে হবে তাপমাত্রা কম হয়েছে। আর যদি বাল্ব থেকে দূরে থাকে তবে তাপমাত্রা অধিক বুঝতে হবে। বাচ্চাগুলো যদি চারদিকে সমভাবে ছড়িয়ে থাকে এবং স্বাভাবিক ঘুরাফেরাসহ খাদ্য ও পানি গ্রহণ করে তাহলে বুঝতে হবে পরিমিত তাপমাত্রা আছে। বাংলাদেশে গরমের সময় দুই সপ্তাহ এবং শীতের সময় তিন চার সপ্তাহ কৃত্রিম উপায়ে তাপ দিতে হয়। গবেষণা থেকে জানা যায় যে, দুই সপ্তাহ কেইজে ব্রুডিং করে পরবর্তীতে মেঝেতে পালন করলে বাচ্চার মৃত্যু হার অনেক কম এবং বাচ্চার ওজন অপেক্ষকৃত বেশি হয়। কোয়েলের মৃত্যুহার নির্ভর করে তার উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার ওপর। ব্রুডিংকালীন সময়ে পর্যাপ্ত তাপ প্রদান করতে না পারলে বাচ্চার মৃত্যু হার বেড়ে যাবে। কাজেই এ সময়ে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

ইনকুবেটরে বাচ্চা ফুটার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্রুডিং ঘরে বাচ্চা স্থানান্তর করতে হবে এবং প্রথমে গ্লুকোজ পানি এবং পরে খাদ্য দিতে হবে। খাদ্যের সাথে পর পর তিনদিন গ্লুকোজ পানি খেতে দেয়া ভালো। তারপর এমবাভিট ডবিউ এস (Embavit-WS) পানির সংগে তিনদিন সরবরাহ করতে হবে। প্রথম ২-১ দিন খবরের কাগজ বিছিয়ে তার উপর খাবার ছিটিয়ে দিতে হবে এবং প্রতিদিন খবরের কাগজ পরিবর্তন করতে হবে। এরপর ছোট খাবার পাত্র বা ফ্লাট ট্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। পানির পাত্রে বাচ্চা যাতে পড়ে না যায় সে জন্য মার্বেল অথবা কয়েক টুকরা পাথর খন্ড পানির পাত্রে রাখতে হবে। সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পানি সরবরাহ করতে হবে।

অন্যান্য পোল্ট্রির মতো কোয়েলের জীবনচক্রকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- বাচ্চা, বাড়ন্ত এবং বয়স্ক। অনেকে আবার কোয়েলের জীবনচক্র সংক্ষিপ্ত বিধায় একে শুধু বাচ্চা এবং বয়স্ক দুইভাগে ভাগ করেন। স্বাভাবিকভাবে ১-৩ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চা বলা হয়। ৩-৫ সপ্তাহ বয়সের কোয়েলকে বাড়ন্ত এবং ৫ সপ্তাহের ওপরের কোয়েলকে বয়স্ক কোয়েল বলা হয়।

বাসস্থান

বাণিজ্যিকভাবে কোয়েল পালনের জন্য লিটার পদ্ধতির চেয়ে কেইজ পদ্ধতি অধিক লাভজনক। ছোট জোড়া খাঁচা বা কেইজ কোয়েল পালনের জন্য অধিকতর উপযোগী। মেঝে এবং খাচায় দুই পদ্ধতিতে কোয়েল পালন সু-প্রতিষ্ঠিত। বাচ্চা অবস্থায় প্রতিটি কোয়েলের জন্য ৭৫ বঃ সেঃ মিঃ এবং ১০০ বঃ সেঃ মিঃ জায়গায় যথাক্রমে খাঁচায় ও মেঝেতে দরকার। অন্যদিকে বয়স্ক কোয়েলের বেলায় খাচায় প্রতিটির জন্য ১৫০ বঃ সেঃ মিঃ এবং মেঝেতে ২৫০ বঃ সেঃ মিঃ জায়গা প্রয়োজন। দুইটি ডিমপাড়া কোয়েলের জন্য একটি ১২.৭×২০.৩ সেঃ (৫×৮ ইঞ্চি) মাপের কেইজই যথেষ্ট। কোয়েলের ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাপমাত্রা ৫০°-৭০° ফাঃ হওয়া ভালো। স্ত্রী কোয়েল এবং পুরুষ কোয়েল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৃথক পৃথকভাবে রাখতে হবে।

খাঁচায় কোয়েল পালন

খাঁচায় ৫০টি বয়স্ক কোয়েলের জন্য ১২০ সেঃ মিঃ দৈর্ঘ্য, ৬০ সেঃ মিঃ প্রস্থ এবং ৩০ সেঃ মিঃ উচ্চতাবিশিষ্ট একটি খাঁচার প্রয়োজন। খাঁচার মেঝের জালিটি হবে ১৬-১৮ গেজি ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত বাচ্চার খাচার মেঝের জালের ফাক হবে ৩ মিঃ মিঃ × ৩ মিঃ মিঃ এবং বয়স্ক কোয়েলের খাঁচায় মেঝের জালের ফাক হবে ৫ মিঃ মিঃ × ৫ মিঃ মিঃ। খাঁচার দুই পার্শে একদিকে খাবার পাত্র অন্যদিকে পানির পাত্র সংযুক্ত করে দিতে হবে। খাঁচায় ৫০টি কোয়েলের জন্য তিন সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত ২৫ সেঃ মিঃ বা ১০ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট ২৮ বঃ সেঃ মিঃ বা ৩ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন।

খাবার পাত্র

বাচ্চা অবস্থায় ফ্লাট ট্রে বা ছোট খাবার পাত্র দিতে হবে যেন খাবার খেতে কোনোরকম অসুবিধা না হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রতি ২৮টি বাচ্চার জন্য একটি খাবার পাত্র (যার দৈর্ঘ্য ৫০ সেঃ মিঃ, প্রস্থ ৮ সেঃ মিঃ এবং উচ্চতা ৩ সেঃ মিঃ) এবং প্রতি ৩৪টি বয়স্ক কোয়েলের জন্য একটি খাবার পাত্র (যার দৈর্ঘ্য ৫৭ সেঃ মিঃ প্রস্থ ১০ সেঃ মিঃ এবং উচ্চতা ৪ সেঃ মিঃ) ব্যবহার করা যায়। দিনে দুইবার বিশেষ করে সকালে এবং বিকেলে খাবার পাত্র ভালো করে পরিষ্কার সাপেক্ষে মাথাপিছু দৈনিক ২০-২৫ গ্রাম খাবার দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, প্রথম সপ্তাহ থেকে ৫ গ্রাম দিয়ে শুরু করে প্রতি সপ্তাহে ৫ গ্রাম করে বাড়িয়ে ২০-২৫ গ্রাম পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। প্রতিটি বয়স্ক কোয়েলের জন্য ১.২৫ থেকে ২.৫ সেঃ মিঃ (১/২ থেকে ১ ইঞ্চি) খাবার পাত্রের জায়গা দিতে হবে।

পানির পাত্র

সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পানি সরবরাহ করতে হবে। প্রতিটি বয়স্ক কোয়েলের জন্য ০.৬ সেঃ মিঃ (১/৪ ইঞ্চি) পানির পাত্রের জায়গা দিতে হবে। অটোমেটিক বা স্বাভাবিক যে কোনো রকম পানির পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতি ৫০টি কোয়েলের জন্য একটি পানির পাত্র দেয়া উচিত। নিপল ডিংকার বা কাপ ড্রিংকারও ব্যবহার করা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রতি ৫টি বয়স্ক কোয়েলের জন্য ১টি নিপল বা কাপ ড্রিংকার ব্যবহার করা যেতে পারে।

লিটার এবং এর ব্যবস্থাপনা

তুষ, বালি, ছাই, কাঠের গুঁড়া প্রভৃতি দ্রব্যাদি কোয়েলের লিটার হিসেবে মেঝেতে ব্যবহার করা যায়। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তুষ উপযোগী এবং সহজলভ্য। অবস্থাভেদে লিটার পরিবর্তন আবশ্যক যেন কোনোরকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি না হয়। মেঝেতে ডিপ লিটার পদ্ধতি অবলম্বন করা শ্রেয়। প্রথমেই ৫-৬ ইঞ্চি পুরু তুষ বিছিয়ে দিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন লিটার ভিজা না হয়। স্বাভাবিকভাবে শীতকালে লিটার পরিবর্তন এবং স্থাপন করতে হবে, অন্য ঋতুতে লিটার পরিবর্তন এবং স্থাপন করলে লিটারের ১-২ ভাগ চুন মিশিয়ে দিতে হবে যেন লিটার শুষ্ক ও জীবাণুমুক্ত হয়।

আলোক ব্যবস্থাপনা

কাঙ্ক্ষিত ডিম উৎপাদন এবং ডিমের উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য দৈনিক ১৪-১৮ ঘণ্টা আলোক প্রদান করা প্রয়োজন। শরৎকালে এবং শীতকালে দিনের আলোক দৈর্ঘ্য কম থাকে তাই কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা কর হয়। পুং কোয়েল যেগুলো প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হয় না এবং যেগুলো শুধুমাত্র মাংস উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় সেগুলোর জন্য দৈনিক ৮ ঘণ্টা আলোই যথেষ্ট। প্রাকৃতিক আলোর আলোর সাথে কৃত্রিম আলোর সমন্বয় করে নিম্ন সারণি মোতাবেক আলোক দিলে কাম্য ডিম উৎপাদন সম্ভব।

বয়স (সপ্তাহ)	প্রয়োজনীয় আলোর সময় (ঘণ্টা)
৫	১২.০০
৬	১২.০০
৭	১৩.৩০
৮	১৩.৩০
৯	১৪.৩০
১০	১৪.৩০
১১	১৫.০০
১২	১৬.০০

সুষম খাদ্য

বাচ্চা, বাড়ন্ত অথবা প্রজনন কাজে ব্যবহৃত কোয়েলের জন্য স্ট্যান্ডার্ড রেশন বাজারে সহজলভ্য নয়। কোয়েলের রেশনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- স্টার্টার (০-৩ সপ্তাহ), বাড়ন্ত (৪-৫ সপ্তাহ) এবং লেয়ার বা ব্রিডার (৬ সপ্তাহ) তিন সপ্তাহ পর্যন্ত কোয়েলের প্রতি কেজি খাবারে ২৭% প্রোটিন এবং ২৮০০ কেজিক্যালরি বিপাকীয় শক্তি, বাড়ন্ত কোয়েলের প্রতি কেজি খাবারে ২৩% প্রোটিন এবং ২৭০০ কেজিক্যালোরি বিপাকীয় শক্তি এবং লেয়ার কোয়েলের প্রতি কেজি খাবারে ২২-২৪% প্রোটিন এবং ২৭০০ কেজিক্যালোরি বিপাকীয় শক্তিতে ভালোফল পাওয়া যায়। ডিমপাড়া কোয়েলের প্রতি কেজি খাবারে ২.৫-৩.০% ক্যালসিয়াম থাকতে হবে। ডিমের উৎপাদন ধরে রাখার জন্য গরমের সময় ৩.৫% ক্যালসিয়াম প্রয়োজন।

বয়স	খাদ্যের প্রকার	প্রোটিন %	বিপাকীয় শক্তি
০-৩ সপ্তাহ	স্টার্টার ম্যাশ	২৭%	২৮০০ Kcal/kg
৪-৫ সপ্তাহ	বাড়ন্ত ম্যাশ	২৩%	২৭০০ Kcal/kg
৬ সপ্তাহ থেকে	লেয়ার এবং ব্রিডার ম্যাশ	২২-২৪%	২৫০০-২৭০০ Kcal/kg

রোগ

কোয়েলের রোগবালাই নেই বললেই চলে। সাধারণত কোনো ভ্যাক্সিন অথবা কৃমিনাশক ঔষধ দেয়া হয় না। তবে বাচ্চা ফুটার প্রথম ২ সপ্তাহ বেশ সংকটপূর্ণ। এ সময় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কোয়েলের বাচ্চার যত্ন নিতে হয়। অব্যবস্থাপনার কারণে কোয়েলের বাচ্চা মারা যায় তবে বয়স্ক কোয়েলের মৃত্যুহার খুবই কম।

উপসংহার

উৎপাদনের দিক থেকে কোয়েল অধিক উৎপাদনশীল। অন্যান্য পোল্ট্রির তুলনায় কোয়েলের মাংস এবং ডিম গুণগতভাবে শ্রেষ্ঠ। কোয়েলের ডিমে কোলেস্টরল কম এবং আমিষ বেশি। একটি মুরগির পরিবর্তে ৮টি কোয়েল পালন করা যায়। অল্প জায়গায় বাংলাদেশের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় অল্প খরচে পারিবারিক পর্যায়ে অথবা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোয়েল পালন দেশে পুষ্টি ঘাটতি মেটাতে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।

প্যাকেজের উদ্ভাবক

ড. কাজী মোঃ ইমদাদুল হক, দুলাল চন্দ্র পাল, ড. শাকিলা ফারুক, ড. নাথু রাম সরকার এবং ড. মোঃ সালাহ উদ্দিন

গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন

ভূমিকা

বাংলাদেশ নদীমাতৃক কৃষিনির্ভর দেশ। এ দেশের নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওড় পুকুর, ডোবা হাঁস পালনের জন্য উপযোগী। এছাড়াও বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু হাঁস পালনের জন্য অনুকূল। গ্রামবহুল এ দেশে পারিবারিকভাবে হাঁস পালন একটি প্রাচীন প্রথা। অল্প খরচে অধিক মুনাফা অর্জনে হাঁস পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। হাঁস প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্যের অর্ধেকেরও বেশি পুরণ করতে পারে। দেশে প্রচুর খাল-বিল, নদী নালা থাকায় একজন খামারি সামান্য পরিমাণ খাদ্য প্রদান করে সারা বছরই লাভজনকভাবে হাঁস পালন করতে পারেন। প্রাণিজ আমিষের প্রধান প্রধান উৎসের মধ্যে হাঁসের মাংস, মুরগির মাংস ও ডিম অন্যতম। প্রাকৃতিক উৎসের ওপর নির্ভর করে হাঁস পালন করলে উৎপাদন খরচ অনেক কম হবে।

হাঁসের জাত এবং জাতসমূহের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান হাঁস উৎপাদনকারী এলাকাগুলোতে যেমন- নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জের নিচু এলাকা এবং অন্যান্য এলাকায় যেখানে অধিকসংখ্যক হাঁস পালন করা হয়, সে সমস্ত এলাকায় প্রাপ্ত হাঁসের জাত ও তাদের শতকরা হার নিম্নরূপ-

জাত	শতকরা হার
খাকি ক্যাম্পবেল	৪৫
দেশী	৩০
জিন্ডিং	২০
ইন্ডিয়ান রানার	৫

দেশী

দেশী হাঁস নানা প্রতিকূল পরিবেশে ডিম ও মাংস উৎপাদন করে থাকে। বাংলাদেশের দেশী হাঁস উৎপাদন ক্ষমতার বিচারে উৎকৃষ্টমানের হাঁস। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশী জাতের হাঁস থেকে বাছাই ও নির্বাচনের মাধ্যমে দুইটি হাঁসের জাত উদ্ভাবন করেছে। এগুলো

হচ্ছে, বিএলআরআই-১ (নাগেশ্বরী) এবং বিএলআরআই-২ (রূপালী)। এ সমস্ত হাঁসের উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য বিদেশী ডিম উৎপাদনকারী হাঁসের সমকক্ষ। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এ সমস্ত হাঁসের জাতকে উন্নত ব্যবস্থাপনায় আবদ্ধ অবস্থায় পালন করলে ২০০ থেকে ২০৫টি ডিম পাওয়া যেতে পারে।

খাকি ক্যাম্পবেল

ডিম উৎপাদনের জন্য খাকি ক্যাম্পবেল একটি জনপ্রিয় জাত। এ জাত প্রধানত দেশের নিম্নাঞ্চলগুলোতে পালন করা হয়। শারীরিক ওজন হাঁসা ২-২.৫ কেজি এবং হাঁসি ১-১.৫ কেজি। এ জাতীয় হাঁস সাধারণত ১৪১ দিন (২০ সপ্তাহ) বয়সে বয়প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ১৭৬ গ্রাম। গড়ে বছরে একটি হাঁসি ২৫০-৩০০ টি ডিম পাড়ে। প্রতিটি ডিমের ওজন গড়ে প্রায় ৬৯ গ্রাম।

জিন্ডিং

ডিম উৎপাদনকারী জাতগুলোর মধ্যে জিন্ডিং অন্যতম। এদেরও গড় ওজন হাঁসা ২.০০ কেজি এবং হাঁসি ১.৫ কেজি। সাধারণত ১২৬ দিন বয়সে (১৮ সপ্তাহ) বয়সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। দৈনিক একটি বয়স্ক হাঁসের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ১৬০ গ্রাম। বছরে ডিম পাড়ে প্রায় ২৭০টি। গড়ে প্রতিটি ডিমের ওজন ৬৮ গ্রাম।

ইন্ডিয়ান রানার

ইন্ডিয়ান রানার একটি ডিম উৎপাদক জাত। এ জাতের তিনটি উপজাত আছে। তার মধ্যে সাদা জাতটি বেশি প্রচলিত। এ জাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ঘাড় শরীরের সঙ্গে সমান্তরাল। দৈহিক ওজন হাঁসা ২-২.৫ কেজি এবং হাঁসি ১-২ কেজি। এ জাতটি ১৪০ দিন (২০ সপ্তাহ) বয়সে প্রথম ডিম পাড়া আরম্ভ করে। গড়ে বছরে একটি হাঁসি ২৫০-৩০০ টি ডিম পাড়ে। প্রতিটি ডিমের ওজন গড়ে প্রায় ৬৬ গ্রাম।

হাঁসের বাচ্চা প্রাপ্তি স্থান

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করা যেতে পারে। খামারিগণ সরকারি হাঁস-মুরগি খামার থেকেও বাচ্চা পেতে পারেন। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন খামার নারায়ণগঞ্জ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার যেমনঃ দৌলতপুর, নওগাঁ এবং সোনাগাজী থেকেও হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেসরকারি উদ্যোগেও হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করা হয়। তন্মধ্যে এফআইভিডি (FIVD) এবং গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলা রামভদ্র গ্রামে তুষ পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করা হয়। খামারিরা ইচ্ছা করলে এ সমস্ত এনজিও এবং ব্যক্তি পর্যায়ে উৎপাদিত খামারিদের নিকট থেকেও হাঁসের বাচ্চা ক্রয় করতে পারেন।

হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং কালীন ব্যবস্থাপনা

বাচ্চা ফোটার পর থেকে ৫-৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চার কাঙ্কিত পরিবেশ নিশ্চিত করাই হচ্ছে ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা। ব্রুডিংকালে হাঁসের বাচ্চার পর্যাপ্ত যত্ন নিশ্চিত করতে হবে। এ সময় হাঁসের বাচ্চার মৃত্যুহার খুব বেশি। এই সময়ে হাঁসের বাচ্চার তাপ, আদ্রর্তা, আলো, বা চলাচল সঠিক হতে হবে। বাচ্চা পালনের ক্ষেত্রে প্রথম থেকে ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে নিম্নোক্তহারে (সারণি-১) তাপমাত্রা, বায়ু চলাচল ও আলো সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বাচ্চার ঘর যেন সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সারণি : ১ হাঁসের বাচ্চা ব্রুডিংকালে প্রয়োজনীয় কৃত্রিম তাপ, আলো ও বায়ু চলাচল

বয়স (সপ্তাহ)	তাপমাত্রা (০ফা)	আলো প্রদান (ঘণ্টা/দিন)	বায়ু চলাচল
১	৯৫	২০	ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকলে ক্ষতিকর গ্যাস বেরিয়ে যাবে আর্দ্রতা ঠিক থাকবে ও বাচ্চা সুস্থ থাকবে।
২	৯০	১৮	
৩	৮৫	১৪	
৪	৮০	১২	
৫	৭৫	১২	
৬	৭০	১২	

ব্রুডিংকালীন সময়ে প্রয়োজন অনুসারে খাবার পাত্র ও পানির পাত্র সরবরাহ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে খাবার ও পানির পাত্র অবশ্যই তাপের উৎসের কাছাকাছি থেকে একটু দূরে সাজিয়ে রাখতে হবে। এ সময় বাচ্চাগুলোকে নিয়মিত সুষম ও পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করতে হবে। ব্রুডারে বাচ্চার অবস্থান দেখে বুঝা যায় তাপমাত্রা কম বা বেশি আছে কি-না। বাচ্চাগুলোকে তাপ প্রদানের সময় যদি দেখা যায় তারা ছড়ানো ছিটানো থাকে ও সতর্ক মনে হয় তবেই বুঝতে হবে বাচ্চাগুলো সুস্থ আছে। অনেক সময় দেখা যায়, প্রথম কয়েকদিন ঠান্ডা লিটারের সংস্পর্শে এসে বাচ্চার দেহের তাপমাত্রা কমে যায়। এ কারণে বাচ্চা ব্রুডিং রুমে নেয়ার ১২-১৪ ঘণ্টা পূর্ব থেকেই ব্রুডার জ্বালিয়ে ঘর গরম করে রাখতে হয়, যেন বাচ্চা রাখার সময় লিটারের তাপমাত্রা ২৮° সেঃ থেকে ৩১° সেঃ এর মধ্যে থাকে। ব্রুডিং সময়ে তাপমাত্রা উঠানামা করলে কিংবা পর্যাপ্ত তাপমাত্রার ব্যবস্থা না থাকলে বাচ্চা ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে এবং বাচ্চার মৃত্যুর হার অধিক হতে পারে। এজন্য ব্রুডিংকালীন সময়ে সঠিক ব্যবস্থাপনা করলে বাচ্চার মৃত্যুর হার কম হবে এবং পরবর্তীতে এ সমস্ত হাঁস থেকে অধিক ডিম উৎপাদন সম্ভব হবে।

হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

গ্রামাঞ্চলে হাঁস অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতিতে পালন করা হয়। পুকুর, খাল-বিল, নদী ইত্যাদিতে হাঁস চড়ে বেড়ায় এবং এখান থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে। এই সমস্ত এলাকায় খাদ্য প্রাপ্তির ওপর (যেমন: শামুক, ঝিনুক ও অন্যান্য জলজ প্রাণী) তাদের উৎপাদন নির্ভর করে। অনেক খামারি চড়ে খাওয়ানোর পাশাপাশি চালের কুঁড়া, চাল ভাঙা, গম ভাঙা, ইত্যাদি খেতে দেয়। এছাড়া দেখা গেছে, যে সমস্ত খামারিদের সুষম খাবার তৈরি ও খাওয়ানো পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। ফলে পরবর্তীতে হাঁসের ডিম উৎপাদন কম হয়। এ কারণেই খামারিদের জন্য হাঁসের খাদ্য সূত্র সারণি-২ এ নমুনা হিসেবে প্রদান করা হলো। নিম্নোক্ত খাদ্যগুলো পরিমাণগত ক্রমানুসারে একত্র করে খুব ভালোভাবে মিশ্রিত করে হাঁসকে সরবরাহ করলে হাঁস তার চাহিদামতো পুষ্টিমান পাবে। সাধারণত বর্ষা মৌসুমে হাঁসের বাচ্চাগুলোকে অর্ধছাড়া অবস্থায় পালন করলে সম্পূরক খাদ্য হিসেবে বাচ্চা প্রতি ৪০ গ্রাম এবং বয়স্কগুলোকে ৬০ গ্রাম হারে সুষম খাদ্য দিতে হবে। তবে শুষ্ক মৌসুমে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততা কমে যায় বিধায় এ সময় ছেড়ে খাওয়ানোর পাশাপাশি ৭০ থেকে ৮০ গ্রাম খাদ্য সরবরাহ করা দরকার। প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততার ওপর ভিত্তি করে অর্ধছাড়া অবস্থায় হাঁস পালনের জন্য সম্পূরক খাবারের পরিমাণ কম বা বেশি হতে পারে।

সারণি : ২ বিভিন্ন বয়সের হাঁসের খাদ্য তৈরির সূত্র

খাদ্য উপাদান (%)	হাঁসের বাচ্চা (০-৬ সপ্তাহ)	বাড়ন্ত হাঁস (৭-১৯ সপ্তাহ)	ডিমপাড়া হাঁস (২০ সপ্তাহ ও তদুর্দ্ধ)
গম ভাঙা	৩৬.০০	৩৮.০০	৩৬.০০
ভুট্টা ভাঙা	১৮.০০	১৮.০০	১৬.০০
চালের কুঁড়া	১৮.০০	১৭.০০	১৭.০০
সয়াবিন মিল	২২.০০	২৩.০০	২৩.০০
প্রোটিন কনসেনট্রেট	২.০০	২.০০	২.০০
ঝিনুক চূর্ণ	২.০০	২.০০	৩.৫০
ডিসিপি	১.২৫	১.২৫	০.৭৫
ভিটামিন খনিজ মিশ্রিত	০.২৫	০.২৫	০.২৫
লাইসিন	০.১০	০.১০	০.১০
মিথিওনিন	০.১০	০.১০	০.১০
লবণ	০.৩০	০.৩০	০.৩০
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

হাঁসের খাদ্য তৈরির সময় যে সমস্ত খাদ্য উপাদান ব্যবহার করা হবে সেগুলো ফাঙ্গাসযুক্ত আছে কি না তা যাচাই করে দেখতে হবে।

হাঁস পালন পদ্ধতি

নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে হাঁস পালন করা যায়।

১. আবদ্ধ পদ্ধতি
২. অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতি
৩. মুক্ত রেঞ্জ পদ্ধতি
৪. হারডিং পদ্ধতি
৫. ল্যানটিং পদ্ধতি

আবদ্ধ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে পুরোপুরি হাঁসগুলোকে ঘরের মধ্যে রেখে লালন পালন করা হয়। কোনো অবস্থাতেই হাঁসগুলোকে বাইরে যেতে দেয়া হয় না। এই পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চা (৪-৬) সপ্তাহ পর্যন্ত লালন পালন করা সুবিধাজনক। এই পদ্ধতি ৩ প্রকার

১. ফ্লোরে লালন পালন,
২. খাঁচায় লালন পালন,
৩. তারের জালের মেঝেতে হাঁস পালন।

মেঝেতে হাঁস পালনঃ

এই পদ্ধতিতে মেঝেতে লিটার দ্রব্য দিয়ে হাঁস রাখা হয়। মেঝের ৪ ভাগের এক ভাগ খাবার ও পানি দেয়ার জন্য রাখা হয়, বাকি অংশে হাঁস অবস্থান করে। এই পদ্ধতিতে হাঁস পালনের জন্য অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ছোট আকারের নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সুবিধা

১. হাঁসগুলোকে ভালোভাবে পরিচর্যা করা যায়,
২. খরচ কম লাগে,
৩. শ্রমিক কম লাগে।

অসুবিধা

১. লিটার দ্রব্য যেগুলো ঘরে বিছানো হয় তা তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করতে হয়,
২. হাঁসগুলো এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকার কারণে বাচ্চা হাঁস বের করা কঠিন হয়ে পড়ে,
৩. লিটার দ্রব্যের সাথে খাদ্য দ্রব্য ও পানি দিলে বাসস্থান স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায় তাই বাসস্থান সহজেই কলুষিত হয়।

খাঁচায় হাঁস পালন

এই পদ্ধতিতে খাঁচাগুলো একটির পর একটি স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। খাঁচায় অনেক হাঁস এক সাথে পালন করা যায়। এই পদ্ধতি সাধারণত ২-৩ সপ্তাহ হাঁসের বাচ্চার জন্য উপযুক্ত। প্রতিটি খাঁচায় ২০-২৫ টি বাচ্চা রাখা যায়। হাঁসের বাচ্চাগুলোকে ৩-৪ সপ্তাহের বেশি রাখলে এদের বৃদ্ধি কমে যায়। খাঁচায় হাঁস পালনপালন করলে প্রতিটি হাঁসের জন্য ১.৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়।

সুবিধা

১. এই পদ্ধতিতে বাচ্চা হাঁস পালন করা সহজ,
২. অনেকগুলো এক সাথে পালন করা যায়,
৩. সহজে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করা যায়।

অসুবিধা

১. এই পদ্ধতিতে বড় হাঁস পালন করা যায় না।

তারের জালের মেঝেতে হাঁস পালন

এ পদ্ধতিতে ঘরের মেঝ থেকে উঁচু করে তারের জাল দেয়া হয় এবং তার জালের ফাঁক যাতে ১/২ বর্গ ইঞ্চি ছিদ্রের বেশি না হয়। মাঁচা র চারপাশে ১-২ ফিট বেড়া দিতে হবে যেন হাঁসের বাচ্চা পড়ে না যায়। মেঝে পদ্ধতিতে প্রতিটি হাঁস পালনের জন্য যে জায়গা লাগে তার চেয়ে তার জালের পদ্ধতিতে হাঁস পালনের জন্য ১/৩-১/২ পরিমাণ জায়গা কম লাগে। এই পদ্ধতিতে হাঁস পালন করলে প্রাথমিক খরচ একটু বেশি হয়।

অসুবিধা

১. তারের জাল বাবদ খরচ বেশি হয়,
২. সাধারণত বেশি বয়স্ক হাঁস পালন করা যায় না।

অর্ধছাড়া পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে রাতে হাঁসগুলোকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয় এবং দিনের বেলায় ঘরের সামনে চারণ অংশে ছেড়ে দেয়া হয়। অর্ধছাড়া অবস্থায় হাঁস পালনের জন্য খাদ্য ঘরের ভিতরে অথবা চারণ অংশে দেয়া যেতে পারে। তবে চারণ অংশে খাদ্য ও পানি সরবরাহ করা সুবিধাজনক। এই পদ্ধতিতে ঘরের প্রস্থ ১৮-২০ ফুট এবং দৈর্ঘ্য হাঁসের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে দেয়া হয়। চারণ অংশ ঘরের তুলনায় বেশি বড় রাখতে হবে। অর্ধ ছাড়া পদ্ধতিতে হাঁস পালনের জন্য ঘরের সাথে একটি পানির চৌবাচ্চা তৈরি করা যেতে পারে। যার প্রস্থ ২৮ এবং গভীরতা ৬-৮ যাতে হাঁসগুলো সহজে পানি খেতে এবং ভাসতে পারে। এই পদ্ধতিতে একটি হাঁসের জন্য ১০-১২ বর্গফুট চারণ ভূমি দরকার। অর্ধছাড়া অবস্থায় হাঁস পালন করলে ঘরের মেঝে সব সময় শুকনা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

সুবিধা

১. বাণিজ্যিকভিত্তিতে হাঁস পালনের জন্য সুবিধাজনক,
২. হাঁসের যত্ন নেয়া সহজ।

অসুবিধা

১. খরচ বেশি হয়,
২. বন্য প্রাণীর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ছাড়া অবস্থায় হাঁস পালন

এই পদ্ধতিতে হাঁসকে কেবল মাত্র রাতের বেলায় ঘরের মধ্যে আটকিয়ে রাখা হয় এবং দিনের বেলায় বিভিন্ন জায়গায় যেমন- পুকুর, নদী-নালা, হাওর, বিল প্রভৃতি জায়গায় ছড়ানো হয়। এই পদ্ধতিতে বাড়ন্ত এবং পূর্ণ বয়স্ক উভয় প্রকার হাঁসই পালন করা হয়ে থাকে। ছাড়া অবস্থায় হাঁস পালন পদ্ধতিতে হাঁসগুলোকে সকাল ৯ টা পর্যন্ত ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়। এতে ডিম সংগ্রহ করা সুবিধাজনক। ছাড়া অবস্থায় হাঁস পালনের ক্ষেত্রে একটি পূর্ণ বয়স্ক হাঁসের রাতে অবস্থানের জন্য ৩ বর্গফুট জায়গা দরকার এবং বাড়ন্ত হাঁসের জন্য ২ বর্গফুট জায়গা দরকার।

সুবিধা

১. খাদ্য বাবদ খরচ কম লাগে,
২. ব্যবস্থাপনায় কম শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

অসুবিধা

১. বাচ্চা হাঁস পালন করা যায় না,
২. হাঁসগুলোকে বিভিন্ন প্রিডেটর (বন্য প্রাণী) খেয়ে ফেলতে পারে।

হারডিং পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে বাড়ন্ত এবং পূর্ণ বয়স্ক হাঁস একই সাথে পালন করা যায়। হার্ডিং পদ্ধতিতে হাঁস গুলোকে কোনো প্রকার ঘরে রাখা হয় না। হাঁসগুলোকে সাধারণত গতিশীল রাখা হয়। যে সমস্ত জায়গায় প্রাকৃতিক খাবার আছে সে সকল এলাকায় হাঁসগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়। সারাদিন চরে বেড়ানোর পর রাতের বেলায় হাঁসগুলোকে কোনো একটা উঁচু জায়গায় আটকিয়ে রাখা হয় সকাল পর্যন্ত। কোন নির্দিষ্ট জায়গায় কিছুদিন চরে খাওয়ানোর পর অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এই পদ্ধতিতে এক সাথে একজন লোক ১০০ থেকে ৫০০টি হাঁস চড়াতে পারে। এই পদ্ধতিতে ডিম উৎপাদনের হার ৪৫-৪৮%। এদের ডিম উৎপাদন কম হলেও খাবার খরচ কম হয় বলে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।

সুবিধা

১. খাবার খরচ কম হয়,
২. বেশি সংখ্যক হাঁস পালন করা সম্ভব।

অসুবিধা

১. ডিম উৎপাদন কম হয়।

ল্যানটিং পদ্ধতি

ল্যানটিং পদ্ধতিতে বড় বড় বিল, হাওড়, জলাশয় এর আশপাশে ঘর তৈরি করে হাঁস পালন করা হয়। হাঁসগুলো দিনের বেলায় বিল বা জলাশয়ে চরে বেড়ানোর পর রাতের বেলায় ঘরে রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে একটি ঝাঁকে ১০০ থেকে ২০০টি হাঁস পালন করা যায়।

সুবিধা

১. এদের ডিম উৎপাদন ক্ষমতা ৯০ শতাংশ,
২. খাবার খরচ কম লাগে।

অসুবিধা

১. বাচ্চা হাঁস পালন করা যায় না,
২. কিছু অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহ করতে হয়।

হাঁসের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

বাসস্থান

হাঁস খুব বেশি গরম ও খুব ঠান্ডা সহ্য করতে পারেনা। হাঁসের ঘর এলাকাভিত্তিক উপকরণের ওপর ভিত্তি করে নির্মাণ করা উচিত। হাঁসের ঘর নির্মাণের সময় সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার-

১. স্থান নির্বাচন : হাঁসের ঘরের জন্য সাধারণত খোলামেলা উচু ও রৌদ্র থাকে এমন জায়গা নির্বাচন করা উচিত। ড্রেন কাটার সুবিধা আছে এবং ঘাস জন্মাতে পারে এমন স্থান নির্ধারণ করা উচিত। ঘরের আশপাশে গাছ বা জঙ্গল থাকা ঠিক নয়। হাঁসের ঘরের স্থান মুরগির খামারের পাশে ঠিক করা উচিত নয়।
২. হাঁসের সংখ্যা এবং কী ধরনের ঘরে হাঁস পালন করা হবে তা বিবেচনা করে ঘর তৈরি করতে হবে। গ্রামীণ পরিবেশ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ঘরের চালা নির্বাচন করতে হবে।

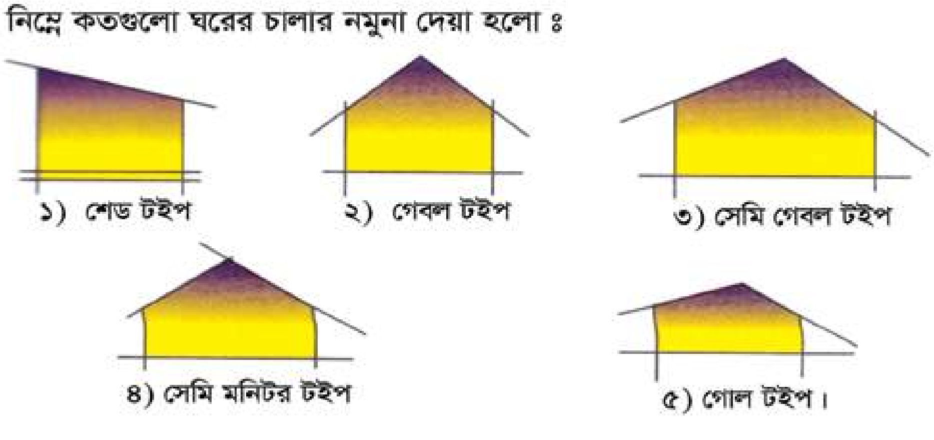

হাঁসের ঘরের ব্যবস্থাপনা

তাপমাত্রা: হাঁসের জন্য অতিরিক্ত গরম ও অতিরিক্ত ঠান্ডা দুটিই ক্ষতিকর। ঘরের তাপমাত্রা সাধারণত ১১.৮ ডিগ্রি সেঃ বা ৫৫ ডিগ্রি ফাঃ থেকে ২৩.৯ ডিগ্রি সেঃ বা ৭৫ ডিগ্রি ফাঃ পর্যন্ত রাখাই সর্বোত্তম।

আর্দ্রতা: হাঁসের ঘরের আর্দ্রতা ৭০% থাকাই বাঞ্ছনীয়। অনুকূল পরিবেশ এবং আবহাওয়ায় হাঁসের লোম গজানো, শারীরিক বৃদ্ধি এবং ডিম উৎপাদন ভালো হয়। ঘরের আর্দ্রতা ৭০% এর বেশি হলে ককসিডিয়া ও কৃমি দেখা দিতে পারে। ঘরের লিটার শুকনা রাখা এবং বায়ু চলাচলের পর্যাপ্ত সুবিধা রাখলে এসব রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয়।

আলো: হাঁসের ডিম উৎপাদন ভালো পাওয়ার জন্য আলোর ভূমিকা অপরিসীম। প্রথম ৬ সপ্তাহে রাতে আলোর ব্যবস্থা রাখা হলে খাদ্য বেশি খাবে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাবে। ডিমপাড়া হাঁসের জন্য ১৪-১৬ ঘণ্টা আলো থাকা দরকার। দিনের আলোর দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে অতিরিক্ত আলো কৃত্রিম বাল্বের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হবে। ব্রয়লার হাঁস উৎপাদনের জন্য রাতে এবং দিনে আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

বাতাস চলাচল ব্যবস্থা (ভেনটিলেশন): হাঁসের ঘরে বাতাস চলাচল ব্যবস্থা খুবই জরুরি। ঘরের বেড়া তারের জালের বা বাশের তৈরি ছিদ্রওয়ালা হলে আলো বাতাস চলাচলে সুবিধা হয়।

মেঝে এবং মেঝের পরিমাপ : মেঝে অবশ্যই শুকনা হতে হবে এবং মেঝেতে কোনো প্রকার গর্ত থাকা চলবে না। ১-২ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার জন্য ১/২ বর্গফুট, ৩-৪ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার জন্য ১ বর্গফুট এবং ৫-৭ সপ্তাহ ও এর ওপরের বয়সের হাঁসের জন্য ২ বর্গফুট জায়গার দরকার।

খাবার ও পানির পাত্র: হাঁসের ঘরে পানির জন্য ওয়াটার চেনেল তৈরি করতে হবে যার প্রস্থ ২০" এবং গভীর ৮-৯" হবে। ওয়াটার চেনেলের পানি অপরিষ্কার হলে তা বের করে পরিষ্কার পানি দিতে হবে। পানির কাছে খাবারের পাত্রে খাবার দিতে হবে।

হাঁসের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

হাঁস পালন মুরগির তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ। হাঁসের দুইটি মারাত্মক রোগ হলো ডাক প্লেগ ও ডাক কলেরা। সারণি-৩ এ বর্ণিত টিকা দান কর্মসূচি নিয়মিত অনুসরণ করলে হাঁসের রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। এছাড়া আজকাল খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত রোগ যেমন আফলাটক্সিন ও বটুলিজমের কারণে হাঁসের মৃত্যু ঘটতে দেখা যাচ্ছে। কাজেই খাদ্য তৈরির সময় বিশেষ করে ভুট্টাবীজ খুব ভালোভাবে নির্বাচনপূর্বক অন্যান্য খাদ্য উপাদান সঠিকভাবে নির্বাচন করে খাদ্য তৈরি করলে এ সমস্যা এড়ানো সম্ভব।

সারণি- ৩ : হাঁসের রোগ প্রতিরোধক টিকা দান কর্মসূচি

রোগের নাম	টিকার নাম	প্রাপ্তি স্থান	প্রয়োগের বয়স	প্রয়োগ পদ্ধতি
ডাক প্লেগ	ডাক প্লেগ টীকা	দেশের সকল প্রাণী চিকিৎসালয়	প্রথম মাত্রা ২১-২৮ দিন বয়সে দ্বিতীয় মাত্রা (বুস্টার ডোজ) ১ম মাত্রার ১৫ দিন পর অর্থাৎ ৩৬-৪৩ দিন বয়সে পরবর্তী প্রতি ৪-৫ মাস পর পর একবার	বুকের মাংসে/ প্রয়োগ বিধিমতে
ডাক কলেরা	ডাক কলেরা টীকা	দেশের সকল প্রাণী চিকিৎসালয়	প্রথম মাত্রা ৪৫-৬০ দিন বয়সে দ্বিতীয় মাত্রা (বুস্টার ডোজ) ১ম মাত্রার ১৫ দিন পর অর্থাৎ ৬০-৭৫ দিন বয়সে পরবর্তী প্রতি ৪-৫ মাস পর পর একবার	ডানার তলদেশে পালক ও শিরাহীন স্থানে চামড়ার নিচে/ প্রয়োগ বিধিমতে ডানার তলদেশে পালক ও শিরাহীন স্থানে

বিঃ দ্রঃ প্রতিষেধক টিকা প্রস্তুতকারীর নির্দেশ মোতাবেক প্রয়োগ করা উচিত

উপসংহার

বাংলাদেশের বিভিন্ন এগ্রো-ইকোলজিক্যাল এলাকায় অঞ্চলভিত্তিক খামারিরা হাঁস পালন করে আসছে। এ সমস্ত খামারিদের অধিকাংশই বিজ্ঞানভিত্তিক হাঁস পালন সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত সীমিত। হাঁস পালনের ক্ষেত্রে খামারিদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব। হাঁস পালনের বিজ্ঞানভিত্তিক দক্ষতা খামারিদের দারিদ্র্যবিমোচনে, পুষ্টি চাহিদা পূরণে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের ব্রয়লার ও লেয়ার শিল্পের পাশাপাশি গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালনের ওপর সরকারের নীতি নির্ধারকগণ দৃষ্টি প্রদান করলে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি, পুষ্টি অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

প্যাকেজের উদ্ভাবক

ড. কাজী মোঃ ইমদাদুল হক, মোঃ জাহিদ হোসেন, ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার
ড. মোঃ সালাহ উদ্দিন এবং ড. মোঃ নজরুল ইসলাম

কবুতর পালন

ভূমিকা

পৃথিবীতে প্রায় ১২০ জাতের কবুতর পাওয়া যায়। বাংলাদেশে প্রায় ২০ প্রকার কবুতর রয়েছে। এগুলো কোনো নির্দিষ্ট জাতের নয়। বাংলাদেশের সর্বত্র এ সকল কবুতর রয়েছে। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে সাধারণত এরা চরে বেড়ায়। বাংলাদেশের জলবায়ু এবং বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র কবুতর পালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। পূর্বে কবুতরকে সংবাদ বাহক, খেলার পাখি হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু বর্তমানে এটি পরিবারের পুষ্টি সরবরাহ, সমৃদ্ধি, শোভাবর্ধনকারী এবং বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের সুষ্ঠু পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সঠিকভাবে প্রতিপালন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা যায়।

কবুতরের জাত

(১) মাংস উৎপাদনকারী কবুতর	(২) রেসিং কবুতর	(৩) ফ্লাইং কবুতর	(৪)শোভাবর্ধনকারী (ওরনামেন্টাল) কবুতর (৫) দেশী কবুতর	(১)মাংস উৎপাদনকারী কবুতর
(ক) কিং- সাদা, কালো, সিলভার, হলুদ ও নীল (খ) কারনিউ (গ) মনডেইন সুইস, ফ্রেন্স (ঘ) আমেরিকান জায়ান্ট হোমার (ঙ) রাস্ট	(ক) রেসিং হোমার (খ) হর্স ম্যান	(ক) বার্মিংহাম রোলার (খ) ফ্লাইং টিপলার/ ফ্লাইং হোমার (গ) থাম্বলার (ঘ) কিউমুলেট (ঙ) হর্স ম্যান	(ক) মালটেজ (খ) ক্যারিয়ার (গ) হোয়াইট ফাউন্টেল (ঘ) টিম্বলার (ঙ) প্লোটারস (চ) নান্স	(ক) সিরাজী (খ) জালালী (গ) বাংলা (ঘ) গিরিবাজ (ঙ) লোটন (চ) বোম্বাই (ছ) গোবিন্দ

কবুতর পালন এলাকা : কবুতর বাংলাদেশের সর্বত্র পালন হয়ে থাকে তবে যে সকল এলাকাতে অধিক পরিমাণ কবুতর পালন করা হয়ে থাকে সেগুলো হলো ঢাকা, ঝিনাইদহ, পটুয়াখালী, বরগুনা, কক্সবাজার, বান্দরবান, রংপুর ও ময়মনসিংহ।

কবুতর পালনের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(ক) প্রাপ্ত বয়স্ক কবুতরের দৈহিক ওজন (জাতভেদে)	:	২৫০-৮০০ গ্রাম
(খ) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সময়কাল	:	৫-৬ মাস
(গ) কবুতর প্রতিবার ডিম দেয়	:	১ জোড়া
(ঘ) গড়ে ডিম উৎপাদন	:	১০.৪৩ জোড়া প্রতি বছর
(ঙ) হ্যাচাবিলিটি	:	৮৮.৫৪%
(চ) বাচ্চা উৎপাদনের বয়সকাল	:	৫-৬ বছর
(ছ) বাচ্চার চোখ ফোটে	:	৪-৫ দিনে
(জ) বাচ্চা ফোটার জন্য ডিমে তা দেয়া	:	১৭-১৯ দিন
(ঝ) পালক গজানোর সময়কাল	:	১০-১২ দিনে
(ঞ) পাখা এবং পা শক্ত হয়	:	১৯-২০ দিনে
(ট) বাজারজাতকরণের বয়স	:	২৮-৩০ দিন
(ঠ) দেহের তাপমাত্রা	:	১০৭-৬০ ফাঃ
(ড) হৃদস্পন্দন	:	১২৮-১৪০ বার/মিনিট
(ঢ) জীবনকাল	:	১৫-২০ বছর

* প্রথম ডিম দেয়ার প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় ডিম দেয়।

কবুতর পালনের সুবিধা এবং অসুবিধা

সুবিধাসমূহ

(ক) বিনিয়োগ কম
(খ) বেকার যুবক এবং দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের উপায়
(গ) শিক্ষিত লোকও বাণিজ্যিকভিত্তিতে খামার করে আয় বর্ধন করতে পারে।
(ঘ) সংক্ষিপ্ত প্রজননকাল
(ঙ) রোগবালাই কম
(চ) অল্প জায়গায় পালন করা যায়
(ছ) অল্প খাদ্যের প্রয়োজন হয়
(জ) প্রতিপালন অত্যন্ত সহজ
(ঝ) পরিবেশ বান্ধব, ভারসাম্যতা বজায়কারী এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য
(ঞ) মাংস সুস্বাদু, পুষ্টিকর, সহজে পাচ্য এবং প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের উৎস
(ট) মল জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করা যায়

অসুবিধাসমূহ

(ক) পালন বিষয়ক কারিগরি জ্ঞানের অভাব
(খ) দেশী বা বিদেশী জাতের কবুতর কেনার বিশ্বস্ত উৎসের অভাব
(গ) কবুতর ক্রয় বা বিক্রয় করার ভালো স্থানের অভাব
(ঘ) কবুতর প্রতিপালন সংক্রান্ত গবেষণা ফলাফলের অভাব
(ঙ) জাতীয়ভাবে বাণিজ্যিকভিত্তিতে কবুতর পালন এবং উৎপাদনের অভাব

কবুতর চেনার উপায়

স্ত্রী এবং পুরুষ কবুতর চেনা বেশ কঠিন। তবে দীর্ঘদিন অবলোকনের পর চেনা সহজ হয়। কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে স্ত্রী এবং পুরুষ কবুতরকে পৃথক করা যায়। যেমন-

পুরুষ কবুতর: তুলনামূলকভাবে আকারে বড়, চঞ্চল, দেহ চাকচিক্যপূর্ণ, মলদ্বারে উচু মাংসল অংশ থাকে, স্ত্রী কবুতরকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে ডাকে, ঠোঁট সামনের দিকে টানলে গলা নিজের দিকে নেয়ার চেষ্টা করে।

স্ত্রী কবুতর: আকারে ছোট, শান্ত এবং নমনীয় প্রকৃতির, মলদ্বারে উচু মাংসল অংশ থাকে না, এরা ঘুরে ঘুরে ডাকে না এবং ঠোঁট সামনের দিকে টানলে চুপ করে থাকে।

খামারের জন্য কবুতর ক্রয়ের সময় বিবেচ্য বিষয়

(ক) সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন চঞ্চল, সজীব কবুতর কিনতে হবে।
(খ) পালক এবং মলদ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে।
(গ) ঠোঁট বা মুখ দিয়ে কোনো লালা বা মিউকাস পড়বে না।
(ঘ) যে কোনো ধরনের আঘাত মুক্ত হতে হবে।
(ঙ) জোড়া হিসাবে কবুতর কিনতে হবে

কবুতর কিনে বাক্স বা ঝুঁড়িতে করে আনার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন বাক্স বা ঝুঁড়িতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের সুযোগ থাকে এবং কবুতর ভালোভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে।

কবুতরের বাসস্থান

স্থান : কবুতরের ঘর হবে উঁচু ভূমিতে, মাটির প্রকৃতি হবে বালুময় এবং উত্তম নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অবস্থান : কবুতরের ঘর মালিক বা খামারির আবাসস্থল থেকে ২০০-৩০০ ফুট দূরে হওয়া উচিত, এতে খামারি সারাক্ষণ যত্ন বা তদারকি করতে পারবেন। পর্যাপ্ত সূর্যালোক এবং বায়ু চলাচল আছে এরূপ স্থানে ঘর তৈরি করতে হবে। ঘর সাধারণত দক্ষিণমুখী হওয়া ভালো।

আকার : একটি খামারের জন্য ৩০-৪০ জোড়া কবুতর আদর্শ। এরূপ ঘরের মাপ হবে ৯ ফুট ×৮.৫ ফুট। কবুতরের খোপ ২-৩ তলাবিশিষ্ট করা যায়। একজোড়া কবুতরের জন্য ২টি খোপ দরকার যাতে করে একটি খোপে ১টি কবুতর ডিমে তা দিলে অন্য খোপে আরেকটি কবুতর থাকতে পারে। এতে ডিমে তা দেয়া সুবিধা হয়। এরূপ খোপের আয়তন প্রতিজোড়া ছোট আকারের কবুতরের জন্য ৩০ সে.মি. ×৩০ সে.মি. ×২০ সে.মি. এবং বড় আকারের কবুতরের জন্য ৫০ সে.মি. ×৫৫ সে.মি. ×৩০ সে.মি.।

ঘরের উচ্চতা : মাটি থেকে ঘরের উচ্চতা ২০-৩৬ ফুট, তবে ২৪ ফুট হওয়া ভালো এবং খাঁচার উচ্চতা ৮-১০ফুট হওয়া ভালো।

ঘর তৈরির উপকরণ : স্বল্প খরচে সহজে তৈরি এবং স্থানান্তরের জন্য কবুতরের ঘর কাঠ দিয়ে তৈরি করা উত্তম। তবে সাধারণত কাঠ, টিন, বাঁশ, খড় ইত্যাদি দিয়ে ঘর তৈরি করা যায়। ঘর তৈরির সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন শিয়াল, বেজি, ইঁদুর, বনবিড়াল ইত্যাদি বন্যপ্রাণী ঘরে ঢুকতে না পারে।

ডিমপাড়ার বাসা

ডিমপাড়ার জন্য কবুতর নিজেরাই বাসা তৈরি করে নেয়। খামারের ভেতরে নরম, শুক খড়-কুটা, শুকনো ঘাস, কচি ঘাসের ডগা জাতীয় দ্রব্যাদি উত্তম। শক্ত কোনো দ্রব্যাদি দিয়ে বাসা তৈরি করে সেখানে ডিম পাড়ার জন্য বসলে কবুতর আঘাত পেতে পারে এবং অনেক সময় ডিম ভেঙেও যেতে পারে। খোপের ভেতর মাটির সরা বসিয়ে রাখলে কবুতর সরাতে ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা ফুটায়।

কবুতরের ঘরের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

(ক) দানাদার খাদ্য সরবরাহের পাত্র
(খ) পানি সরবরাহের পাত্র
(গ) খনিজ মিশ্রণ সরবরাহের পাত্র
(ঘ) গোছল করার পাত্র
(ঙ) খোপ বা খাঁচা
(চ) কবুতর বসার জন্য স্ট্যান্ড
(ছ) মগ, বালতি, ঝাঁড়ু- ইত্যাদি
(জ) ডিম পাড়ার বাসা

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

কবুতরের বাচ্চার খাদ্য : ডিম ফোটে বাচ্চা বের হওয়ার কমপক্ষে ৪-৫ দিন পর কবুতরের বাচ্চার চোখ ফুটে। এজন্য এসময়ে বাচ্চাগুলো কোনো দানাদার খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। এ সময় স্ত্রী এবং পুরুষ কবুতর তাদের পাকস্থলী (ক্রপ) থেকে ঘন ক্রিম বা দধির মত নিঃসরণ বের করে যাকে কবুতরের দুধ বলে। এ দুধ অধিক আমিষ, চর্বি এবং খনিজ লবণ সমৃদ্ধ যা খেয়ে কবুতরের বাচ্চা বড় হয় এবং এক সপ্তাহ পর্যন্ত খেতে পারে। বাচ্চাগুলো যখন বড় হতে থাকে তখন স্ত্রী এবং পুরুষ কবুতর উভয়ে দানাদার খাদ্যের সাথে দুধ মিশিয়ে ঠোট দিয়ে বাচ্চাদের খাওয়ায়। বাচ্চা বড় হয়ে নিজে খাদ্য গ্রহণ না করা পর্যন্ত এভাবে খাবার খাওয়াতে থাকে।

কবুতরের দুধের রাসায়নিক গুণাবলি

পুষ্টি উপাদান	শতকরা পরিমাণ (%)	পুষ্টি উপাদান	শতকরা পরিমাণ (%)
পানি/জলীয় অংশ	৬৪-৮৪	হিস্টিডিন	১.৫২
ক্রুড প্রোটিন	১১-১৮.৮	আইসোলিউসিন	৪.৫০
ফ্যাট	৪.৫-১২.৭	লিউসিন	৮.৯৬
অ্যাশ	০.৮-১.৮	লাইসিন	৫.৮৭
কার্বোহাইড্রেট	০-৬.৪	মিথিওনিন	২.৮৪
ক্যালসিয়াম	০.৮১	মিথিওনিন+সিস্টিন	২.৮৪
পটাশিয়াম	০.৬২	ফিনাইল অ্যালালিন	৩.১৮
ম্যাগনেশিয়াম	০.০৮	টাইরোসিন	৫.৫০
সোডিয়াম	০.৫৪	থিওনিন	৫.৪৯
আরজিনিন	৫.৪৮	ট্রিপটোফেন	২.৮০
লাইসিন	৪.৯৯	ভ্যালিন	৫.৬১
সিরিন	৫.২০	আয়রন	৪২৯

প্রাপ্ত বয়স্ক কবুতরের খাদ্য : কবুতরের জন্য তৈরিকৃত খাদ্য শর্করা, আমিষ, খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন, চর্বি এবং খনিজ লবণ সম্পন্ন সুষম খাদ্য হতে হবে। কবুতর দানাদার জাতীয় খাদ্য বেশি পছন্দ করে, ম্যাশ বা পাউডার জাতীয় খাদ্য অপছন্দ করে। ছোট আকারের কবুতরের জন্য ২০-৩০ গ্রাম, মাঝারি আকারের জন্য ৩৫-৫০ গ্রাম এবং বড় আকারের জন্য ৫০-৬০ গ্রাম খাদ্য প্রতিদিন দিতে হবে। দানাদার জাতীয় খাদ্যের মধ্যে গম, ধান, ভুট্টা, সরগম, ওট শতকরা ৬০ ভাগ এবং লেগুমিনাস বা ডাল জাতীয় খাদ্যের মধ্যে সরিষা, খেসারি, মাশকলাই শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ সরবরাহ করতে হবে। কবুতরের ভিটামিন সরবরাহের জন্য বাজারে প্রাপ্ত ভিটামিন ছাড়া সবুজ শাকসবজি, কচি ঘাস সরবরাহ করা প্রয়োজন। প্রতিদিন ২ বার খাদ্য সরবরাহ করা ভালো। মাঝে মাঝে পাথর, ইটের কণা (গ্রিট) এবং কাচা হলুদের টুকরা দেয়া উচিত কারণ এ গ্রিট পাকস্থলীতে খাবার ভাঙতে এবং হলুদ পাকস্থলী পরিষ্কার বা জীবাণুমুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

দেহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃদ্ধির জন্য প্রোটিন এবং শক্তির প্রয়োজনীয়তা

বয়স (সপ্তাহ)	প্রোটিন (গ্রাম/দিন)		শক্তি (কেজিজুল/দিন)
	শরীরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	দৈহিক বৃদ্ধির জন্য	
১ম দিন	০.০১	৫.৫৫	১.৪৫
১ম সপ্তাহ	০.০৭	১৪.৮৪	১০.২৪
২য় সপ্তাহ	০.১৭	১০.৭৪	২.৯৮
৩য় সপ্তাহ	০.২২	৪.৪৯	২৯.৮২
৪র্থ-শেষ সপ্তাহ	০.২৪	১.৫৮	৩২.৪৩

এছাড়া কবুতরের প্রয়োজনের সময় বা ডিম দেয়ার সময় গ্রিট মিশ্রণ বা খনিজ মিশ্রণ, ডিম এবং ডিমের খোসা তৈরি এবং ভালো হ্যাচাবিলিটির জন্য অতীব প্রয়োজনীয়।

খনিজ মিশ্রণ

(ক) বোন মিল (সিদ্ধ) : ৫%	(ঙ) লবণ : ৪%
(খ) ঝিনুক : ৪০%	(চ) চারকোল : ১০%
(গ) লাইম স্টোন : ৩৫%	(ছ) শিয়ান রেড : ১%
(ঘ) গ্রাউন্ড লাইম স্টোন : ৫%	

পানি সরবরাহঃ প্রতিদিন পানির পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করে কবুতরকে দিনে ৩ বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা উচিত। কবুতর যেহেতু ঠোঁট প্রবেশ করিয়ে ঢোক গেলার মাধ্যমে পানি পান করে সেহেতু পানির পাত্র গভীর বা খাদ জাতীয় হওয়া উচিত। দুই সপ্তাহ পর পর পটাশ মিশ্রিত পানি সরবরাহ করলে পাকস্থলী বিভিন্ন জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

কবুতরের রোগ প্রতিরোধ করা গুরুত্বপূর্ণ। রোগ প্রতিরোধের জন্য কার্যকরি জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার নীতিমালাসমূহ মেনে চলতে হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত খামার ব্যবস্থাপনা

খামার হতে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খামার ব্যবস্থাপনা বা খামারের জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বেশিরভাগ রোগই খামার ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খামার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করলে একদিকে যেমন বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে অন্য দিকে তেমনি মানসম্পন্ন বাচ্চা উৎপাদন হবে এবং অধিক লাভবান হওয়া যাবে। স্বাস্থ্যসম্মত খামার ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়গুলো নিম্নে তালিকাবদ্ধ করা হলোঃ

১। সঠিকভাবে সেড তৈরি করতে হবে যেন পর্যাপ্ত আলো প্রবেশ এবং বায়ু চলাচল করতে পারে।

২। উপরে বর্ণিত উপায়ে সঠিক মাপে খোপ তৈরি করতে হবে।

৩। কবুতর উঠানোর আগে খামারসহ ব্যবহার্য সকল যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে পানি দিয়ে পরিষ্কার করার পর পানির সাথে কার্যকরি জীবাণুনাশক (যেমন ০.২-০.৫% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড বা আয়োডিন দ্রবণ কোম্পানি কর্তৃক নির্দেশ মোতাবেক) মিশিয়ে খামারের সকল অংশে স্প্রে করতে হবে।

৪। সুস্থ সবল কবুতর সংগ্রহ করতে হবে। প্রয়োজনে বাহ্যিক পরজীবী নিধনের জন্য ০.৫% ম্যালাথিয়ন দ্রবণে কবুতরকে গোসল করিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কবুতরের মুখ এ দ্রবণে ডুবানো যাবে না। হাত দিয়ে মাথায় লাগিয়ে দিতে হবে। অন্তঃপরজীবী প্রতিরোধের জন্য কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করাতে হবে।

৫। জীবাণুমুক্ত খাবার এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে। বিশেষ করে খাবার যাতে কোনো অবস্থাতেই অতিরিক্ত আর্দ্রতাযুক্ত না হয়। অতিরিক্ত আর্দ্রতাযুক্ত খাবারের মাধ্যমে অ্যাসপারজিলোসিস ও বিষক্রিয়াসহ জটিল রোগ হতে পারে।

৬। কবুতরের খোপ, দানাদার খাদ্য ও খনিজ মিশ্রণ সরবরাহের পাত্র, পানির পাত্র ও গোসল করার পাত্র এবং কবুতর বসার স্ট্যান্ড নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

৭। খামারে মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রতিবার খামারে প্রবেশ করার পূর্বে এবং খামার থেকে বের হওয়ার সময় হাত ও পা অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আয়োডিন যৌগ (আয়োডিন, পভিসেপ) বা কার্যকর জীবাণুনাশক ব্যবহার করতে হবে।

৮। খামারে যাতে বন্য পাখি ও ইঁদুর জাতীয় প্রাণী প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কেননা বন্য প্রাণী ও ইঁদুর দ্বারা রানীক্ষেত, মাইকোপ্লাজমা ও সালমোনেলাসহ গুরুত্বপূর্ণ রোগ খামারে আসতে পারে।

৯। শেড এবং খোপ নিয়মিত পরিষ্কার করে খামারের ভেতরের পরিবেশ অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে হবে।

১০। কোনো কবুতর অসুস্থ হলে দ্রুত আলাদা করে ফেলতে হবে। অসুস্থ বা মৃত কবুতর অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়ে কারণ জেনে অন্যান্য জীবিত কবুতরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১। খামারে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী মোকাবেলা করতে হবে।

টিকা প্রদান

খামারে রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা প্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কবুতরের প্রজননকালীন সময়ে প্যারেন্ট কবুতরগুলোকে রানীক্ষেত রোগের ইনএকটিভেটেড মৃত টিকা প্রয়োগ করা উত্তম। টিকা প্রয়োগের কমপক্ষে ৩ সপ্তাহ পর বাচ্চা ফুটানোর জন্য ডিম সংগ্রহ করতে হবে। তবে বাচ্চা কবুতর উড়তে শেখার সাথে সাথেও টিকা প্রয়োগ করা যায়। জীবিত বা ইনএকটিভেটেড মৃত উভয় টিকাই প্রয়োগ করা যায়। জীবিত টিকা চোখে এবং মৃত টিকা চামড়ার নিচে বা মাংসপেশিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম টিকা (জীবিত) প্রয়োগের কমপক্ষে ১৪ দিন পর দ্বিতীয় বা বুস্টার ডোজ দিতে হবে।

কবুতরের রোগবালাই

বিভিন্ন প্রকার রোগ জীবাণু দ্বারা কবুতর আক্রান্ত হতে পারে। সাধারণত খাদ্য এবং পানির মাধ্যমে জীবাণু কবুতরের দেহে প্রবেশ করে। তাছাড়া অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডাজনিত পীড়নের কারণেও অনেক সময় কবুতর দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। তাই কবুতরের খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে এবং গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে রোগবালাই অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কবুতরের সংক্রামক রোগসমূহের মধ্যে সাধারণত রানীক্ষেত, ইনকুশন বডি হেপাটাইটিস, বসন্ত, সালমোনেলোসিস, কক্সিডিওসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস এবং ছত্রাকজনিত রোগ গুরুতৃপূর্ণ। এছাড়া ভিটামিন বা খনিজ লবণের অভাবজনিত রোগ, বদহজম জনিত সমস্যা, গেঁটেবাত, অন্তপরজীবী যেমন কৃমি এবং বাহ্যিক পরজীবী যেমনঃ মাছি, উকুন ইত্যাদি দ্বারাও কবুতর আক্রান্ত হতে পারে। কবুতরের গুরুত্বপূর্ণ রোগ বালাইসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো-

রানীক্ষেত (Newcastle disease): Avian paramyxovirus ১ এ রোগের জন্য দায়ী। এ ভাইরাসটি সাধারণত খাদ্যযন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রান্ত করে। আক্রান্ত কবুতর থেকে সুস্থ কবুতরে এ রোগের জীবাণুর বিস্তার ঘটে। এ রোগে মৃত্যুহার শতকরা প্রায় ১০ ভাগ। মুরগির রানীক্ষেত রোগের ভাইরাসের এন্টিজেনিক বৈশিষ্ট্যের সাথে এ ভাইরাসের এন্টিজেনিক বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে।

সবুজ ডায়রিয়া বা টুথ পিকের মতো পায়খানা এবং প্যারালাইসিস ইত্যাদি এ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ। স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হলে মাথা কাপুনি, পা এবং পাখা ঝুলে পড়া, ঘাড় বাঁকা করে উল্টানোর ফলে কোন কোনো সময় এক চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। শতকরা ২-৩ ভাগ কবুতরে প্যারালাইসিস দেখা দিতে পারে। রোগের লক্ষণ, প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন দেখে এবং ভাইরাস শনাক্ত করে এ রোগ নির্ণয় করা যায়।

কবুতরকে জীবিত বা ইনএকটিভেটেড/মৃত টিকা প্রয়োগ এবং খামারের জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

ইনক্লুশন বডি হেপাটাইটিস (Inclusion body hepatitis): ইনক্লুশন বডি হেপাটাইটিস কবুতরের একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। Avain adenovirus বা pigeon herpesvirus এ রোগের জন্য দায়ী। অসুস্থ কবুতরের বমির সাহায্যে এ রোগ খামারের অন্যান্য সুস্থ কবুতরে বিস্তার লাভ করে। আক্রান্ত পিতামাতা থেকেও এ রোগ বাচ্চা কবুতরে বিস্তার লাভ করতে পারে। এ রোগের মৃত্যুহার শতকরা প্রায় ৪০-১০০ ভাগ।

দুর্গন্ধযুক্ত বাদামি বা সবুজ ডায়রিয়া, ঝিমানো, খাবারে অনীহা, শুকিয়ে যাওয়া, বমি করা এবং হঠাৎ মারা যাওয়া ইত্যাদি এ রোগের লক্ষণ। রোগের তীব্র প্রকৃতির ক্ষেত্রে লালচে কাল কলিজা (লিভার) বা দীর্ঘ প্রকৃতির ক্ষেত্রে কলিজা শুকিয়ে যায় এবং খাদ্যনালীতে শেথ (ইডিমা) দেখা দেয়। কোন কোন সময় কলিজা, প্লিহা ও অগ্ন্যাশয়ে সাদা ফুটি ফুটি দাগ এবং কোষের নিউকিয়াসে ইনক্লুশন বডি পাওয়া যায়।

রোগের লক্ষণ, প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন, কোষের নিউক্লিয়াসে ইনক্লুশন বডির উপস্থিতি সর্বোপরি ভাইরাস শনাক্ত করে এ রোগ নির্ণয় করা যায়।

এ রোগের কোনো চিকিৎসা না থাকার দরুণ আক্রান্ত কবুতরকে দ্রুত সরিয়ে ফেলাই রোগের বিস্তার, রোধ এবং প্রতিরোধের প্রধান উপায়।

বসন্ত (Pigeon Pox): Poxvirus নামক এক প্রকার ভাইরাস কবুতরের বসন্ত রোগের জন্য দায়ী। সাধারণত শরীরের পালকবিহীন অংশ যেমন- চোখ বা মুখের চারদিক, পা ইত্যাদি জায়গায় এ রোগের ফোস্কা বা গুটি দেখা যায়। আক্রান্ত কবুতরের চোখের পাতা ও চোখ ফুলে যায়, লাল হয়ে যায়, (conjunctivitis) এবং পানি পড়ে। ফোস্কা বা গুটিগুলো প্রাথমিক অবস্থায় ছোট থাকে কিন্তু পরবর্তীতে বড় হয়ে যাওয়ার দরুন অন্ধত্ব দেখা দিতে পারে। যার ফলে খেতে না পেরে আস্তে আস্তে শুকিয়ে মারা যায়।

শরীরের পালকবিহীন অংশ যেমন- চোখ বা মুখের চারদিক, পা ইত্যাদি জায়গায় তৈরি হওয়া ফোস্কা বা গুটি দেখেই সাধারণত এ রোগ নির্ণয় করা যায়।

কোনো চিকিৎসা না থাকার দরুন খামারের জৈবনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনাই রোগ প্রতিরোধের প্রধান উপায়। আক্রান্ত কবুতরকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে উৎপন্ন হওয়া ফোস্কা বা গুটিগুলোকে প্রতিদিন কমপক্ষে তিনবার করে আয়োডিন যৌগ যেমন-পভিসেপ বা আয়োসান দিয়ে মুছে দিতে হবে। এতে ফোস্কা বা গুটি ফেটে জীবাণুর বিস্তার রোধ সম্ভব হবে।

সালমোনেলোসিস (Salmonellosis): সাধারণত গোত্রভুক্ত ব্যাক্টেরিয়া Salmonella spp. এ রোগের জন্য দায়ী। আক্রান্ত পিতামাতা থেকে ডিমের মাধ্যমে এবং খাবার, পানি, খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, কর্মরত শ্রমিক ও আগত অন্যান্য লোকজন, খাদ্য সরবরাহের গাড়ি, বন্যপ্রাণী যেমন ইঁদুর ইত্যাদির মাধ্যমে খামারে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এ রোগে শতকরা ৫-৫০ বা তারও বেশি কবুতর আক্রান্ত হতে পারে।

আক্রান্ত কবুতরের ডায়রিয়া, শুকিয়ে যাওয়া, পা এবং পাখায় প্যারালাইসিস এবং ডিম পাড়ার সমস্যা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। জেলির মতো, হলুদ বা সবুজ পাতলা পায়খানা করে এবং মারা যায়। পা এবং পাখার গিরা ফুলে যায় ও ব্যথা হয়। পেটের ভেতরে Peritoneal cavity ডিম জমা হয়ে Peritonitis দেখা দেয়। অনেক সময় পেটের ভেতরের প্রায় সমস্ত অঙ্গে ডিম লেগে থাকে। ডিমের ফলিকুলগুলোতে প্রচুর রক্তক্ষরণ দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ, প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন এবং ব্যাক্টেরিয়া সনাক্ত করে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। কার্যকরি এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য খামারে ব্যাক্টেরিয়ার প্রবেশ রুদ্ধ করতে হবে এবং আক্রান্ত কবুতর খামার থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

এসপারজিলোসিস (Aspergillosis): Aspergillus fumigatus নামক ছত্রাক মূলত এ রোগের কারণ। এ জীবাণুটি প্রধানত শ্বাসযন্ত্রকে আক্রান্ত করে তবে শরীরে ভেতরের অন্যান্য কলাকেও আক্রান্ত করতে পারে। ডিমের খোসার ভিতর দিয়ে এ রোগের জীবাণু ভ্রূণে প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া আক্রান্ত কবুতর থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস মাধ্যমে সুস্থ কবুতর আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে মৃত্যুহার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে।

শ্বাসকষ্ট, ঝিমানো, শুকিয়ে যাওয়া, খাবারের প্রতি অনীহা, ওজন কমে যাওয়া এবং ঘন ঘন পিপাসা পাওয়া ইত্যাদি এ রোগের লক্ষণ। আক্রান্ত কবুতরের ফুসফুসেছোট ছোট হলুদাভ গুটি দেখা যাবে এবং বায়ু কুঠুরী মোটা, ঘোলাটে এবং হলুদাভ হয়ে যাবে।

রোগের লক্ষণ: প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন এবং ছত্রাক শনাক্ত করে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। কার্যকরী ছত্রাক বিরোধী ঔষধ যেমন Amphotericin দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য আক্রান্ত কবুতর খামার থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

রক্ত আমাশয় (Coccidiosis): Eimeria গোত্রভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির প্রটোজোয়া দ্বারা এ রোগ হতে পারে। এই জীবাণুগুলো সাধারণত খাদ্যনালীকে আক্রান্ত করে। সংক্রমিত খাবার, পানি বা লিটার থেকে মুখের মাধ্যমে জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। এ রোগে মৃত্যুহার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ।

রক্ত মিশ্রিত ডায়রিয়া, ক্ষুধামন্দা এবং ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি এ রোগের প্রধান লক্ষণ। আক্রান্ত কবুতরের খাদ্যনালীর বিভিন্ন অংশে রক্তক্ষরণ, রক্তমিশ্রিত অপাচ্য খাদ্য এবং আলসার বা ঘা দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ: প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন এবং পায়খানা বা খাদ্যনালীর ভেতরের দিকের অংশ নিয়ে পরীক্ষা করে প্রটোজোয়া সনাক্ত করে এ রোগ নির্ণয় করা যায়। কার্যকরি প্রেটোজোয়া বিরোধী ঔষধ যেমন সালফারজাতীয় ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য আক্রান্ত কবুতর কার্যকরি জীবাণুনাশক দিয়ে শেড ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে এবং কঠোর জৈবনিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে।

ক্যাঙ্কার (Trichomoniasis): Trichomonas gallinae নামক এক প্রকার প্রটোজোয়া এ রোগের জন্য দায়ী। এ জীবাণুটি সাধারণত খাদ্যনালীর ওপরের অংশকে আক্রান্ত করে। আক্রান্ত বয়স্ক পিতামাতা কবুতর থেকে দুধের মাধ্যমে বাচ্চায় এ রোগের সংক্রমণ ঘটে। আক্রান্ত জীবিত কবুতর সারাজীবন এ রোগের জীবাণু বহন করে। এ রোগে মৃত্যুহার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ।

আক্রান্ত কবুতর অস্থির থাকে, পাখা উষ্কু খুষ্কু হয়ে যায়, খাদ্য গ্রহণ কমে যায় এবং ধীরে ধীরে শুকিয়ে মারা যায়। আক্রান্ত কবুতরের মুখের চারিদিকে সবুজাভ বা হলুদ লালা লেগে থাকে এবং কোনো কোনো সময় ঠোঁট বেয়ে ফোটাঁ ফোটাঁ লালা পড়তে দেখা যায়। রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে কবুতরের মুখগহবর এবং গলাতে গোলাকৃতির ছোট ছোট গুটি দেখা যায়। পরবর্তীতে এ গুটিগুলো একত্রিত হয়ে বড় গুটিতে পরিণত হয়ে খাদ্যনালী আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ বন্ধ হয়ে যায়। একই রকমের গুটি মাথা, নাসিকা গহ্বর এবং কলিজাতেও দেখা যেতে পারে।

রোগের লক্ষণ, প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন এবং মুখ বা পাকস্থলী (ক্রপ) থেকে কলা নিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পরীক্ষা করে রোগের জীবাণু দেখে রোগ নির্ণয় করা যায়।

আক্রান্ত কবুতরকে দ্রুত দল থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ান এর পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে।

কবুতর বাজারজাতকরণ

কবুতর পালন একটি লাভজনক ব্যবসা। এটি কেবল ক্ষুদ্র এবং মাঝারি খামারিদের জন্য নয় বরং সুশীল সমাজের জন্য একটি বাণিজ্যিক শিল্প। কবুতর পালন বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জ থেকে শুরু করে অনেক শহরে খামার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। তবে এ সকল কবুতর বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সঠিক কোনো স্থান বা পদ্ধতি গড়ে ওঠেনি। তাছাড়া কবুতরের বিশুদ্ধ জাত পাওয়ার বা কেনার কোনো বিশ্বস্ত উৎস বা মাধ্যম নেই। খামারিগণ তাদের উৎপাদিত কবুতর সাধারণত স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে থাকেন। তবে এ পদ্ধতিতে ন্যায্য মূল্য পাওয়া যায় না। ঢাকার কাটাবন, জিঞ্জিরা, টঙ্গী, গাজীপুর, ঠাটারিবাজার কবুতর ক্রয় বিক্রয়ের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এসব স্থানে বিভিন্ন শৌখিন জাতের কবুতর পাওয়া যায়।

উৎপাদনকারীর নিকট থেকে ভোক্তার নিকট দ্রব্য পৌঁছানোর জন্য একটি সুষ্ঠু এবং সুন্দর মাধ্যম গড়ে ওঠা উচিত। সাধারণত ২৮-৩০ দিন বয়সের কবুতর খাবার জন্য বিক্রয় করার উপযুক্ত হয়।

কবুতর পালনে আয় ব্যয়ের হিসাব

উন্নত বা শৌখিন জাতের কবুতরের ক্ষেত্রে

(ক) মূলধন বিনিয়োগঃ স্থায়ী খরচ

৩০ জোড়া কবুতরের দামঃ ৫০০০ × ৩০	= ১,৫০,০০০ টাকা (গড়ে প্রতি জোড়া ৫০০০ টাকা হিসাবে)
ঘর এবং যন্ত্রপাতি বাবদ	= ২০,০০০ টাকা
মোট খরচ	= ১,৭০,০০০ টাকা

(খ) খামার পরিচালনা খরচ

খাদ্য খরচ	= ১৭,০০০ টাকা
ঔষধ, টিকা ও জীবাণুনাশক বাবদ খরচ	= ৫০০০ টাকা
বিদ্যুৎ খরচ	= ১২০০ টাকা
অন্যান্য খরচ	**= ২০০০ টাকা**
মোট খরচ	**= ২৫,২০০ টাকা**

সর্বমোট খরচ (ক+খ) = (১,৭০,০০০+২৫,২০০) = ১,৯৫,২০০ (এক লাখ পচানব্বই হাজার দুইশত) টাকা।

(গ) আয়

১ জোড়া কবুতর প্রতি বছর গড়ে বাচ্চা দেয় ৫ জোড়া
সুতরাং ৩০ জোড়া কবুতর প্রতি বছর গড়ে বাচ্চা দেয় (৫ × ৩০) = ১৫০ জোড়া
বাচ্চার মোট বিক্রয় মূল্য (২০০০ × ১৫০) = ৩,০০০০০ টাকা (প্রতি জোড়া বাচ্চার দাম গড়ে ২০০০ টাকা)
বিষ্ঠার বিক্রয় মূল্য গড়ে প্রতি বছর = ৫০০ টাকা
মোট আয় = ৩,০০৫০০ (তিন লক্ষ পাঁচশত) টাকা
সুতরাং এক বছরে প্রকৃত লাভ = (৩,০০৫০০-১,৯৫,২০০) = ১,০৫,৩০০ (এক লক্ষ পাঁচ হাজার তিন শত) টাকা

২। দেশী জাতের কবুতরের ক্ষেত্রে-

(ক) মূলধন বিনিয়োগ : স্থায়ী খরচ

৩০ জোড়া কবুতরের দামঃ ৮০ × ৩০	= ২৪০০ টাকা (গড়ে প্রতি জোড়া ৮০ টাকা হিসাবে)
ঘর এবং যন্ত্রপাতি বাবদ	= ২০০০ টাকা
মোট খরচ	= ৪,৪০০ টাকা

(খ) খামার পরিচালনা খরচ = ১,০০০ টাকা

সর্বমোট খরচ কে+খ) = (৪,৪০০+১০০০) = ৫,৪০০ (পাঁচ হাজার চারশত) টাকা।

(গ) আয়

১ জোড়া কবুতর প্রতি বছর গড়ে বাচ্চা দেয় ৬ জোড়া
সুতরাং ৩০ জোড়া কবুতর প্রতি বছর গড়ে বাচ্চা দেয় (৬ × ৩০) = ১৮০ জোড়া
বাচ্চার মোট বিক্রয় মূল্য (৫০ × ১৮০) = ৯০০০ টাকা (প্রতি জোড়া বাচ্চার দাম গড়ে ৫০ টাকা)
বিষ্ঠার বিক্রয় মূল্য গড়ে প্রতি বছর = ১০০০ টাকা
মোট আয় = ১০,০০০ (দেশ হাজার) টাকা
সুতরাং এক বছরে প্রকৃত লাভ = ১০,০০০-৫,৪০০ = ৪,৬০০ (চার হাজার ছয়শত) টাকা

কবুতর পালনের ঝুঁকিপূর্ণ দিকসমূহ

১. কবুতর মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়
২. কবুতরের মাংস সবাই খায় না
৩. কবুতর অসুস্থ হলে বাচাতে বেগ পেতে হয়
৪. ডিম এবং বাচ্চা বন্যপ্রাণী সাধারণত খেয়ে ফেলে

উপসংহার

বাংলাদেশে কবুতরকে সাধারণত শখের বা পোষা প্রাণী হিসাবে পালন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে কবুতর পালন করা হচ্ছে। কবুতরের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে কবুতর পালনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক আয়ের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কবুতরের মাংস একদিকে যেমন প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ করছে, অন্যদিকে তেমনি অভাবগ্রস্থ মহিলা ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের একটি উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্যাকেজের উদ্ভাবক

ড. রেজিয়া খাতুন, ড. জাহাঙ্গীর আলম এবং ড. মোঃ নজরুল ইসলাম

পারিবারিক পর্যায়ে খরগোশ পালন

ভূমিকা

জনবহুল বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি একটি প্রধান সমস্যা। বিগত বছরগুলোতে দেখা যায় উৎপাদিত প্রাণিজ আমিষ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে না। কিন্তু মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণে প্রাণিজ আমিষ যথা : দুধ, ডিম, মাংস ইত্যাদির গুরুত্ব ব্যাপক বা অপরিসীম। আমাদের প্রতিদিন প্রাণিজ আমিষের প্রয়োজন ২৫ গ্রাম এবং প্রাপ্যতা ৫.৭ গ্রাম/জন। ফলে, মানুষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও মানসিক পরিপূর্ণতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। দেশে শতকরা ৬৫ ভাগ লোক অতি দরিদ্র এবং অধিকাংশ লোক পুষ্টি হীনতায় ভুগছে। পারিবারিক পর্যায়ে খরগোশ পালন করে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, আয় বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। অন্য প্রাণির তুলনায় খরগোশ সহজেই পালন করা যায়। এর খাদ্য এবং ব্যবস্থাপনা সহজ বিধায় বাড়ির মহিলা ও ছেলে মেয়েরা কাজের ফাঁকে সহজেই খরগোশ পালন করতে পারেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যথা- আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ড, চীন, জাপানসহ অনেক দেশে বাণিজ্যিকভাবে খরগোশ প্রতিপালন করা হয়। বাংলাদেশে এর পালন এবং মাংস এখনো জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। তবে, বি,আর,ডি,বি, এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য কিছু বেসরকারি সংস্থা খরগোশ পালনে খামারিদের উৎসাহিত করতে সক্ষম হয়েছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খরগোশ পালন অত্যন্ত লাভজনক। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রজাতির যে খরগোশ দেখা যায়, তন্মধ্যে সাদা, কালো, ডোরা এবং খয়েরি রঙের খরগোশ বেশি। বাংলাদেশে প্রাপ্ত জাত সমূহের মধ্যে ডার্ক গ্রে (নেটিভ), ফক্স, ডাচ, নিউজিল্যান্ড লাল, নিউজিল্যান্ড সাদা, নিউজিল্যান্ড কালো, বেলজিয়াম সাদা এবং ছিনছিলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

টেবিল ১. বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন জাতের খরগোশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

জাত	উৎপত্তি	প্রাপ্তি স্থান	রঙ	দৈহিক ওজন (বয়স্ক)	অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
(১) ডার্ক গ্রে (নেটিভ)	বাংলাদেশ	ঢাকা, যশোর	গাঢ় ধূসর	২-৩ কেজি	চালাক চতুর এবং ভালো তৃণভোজী
(২) ফক্স	আমেরিকা	ঐ	কালো এবং অম্রবর্ণ	২.৫-৩.১৭ কেজি	ছোট আকৃতির এবং মাংসল জাত
(৩) ডাচ	নেদারল্যান্ড	ঢাকা	সাদা দাগযুক্ত ধূসর রঙের	১.৮-২.২৫ কেজি	মাংস উন্নতমানের এবং ল্যাব প্রাণী
(৪) নিউজিল্যান্ড লাল	নিউজিল্যান্ড	ঢাকা যশোর	লালচে সাদা	৩.৬০-৪.৫০ কেজি	মাংস খুবই উন্নতমানের তৃণভোজী এবং তুলনামূলকভাবে বেশি শান্ত
(৫) নিউজিল্যান্ড সাদা	নিউজিল্যান্ড	ঢাকা যশোর খুলনা	সাদা	৪.০৫-৫.৪৪ কেজি	মাংস খুবই সুস্বাদু, দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ভালো তৃণভোজী
(৬) নিউজিল্যান্ড কালো	নিউজিল্যান্ড	ঢাকা যশোর খুলনা	কালো	৪-৫.৪৪ কেজি	দ্রুত বর্ধনশীল, তৃণভোজী এবং মাংস খুবই সুস্বাদু
(৭) বেলজিয়াম সাদা	বেলজিয়াম	ঢাকা	সাদা	৩.৫২-৪.৭ কেজি	দ্রুত বর্ধনশীল, তৃণভোজী এবং মাংস খুবই সুস্বাদু
(৮) ছিনছিলা	ফ্রান্স	ঢাকা যশোর	-	২.৫০-২.৯৫ কেজি	অত্যন্ত ভালো মানের মাংস উৎপাদনকারী এবং তৃণভোজী

খরগোশ পালনের সুবিধাসমূহ

১. এটি দ্রুত বর্ধনশীল প্রাণি।
২. বাচ্চা দেয়ার হার অত্যধিক, এক সাথে ২-৮ টি বাচ্চা প্রসব করে।
৩. প্রজনন ক্ষমতা অধিক এবং এক মাস পর পর বাচ্চা প্রদান করে।
৪. খাদ্য দক্ষতা অপেক্ষাকৃত ভালো।
৫. মাংস উৎপাদনে পোল্ট্রির পরেই খরগোশের অবস্থান।
৬. অল্প জায়গায় স্বল্প খাদ্যে পারিবারিক পর্যায়ে পালন করা যায়।
৭. অল্প খরচে অধিক উৎপাদন সম্ভব।
৮. খরগোশের মাংস অধিক পুষ্টিমানসম্পন্ন ও উন্নতমানের।
৯. সব ধর্মের লোকই এর মাংস খেতে পারে তাতে কোনো সামাজিক বাধা নেই।
১০. রান্না ঘরের উচ্ছিষ্টাংশ, বাড়ির পাশের ঘাস, লতা-পাতা খেয়ে এর উৎপাদন সম্ভব।
১১. পারিবারিক শ্রমের সফল ব্যবহার করা সম্ভব।

টেবিল ২. খরগোশের শারীরিক ও বায়োলজিক্যাল বৈশিষ্ট্যাবলি

গুণাবলি	পর্যবেক্ষণ	মন্তব্য
পায়ুর তাপমাত্রা	গড়ে ৩৯.৫° সে রেঞ্জ ৩৮-৪° সেঃ	জাতের পার্থক্য বিদ্যমান এবং ছোট প্রাণীতে বেশি তাপমাত্রা থাকে
নাড়ী স্পন্দন	(১৫০-৩০০) বিট/মিনিট	খুব ছোট খরগোশের হৃদ স্পন্দন বেশি হয়
শ্বাস-প্রশ্বাসের হার	৩০-১০০/মিঃ	প্রাপ্ত বয়সে গড়ে ৫-৫০
দুগ্ধ দান কাল	গড়ে ৪২ দিন	-
বাচ্চা প্রদানের হার/মাদী খরগোশ/বছর	২-১০	সাধারণত দর্শনী জাতগুলোতে কম হয় তবে আভ্যন্তরীণ ফার্মে ব্যবহৃত জাতগুলিতে এর সংখ্যা বেশি হয়।
বাচ্চার সংখ্যা	২-১৪ টি	ইহা নির্ভর করে জাত, স্টেইন পার্থক্যের উপর। মাঝারি আকারের প্রদর্শনী স্টকে কম গড়ে ৫-৬টি কিন্তু বাণিজ্যিক জাতে ৮-৯ টি
জীবনকাল	৬-১১ বছর	-
পূর্ণতা প্রাপ্তির বয়স	১৬-২৬ সপ্তাহ	ছোট জাতের পূর্ণতা প্রাপ্তি আগে হয়
গর্ভধারণ কাল	৩১-৩২ দিন	তবে এটি ২৯-৩৪ দিন হতে পারে
প্রাপ্ত বয়স্ক ওজন	১-৭.৫ কেজি	তবে খুব কম ক্ষেত্রে ১২ কেজি পর্যন্ত ওজন হয়
সেক্স রেশিও	১০০ পুরুষ : ১০২ স্ত্রী খরগোশ	-

খরগোশ প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাসস্থান

বাণিজ্যিকভাবে খরগোশ প্রতিপালনের জন্য বহুতল বিশিষ্ট খাঁচা এবং মেঝেতে খরগোশ পালন করা যায়। স্বাভাবিকভাবে জাত অনুযায়ী মেঝের আকারে বিভিন্ন ধরনের হয়। সাধারণত প্রতি ৮ টি বয়স্ক খরগোশের জন্য ৫/ × ২/ বর্গফুট একটি খাচার প্রয়োজন হয় এবং প্রজননের সময় আলাদা প্রজনন ঘর ব্যবহার করা (১ বর্গফুট /১/২ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য) হয়। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের খরগোশ ছেড়ে পালন করা যায়, তবে বাচ্চা দেয়ার সময় এরা নিজেরাই গর্ত খুঁড়ে নিজের গায়ের লোম ছিড়ে বাসা তৈরি করে। যদি খাচায় পালন করা হয়, তবে বাচ্চা দেয়ার সময় মের্টানিটি বক্স বা নেট ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক খরগোশের খাঁচার পরিমাপ ও মের্টানিটি বক্সের পরিমাণ দেয়া হলো-

খরগোশের ঘরের / খাচার পরিমাপ : প্রতিটি খরগোশের জন্য খাচার পরিমাপ

দৈর্ঘ্য - ৭৫ সেঃ মিঃ
প্রস্থ- ৪৫ সেঃমিঃ
এবং উচ্চতা - ৩৫ সেঃ মিঃ

মের্টানিটি বক্সের পরিমাপছ

দৈর্ঘ্য - ৪০ সেঃ মিঃ
প্রস্থ- ৩০ সেঃমিঃ
উচ্চতা - ২৫ সেঃ মিঃ
দরজা - ১৫ সেঃ মিঃ

খাদ্য : বয়স ও জাত ভেদে খরগোশের খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন হয়। একটি বয়স্ক খরগোশের খাদ্যে রসদে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা নিম্নে দেয়া হলো-

ক্রুড প্রোটিন (সিপি) = ১৭% (ভাগ)
আশ (ফাইবার) = ১৪% (ভাগ)
মিনারেল = ৭%
বিপাকীয় শক্তি (এমই) = ১১ মেগাজুল /কেজি

খাদ্য গ্রহণ

১৩০-১৪৫ গ্রাম/দিন (বয়স্ক খরগোশ)
২৫০-৩০০ গ্রাম/দিন (দুধালা খরগোশ)
৯০ গ্রাম/দিন (বাড়ন্ত খরগোশ)

খাদ্য উপাদান সমূহ

সবুজ শাকসজি

ঋতুভিত্তিক সবজি, পালং শাক, গাজর, মুলা, শসা শাকের উচ্ছিষ্টাংশ, সবুজ ঘাস ইত্যাদি।

দানা খাদ্য

চাল, গম, ভুট্টা, তৈলবীজ ইত্যাদি তবে বাণিজ্যিকভাবে খরগোশ পালনের জন্য মুরগির মত তৈরিকৃত মিশ্রিত খাদ্য খরগোশের রেশন হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রজনন

খরগোশ সাধারণত ৫-৬ মাস বয়সে প্রথম প্রজননক্ষম হয়, তবে ঋতু এবং পর্যাপ্ত ওজন প্রাপ্তির ওপর এটি অনেকাংশে নির্ভরশীল। গর্ভবর্তী খরগোশ ২৮-৩৪ দিনের মধ্যে বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চার ওজন খরগোশের শারীরিক ওজনের ওপর নির্ভরশীল এবং এটি সাধারণত দৈহিক ওজনের ২% হয় অর্থাৎ ১.২৫ কেজি (সোয়া কেজি) ওজনের একটি খরগোশের বাচ্চার ওজন হয় ৩০ গ্রাম। খরগোশের দুগ্ধদান কাল সময় ৬-৮ সপ্তাহ এবং উইনিং ওজন হলো ৮০০-১২০০ গ্রাম। খরগোশ প্রতিবারে ২- ৮ টি বাচ্চা প্রদান করে এবং একবার বাচ্চা দেয়ার ৩ মাস পরেই আবার বাচ্চা দিতে পারে। প্রজননের সময় একটি পুরুষ খরগোশের সাথে ৩-৪টি স্ত্রী খরগোশ রাখা যেতে পারে, তবে গর্ভবতী খরগোশকে পৃথক করে রাখা প্রয়োজন।

খরগোশের বাচ্চার যত্ন

খরগোশ ছোট প্রাণী যদিও এটি এক সংগে ৬-৮টি বাচ্চা দেয়, তাই অনেক সময় প্রথম দশ দিন এই বাচ্চাগুলোর বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়, যেমনঃ মা খরগোশ থেকে দুধ খেতে সাহায্য করা, প্রয়োজনে ফিডারে করে দুধ খাওয়ানো, ভাতের মাড় বা দুধে বিস্কুট ভিজিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া বাচ্চার ঘরের প্রয়োজনীয় তাপের ব্যবস্থা করা, প্রিডেটর, লাল পিঁপড়া ইত্যাদির হাত থেকে বাচ্চা রক্ষা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

খরগোশের রোগ-বালাই

খরগোশ অতিশয় সুন্দর এবং নরম প্রকৃতির প্রাণী। এটি অত্যধিক পোষ মানে। খরগোশের রোগ তুলনামূলকভাবে কম। খরগোশ পরিচ্ছন্ন জায়গায় থাকতে বেশি পছন্দ করে। এর ঘর সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। ঘরে প্রয়োজনীয় আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ঘরে অতিরিক্ত তাপমাত্রা, ধুলাবালি, পোকামাকড়, ইঁদুর, পিঁপড়া ইত্যাদি রোধ করতে হবে। ঘরে ২৯° সেঃ এর বেশি তাপমাত্রা থাকলে পুরুষ খরগোশের সাধারণত অনুর্বরতা দেখা যায়। তাছাড়া কক্সিডিওসিস, গলাফুলা, পাস্তুরিলোসিস প্রভৃতি কয়েকটি রোগ খরগোশে সাধারণত দেখা দেয়। নিম্নে অসুস্থ খরগোশের কয়েকটি লক্ষণ দেয়া হলো-

১. চোখ, কান খাঁড়া থাকে না।
২. লোম শুষ্ক ও রুক্ষ দেখায়।
৩. পানি খেতে অনীহা প্রকাশ করে।
৪. দৌড়াদৌড়ি নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়।
৫. শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

খরগোশ পালনে আর্থিক লাভ

যে কোনো পর্যায়ে খরগোশ পালন শুরু করা যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে ৮টি স্ত্রী ও ২টি পুরুষ খরগোশ দিয়ে শুরু করলে প্রতি মাসে বেশ কিছু পরিমাণ টাকা আয় করা যেতে পারে। নিম আয়-ব্যয়ের হিসাব দেয়া হলোঃ

এক জোড়া খরগোশের দাম	= ৭৫-১৫০ টাকা
৫ জোড়া খরগোশের দাম	= ৩৭৫-৭৫০ টাকা
খাদ্য ও অন্যান্য খরচ	= ১০০০ টাকা/বছর
একটি স্ত্রী খরগোশ থেকে প্রাপ্ত বাচ্চার সংখ্যা	= ৩৬ টি/ বছর
৮টি স্ত্রী খরগোশ থেকে প্রাপ্ত বাচ্চার সংখ্যা	= ২৮৮ টি/ বছর

প্রতিটি ২ মাস বয়সের বাচ্চা খরগোশ = ৫০.০০ টাকা হারে বিক্রয় করলে ও প্রতিবছর ১৪,৪০০ টাকা আয় হয়। সুতরাং, প্রতিমাসে আয় হয় = ১০৫৪.০০ টাকা

মোট আয়	= ১৪,৪০০.০০ টাকা
মোট খরচ	= ১৭৫০.০০ টাকা
বার্ষিক আয়	= ১২,৬৫০.০০ টাকা
মাসিক আয়	= ১০৫৪.০০ টাকা।

উল্লেখ্য, নামমাত্র দানাদার খাবার এবং বাড়ির আশপাশের ঘাস, লতা-পাতা এবং উচ্ছিষ্টাংশ খেয়ে পারিবারিক পর্যায়ে ২০টি খরগোশ প্রতিপালনে ২১০০.০০ টাকা আয় করা সম্ভব, যা অন্য কোনো পদ্ধতিতে এত স্বল্প ব্যয়ে সম্ভব নয়।

খরগোশ প্রতিপালনে ঝুঁকিপূর্ণ দিকসমূহ

১. উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণে সমস্যা।
২. খরগোশের মাংস সবাই খেতে চায় না।
৩. খরগোশ অসুস্থ হলে বাচানো সম্ভব হয় না।
৪. খরগোশের ইউরিনে ভীষণ গন্ধ থাকে।
৫. বাচ্চার যত্ন বিশেষ করে প্রথম ১০ দিন সতর্কতামূলক অবলম্বন করা প্রয়োজন।

উপসংহার

বাংলাদেশে খরগোশকে সাধারণত শখের বা পোষা প্রাণী হিসেবে পালন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে খরগোশ পালন করা হচ্ছে। খরগোশের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। খরগোশের মাংসে প্রোটিন, শক্তি, মিনারেল ইত্যাদির পরিমাণ বেশি এবং ফ্যাট, সেডিয়াম এবং কোলেস্টেরলের পরিমাণ কম। তাছাড়া গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে খরগোশ পালনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক আয়ের প্রচুর সম্ভবনা রয়েছে। খরগোশে মাংস একদিকে যেমন প্রাণিজ আমিষের একটি চমৎকার উৎস হতে পারে অন্যদিকে অভাবগ্রস্ত মহিলা ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের একটি বিরাট উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

প্যাকেজের উদ্ভাবক

ড. কাজী মোঃ ইমদাদুল হক, দুলাল চন্দ্র পাল, ড. কামরুন নাহার মনিরা, ড. নাথু রাম সরকার
ড. মোঃ সালাহ উদ্দিন এবং ড. রেজিয়া খাতুন

বাণিজ্যিক খামারে মুরগির জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

গত কয়েক বছর যাবত বাণিজ্যিক লেয়ার ও ব্রয়লার মুরগির খামার একটি লাভজনক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খামারিরা এখন আধুনিক পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক মুরগি পালন করছে। ছোট খামারগুলো দেশের মহিলা এবং যুব সম্প্রদায়ের জন্য লাভজনক পেশা হিসেবে দেখা দিয়েছে। দেশে জনস্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নয়ন, দারিদ্র্যবিমোচন এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সরকার বাণিজ্যিক পোল্ট্রি উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে মারাত্মক কিছু রোগ লাভজনক মোরগ-মুরগি পালনের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হিসাবে কাজ করছে। বাংলাদেশে খামারিরা মুরগির নানা ধরনের রোগবালাইয়ের সম্মুখীন হয় যা খামারের আকাঙ্ক্ষিত উৎপাদন মাত্রাকে হ্রাস করে। গত কয়েক বছর যাবত কিছু নতুন রোগ যেমন, গামবোরো, আফলাটক্সিকোসিস, চিকেন এ্যানিমিয়া, এগড্রপ সিনড্রোমসহ অন্যান্য রোগ পোল্ট্রি শিল্পের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। খামারে রোগ বিস্তারের বিষয়টি আনুষঙ্গিক কিছু অবস্থার ওপর নির্ভরশীল যেমন খামারে স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যমান অণুজীবের পরিমাণ, জীবাণুর রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা এবং মুরগির স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা। সাধারণত দুর্বল বা রোগ থেকে সদ্য সেরে ওঠা মুরগির চেয়ে স্বাস্থ্যবান মুরগির দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকে। ভালো জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য একটি পূর্ব শর্ত। খামারে যথাযথ জৈব নিরাপত্তা এবং পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অণুজীবের উপস্থিতি কমতে পারে এবং তা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতেও সাহায্য করে। জৈব নিরাপত্তা হল সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার একটি অংশ যা অবশ্যই রোগ জীবাণু বিস্তারের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- প্রযুক্তিটি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক লেয়ার এবং ব্রয়লার মুরগির খামারে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার একটি ফলপ্রসূ পদ্ধতি।
- জৈব নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার পদ্ধতি।
- খামারের ভেতরে বা খামার হতে খামারে রোগ বিস্তার রোধের পদ্ধতি, এবং
- স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং কার্যকর টিকা প্রদান কর্মসুচি পালন করে বাণিজ্যিক খামারে কিভাবে জৈব নিরাপত্তা সংরক্ষণ করা যায় তার পদ্ধতি।

ব্যবহার পদ্ধতি

মানসম্পন্ন খাদ্য ও পানি

বেশির ভাগ জীবাণু সাধারণত বিষ্ঠার মাধ্যমে পানি অথবা খাদ্য সংক্রমিত করে এবং খামারে বিস্তার লাভ করে। তাই খাদ্য এবং পানি ব্যবস্থাপনায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে। যেমন-

- শুধুমাত্র প্রথম দিন কাগজের ওপর খাদ্য সরবরাহ করা যাবে। দ্বিতীয় দিন থেকে খাবারের পাত্রে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- খাদ্য এবং পানির পাত্রে মুরগি যাতে পায়খানা করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। মুরগির উচ্চতা অনুযায়ী পাত্র ওপর থেকে ঝুলিয়ে দিতে হবে বা উঁচু করে দিতে হবে। খাদ্য এবং পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।
- মাইকোটক্সিন যুক্ত খাদ্য মুরগির ওজন বৃদ্ধির অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।
- এজন্য খাদ্য উপাদান বিশেষ করে ভুট্টা ও সয়াবিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে
  - ক) ভুট্টার দানা অবশ্যই পরিপক্ব এবং ছত্রাকমুক্ত হতে হবে।
  - খ) মুরগির খাদ্যে ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই ভুট্টা ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
  - গ) সয়াবিন মিলের গুণগতমান সঠিকভাবে যাচাই করে ক্রয় করতে হবে। সয়াবিন মিল ঠিকভাবে সিদ্ধ বা কুকিং হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে নিতে হবে। সঠিক ভাবে প্রক্রিয়াজাতকৃত সয়াবিন দেখতে বাদামি রঙের হবে এবং গন্ধ বাদামের মত হবে।
  - ঘ) এছাড়া সয়াবিনে কোনো ভেজাল আছে কি না তা পরীক্ষা করে ক্রয় করতে হবে।
  - ঙ) একইভাবে অন্যান্য খাদ্য উপাদানসমূহের গুণগত মান যাচাই করে ক্রয় ও ব্যবহার করতে হবে।
- প্রস্তুতকৃত খাদ্য যেন গুণগত মানসম্পন্ন ও সুষম হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। খাদ্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ভালভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সংরক্ষণ করলে খাদ্যে মাইকোটক্সিন উৎপন্ন হতে পারে। সেই সাথে অন্যান্য জীবাণু যেমন সালমোনেলা, ই কলাই, কক্সিডিয়া, ইত্যাদির সংক্রমণ ঘটতে পারে।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণ

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ (Sanitary) ব্যবস্থাপনা পোল্ট্রি উৎপাদন ও রোগ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কঠিন এবং ব্যয়বহুল নয়।

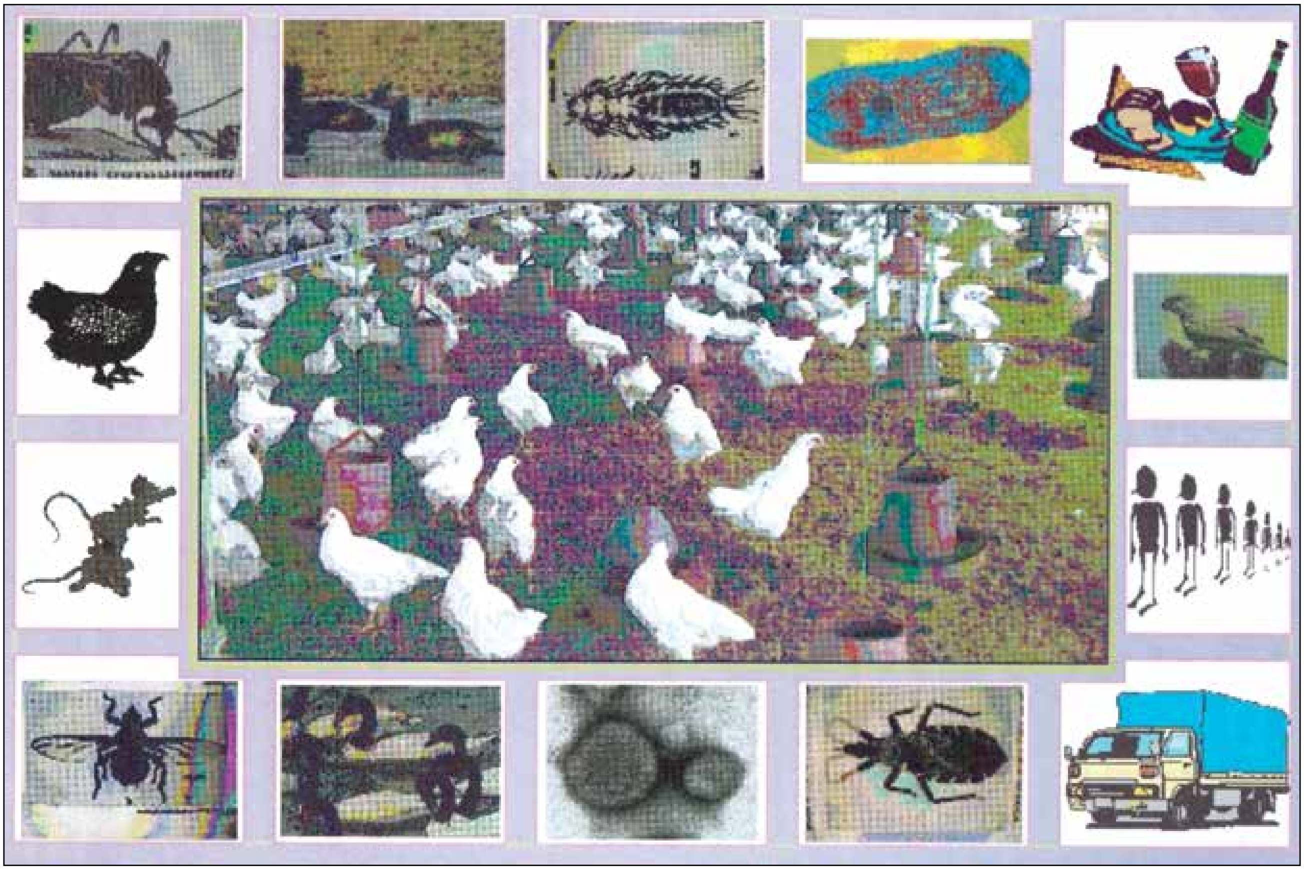

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করে

নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ

মুরগির খামারের শ্রমিকরা প্রতিদিন পরিচ্ছন্ন হয়ে এবং হাত পা জীবাণু মুক্ত করে পোল্ট্রি শেডে প্রবেশ করবে। তারা অসুস্থ এবং মৃত মুরগি দ্রুত সরিয়ে ফেলবে এবং মুরগির বিষ্ঠাও নিয়মিত পরিষ্কার করবে।

অযাচিত প্রাণী

খাদ্য এবং অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ইঁদুর, বিড়াল, ছুঁচো, ইত্যাদি প্রাণীর বসবাসের জন্য খুবই উপযোগী এবং প্রজননের স্থান। এরা নিজেরা সরাসরি বিভিন্ন রোগের উৎস হিসেবে কাজ করে এবং মল মূত্রাদির মাধ্যমে রোগ ছড়াতে পারে।

পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ

পোকা মাকড় রোগের উৎস হিসেবে এবং পরজীবী অথবা অন্য রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে। এক ব্যাচ শেষ করার পর খামারের সকল আবর্জনা, মাকড়সার ঝুল, ইত্যাদি একত্রিত করে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে অথবা কম্পোস্টিং পিটে ফেলতে হবে। সকল যন্ত্রপাতি ও ঘর ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে পানি দিয়ে ধোয়ার পর জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

হিংস্র এবং অন্যান্য পাখি নিয়ন্ত্রণ

এরা বিভিন্ন সংক্রামক ও পরজীবীজনিত রোগের জীবাণু বহন করে। মৃত মুরগি যত্রতত্র ফেলে রাখলে সেগুলো খাওয়ার জন্য খামারে কাক বা অন্যান্য বন্য পাখি, বন বিড়াল, শিয়াল, কুকুর, ইত্যাদি আসতে পারে। খামারের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এবং বন্য পাখি নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করে এদের নিয়ন্ত্রণ করা অত্যাবশ্যক।

মৃত মুরগি সৎকার

মৃত মুরগির দেহাবশেষ নিজেই রোগের উৎসে পরিণত হয় যা খামারের অন্যান্য মুরগিতে এবং আশপাশের খামারে সংক্রমণের উৎস হিসেবে কাজ করে।

মৃত মুরগি সৎকারের বিভিন্ন পদ্ধতি

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৃত মুরগি সৎকার করা যায়। নিম্নে বিভিন্ন উপায়সমূহ বর্ণনা করা হলোঃ-

পোড়ানো

সংক্রামক জীবাণুকে ধ্বংস করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে মৃত মুরগি পুড়িয়ে ফেলা। বাণিজ্যিক ভাবে ধোয়াবিহীন, দুর্গন্ধবিহীন পোড়ানোর চুল্লি বাজারে সহজলভ্য।

পুঁতে ফেলা

পরিবেশ আইন মেনে বড় গর্ত করে আবর্জনা গভীর গর্তে পুতে ফেলাই উত্তম। এতে শিয়াল কুকুর জাতীয় প্রাণী বর্জ্যের নাগাল পাবে না।

গর্তের মাধ্যমে

সাধারণত পচনের জন্য ছোট গর্ত করে মৃত মুরগির দেহাবশেষ ও অন্যান্য বর্জ্য নিঃষ্কাশন করা যায়।

কম্পোস্টিং এর মাধ্যমে খামার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

কম্পোস্টিং বা পচানো হলো প্রাকৃতিকভাবে বর্জ্য প্রত্রিয়াজাতকরণের একটি পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়াটি চলার সময় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরিত্যক্ত বর্জ্যের গাঁজন প্রক্রিয়ার ফলে যে তাপ উৎপাদিত হয় তাতে রোগজীবাণু ও অন্যান্য জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। এটি বায়বীয় ও তাপ সংবেদন পোল্ট্রি খামার বর্জ্য ধ্বংসের একটি অন্যতম পদ্ধতি। কম্পোস্ট তৈরির জন্য খামারের এক পার্শ্বে একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে স্থানটির চারদিক দিয়ে নির্দিষ্ট মাপে (দৈর্ঘ্য ৮ ফুট, প্রস্থ ৫ ফুট ও গভীরতা ৫ ফুট) ইট দিয়ে ঘিরে একটি পিট তৈরি করতে হবে। জৈব বর্জ্যের মিশ্রণে খড়, মুরগির দেহাবশেষ, মল এবং পানির অনুপাত হবে যথাক্রমে ১:১:১.৫:০.৫ (প্রতি স্তরে তিন ভাগের এক ভাগ পানি যোগ করতে হবে)। উক্ত অনুপাত ঠিক রেখে মিশ্রণটি তৈরি হলে দ্রুত এবং গন্ধহীনভাবে বর্জ্য কম্পোস্টিং প্রক্রিয়া শুরু হবে। মিশ্রণের তাপমাত্রা ৬০°-৭০° সেন্টিগ্রেডে উঠবে এবং বর্জ্যের নরম কোষকলার কম্পোস্টিং প্রক্রিয়া ১৪ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে।

পৃথকীকরণ (Isolation)

অনুজীবের বিস্তার পৃথকীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে ঠেকানো সম্ভব। রুগ্ন বা আক্রান্ত মুরগিকে স্বাস্থ্যবান নিরোগ মুরগি থেকে পৃথক করে রাখা উচিত এবং নিরোগ মুরগিকে পরিচর্যার জন্য ভিন্ন শ্রমিক নিয়োগ করা উচিত। সবচেয়ে ভালো হয় রুগ্ন মুরগিকে বর্জ্য হিসেবে সৎকার করে ফেলা, কারণ এসব রুগ্ন মুরগি আরোগ্য লাভ করলেও দীর্ঘ সময় ধরে জীবাণু বাহক হিসেবে কাজ করতে পারে।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা

ব্যবস্থাপক, সুপারভাইজার এবং খামার মালিকগণকে পরিচ্ছন্নতা নিয়মাবলি অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। খামারে দর্শনার্থীর প্রবেশ যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে যদি কোনো দর্শনার্থী মুরগির শেডে প্রবেশ করতে চান তবে জুতা পরে জীবাণুনাশক দ্রবণে হাত পা ধুয়ে খামারে প্রবেশ করতে হবে। এক শেডের পোল্ট্রি এটেনডেন্ট অন্য শেডে বা ফার্মে যেতে পারবে না।

টিকা প্রয়োগ

মুরগিকে সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষার জন্য টিকা দেয়া অত্যাবশ্যক। কিছু রোগ সঠিক সময়ে গুণগতমান সম্পন্ন টিকা প্রদানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

আয় ব্যয় (প্রযুক্তির ব্যবহারে লাভ ক্ষতি)

প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে মুরগির বিভিন্ন ধরনের রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ফলে মুরগির মৃত্যুহার কমবে এবং মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। খামারিগণ অধিক লাভবান হবেন।

ব্যবহার সম্ভাবনা (কোন ঋতুতে কোন অঞ্চলে ব্যবহারযোগ্য)

সকল বাণিজ্যিক লেয়ার এবং ব্রয়লার খামারে সর্বত্র ব্যবহার করতে হবে।

প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা/ বিশেষ পরামর্শ

প্রযুক্তিটি ব্যবহারে সর্বদাই সচেষ্ট থাকতে হবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ড. মোঃ মাসুদুর রহমান এবং ড. এম. জে. এফ. এ. তৈমুর

পোল্ট্রি খাদ্যে নারিকেল, সরিষার খৈল এবং ইপিল ইপিলের ব্যবহার

ভূমিকা

বাংলাদেশে পোল্ট্রি খাদ্যের দাম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পোল্ট্রি উৎপাদনের মোট খরচের শতকরা ৬৫-৭০ ভাগ খরচ হয়ে থাকে খাবারের জন্য। এই কারণে পোল্ট্রি উৎপাদনে লাভ-লোকসান নির্ভর করে সুষম খাদ্য সরবরাহের ওপর। বর্তমান পোল্ট্রি খাদ্যে যে সমস্ত খাদ্য উৎপাদন বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয় (যেমনঃ- গম, ভুট্টা, সয়াবিন ও প্রোটিন কনসেনট্রেট) তার অধিকাংশই বিদেশ হতে আমদানি করতে হয়। ফলে খাবারের দাম অনেক বেশি পড়ে এবং অনেক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, আমাদের দেশে যে অপ্রচলিত উপকরণ পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে সাশ্রয় মূল্যে সুষম খাদ্য তৈরির পদ্ধতি সংযোজন করেছে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে খামারিগণ প্রতি কেজি খাদ্য তৈরিতে প্রায় ০.৫-১.৭৫ টাকা কমে সুষম খাদ্য তৈরি করতে পারেন এবং এতে পোল্ট্রি খাদ্য তৈরিতে যে ব্যয় হবে তা সাশ্রয় করা সম্ভব।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- পোল্ট্রি খাদ্যে পরিমিত মাত্রায় সহজ প্রাপ্য পুষ্টিকর অপ্রচলিত খাদ্যসামগ্রী যেমন- নারিকেল ও সরিষার খৈল এবং ইপিল ইপিল পাতা ব্যবহার।
- সুলভ মূল্যে ডিম ও মাংস উৎপাদন।

প্রযুক্তি প্রয়োগ নির্দেশিকা

বর্তমানে পোল্ট্রি খাদ্যে পরিমিত মাত্রায় সহজপ্রাপ্য পুষ্টিকর অপ্রচলিত খাদ্যসামগ্রীর ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সহজপ্রাপ্যতা, পুষ্টিমান, উদ্দেশ্য অনুসারে এবং পোল্ট্রির বয়স বিবেচনায় রেখে নির্বাচিত অপ্রচলিত খাদ্য সামগ্রীর সমন্বয়ে সুষম খাদ্য তৈরি করতে হবে। ব্যবহারের পূর্বে অপ্রচলিত খাদ্য যেমন ইপিল-ইপিল পাতা রোদে শুকিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গুঁড়া করে এবং সরিষার খৈল, এবং ছত্রাকমুক্ত নারিকেল খৈল চূর্ণ করে মিশ্রিত খাদ্যে মেশাতে হবে। এ সকল খাদ্য উপাদান রোদে শুকালে অথবা সিদ্ধ করলে এর মধ্যে বিদ্যমান ক্ষতিকর বস্তু নষ্ট হয়ে যায়। ফলে খাদ্য সামগ্রীগুলো পোল্ট্রির স্বাস্থ্যের ওপর কোনো ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে না। ক্ষুদ্র বা মাঝারি খামারিগণ অতি সহজেই এই সকল প্রচলিত খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে পোল্ট্রির সুষম খাদ্য তৈরি করতে পারে।

সারণি ১ : অপ্রচলিত খাদ্য সামগ্রীর পোল্ট্রি খাদ্যে সর্বোচ্চ প্রয়োগ ও পুষ্টির তালিকা

অপ্রচলিত খাদ্যসমূহ	সর্বোচ্চ প্রয়োগ মাত্রা (%)	প্রোটিন/আমিষ (%)	বিপাকীয় শক্তি কেজি ক্যালরি/ কেজি
ইপিল-ইপিল	৫	২১-২৪	-
সরিষার খৈল	১০	১৮-২৩	২৩৭৩
নারিকেল খৈল	১০	২৫-৩০	১২০০

উপরোক্ত অপ্রচলিত খাদ্য উপাদানগুলো অন্যান্য খাদ্য উপকরণের সাথে উল্লেখিত অনুপাতে মিশ্রিত করে সুষম খাবার প্রস্তুত করা সম্ভব।

ব্যবহার সম্ভাবনা

বাংলাদেশের যে সকল এলাকায় ইপিল ইপিল, নারিকেল খৈল ও সরিষার খৈল সহজলভ্য সে সমস্ত এলাকায় এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা

খাদ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অসাবধানতার কারণে জীবাণু মিশ্রিত অপ্রচলিত খাদ্য উপকরণ মিশ্রিত খাবার খেয়ে স্বাস্থ্যহানীর কারণে পোল্ট্রির উৎপাদন ক্ষমতা বিঘ্নিত হতে পারে। ঋতু, আবহাওয়া এবং সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করে সাত দিনের বেশি খাবার এক সংগে তৈরি করা ঠিক নয়। মিশ্রিত খাদ্য ব্যবহারের আগে অবশ্যই পাতা রোদে অথবা অন্য কোনো উপায়ে শুকিয়ে ভালোভাবে গুঁড়া করে নিতে হবে। সব সময় শুকনা ও ছত্রাকমুক্ত খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

উপসংহার

- সারা দেশে বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিরা উল্লিখিত খাদ্য উপাদান ব্যবহার করে সুলভ মূল্যে পোল্ট্রি খাদ্য তৈরি করতে পারেন।
- পোল্ট্রির উৎপাদন খরচ কমানো সম্ভব হবে।
- ইপিল ইপিল, সরিষার খৈল ও নারিকেল খৈল ব্যবহার করলে প্রচলিত প্রাণিজ/উদ্ভিজ আমিষ জাতীয় খাদ্য সামগ্রীর ওপর চাপ কমানো সম্ভব হবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. মোঃ সালাহ উদ্দিন এবং ড. কাজী মোঃ ইমদাদুল হক

স্বাস্থ্যসম্মত উন্নত চিক ব্রুডার

ভূমিকা

ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার পর থেকে ঋতুভেদে ৪-৬ সপ্তাহ পর্যন্ত সঠিক তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ু চলাচল, পরিমিত খাবার এবং পানি সরবরাহের মাধ্যমে হাঁস-মুরগির বাচ্চাকে লালন-পালন করাকে ব্রুডিং বলে। ব্রুডিং সময়কালে ব্রুডারের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বায়ু চলাচল বাচ্চার শরীরবৃত্তীয় অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অযত্নে এবং অব্যবস্থাপনায় বাচ্চা লালন-পালন করলে কৌলিক গুণাগুণ ভালো থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীতে ভালো উৎপাদন আশা করা যায় না। উন্নতমানের বাচ্চা উৎপানের জন্য এবং ব্রুডিং সময়ে বাচ্চার মৃত্যুর হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির সহায়তায় স্বল্প মূল্যে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য কাঠ, বাঁশ, প্লাইউড অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সামগ্রী দ্বারা তৈরি করা যায় এরূপ ব্রুডার উদ্ভাবন করেছেন।

চিক ব্রুডারের গঠন প্রণালী

১৫০ সে. মি. উচ্চতা, ৪৫ সে. মি. প্রস্থ এবং ৫৮ সে. মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ব্যাটারি টাইপ চিক ব্রুডারে মোট ৫টি করে তাক থাকে যেখানে পার্টিশন দিয়ে আলাদা পেন তৈরি করা হয়- যার প্রতিটিতে ২২-২৫ টি করে বাচ্চা পালন করা যায়। প্রতিটি তাকের উচ্চতা ১৪ সে. মি. এবং প্রতিটি তাকের নিচে ৭ সে. মি. উচ্চতা বিশিষ্ট একটি করে বিষ্টার ট্রে রাখা হয়। হিটিং (তাপ উৎপাদনকারী) ট্যাংক ও তাপ প্রদানের উৎস স্থাপনের জন্য ব্রুডারের নিচের অংশে ব্যবস্থা থাকে যেখানে পানি গরম হয় এবং বাষ্প দিয়ে সমস্ত ব্রুডারকে গরম রাখবে। ব্রুডারের মূল দেহ কাঠামো কাঠ ও বাঁশ দিয়ে তৈরি করা যায়। তবে খরচ ও টেকসই হিসেবে কাঠ ব্যবহার করা অত্যন্ত লাভজনক।

চিক ব্রুডার তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ

- কাঠ : কেরোসিন, জাম ও গামারি কাঠ ব্যবহৃত হয়।
- তাপের উৎস : গ্যাস, কেরোসিন বা কয়লা ব্যবহার করা যায়।

ব্রুডারের মাপ

ব্রুডার তৈরিতে ব্যবহৃত কাঠের পরিমাপ ও পরিমাণ নিম্নরূপ

প্লাই উড	:	১৫০ সে. মি. × ৪৫ সে. মি.	= ৬টি
	:	৪৫ সে. মি. × ২ সে. মি. × ২ সে. মি.	= ৪৮টি
		১৫০ সে. মি. × ২ সে. মি. × ৪ সে. মি.	= ১২টি
		১৩০ সে. মি. × ১১ সে. মি. × ২.৫ সে. মি.	= ৩৫টি
তক্তা	:	৫৮ সে. মি. × ৪৫ সে. মি. × ১ সে. মি.	= ২০টি
		১৫০ সে. মি. × ২ সে. মি. × ৪ সে. মি.	= ৪টি
		১৩০ সে. মি. × ১ সে. মি. × ২.৫ সে. মি.	= ২টি
অন্যান্য উপকরণ	:	খাদ্য পাত্র ১২০ সে. মি.	= ১০টি
		পানির পাত্র ১৭ সে. মি.	= ২০টি
		নেট ৫৭ × ৪৫ সে. মি.	= ২০টি
		হিটিং ট্যাংক স্ট্যান্ডসহ ১১২ × ৭০ সে. মি.	= ১টি
		মাঝের দন্ডের উচ্চতা ৪০ সে. মি.।	

প্রযুক্তি ব্যবহারের পদ্ধতি

চিক ব্রুডারের বাচ্চা পালনের পূর্বে করণীয় বিষয়সমূহ

- ব্রুডারের বাচ্চা প্রদানের এক সপ্তাহ পূর্বেই ব্রুডার প্রস্তুত করা বা প্রতিটি অংশ সঠিকভাবে স্থাপন সম্পন্ন করতে হবে।
- সঠিকভাবে ধৌত ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- হিটিং (তাপ উৎপাদনকারী) ট্যাংকে পানি পূর্ণ করে তাপ প্রদানের উৎস সঠিক ভাবে কাজ করছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- ব্রুডারের ভেতর সহজভাবে বায়ু চলাচল করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- মাঁচা হিসেবে যে নেট ব্যবহার করা হয় সেটা সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে।

ব্রুডারে বাচ্চা পালন

যদি গ্রীষ্মকাল হয়, তবে বাচ্চা ব্রুডারে প্রদানের পূর্বেই হিটিং ট্যাঙ্ক উত্তপ্ত করার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র শীতকালে বাচ্চা প্রদানের এক ঘণ্টা পূর্বে থেকে তাপ প্রদান শুরু করে ৩২° সে. এ আসা পর্যন্ত তাপ প্রদান করে যেতে হবে। এরপর ৩২° তাপমাত্রা চলে আসলে তাপ প্রদান বন্ধ করে দিতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ব্রুডারের মধ্যে সব সময় তাপমাত্রা যেন ৩২°-৩৪° সে. থাকে। ব্রুডারের মধ্যে সঠিক তাপমাত্রায় আসার পর প্রতিটি পেনে ২২-২৫ টি করে বাচ্চা প্রদান করতে হবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রতিটি খোপে/তাকে একত্রে ২০টি বাচ্চা ভালোভাবে খাদ্য ও পানি গ্রহণ করে। খাদ্য ও পানির পাত্র যেন কখনো খালি না থাকে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। বিষ্ঠা জমাকৃত ট্রে সপ্তাহে ২ দিন পরিষ্কার করতে হবে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ব্রুডারের ঝুঁকিপূর্ণ দিক

ব্রুডারে বাচ্চা পালনে তেমন কোনো ঝুঁকিপূর্ণ দিক নেই, তবে হিটিং ট্যাংকের তাপমাত্রা বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রযুক্তি ব্যবহারে ফলাফল ও লাভ

এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে নিম্নলিখিত সুবিধাবলি পাওয়া যায়

- খাবার ও পানির পাত্র সব সময় পরিষ্কার থাকে।
- আভ্যন্তরীণ তাপ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ।
- খাদ্যের অপচয় হয় না।
- বাচ্চ সহজেই খাদ্য ও পানি গ্রহণ করতে পারে।

- ব্রুডারের প্রতিটি অংশে তাপ সমভাবে বিস্তৃতি থাকে ফলে বাচ্চা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।
- বিষ্ঠা পৃথকভাবে জমা হয় বলে রোগ কম হয়।
- ভ্যাক্সিনেশন ও বাচ্চা পর্যবেক্ষল করা অত্যন্ত সহজ হয়।

৫০০ বাচ্চা লালন-পালন করা যায় এমন একটি ব্রুডার তৈরি করতে মোট খরচ

প্লাইউড বোর্ড, বাটাম ও তকতা	= ৩০০০/- থেকে ৫০০০/-
সামনের নেট, খাবার পাত্র, পানির পাত্র ও পাব নেট	= ২০০০/-
হিটিং ট্যাঙ্ক স্ট্যান্ডসহ	= ৩০০০/-
মোট মূল্য	= ৮০০০ থেকে ১০,০০০/-

প্রাথমিক খরচ তুলনামূলকভাবে একটু বেশি হলেও অন্য কোনো মেরামত খরচ ছাড়াই ৮-১০ বছর ব্যবহার করা যায়, সেই দিক থেকে এই ব্রুডার ব্যবহার অত্যন্ত লাভজনক।

পরিবেশের ওপর প্রতিক্রিয়া

ব্রুডার ব্যবহারে পরিবেশের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না।

সম্প্রসারণ পদ্ধতি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এনজিওদের সহযোগিতায় মাঠ দিবস এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খামারিদের মাঝে সম্প্রসারণ করা সম্ভব।

আয়-ব্যয় (প্রযুক্তি ব্যবহারে লাভ ক্ষতি)

প্রাথমিক খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও অন্য কোনো খরচ ছাড়াই যেহেতু ৮-১০ বছর ব্যবহার করা যায় এবং এ পদ্ধতি অন্যান্য ব্রুডিং পদ্ধতির চেয়ে কারিগরি দিক বিবেচনায় উত্তম, সেই দিক থেকে এই ব্রুডার ব্যবহার সার্বিক দিক বিবেচনায় অত্যন্ত লাভজনক।

ব্যবহার সম্ভাবনা (কোন ঋতুতে কোন অঞ্চলে ব্যবহারযোগ্য)

বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে ব্যবহার করা সম্ভব, বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই। যেহেতু ব্রুডার সব জায়গায় ব্যবহার করা যায়, ব্রুডার তৈরি ব্যতীত অন্য কোনো খরচ নেই বললেই চলে এবং এতে পালিত বাচ্চার দৈহিক ওজন অন্যান্য ব্রুডারে পালিত বাচ্চার সমান হয়, তাছাড়া বাচ্চাগুলোকে সহজে পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং এটি ক্ষুদ্র পোল্ট্রি খামারিদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা/বিশেষ পরামর্শ

- ব্রুডারে বাচ্চা প্রদানের পূর্বে ব্রুডারের প্রতিটি অংশ সঠিকভাবে স্থাপন করে নিতে হবে। সঠিকভাবে ধৌত ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- হিটিং ট্যাঙ্কে পানি পূর্ণ করে তাপ প্রদানের উৎস সঠিকভাবে কাজ করছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- মাঁচা হিসেবে যে নেট ব্যবহার করা হয় সেটা সঠিকভাবে স্থাপিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

উপসংহার

চিক ব্রুডার বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে কোনো বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই সে সমস্ত অঞ্চলেও ব্রয়লার ও লেয়ার পালনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া, এই জাতীয় ব্রুডারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান ও উন্নত মানের বাচ্চা উৎপাদন সম্ভব।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. মোঃ সালাহ উদ্দিন, দুলাল চন্দ্র পাল, ড. নাথু রাম সরকার, ড. কামরুন নাহার মনিরা এবং ড. মোঃ নজরুল ইসলাম

দেশী (অরগানিক) মুরগি উৎপাদনে উন্নত কৌশল

ভূমিকা

বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় প্রায় প্রতিটি পরিবার দেশী মুরগি পালন করে থাকে। এদের উৎপাদন ক্ষমতা বিদেশী মুরগির চেয়ে কম। কিন্তু উৎপাদন ব্যয়ও অতি নগণ্য এবং অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। অধিকন্তু এদের মাংস ও ডিমের মূল্য বিদেশী মুরগির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এবং চাহিদা খুবই বেশি। গবেষণায় দেখা গেছে যে, দেশী মুরগির মৃত্যহার বাচ্চা বয়সে অধিক এবং অপুষ্টিজনিত কারণে উৎপাদন আশানুরূপ নয়।

বাচ্চা বয়সে দেশী মোরগ-মুরগির মৃত্যুহার কমিয়ে এনে এবং সামান্য সম্পূরক সাপ্লিমেন্টারি খাদ্যের ব্যবস্থা করলে দেশী মুরগি থেকে অধিক ডিম ও মাংস উৎপাদন করা সম্ভব। উপরোক্ত অবস্থার আলোকে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশী মুরগি উৎপাদনে উন্নত কৌশল শীর্ষক প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করেছে। যা ব্যবহার করে খামারিরা দেশী মুরগি থেকে অধিক ডিম, মাংস উৎপাদন করে পারিবারিক পুষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন।

প্রযুক্তির মূল বৈশিষ্ট্যাবলী

- সম্পূরক খাদ্য, পরজীবী, রানীক্ষেত ও বসন্তের প্রতিষেধক প্রদান করে এবং বন্য জন্তুর কবল থেকে মুক্ত রেখে দেশী মুরগি, বিশেষ করে ছোট বাচ্চার মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা।
- দেশী মুরগির দৈহিক ওজন ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

খামারের আকার	আবাদি জমির পরিমাণ (শতাংশ)	মোরগ/মুরগি
ছোট	৫০ শতাংশ	১টি মোরগ, ৩টি মুরগি
মাঝারি ও বড়	৫০ ও তার অধিক	১টি মোরগ, ৬টি মুরগি

প্রযুক্তি ব্যবহারের পদ্ধতি

- প্রযুক্তিটি গ্রামীণ পর্যায়ে সকল গৃহস্থ পরিবারই ব্যবহার করতে পারবেন। বসতবাড়ীর আকার অনুযায়ী প্রত্যেক খামারির জন্য মোরগ-মুরগির সংখ্যা উপরোক্ত ছক অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- প্রত্যেক খামারিগণ তাদের মুরগির খোয়ার ছাড়াও মুরগি গুলোকে সম্পূরক খাদ্য খাওয়ানোর জন্য বাঁশ, তার, জালি অথবা শুধু বাঁশ দিয়ে নির্মিত একটি ক্রিপ ফিডার তৈরি করবেন। এতে দুটো অংশ থাকবে। এক অংশে বাচ্চা ও অপর অংশে বয়স্ক মোরগ-মুরগির সম্পূরক খাদ্য প্রদান করতে হবে।
- ছোট খামারিদের জন্য খাচার (ক্রিপ ফিডার) সাইজ ৪২ × ১৫ এবং বড় খামারিদের জন্য ৫×৩ হতে পারে। ক্রিপ ফিডারের তার, জালি বা বাঁশের দরজার ফাঁকা ১.৫ থেকে ১.৭৫ হবে, যাতে করে বাড়ন্ত বা বয়স্ক মুরগি ক্রিপ ফিডারের বাচ্চার জন্য খাদ্য প্রদানের অংশে প্রবেশ করে বাচ্চার সম্পূরক খাদ্য খেতে না পরে।
- প্রতিটি বয়স্ক মুরগিকে দৈনিক চরে খাওয়ানোর পাশাপাশি ৩৫ গ্রাম করে সম্পূরক মুরগির খাদ্য খেতে দিতে হবে।
- ছোট খামারিগণ সারা বছর ১টি মুরগি বাচ্চা ফুটানোর জন্য ব্যবহার করবেন। বাকি ২টি মুরগি সারা বছর ডিম উৎপাদন করবে। মাঝারি ও বড় খামারিগণ প্রতিবারে তাদের ৬টি মুরগির মধ্যে ২টি মুরগিকে ডিম ফুটানোর জন্য বসাবে, বাকি ৪টি মুরগি সারা বছর ডিম পাড়ার জন্য ব্যবহার করবেন। খামারিরগণ ছোট বাচ্চাগুলোকে প্রথম ৬ সপ্তাহ তাদের প্রয়োজনীয় অর্থাৎ তারা দু'বেলা যতটুকু খেতে পারে, সে পরিমাণ সম্পূরক খাদ্য ক্রিপ ফিডারের ভেতরে দিতে হবে। ৬ সপ্তাহের পর সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে দিতে হবে। বাচ্চা ফুটার পর প্রথম ৪/৫ দিন বাচ্চার ক্রিপ ফিডারের ভেতর তাদের মাকেও খেতে দিতে হবে, কেননা ছোট বাচ্চা প্রথম কয়েক দিন মাকে ছাড়া খাদ্য খায় না। দশ সপ্তাহ বয়সে প্রতিটি ছোট বাচ্চার জন্য সম্পূরক খাদ্যের পরিমাণ হবে দৈনিক ৩৫ গ্রাম। ছয় থেকে দশ সপ্তাহ বয়সকালীন সময়ে ছোট বাচ্চা গুলো মুরগির সাথে বাড়ির আঙ্গিনায় চরে খেতে অভ্যস্ত হবে।

- মুরগিগুলোকে নিরোগ রাখার জন্য মুরগির খোয়ার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এছাড়া সারণি ২ অনুযায়ি রানীক্ষেত ও বসন্ত রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।

প্রতিষেধক প্রদানের কর্মসূচি

প্রতিষেধকের নাম	যে বয়সে প্রদান করতে হবে	মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি
বিসিআরডিভি	৫-৭ দিন বয়সে	১ চোখে ১ ফোটা
বিসিআরডিভি (বুস্টার)	১৪ দিন বয়সে	১ চোখে ১ ফোটা
ফাউল পক্স	৩০-৩৫ দিন বয়সে	পাখার চামড়ায় সুচ ফুটানোর মাধ্যমে
আরডিভি	৬০ দিন বয়সে	মাংসপেশিতে ১ সিসি

ঝুঁকিপূর্ণ দিক

- টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দেশিত পদ্ধতি পালন করা আবশ্যক।
- সম্পূরক খাদ্য যাতে প্রতিবেশীর হাঁস-মুরগি খেতে না পারে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- এলাকা বিশেষে বন্যপ্রাণী থেকে মুরগিকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সম্প্রসারণ উপযোগী অঞ্চল

বাংলাদেশের সকল গ্রাম এলাকায়, যেসব কৃষক পরিবারে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়, সে সকল অঞ্চলে প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল ও লাভ

ফলাফল

- মুরগির মৃত্যুর হার কমে যাবে, বিশেষ করে বাচ্চা মুরগির ক্ষেত্রে এ হার শতকরা বর্তমান হার ৫৫-৬০ ভাগ থেকে ২৫-৩০ ভাগে নেমে আসবে।
- এ পদ্ধতিতে দেশী মুরগি পালন করলে মুরগির দৈহিক ওজন শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ এবং ডিম উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগ বেড়ে যাবে।

লাভ

সনাতনি পদ্ধতিতে ৬-৭ টি দেশী মুরগি পালন করে সাধারণত গড়ে একজন খামারি দেশী মুরগি পালন থেকে প্রতিবছর ২ হাজার টাকা আয় করতে পারে। পক্ষান্তরে উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে একজন খামারি দেশী মুরগি পালন থেকে গড়ে ৬০০০.০০ থেকে ৬৬০০.০০ টাকা আয় করতে পারেন।

পরিবেশের ওপর প্রতিক্রিয়া

এই প্রযুক্তি ব্যবহারে ফলে পরিবেশের ওপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব নেই। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে খামারিদের পরিবারিক আয় বাড়বে এবং পুষ্টি চাহিদার ঘাটতি লাঘব হবে। এছাড়া বাড়ির আঙ্গিনার মুরগি পালন জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সম্প্রসারণ পদ্ধতি

এই প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন এন জি ও এর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসগুলোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদের সহায়তায় প্রশিক্ষণ ও বুকলেট সরবরাহের মাধ্যমে সফলভাবে হস্তান্তর করা যেতে পারে।

উপসংহার

পরিবারের বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে এই প্রযুক্তি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও পুষ্টি সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। দেশের ন্যূনতম ৫ কোটি পরিবার যদি বছরে ৫ টি করে দেশী মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধি করে, তাহলে প্রতি বছর ২৫ কোটি অতিরিক্ত মুরগি আমাদের দেশের পুষ্টি ঘাটতির আংশিক সমাধান দিতে পারে। ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও জন সচেতনতার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও এন জি ও সমূহ দেশের প্রতিটি এলাকায় প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণ করতে পারে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, ড. কাজী মোঃ ইমদাদুল হক, ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার এবং ড. মোঃ সালাহ উদ্দিন

উন্নত জাতের দেশী মুরগি উৎপাদনে বিজ্ঞান সম্মত কৌশল

ভূমিকা

দেশীয় মুরগির প্রজাতি গুলোকে দেশীয় মুরগির প্রজাতি দ্বারা উন্নয়ন করার চেষ্টা বা পরিকল্পনা বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) শুরু করেছে ২০১০ সালে। মূল লক্ষ্য ছিল দেশীয় তিন ধরনের (কমনদেশী, হিলি, গলাছিলা) মুরগি সংগ্রহ করে ইহার কৌলিক মান উন্নয়ন এবং সিলেকটিভ ব্রীডিং এর মাধ্যমে বিশেষ ধরনের উৎপাদনক্ষম মুরগির জাত তৈরি করা। বিএলআরআই-এ বিদ্যমান স্টককে ব্যবহার করে এবং দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে উন্নত জাতের দেশীয় মুরগি বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ফাউন্ডেশন স্টক তৈরি করা হয়। দীর্ঘ ৮ (আট) বছর যাবৎ নির্বাচিত প্রজনন এবং লালন পালনের মাধ্যমে দেশী মুরগির উপর বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করে এদের উৎপাদনে আশাতীত উৎকর্ষ আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে। দেশী মুরগির ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, ডিমের ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রথম ডিম পাড়ার বয়স কমেছে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে। কমনদেশী ও গলাছিলা মুরগি ডিম উৎপাদনের জন্য এবং হিলি মুরগি মাংস উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যাবে। এরূপ উন্নত জাতের দেশী মুরগির বিজ্ঞানভিত্তিক উৎপাদন কৌশল বা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে যা ব্যবহার করে গ্রামের মানুষ বিশেষ করে নারীগোষ্ঠী এবং বাণিজ্যিক উদ্যোক্তাগণ পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তথা আর্থিকভাবে লাভবান হতে সক্ষম হবেন।

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৮ (আট) বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশুদ্ধ দেশী জাতের মুরগির উন্নয়নের সাথে সাথে উন্নত নির্বাচনশীল প্রজনন (Selective breeding) কার্যক্রম পরিচালনা করার ফলে এদের উৎপাদনশীলতা লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণালব্ধ ফলাফল সমূহ খামারিদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে, "দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ছয়টি উপজেলায় নির্বাচিত ৩০০ জন (প্রত্যেক উপজেলায় ৫০ জন মহিলা খামারি) সুফলভোগীদের মাঝে (নকলা, শেরপুর; জয়পুরহাট সদর; দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর; ডুমুরিয়া, খুলনা; কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এবং সোনাগাজী, ফেনী) মাঠ পর্যায়ের উৎপাদনশীলতা যাচাই করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রত্যেকটি পরিবারে ৬ টি করে মুরগি ও ২ টি করে মোরগ প্রদান করা হয়েছে। মোরগ-মুরগি গুলো ৭২ সপ্তাহ পর্যন্ত লালন-পালন করা হয়। ক্রিপ ফিডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে দৈনিক প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মোরগ-মুরগিকে ৬০ গ্রাম করে সম্পূরক খাদ্য প্রদান করা হয় এবং সময়মত টীকা প্রদান করা হয়। বাচ্চাগুলোকে ৪ (চার) সপ্তাহ পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তাপ প্রদান করা হয়।

বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত দেশী জাতের মুরগি খামারি পর্যায়ে লালন-পালন করে গ্রামীণ নারী গোষ্ঠী আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়ার মাধ্যমে যেমন দারিদ্র্য বিমোচন ঘটাতে পারে তেমনি সামাজিক ভাবে সাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। স্থানীয় দেশীয় জাতের তুলনায় এ মুরগির ডিম উৎপাদন প্রায় ৩ গুণেরও বেশি তেমনি দৈহিকভাবে দ্রুত বর্ধনশীল হওয়ায় ৮ সপ্তাহেই বাজারজাত করা যায়। গ্রামীণ কৃষক পর্যায়ে আংশিক সম্পূরক খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে ৬ টি মুরগি ও ২ টি মোরগ লালন-পালন করলে আয় ব্যয়ের অনুপাত ১.৮:১ হয় অর্থ্যাৎ এক (১) টাকা ব্যয় করে ১.৮০ টাকা লাভ করতে পারে। তাছাড়াও, অল্প কিছু পুঁজি বিনিয়োগ করে ৫০০ বা ১০০০ টাকা বিনিয়োগ করে মাংস উৎপাদনের জন্য দেশী মুরগি পালন করে মাত্র ৮ সপ্তাহে ভাল মুনাফা অর্জন করতে পারেন।

বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত জাতের দেশী মুরগি পালনে বিজ্ঞান সম্মত কৌশল শীর্ষক প্রযুক্তিটি বাংলাদেশের যে কোন প্রান্তের কৃষক পরিবার এমনকি শহরের আশ-পাশের বাসিন্দাগণও স্বাচ্ছন্দে ব্যবহার করে স্বল্প বিনিয়োগে ও অল্প সময়ে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে। প্রযুক্তির উপকরণসমূহ খুবই সহজলভ্য, স্বল্প মূল্যের এবং সহজেই ব্যবহার উপযোগী হওয়ায় দেশের নারীগোষ্ঠীর ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি প্রযুক্তি। সারা দেশের জনগণ প্রযুক্তিটি ব্যবহার করলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা অর্থ্যাৎ পারিবারিক পুষ্টির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

সারণী-১: বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত তিন ধরনের দেশী মুরগির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

বৈশিষ্ট্য		কমনদেশী	হিলি	গলাছিলা
পালকের রং	:	লালচে বাদামী বা লালচে কালো	সাদার মধ্যে কালো ছিটাযুক্ত রঙের হয়। তবে ধূসর এবং লালচে মুরগিও দেখা যায়	কালো এবং লালচে কালো
চামড়ার রং	:	সাদা	সাদা	সাদা, লাল
ঝুঁটির রং	:	লাল	লাল	লাল
ঝুঁটির প্যাটার্ন	:	একক	একক	একক
কানের লতি	:	সাদা, লাল	সাদা, লাল	সাদা,লাল
ডিমের খোসার রং	:	হালকা সাদা থেকে গাঢ় বাদামী	হালকা বাদামী	হালকা বাদামী
পায়ের নলার রং	:	হলুদ,সাদা, কালো	সাদাটে, হলুদ, কালো	হলুদ, সাদা, কালো
পায়ের নলার দৈর্ঘ্য	:	১০.৮ সে:মি	১১.৮ সে:মি	১০.৮ সে:মি

কমনদেশী মোরগ

হিলি মোরগ

গলাছিলা মুরগি

সারণী-২: বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত ৩ জাতের দেশী (কমনদেশী, হিলি, গলাছিলা) মোরগ-মুরগির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন দক্ষতাঃ

বৈশিষ্ট্য		কমনদেশী	হিলি	গলাছিলা
প্রথম ডিম পাড়ার সময় দৈহিক ওজন (গ্রাম)	:	১৩০০-১৪০০	১৫০০-১৬০০	১৩০০-১৪০০
প্রথম ডিম পাড়ার বয়স (সপ্তাহ)	:	১৮-২০	১৯-২১	১৯-২১
বার্ষিক ডিম উৎপাদন (সংখ্যা)	:	১৭০-১৮০	১৫০-১৬০	১৭০-১৮০
প্রতি ডিমের গড় ওজন (গ্রাম) (৪০ সপ্তাহ)	:	৪৫-৪৭	৪৫-৪৭	৪৩-৪৫
উর্বর ডিম (%)	:	৯৪	৮৮	৮৮
বাচ্চা পরিস্ফুটনের হার (%) (মোট ডিমের ভিত্তিতে)	:	৮৪	৮০	৭০
খাদ্য প্রদান (গ্রাম/দিন/মুরগি)	:	৮০	৯০	৮০
দৈহিক ওজন (৮ সপ্তাহ) মোরগ বাচ্চা (গ্রাম)	:	৬০০-৭০০	৮০০-৯০০	৬০০-৭০০
দৈহিক ওজন (৮ সপ্তাহ) মুরগি বাচ্চা (গ্রাম)	:	৫০০-৬০০	৬০০-৭০০	৫০০-৬০০
দৈহিক ওজন মোরগ (৪০ সপ্তাহ) (গ্রাম)	:	২০০০-২৫০০	২৫০০-৩০০০	২০০০-২৫০০
দৈহিক ওজন মুরগি (৪০ সপ্তাহ) (গ্রাম)	:	১৪০০-১৫০০	১৭০০-১৮০০	১৪০০-১৫০০

সারণী-৩ঃ বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত তিন জাতের দেশী (কমনদেশী, হিলি ও গলাছিলা) মোরগ-মুরগির মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত ফলাফলঃ

বৈশিষ্ট্য		কমনদেশী	হিলি	গলাছিলা
প্রথম ডিম পাড়ার দৈহিক ওজন (গ্রাম)	:	১৩০০-১৪০০	১৪০০-১৬০০	১৩০০-১৪০০
প্রথম ডিম পাড়ার বয়স (সপ্তাহ)	:	১৯-২০	১৯-২০	১৯-২০
বার্ষিক ডিম উৎপাদন (সংখ্যা)	:	১৪৯	১৫২	১৫১
প্রতি ডিমের গড় ওজন (গ্রাম) (৪০ সপ্তাহ)	:	৪৫	৪৭	৪৬
উর্বর ডিম (%)	:	৮৩	৮৭	৮৬
বাচ্চা পরিস্ফুটনের হার (%) (মোট ডিমের ভিত্তিতে)	:	৭০	৭২	৭৩
সম্পূরক খাদ্য প্রদান (গ্রাম/দিন/মুরগি)	:	৬০	৬০	৬০
দৈহিক ওজন (৮ সপ্তাহ) মোরগ বাচ্চা (গ্রাম)	:	৬০০-৭০০	৭০০-৮০০	৬০০-৭০০
দৈহিক ওজন (৮ সপ্তাহ) মুরগি বাচ্চা (গ্রাম)	:	৫০০-৬০০	৬০০-৭০০	৫০০-৬০০
মৃত্যু হার (০-৮ সপ্তাহ) (%)	:	১.০	১.৩	০.৮৫
মৃত্যু হার (৫১-৭২ সপ্তাহ) (%)	:	১.০	১.২	৩.০০

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. শাকিলা ফারুক, ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া, ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, ড. হালিমা খাতুন, মোঃ ওবায়েদ-আল রহমান, ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার, ড. মোঃ রাকিবুল হাসান এবং মোঃ আতাউল গনি রাব্বানী

বিএলআরআই লেয়ার -১ (শুভ্রা) মুরগির বাণিজ্যিক সফলতা

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এর কারিগরি সহায়তায় পোল্ট্রির উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে একটি পোল্ট্রি ব্রীডিং প্রোগ্রামের কাজ হাতে নেয়। উক্ত ব্রীডিং প্রোগ্রামের আওতায় চারটি পিওর লাইন জাপানের ন্যাশনাল লাইভস্টক ব্রীডিং সেন্টার (NLBC), ওকাজাকি স্টেশন, হতে সংগ্রহ করা হয়। ব্রীডিং প্রোগ্রামের আওতায় পিওর লাইনগুলিকে সিলেকশন ব্রীডিং এর মাধ্যমে জেনেটিক পটেনসিয়ালিটি উন্নয়ন করা হয়েছে। উক্ত পিওর স্টকগুলো হতে লাইন ব্রীডিং এর মাধ্যমে একটি ডিম পাড়া মুরগির জাত উদ্ভাবন করা হয, যাহা বিএলআরআই লেয়ার -১ (শুভ্রা) নামে পরিচিত। ইতোমধ্যে খামারি পর্যায়ে জাতটি লালন-পালন করে এর উৎপাদন দক্ষতা যাচাই করা হয়েছে। উদ্ভাবিত জাতটি দেশের বিভিন্ন প্রযুক্তি হস্তান্তর এলাকার পোল্ট্রি খামারিগণ লালন-পালন করে সফলতা অর্জন করেছে।

চিত্র-১ঃ বিএলআরআই লেয়ার -১(শুভ্রা)

বিএলআরআই লেয়ার -১ (শুভ্রা) এর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যাবলী

পালকের রং	সাদাটে (off white)
দেহের আকার	ত্রিকোণাকৃতি
চামড়ার রং	সাদাটে (off white)
ঝুঁটির রং	লাল
ঝুঁটির প্যাটার্ন	একক (Single comb)
গলার পালক	স্বাভাবিক
ডিমের খোসার রং	হালকা বাদামী (দেশী মুরগীর ডিমের অনুরুপ)
পায়ের নলার রং	হালকা হলুদ

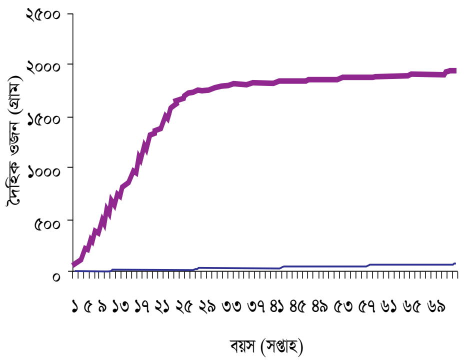

চিত্র-২ঃ বিএলআরআই লেয়ার -১ (শুভ্রা) এর দৈহিক ওজন বৃদ্ধি

বিএলআরআই লেয়ার -১ (শুভ্রা) এর উৎপাদন দক্ষতা

প্রাপ্ত বয়স্ক দৈহিক ওজন	১৭০০ গ্রাম (৩০ সপ্তাহ)
দৈনিক খাদ্য গ্রহণ	১১৫-১২০ গ্রাম (৩০-৭২ সপ্তাহ)
প্রথম ডিম পাড়ার বয়স	১৯ সপ্তাহ
বাৎসরিক ডিম উৎপাদনের সংখ্যা	২৮০-২৯৫ টি
ডিমের গড় ওজন	৬২ গ্রাম (৩৮ সপ্তাহ)

ব্রীডিং ফ্লকের Male এবং Female লাইন সম্পর্কিত তথ্যাবলী

Male এবং Female ব্রীডার লাইন এর জন্য বিএলআরআই এ সীমিতভাবে পেডিগ্রী বাচ্চা উৎপাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। কেইজে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে প্যারেন্ট স্টকের জন্য হ্যাচিং ডিম উৎপাদন করা হয় এবং নিজস্ব হ্যাচারীতে ডিম ফুটানো হয়।

Male এবং Female লাইনের পুনরুৎপাদন দক্ষতা

Male লাইন

উর্বরতার হার	৯২.৪২%
বাচ্চা ফোটার হার	৮১.২৩%
ভাল বাচ্চার হার	৮২.৫৭%

Female লাইন

উর্বরতার হার	৯২.৩৩%
বাচ্চা ফোটার হার	৯০.১৪%
ভাল বাচ্চার হার	৮৭.৭৯%

চিত্র-৩ঃ প্যারেন্ট Male লাইন

Male এবং Female প্যারেন্টের উৎপাদন দক্ষতা

Male প্যারেন্ট

প্রাপ্ত বয়স্ক দৈহিক ওজন	২৭০০ গ্রাম

Female প্যারেন্ট

প্রাপ্ত বয়স্ক দৈহিক ওজন	১৭০০ গ্রাম
প্রথম ডিম পাড়ার বয়স	২১ সপ্তাহ
গড় ডিম উৎপাদনের হার	৭৭%
ডিমের গড় ওজন	৫৭ গ্রাম

চিত্র-৪ঃ প্যারেন্ট Female লাইন

প্যারেন্ট Male এবং Female কে কেইজে রেখে কৃত্রিম প্রজনন এর মাধ্যমে হ্যাচিং ডিম সংগ্রহ করা হয় এবং নিজস্ব হ্যাচারীতে ডিম হতে বাণিজ্যিক বাচ্চা ফোটানো হয়, যাহা বিএলআরআই লেয়ার -১ নামে বাজারজাত করা হয়।

বিএলআরআই লেয়ার -১ (শুভ্রা) এর প্যারেন্টের তথ্যাদি

উর্বর ডিম	৮৭.৮২%
বাচ্চা পরিস্ফুটনের হার	৯২.৬২% (উর্বর ডিমের ভিত্তিতে)
সুস্থ ও সবল বাচ্চার হার	৮৮.৪৯% (উর্বর ডিমের ভিত্তিতে)
সুস্থ ও সবল বাচ্চার হার	৭৭.৭২% (মোট ডিম বসানোর ভিত্তিতে)
একদিন বয়সের বাচ্চার ওজন	৪০ গ্রাম

বিএলআরআই লেয়ার -১ (শুভ্রা) এর প্যারেন্টের তথ্যাদি

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে অল্প সংখ্যক বিএলআরআই লেয়ার -১(শুভ্রা) বাচ্চা উৎপাদন করছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বা অন্য কোন সরকারি - বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক বিএলআরআই লেয়ার -১ বাচ্চার উৎপাদনের ব্যবস্থা করা দরকার। এতে করে দেশে বাণিজ্যিক লেয়ার মুরগির বাচ্চার স্থানীয় চাহিদা অনেকাংশে পূরণ হবে এবং বিদেশ থেকে আমদানীকৃত প্যারেন্টস্টকের লেয়ার বাচ্চার উপর নির্ভরতা কমানো সম্ভব, ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। ডিম পাড়া মুরগি উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত মজবুত হবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, ড. হালিমা খাতুন, ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, ড. কামরুন নাহার মনিরা, ড. শাকিলা ফারুক, ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার, ড. মোঃ রাকিবুল হাসান, ড. সাবিহা সুলতানা এবং মোঃ আতাউল গনি রাব্বানী

বিএলআরআই লেয়ার - ২ (স্বর্ণা) নামক বাণিজ্যিক ডিমপাড়া মুরগি

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি জনবহুল দেশ হওয়ায় প্রয়োজনের তুলনায় প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি রয়েছে। এই ঘাটতি পুরণে, বিগত তিন দশকে পোল্টি শিল্প এ দেশের একটি সম্ভাবনায় অর্থনৈতিক খাতে পরিণত হয়েছে। তবে, দেশে একদিন বয়স্ক বাচ্চার চাহিদার যোগান দিতে বিদেশ থেকে বিপুল অর্থের বিনিময়ে আমদানি করা প্যারেন্ট এবং গ্রান্ড প্যারেন্ট মুরগির উপর নির্ভরশীল হতে হয়। ফলে, একদিন বয়স্ক বাচ্চার বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, বিশ্বের খ্যাতনামা পোল্টি ব্রীডিং কোম্পানিগুলোর বেশিরভাগই শীতপ্রধান দেশে অবস্থিত অথচ তাদের উদ্ভাবিত পোল্টি ব্রীড/স্ট্রেইন গ্রীষ্মপ্রধান বাংলাদেশ আমদানি করে থাকে। যে কারণে এ দেশের আবহাওয়ায় ঠিকমত খাপ খেতে না পারায় উৎপাদন দক্ষতার তারতম্য হয়। তাই, বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী মুরগির ব্রীড/স্ট্রেইন উদ্ভাবন করা গবেষকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর পোল্ট্রি বিজ্ঞানীবৃন্দ উন্নত পিওর লাইন থেকে ধারাবাহিক সিলেকশন ও ব্রীডিং এর মাধ্যমে সম্প্রতি একটি গাঢ় বাদামী বা সোনালী বর্ণের ডিম পাড়া মুরগির স্ট্রেইন উদ্ভাবন করেছে। লাল ঝুঁটি ও সোনালী পালক বিশিষ্ট উদ্ভাবিত নতুন জাতের মুরগিকে “বিএলআরআই লেয়ার স্টেইন-২ বা স্বর্ণা” নামে নামকরণ করা হয়েছে।

প্রযুক্তির উপযোগিতা :

ইতোমধ্যে, গবেষণা খামার পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে স্ট্রেইনটির ৫টি প্রজন্ম লালন-পালন করে ডিমের উৎপাদন দক্ষতা যাচাই করা হয়েছে এবং আশাব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া গেছে। স্বর্ণার একদিন বয়স্ক বাচ্চার পালকের রং দেখেই এর মেল-ফিমেল সনাক্ত করা যায় (ফিমেল বাচ্চার পালকের রং হালকা বাদামী আর মেল বাচ্চার রং সাদা বর্ণের)। স্বর্ণা জাতের মুরগি অন্যান্য বাণিজ্যিক হাইব্রিড জাতের মতোই ১৯ সপ্তাহ বয়সে ডিম দেয়া শুরু করে এবং একটানা ৮০ সপ্তাহ পর্যন্ত লাভজনক হারে ডিম দেয় এবং বার্ষিক ডিম উৎপাদন সংখ্যা ২৯৫-৩০০ টি। এছাড়াও, বাণিজ্যিক জাতের মুরগির (ISA Brown) সাথে তুলনামূলক গবেষণা করে দেখা গেছে যে, স্বর্ণা জাতের মুরগিগুলো বাণিজ্যিক জাতটির তুলনায় অধিক তাপসহিষ্ণু এবং উৎপাদিত ডিমের গড় ওজন প্রায় ৫ গ্রাম বেশি। তাই, গ্রীষ্মকালীন উচ্চ তাপমাত্রায় (৩৫-৩৮° সে.) স্বর্ণা মুরগির ডিম উৎপাদন হারে তেমন তারতম্য হয় না। উদ্ভাবিত জাতটি টাঙ্গাইল, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ফেনী ও নীলফামারী জেলায় খামারি পর্যায়ে উৎপাদন দক্ষতা ও লাভ ক্ষতির অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত ফলাফল গবেষণা খামারের ফলাফলের সহিত সামঞ্জস্য রয়েছে। এসব গবেষণা প্রতিবেদন থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, স্বর্ণার উৎপাদন দক্ষতা বাণ্যিজিক মুরগির সাথে তুলনীয় এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান আবহাওয়া উপযোগী।

স্বর্ণা মুরগির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য :

পালকের রং	:	সোনালী (Golden)
দেহের আকার	:	ত্রিকোণাকৃতি
চামড়ার রং	:	সাদাটে (Off white)
ঝুঁটির রং	:	লাল
ঝুঁটির প্যাটার্ন	:	একক (Single comb)
গলার পালক	:	স্বাভাবিকভাবে বিন্যস্ত
ডিমের খোসার রং	:	বাদামী
পায়ের নলার রং	:	হালকা হলুদ

স্বর্ণা মুরগির উৎপাদন দক্ষতা :

একদিন বয়স্ক বাচ্চার ওজন	:	৪০-৪২ গ্রাম
প্রাপ্ত বয়স্ক মুরগির দৈহিক ওজন	:	১৭৫০-১৮৫০ গ্রাম
প্রাপ্ত বয়স্ক মুরগির দৈনিক খাদ্য গ্রহণ	:	১১৫-১২০ গ্রাম
প্রথম ডিম পাড়ার বয়স	:	১৯-২০ সপ্তাহ
বার্ষিক ডিম উৎপাদনের সংখ্যা	:	২৯৫-৩০০ টি
বার্ষিক গড় ডিম উৎপাদন হার	:	৮০-৮১.৫%
ডিমের গড় ওজন	:	৬৫-৬৬ গ্রাম
খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা	:	২.২০-২.৩০

আর্থ-সামাজিক প্রভাব/আয় ও ব্যয়ের হিসাব :

বিএলআরআই ও খামারি পর্যায়ে পরিচালিত গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, ১০০০ টি স্বর্ণা মুরগির একটি ব্যাচ ৭২ সপ্তাহ পর্যন্ত পালন করে বাজার মূল্যভেদে ২ লক্ষ ৮০ হাজার থেকে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লাভ করা যায় (সারণী-১)। স্বর্ণা মুরগি দেশীয় আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় এর মৃত্যুহার বাইরে থেকে আমদানি করা বাণিজ্যিক মুরগির তুলনায় কম। এছাড়াও, মুরগিগুলো অধিক তাপমাত্রায় পালন উপযোগী হওয়ায় হিট স্ট্রোকে মৃত্যুহার কম হয়। স্বর্ণা মুরগির ডিমের গড় ওজন বাণিজ্যিক মুরগির তুলনায় প্রায় ৫ গ্রাম বেশি, ফলে এগ মাংস উৎপাদন বেশি হয়। তাই, খোলা বাজারে খামারি ডিমের হালি প্রতি ১.৫-২.০ টাকা বেশি মূল্য পেয়ে থাকেন। তাছাড়াও, মুরগিগুলোর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলক বেশি হওয়ায় কোন ধরনের এন্টিবায়েটিক ছাড়াই তালিকা মোতাবেক ভ্যাকসিন প্রয়োগ ও অত্যাবশ্যকীয় ভিটামিন-মিনারেল দিয়েই সফলভাবে পালন করা যায়, ফলে মুরগি প্রতি ঔষধ খরচ কম হবে। মুরগিগুলো মেঝে ও খাচাঁয় সমান তালে পালন উপযোগী হওয়ায় প্রান্তিক খামারিগণ সহজেই নিজের উপযোগী ব্যবস্থায় পালন করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, স্বর্ণা লেয়ার স্টেইনটি আমাদের দেশীয় পরিবেশে উদ্ভাবিত হওয়ায় এর উৎপাদন খরচ অনেক কম হবে এবং খামারিরা স্বল্পমূল্যে স্বর্ণার বাচ্চা ক্রয় করতে পারবেন। ফলে, একদিন বয়স্ক বাণিজ্যিক লেয়ার বাচ্চার উর্ধ্বমুখী দামে সহজেই লাগাম দেয়া যাবে এবং বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় দেশি আবহাওয়া উপযোগী অধিক ডিম উৎপাদনকারী মুরগির স্ট্রেইনটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করা যায়।

সারণী-১ : ১০০০ টি স্বর্ণা মুরগির ১টি ব্যাচের আয়- ব্যয়ের হিসাব :

নিয়ামক	খাত	টাকার পরিমাণ
ব্যয়	মোট স্থায়ী খরচ	৬০০০০-৭২০০০
	মোট পরিবর্তনশীল খরচ	১৬৫০০০০-১৬৭৫০০০
	মোট খরচ	১৭১০০০০-১৭৪৭০০০
আয়	স্থুল আয়	২০৬২৫০০-২১২৫০০০
	নিট লাভ	৩৫২৫০০-৩৭৮০০০
	মোট পরিবর্তনশীল খরচের উপর নিট লাভ	৪১২৫০০-৪৫০০০০
	আয় ও ব্যয়ের অনুপাত	১.২০৬-১.২১৬

উপসংহারঃ

নতুন উদ্ভাবিত স্বর্ণা লেয়ার স্ট্রেইন সরকারি-বেসরকারি খামারে সঠিকভাবে সম্প্রসারণ করতে পারলে একদিকে স্বল্পমূল্যে প্রান্তিক খামারিগণ অধিক ডিম উৎপাদনকারী লেয়ার বাচ্চা পাবেন, অন্যদিকে আমদানি নির্ভরতা অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। এছাড়া, একদিন বয়স্ক লেয়ার বাচ্চার বাজারমুল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এ প্রযুক্তিটি দেশের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষের স্বয়সম্পূর্ণতা ও সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত দেশ গড়ার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. মোঃ রাকিবুল হাসান, ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, মোঃ আতাউল গনি রাব্বানী, ড. হালিমা খাতুন, ড. শাকিলা ফারুক, ড. কামরুন নাহার মনিরা, ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার ড.মোঃ গিয়াসউদ্দিন এবং ড. সাবিহা সুলতানা

বিএলআরআই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ)

ভূমিকা

সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠনে প্রাণিজ আমিষের কোন বিকল্প নেই। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নত হওয়ায় ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাসেরও পরিবর্তন এসেছে। তাই, প্রাণিজ আমিষের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশে মোট মাংসের চাহিদার শতকরা ৪০-৪৫ শতাংশ আসে পোল্ট্রি থেকে। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে সরকারের ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য দৈনিক ৩৫-৪০ হাজার মেট্রিক টন মুরগির মাংস উৎপাদন করা প্রয়োজন। বর্তমানে মুরগির মাংসের অর্ধেকের বেশি আসে বাণিজ্যিক ব্রয়লার থেকে যার পুরোটাই আমদানি নির্ভর। কিন্তু বৈশ্বিক আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্রমাগত পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পোল্ট্রি শিল্পের উপর দৃশ্যমান। ফলে, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় দেশি আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত উদ্ভাবন করা জরুরী। সেই বিবেচনায়, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর পোল্ট্রি উৎপাদন গরেষণা বিভাগের বিজ্ঞানীবৃন্দ দেশীয় জার্মপ্লাজম ব্যবহার করে ধারাবাহিক সিলেকশন ও ব্রীডিং এর মাধ্যমে সম্প্রতি একটি অধিক মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত উদ্ভাবন করেছে। দেশীয় পরিবর্তনশীল আবহাওয়া উপযোগী মুরগির এই জাতটির নামকরণ করা হয়েছে “সুবর্ণ (বিএলআরআই মিট চিকেন-১)”।

প্রযুক্তির বিবরণ

উদ্ভাবিত মাংসল জাতের এ মুরগিগুলোতে একদিন বয়সে হালকা হলুদ থেকে হলুদাভ, কালো বা ধূসর রংয়ের পালক দেখা যায় যা পরবর্তীতে দেশি মুরগির মতো মিশ্র রংয়ের (Multi-colors) হয়ে থাকে। তবে, গাঢ় বাদামী, সোনালী, সাদা-কালো, সাদা-কালোর মিশ্র পালক বিশিষ্ট মুরগির উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। মুরগিগুলোর ঝুঁটির রং গাঢ় লাল এবং একক (Single comb) ধরনের, চামড়ার রং সাদাটে (Off white) এবং গলার পালক স্বাভাবিকভাবে বিন্যস্ত। নতুন এ জাতের মুরগিগুলোর পায়ের নলার (Shank) রং হালকা হলুদ বা কালচে বর্ণের হয়ে থাকে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

সাধারণত, মুরগি পালনে মোট ব্যয়ের শতকরা ৬০-৭০ ভাগই খরচ হয় খাদ্য বাবদ। তাই, খাদ্য অপচয় রোধে যথাসম্ভব সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নিতে হবে। বাচ্চা উঠানোর কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত লিটারের উপর পেপার বিছিয়ে খাদ্য ছিটিয়ে দিতে হবে। ৩-৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত চিক ফিডারের এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করে দিনে ৩-৪ বার খাবার দিতে হবে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বড় খাবার পাত্রে দিনে ৩-৪ বার খাবার দিতে হবে। খাবার

পাত্রের সংখ্যা, উচ্চতা অবশ্যই মুরগির সংখ্যা ও বয়সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সুবর্ণ মুরগি থেকে সর্বোত্তম ফলাফল পেতে সারণি-১ মোতাবেক খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

সারণী-১ ঃ বয়স অনুযায়ী সুবর্ণ মুরগির খাদ্যের পুষ্টি গুণ

পুষ্টি উপাদান	স্টার্টার (১-২১ দিন পর্যন্ত)	গ্রোয়ার (২২-৩৫ দিন পর্যন্ত)	ফিনিশার (৩৬ দিন-বাজারজাতকরণ পর্যন্ত)
আর্দ্রতা, % (সর্বোচ্চ)	১১	১১	১১
ক্রুড প্রোটিন, % (সর্বনিম্ন)	২২	২১	১৯
বিপাকীয় শক্তি, কেজিক্যালরি/কেজি (সর্বনিম্ন)	৩০৫০	৩১০০	৩২০০
ক্রুড ফাইবার, % (সর্বোচ্চ)	৩.৫	৩.৫	৪
চর্বি, % (সর্বনিম্ন)	৪-৫	৫-৬	৬-৮
ক্যালসিয়াম, % (সর্বনিম্ন)	১.০৫	১	০.৯৫
ফসফরাস, % (সর্বনিম্ন)	০.৫০	০.৪৬	০.৪৩
লাইসিন, % (সর্বনিম্ন)	১.২৫	১.২০	১.০৭
মিথিওনিন, % (সর্বনিম্ন)	০.৫০	০.৪৬	০.৪৩
ভিটামিন, মিনারেল	০.২৫	০.১৫	০.১৫

জায়গা, তাপমাত্রা, আলো ও বায়ু ব্যবস্থাপনা

সুবর্ণ জাতের মুরগি পালনে জায়গার পরিমাণ, ব্রুডিং তাপমাত্রা, আলো ও বায়ু ব্যবস্থাপনা অন্যান্য মুরগির মতই। মুরগির ঘরে উত্তম ব্যবস্থাপনা হিসেবে বিশুদ্ধ বাতাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা ত্রুটির কারণে ঘরের ভেতর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও দূষিত বাতাসের পরিমাণ বেড়ে গেলে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। তাই, সুবর্ণ মুরগির জন্য ঘরের ভেতরে সর্বদা পর্যাপ্ত অক্সিজেন (>১৯.৬০%), নূন্যতম কার্বন-ডাই অক্সাইড (<৩০০০ পিপিএম), কার্বন-মনো অক্সাইড (<১০ পিপিএম), অ্যামোনিয়া (<১০ পিপিএম) এবং দূষিত পদার্থ (<৩.৪ মিলিগ্রাম/ঘনমিটার) নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এছাড়াও, ঘরের ভেতরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৫-৬৫% এর মধ্যে রাখতে হবে। তদুপরি, ভালো ফল পেতে সারণি-২ অনুসরণ করতে হবে।

সারণি-২ ঃ সুবর্ণ জাতের মুরগি পালনে প্রয়োজনীয় জায়গা, তাপমাত্রা, আলো ও বাতাসের বৈশিষ্ট্য

বয়স (সপ্তাহ)	জায়গার পরিমাণ (বর্গফুট/মুরগি)		তাপমাত্রা (° সে.)	আর্দ্রতা (%)	আলোক দৈর্ঘ্য (ঘণ্টা)
	শীতকাল	গ্রীষ্মকাল			
১	০.১০	০.২০	৩২-৩৩	৬০-৬৫	২৩
২	০.২০	০.৩০	৩০-৩১	৬০-৬৫	২৩
৩	০.৪৫	০.৫৫	২৭-২৮	৬০-৬৫	২২
৪	০.৫০	০.৬০	২৪-২৫	৬০-৬৫	২২
৫	০.৬০	০.৭০	২২-২৩	৫৫-৬৫	২২
৬	০.৭০	০.৮০	২০-২১	৫৫-৬৫	২০
৭	০.৭০	০.৮০	২০-২১	৫৫-৬৫	২০
৮	০.৮০	০.৯০	২০-২১	৫৫-৬৫	২০

ঘরের আকার

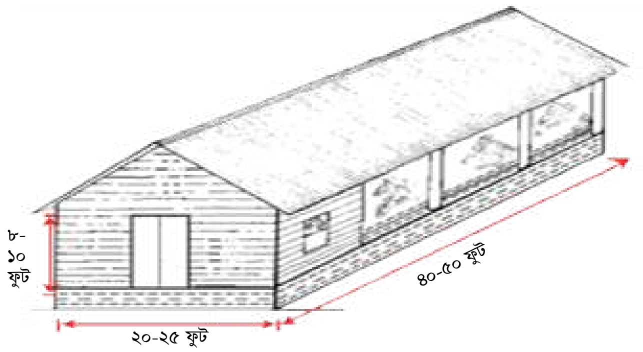

সুবর্ণ জাতের ১০০০ টি মুরগি পালনের জন্য পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল করতে পারে এমন জায়গায় উত্তর-দক্ষিণমুখী করে ৫০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ২০ ফুট প্রস্থের দোচালা ঘর নির্মাণ করতে হবে। ঘরের দরজা সংলগ্ন কিছু অংশ আলাদাভাবে বেষ্টনী দিয়ে (সার্ভিস রুম) খাবার, জীবাণুনাশকসহ অন্যান্য উপকরণ রাখার জন্য ব্যবহার করতে হবে। মেঝে থেকে ১০ ফুট উচ্চতার ঘরের চালা ৩-৪ ফুট বাড়তি রাখতে হবে যেন বৃষ্টির পানির ঝাপটা না লাগে। ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ঘরের পর্দা দুই অংশে ভাগ করতে হবে; উপরের অংশটি প্রাথমিক বায়ু চলাচলের জন্য ব্যবহার করতে হবে, ঠান্ডার সময় মুরগিকে সরাসরি বাতাসের হাত থেকে রক্ষা করতে নিচের অংশের অন্য পর্দাটি আবহাওয়া ও তাপমাত্রা ভেদে উঠা-নামা করতে হবে।

লিটার ব্যবস্থাপনা

সুবর্ণ জাতের মুরগির স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য লিটার বা বিছানা শুষ্ক ও দুর্গন্ধমুক্ত হতে হবে। বিছানা হিসেবে ধানের তুষ ব্যবহার করতে হবে। মুরগির বয়স ও আবহাওয়া অনুযায়ী সঠিক উপাদানের লিটার ব্যবহার করতে হবে। গ্রীষ্মকালে ১-২ ইঞ্চি এবং শীতকালে ৩-৪ ইঞ্চি পুরু লিটার ব্যবহার করতে হবে। ব্রুডিং-এর সময় লিটারের উপর পেপার বিছিয়ে দিতে হবে এবং প্রতিদিন পরিবর্তন করতে হবে। এছাড়াও, কোন কারণে লিটার ভিজে গেলে বা আর্দ্র হয়ে গেলে সাথে সাথে সরিয়ে ফেলতে হবে, প্রয়োজনে নতুন লিটারের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে। উত্তম ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে লিটার নিয়মিত উলট-পালট করতে হবে।

সুবর্ণ প্যারেন্টস মুরগির উৎপাদন দক্ষতা

পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার কারণে বর্তমানে খোলা সেডে মুরগি পালন বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, রোগবালাই এর প্রাদুর্ভাব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে জাত নির্বাচন করা উচিত। এ সকল বিষয় বিবেচনা নিয়ে দেশীয় আবহাওয়ায় অভিযোজিত ফিমেল লাইন এবং উন্নত দেশি জাতের মেইল লাইন সিলেকশন ও ব্রীডিং এর মাধ্যমে কৌলিকমান উন্নয়ন করে সুবর্ণ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা আমাদের দেশের আবহাওয়ায় সহজেই পালন করা যায়। এই জাতের কৌলিকমান এমনভাবে উন্নয়ন করা হয়েছে যাতে ক্ষুদ্র খামারি ও বাণিজ্যিক খামারি লাভবান হতে পারে। বিএলআরআই এর গবেষণা এবং মাঠ পর্যায়ে বাণিজ্যিক খামারে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সারণি-৩ ঃ সুবর্ণ মুরগির প্যারেন্টস এর ফিমেল লাইনের উৎপাদন দক্ষতার তুলনামূলক চিত্র

নিয়ামক	বিএলআরআই এর গবেষণা খামার	বাণিজ্যিক খামার*
একদিনের বাচ্চার ওজন (গ্রাম)	৩৯.৫০	৩৮.১৭
প্রথম ডিম পাড়ার বয়স (দিন)	১৩৫	১৩৬
৫% ডিম উৎপাদন (দিন)	১৫১	১৫০
গড় দৈহিক ওজন (গ্রাম)	১৯৫৪.১২	২০৩১.৮৯
সর্বোচ্চ ডিম উৎপাদন (%)	৮৫.৮৮	৮৬.৬৬
ডিম উৎপাদন (%)	৭০.৯৫	৭১.৪২
ডিমের গড় ওজন (গ্রাম)	৬০.১৯	৫৯.৫৪
গড় খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/দিন)	১০৯.৯২	১১৮.৪৩
খাদ্য রূপান্তর হার (এফসিআর)	২.৪৪	২.৬৫
বাৎসরিক ডিম উৎপাদন (সংখ্যা)	২৫৯.২৯	২৬০.৬৮
বাৎসরিক হ্যাচিং ডিম উৎপাদন (সংখ্যা)	২৩৬.৬৫	১৯১.০৭
বাৎসরিক এক দিন বয়স্ক বাচ্চা উৎপাদন (সংখ্যা/প্যারেন্টস)	১৮০-১৮৫	১৫৫-১৬০
ফার্টিলিটি (%)	৮৯.০৩	৭০.৯৩
হ্যাচাবিলিটি (%)	৭৯.৩২	৬৩.৬৮
লিভাবিলিটি (%)	৯৫.৬৮	৯৩.৭৯

সুবর্ণ মুরগির উৎপাদন দক্ষতা

বিএলআরআই পরিচালিত গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন বয়সে সুবর্ণ মুরগির গড় ওজন, মোট খাদ্যগ্রহণ এবং খাদ্য রূপান্তর হার (FCR) সারণি-৪ এ উল্লেখ করা হলো।

সারণি-৪ ঃ বয়সভিত্তিক গড় ওজন, মোট খাদ্য গ্রহণ ও খাদ্য রূপান্তর হার

বয়স (সপ্তাহ)	সাপ্তাহিক ওজন (গ্রাম/মুরগি)	মোট খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/মুরগি/সপ্তাহ)	পানি গ্রহণের পরিমাণ (মিলি/ মুরগি/সপ্তাহ)	খাদ্য রূপান্তর হার
১	৮০-৮৫	৫০-৭০	১৪০-১৭৫	১.৩২-১.৩৫
২	১৩৫-১৫৫	৯৫-১১০	২৪৫-৩১৫	১.৬৭-১.৭৫
৩	২৪৬-২৬৫	২০০-২২০	৪৫৫-৫২৫	১.৮০-২.০০
৪	৩৬২-৩৮২	২৫৫-২৭০	৫২৫-৬৬৫	২.২-২.৩০
৫	৪৯৫-৫১৫	৩২৫-৩৪০	৬৬৫-৮৪০	২.৪-২.৫৫
৬	৬৩৫-৬৫২	৩৮৫-৪০০	৮৪০-৮৭৫	২.৭৫-২.৮২
৭	৭৮০-৮১৫	৪০১-৪৭৫	৮৭৫-১০৫৫	২.৭৬-২.৯১
৮	৯৭৫-১০০০	৫৪৫-৫৫০	৯৮০-১২২৫	২.৭৯-২.৯৭
০-৮ সপ্তাহ	৯৭৫ গ্রাম-১.০ কেজি	২.২৫-২.৪৩ কেজি	৪.৭২-৫.৮১ লি	২.৩-২.৪৩

সুবর্ণ মুরগির তুলনামূলক উৎপাদন দক্ষতা

বিএলআরআই পরিচালিত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খামারিদের বিদ্যমান হাউজিং পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুবর্ণ মুরগির মুল্যায়ন যাচাই করা হয়। উক্ত ফলাফল ও উৎপাদন দক্ষতা (গড় ওজন, মৃত্যুর হার ও মোট খাদ্য গ্রহণ এবং খাদ্য রূপান্তর হার) সারণি -৫ এ উল্লেখ করা হলো।

সারণি-৫ ঃ অঞ্চলভিত্তিক সুবর্ণ মুরগির তুলনামূলক উৎপাদন দক্ষতা (০-৫৬ দিন)

অঞ্চল	মুরগির সংখ্যা	বাচ্চার ওজন (গ্রাম)	গড় ওজন (গ্রাম/ মুরগি)	ওজন বৃদ্ধি (গ্রাম/ মুরগি)	মোট খাদ্যগ্রহণ (গ্রাম/ মুরগি)	খাদ্য রূপান্তর হার	মৃত্যুর হার (%)
খুলনা	১০০০	৩৭.৪৯	৯৫০.৩১	৯১২.৮২	২২৫০.২১	২.৪৬৫	১.৬৯
বরিশাল	১১০০	৩৮.১৫	১০২০.৫৪	৯৮২.৩৯	২১৯০.৫৪	২.২৩০	১.৩৮
পাবনা	৫০০	৩৭.০৮	৯২০.১৮	৮৮৩.১০	২২১০.৬৩	২.৫০৩	২.১০
রাজবাড়ী	৯০০	৪১.০১	১০৪০.০০	৯৯৮.৯৯	২০২৭.৫২	২.০৩০	০.৯৬
মানিকগঞ্জ	১৫০০	৩৭.৯১	৯৬৩.০০	৯২৫.০৯	২২৮০.৬৮	২.৪৬৫	৩.৬৮
কুমিল্লা	১০০০	৩৭.৬৮	৯৭২.৫৮	৯৩৪.৯০	২৩১০.০৫	২.৪৭১	২.৯৪
রংপুর	৯৪০	৩৬.৯২	৮৯৫.৬৩	৮৫৮.৭১	২১৯০.২৯	২.৫৫১	৪.২১
গাজীপুর	৯৮০	৩৮.৩৬	৯৪০.৫০	৯০২.১৪	২২৪০.৬১	২.৪৮৪	১.৭২
ঢাকা	১৫০০	৩৭.২১	৯৬৫.০২	৯২৭.৮১	২১৬০.৭৩	২.৩২৯	২.৬৪
নরসিংদী	১২৫০	৩৮.০০	৯২৫.০০	৮৮৭.০০	২২১০.৮১	২.৪৯২	৩.২৩
নারায়ণগঞ্জ	৮০০	৩৮.৫৪	৯৫৮.০০	৯১৯.৪৬	২১৭০.২৮	২.৩৬০	১.৮৯
নোয়াখালী	৫৪০	৩৭.৮৪	৯৬০.৩০	৯২২.৪৬	২৩১৫.৩৪	২.৫১০	৩.৪৯
এসইএম		০.৪৮২	৩৮.২৯	৩৭.৪৩	৬৩.৮৪	০.০৭৩	০.২৭১
পি ভেলু		০.১৩৭	০.০২৩	০.০২৭	০.৩৮৪	০.০৩২	০.০৭৮

সুবর্ণ ও অন্যান্য মাংস উৎপাদনকারী মুরগির তুলনামূলক উৎপাদন দক্ষতা

বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত সুবর্ণ মুরগির সাথে অন্যান্য মাংস উৎপাদনকারী মুরগির উৎপাদন দক্ষতা তুলনা করা হয় এবং সুবর্ণ মুরগির ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। নিম্নে সুবর্ণ ও অন্যান্য মাংস উৎপাদনকারী মুরগির তুলনামূলক উৎপাদন দক্ষতা (গড় ওজন, মোট খাদ্যগ্রহণ এবং খাদ্য রূপান্তর হার) সারণি-৬ এ উল্লেখ করা হলো।

সারণি-৬ ঃ সুবর্ণ ও অন্যান্য মাংস উৎপাদনকারী মুরগির উৎপাদন দক্ষতার তুলনামূলক চিত্র (০-৫৬ দিন)

নিয়ামক	হিলি	সুবর্ণ	সোনালী	এসইএম	পি ভেলু
বাচ্চার ওজন (গ্রাম)	৩৩.১৭	৩৯.৪৩	৩৩.৩০		
গড় ওজন (গ্রাম/মুরগি)	৭৭৮.৩৫	৯৮০.৫০	৭০৭.৮০	৩২.১৭	০.০০১
গড় ওজন বৃদ্ধি (গ্রাম/মুরগি)	৭৪৫.১৮	৯৪১.০৭	৬৭৪.৫০	৩১.৪৫	০.০৩৫
মোট খাদ্যগ্রহণ (গ্রাম/মুরগি)	২০৫০.২৮	২২৩৪.২৭	১৮৯২.৫৬	৫৬.৯০	০.০৪৩
খাদ্য রূপান্তর হার (ঋঈজ)	২.৭৫১	২.৩৭৪	২.৮০৫	০.০৭	০.০৩৫

টিকাদান কর্মসূচী

সুবর্ণ জাতের মুরগি গুলোর মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে কম। বিএলআরআই পরিচালিত গবেষণায় গড় মৃত্যুহার ১.৫% পাওয়া গেছে। এই জাতের মুরগিগুলো অধিক রোগ প্রতিরোধক্ষম এবং দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী হওয়ায় সঠিক বায়োসিকিউরিটি বা জীব-নিরাপত্তা এবং উত্তম লালন পালন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারলে রোগ-বালাই হয় না বললেই চলে। তথাপি, অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রস্তুতকারকের নির্দেশনা মোতাবেক নিম্নোক্ত (সারণি-৭) টিকাদান কর্মসূচী পালন করতে হবে।

সারণি-৭ ঃ সুবর্ণ মুরগির টিকাদান কর্মসূচী

বয়স (দিন)	টিকার নাম	যে রোগের জন্য	মাত্রা	প্রয়োগ-স্থান
৫-৬	আইবি ও রানীক্ষেতের জীবন্ত টিকা [IB+ND (Live)]	আইবি ও রানীক্ষেত	১ ফোঁটা	চোখে
৯-১২	গামবুরো রোগের জীবন্ত টিকা [IBD (live)]	গামবুরো	১ ফোঁটা	চোখে
১৬-১৮	গামবুরো রোগের জীবন্ত টিকা [IBD (live)]	গামবুরো	১ ফোঁটা	চোখে/ খাবার পানিতে
২১-২৩	আইবি ও রানীক্ষেতের জীবন্ত টিকা [IB+ND (Live)]	আইবি ও রানীক্ষেত	১ ফোঁটা	চোখে/ খাবার পানিতে
৩২-৩৫	ফাউল পক্স জীবন্ত টিকা [AE+Pox (Live)]	ফাউল পক্স	প্রদত্ত কাঁটা একবার ডুবিয়ে পালকের নীচে	
৪০-৪২	রানীক্ষেতের জীবন্ত টিকা [ND (live)]	রানীক্ষেত	১ ফোঁটা	খাবার পানিতে

আয় ও ব্যয়ের হিসাব

বিএলআরআই-এ পরিচালিত গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, আট সপ্তাহ পর্যন্ত ১০০০ টি সুবর্ণ জাতের মুরগি এক ব্যাচ লালন-পালন করে বাজার মূল্যভেদে প্রায় ৪৫-৬০ হাজার টাকা তথা বছরে অন্তত ৪টি ব্যাচ পালন করলে ১ লক্ষ ৮০ হাজার থেকে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব। এছাড়াও, সুবর্ণ জাতের মুরগিগুলোর মাংসের স্বাদ ও পালকের রং দেশি মুরগির ন্যায় মিশ্র বর্ণের হওয়ায় খামারিগণ বাজার মূল্যও প্রচলিত সোনালী বা অন্যান্য মুরগির তুলনায় বেশি পাবেন।

সারণি-৮ ঃ আট সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত ১০০০ সুবর্ণ মুরগির ১টি ব্যাচের আয়-ব্যয়ের হিসাব

নিয়ামক	খাত	টাকার পরিমাণ
ব্যয়	**মোট স্থায়ী খরচ (Fixed cost) ঃ** ঘর বানানোর প্রয়োজনে কাঠ বাশ, টিন, নেট, ইট, বালি ও সিমেন্ট ও মজুরী বাবদ খরচ	৫৮০০-৭১০০
	মোট পরিবর্তনশীল খরচ (Variable cost) ঃ বাচ্চা, খাবার, তুষ,ইলেকট্রিক মালামাল, খাবার পাত্র, পানির পাত্র, বালতি, মগ, ব্রুডার বাবদ খরচ	১৩৯৫০০-১৭৫০০০
	মোট খরচ (Total cost)	**১৪৫০০০-১৭৭১০০**
আয়	**স্থূল আয় (Gross return) ঃ** মুরগি, লিটার, ফিডের খালী বস্তা বিক্রয়	১৮৯০০০-২৩০০০০
	নিট লাভ (Net return)	৪৪০০০-৫৩৫০০
	মোট পরিবর্তনশীল খরচের উপর নিট লাভ	৪৯৫০০-৬০৫০০
আয় ও ব্যয়ের অনুপাত		১.১৭-১.৪৩

পরিবেশের উপর প্রভাব

বৈশ্বিক তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের ঝুকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তালিকার প্রথম দিকে। প্রতিনিয়ত পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রভাব কম-বেশি সব খাতের উপরই দৃশ্যমান। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় পোল্ট্রি প্রজাতি পরিবেশের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। অন্যদিকে, দেশের ব্রয়লার-লেয়ারের সব জাতের প্যাবেন্টস বিদেশ থেকে আমদানিকৃত হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে মুরগরি কাঙ্খিত উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। সেই দিক বিবেচনা করলে বিএলআরআই উদ্ভাবিত মাংস উৎপাদনকারী জাত বিএলআরআই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ) পরিবর্তনশীল আবহাওয়া উপযোগী এবং উৎপাদনের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব নেই। তাছাড়া, খামারের বিষ্ঠা দিয়ে বায়োগ্যাস করা যেতে পারে এবং বায়োগ্যাসের উপজাত জৈব সার হিসেবে বিভিন্ন ফসল, খাদ্যশস্য ও ঘাস উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে, খামারিগণ অধিক লাভবান হবেন।

উপসংহার

নতুন উদ্ভাবিত মাংসল জাতের মুরগি (সুবর্ণ) খামারি পর্যায়ে সম্প্রসারণ সঠিকভাবে করতে পারলে একদিকে স্বল্পমূল্যে প্রান্তিক খামারিগণ অধিক মাংস উৎপাদনকারী জাতের বাচ্চা পাবেন, অন্যদিকে আমদানি নির্ভরশীলতা অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। উদ্ভাবিত এ জাতটি দেশের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষসহ অন্যান্য পুষ্টির চাহিদা পূরণে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত আত্মনির্ভরশীল দেশ গড়ায় যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. মোঃ রাকিবুল হাসান, ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ আতাউল গনি রাব্বানী, ড. মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ ড. শাকিলা ফারুক, ড. কামরুন নাহার মনিরা, ড. হালিমা খাতুন, ড. সাবিহা সুলতানা এবং ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার

মুরগির কৃত্রিম প্রজননের সহজ পদ্ধতি

ইতিহাসঃ বিজ্ঞানী Spalanzani সর্বপ্রথম ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কৃত্রিম প্রজনন নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে গবেষণা করেন। তিনি একজন ইটালিয়ান জীববিজ্ঞানী। তিনি ৩০টি কুকুরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে ১৮টিতে সফলতা অর্জন করেন। ১৯০৭ সালে একজন রাশিয়ান বিজ্ঞানী Ivanon গৃহপালিত প্রাণীর কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বংশবিস্তার ঘটান ও উন্নয়ন সাধন করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে গরু ও ভেড়াতে কৃত্রিম প্রজননের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। গরু, ঘোড়া, শূকর ইত্যাদিতে কৃত্রিম প্রজননের ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেলেও গৃহপালিত মুরগিতে কৃত্রিম প্রজননের গবেষণা শুরু হয় জাপানে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে। এর মূল কারণ হিসেবে ধরা হয় মুরগি পালন ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিকে। কারণ সেই সময় ছোট বড় সব ধরনের খামারেই ব্যাটারি অথবা খাঁচা পদ্ধতির ব্যবহার হতো এবং এই পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধির ফলেই সাধারণ প্রজননবিদদের মধ্যেও কৃত্রিম প্রজননের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। তবে মুরগিতে কৃত্রিম প্রজননের বিষয়টি ব্যবহারিকভাবে এখনও তেমন প্রাধান্য পায়নি। বাংলাদেশে গরুর ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্রজননের ব্যবহার শুরু হয় ১৯৬৮ সালে।

ভূমিকাঃ কৃত্রিম প্রজনন হচ্ছে, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পুং প্রাণীর জনন অঙ্গ হতে শুক্রাণু সংগ্রহ করে স্ত্রী প্রাণীর ডিম্বাণুর সঙ্গে নিষেক ঘটানো। প্রজননের মাধ্যমে বাংলাদেশে পোল্ট্রির উন্নয়নের জন্য কৃত্রিম প্রজনন একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। সাধারণত আমাদের দেশে সনাতন ফ্লক মেটিং বা পেন মেটিং পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়। পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়নে, উন্নত দেশগুলোতে মুরগির কৃত্রিম প্রজননের ব্যবহার খুব প্রচলিত। পোল্ট্রিতে কৃত্রিম প্রজননের সফলতা নির্ভর করে ব্যবহৃত সিমেনের সংগ্রহ-সংরক্ষণ পদ্ধতি, ব্যাকটেরিয়া দ্বারা দূষণ এবং পরিস্ফূটনের উপর। মুরগিতে কৃত্রিম প্রজনন জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া রোগজীবাণু দমন এবং স্বল্প খরচে ফকের ব্যবস্থাপনার জন্য কৃত্রিম প্রজনন অতীব জরুরি। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মুরগির অত্যাবশ্যকীয় উৎপাদন দক্ষতাও যাচাই করা সম্ভব।

কৃত্রিম প্রজননের উপকারিতা

(১) ব্যবস্থাপনা খরচ কমায়।

(২) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত কমায়। (যেমন স্ত্রী পাখিটি ছোট ও পুং পাখিটি বেশি বড় হলে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে)।

(৩) কৌলিক গুণাগুন সম্পন্ন উন্নত মোরগ বা শায়ার (sire) এর ব্যবহার বাড়ানো যায়।

অসুবিধাসমূহ

(১) কৃত্রিম প্রজননের জন্য যন্ত্রপাতি প্রয়োজন।

(২) দক্ষ লোক প্রয়োজন।

কৃত্রিম প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তালিকাঃ

(১) সিরিঞ্জ (১ মি.লি)।

(২) ভায়াল বা সংগ্রাহক (৫ মি.লি.)।

(৩) হ্যান্ড গ্লোবাস।

(৪) pH পেপার।

সিমেন সংগ্রহ করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন

(১) মোরগ জবাই করার পর উহার বিভিন্ন ডাকট (Duct) হতে সিমেন সংগ্রহ করা।

(২) মুরগির সঙ্গে সংগমের পর পরই গ্লাস, স্পোন অথবা পিপেটের মাধ্যমে সিমেন সংগ্রহ করা।

(৩) সংগমের সময় মোরগ হতে সংগ্রাহক টিউবের মাধ্যমে সিমেন সংগ্রহ করা।

(৪) বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মাধ্যমে সিমেন সংগ্রহ করা।

(৫) মোরগের লাম্বার রিজিয়নে অ্যাবডুমেনের চারদিকে ম্যাসেজের মাধ্যমে সিমেন সংগ্রহ করা।

সিমেন সংগ্রহের পূর্বপ্রস্তুতি

সিমেন সংগ্রহের পূর্বে নিম্লোক্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যকঃ

(ক) মোরগকে সিমেন সংগ্রহের পূর্বে ট্রেনিং দিতে হবে।

(খ) অ্যানাসের চারধারের পালক কাটতে হবে।

(গ) সিমেন সংগ্রহের সময় কেজ হতে মোরগকে বের করা কষ্টকর।

তাই প্রথমে মোরগকে মুরগির সঙ্গে মেশার সুযোগ দিয়ে পরে উহা হতে সিমেন সংগ্রহ করতে হবে।

চিত্র ১: সংগ্রাহক (৫ মি.লি.)

চিত্র ২: সিরিঞ্জ

কৃত্রিমভাবে সিমেন সংগ্রহ করার জন্য উপযুক্ত বয়স

সাধারণভাবে ৭-৮ মাস বয়স হলেই মোরগকে কৃত্রিম প্রজননের জন্য ব্যবহার করা যায়। তবে জাতের উপর নির্ভর করে মোরগের বয়সের ভিন্নতা রয়েছে। যেমন- হোয়াইট লেগ হর্নের (WLH) ক্ষেত্রে মোরগের বয়স হবে ৬ মাস বা তারও বেশি কিন্তু বেয়ার্ড প্লাইমাইথ রকের (BPR) ক্ষেত্রে মোরগের বয়স হতে হবে ৮ মাস বা তারও বেশি।

মোরগ হতে সিমেন সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি থাকলেও নিম্লোক্তভাবে সংগ্রহ করা অতি উত্তম।

চিত্র ৩: ম্যাসেজ করা

চিত্র ৪: সিমেন সংগ্রহ

উপর্যুক্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

(১) অ্যাবডুমিনাল রিজিওনে ম্যাসেজ করে

নিম্নে এ পদ্ধতিতে সিমেন সংগ্রহ করা উপস্থাপন করা হলোঃ

সিমেন সংগ্রহের জন্য প্রথমে একটি স্বাস্থ্যবান মোরগ বাছাই করতে হবে। উপরে উপস্থাপিত জাতের উপর নির্ভর করে মোরগের বয়স নির্ধারণ এবং কৃত্রিম প্রজননের জন্য ব্যবহার করা হয়। মোরগ হতে সিমেন সংগ্রহের পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে মোরগটিকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এরপর এনাসের চারপাশের পালকগুলো কেটে নিয়ে প্রথমে মুরগির সঙ্গে মেটিং করায়ে নিয়ে পরে সিমেন সংগ্রহ করা হয়। এখানে সিমেন সংগ্রহের জন্য অ্যাবডুমেনে ম্যাসেজ করে মৃদুভাবে চাপ দিয়ে সিমেন সংগ্রহ করা যায়।

সিমেনের ঘনত্ব ও সংগ্রহের বিরতিকাল

সিমেনের ঘনত্ব হবে (০.৩ - ০.৫) সিসি তবে সর্বোচ্চ ঘনত্ব ২ সি.সি/মোরগ হতে পারে। দিনে ২ বার সিমেন সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে স্বল্প সময়ের ব্যবধান হলে সপ্তাহে ৩ দিন এবং বেশি সময়ের ব্যবধান হলে সপ্তাহে ২ দিন সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বাহ্যিক পরীক্ষাসমূহ

নিম্নোক্ত নির্দেশিকা অনুসারে সংগ্রহকৃত সিমেনের গুণাগুণের মান নির্ণয় করা যেতে পারে।

(১) রঙ : দুধের (milk) মত সাদাটে
(২) ঘনত্ব : ০.২-০.৮ সি.সি.
(৩) মল/সামঞ্জস্য (consistency) : মোটা ক্রিমের মত- ভাল; পানির মত-খারাপ
(৪) স্বচ্ছতা (Transparency) : অস্বচ্ছ (opaque)-ভাল; পরিষ্কার (clear)-নিম্ন মানের; ঘোলাটে (cloudy)-খারাপ মানের।

সিমেন ঢোকানো/প্রবেশ (injecting) পদ্ধতি

অ্যানাস ওপেনিং এরিয়াঃ অ্যানাস খোলার জন্য প্রথমে মুরগির অ্যানাসের উপর (top) এবং শেষ প্রান্তে (bottom ends) উল্টোদিক থেকে চাপ দিতে হবে। খাঁচার ডিমপাড়া মুরগির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি খুব সহজেই প্রয়োগ করা যায়। সর্বোত্তম হয় যদি মুরগিটিকে উপরের দিকে এবং অ্যাবডুমেন নিচের দিকে ধরা হয়। যদি সিমেন কোয়েকা বা অভিডাক্টের (oviduct) মুখে অথবা এর আশেপাশে সিমেন প্রবেশ করানো হয় তবে উর্বরতা (fertilization) কমে যাবে। সর্বনিম্ন সিমেন প্রবেশ করানোর এরিয়া হচ্ছে ভ্যাজাইনার (vagina) গভীরে দেয়া, অর্থাৎ ভ্যাজাইনা যেখানে কোয়েকা স্পর্শ করে সেখান হতে ২-৩ সে.মি. দূরে সিমেন প্রবেশ করাতে হবে।

সিমেন প্রবেশ করানোর (injecton) বিরতিকাল

সিমেন প্রবেশ করানোর দ্বিতীয় দিনে মুরগি উর্বর ডিম দেয়। তবে ২য় সপ্তাহেও মুরগি উর্বর ডিম দিতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি উর্বর ডিম দেয় সিমেন প্রবেশ করানোর ৬ষ্ঠ ও ৭ম দিনে। ৩-৪ দিন পর পর সিমেন প্রবেশ করানো ভাল। সপ্তাহে ১ম দিন সিমেন প্রবেশ করানো বাঞ্ছনীয়।

নিম্নের সারণিতে বিভিন্ন জাতের মুরগির উর্বরতা (fertility) ও পরিস্ফুটনতার (hatchability) হার দেখানো হলো।

সারণি ১ : বিভিন্ন জাতের মুরগির উর্বরতা (fertility) ও পরিস্ফুটনতার (hatchability) হার

জাত	উর্বরতার হার (fertility) (%)	পরিস্ফুটনের হার (hatchability) (%)	স্বাভাবিক বাচ্চার হার (%)
WLH	92.42	79.13	82.57
BPR	91.74	84.65	83.99
RIR	90.48	80.17	81.20
WR	88.79	90.14	92.33
RIRX BPR	93.29	88.37	83.90

চিত্র ৫-৬: মুরগি ধরা

চিত্র ৭: সিমেন প্রবেশ করানো

উপরে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বাণিজ্যিকভাবে মুরগি পালনকারীগণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে অধিক আয় করতে পারেন।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. কামরুন নাহার মনিরা, ড. মোঃ নজরুল ইসলাম ও ড. টি এন নাহার

মুরগির রানীক্ষেত রোগ নিয়ন্ত্রণ

ভূমিকা

রানীক্ষেত বা Newcastle disease মুরগি তথা পাখি জাতের ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক রোগ। ১৯২৬ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাভায় রোগটি প্রথম সনাক্ত করা হয়। বাংলাদেশে এ রোগ বহু আগেই সনাক্ত করা হয়েছে। যে কোন বয়সের মুরগিই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। বাচ্চা মুরগিতে এ রোগে মৃত্যুর হার শতকরা ৯০ ভাগের উপর। বয়স্ক মুরগিতে মৃত্যুর হার কিছুটা কম। এ দেশে মোট মৃত মুরগির শতকরা ৪০-৬০ ভাগ মৃত্যু হয় রানীক্ষেত রোগে। দেশী চড়ে বেড়ানো এবং বাণিজ্যিক উভয় প্রকার মুরগিতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। বছরের যেকোন ঋতুতেই এ রোগ দেখা দিতে পারে। তবে হঠাৎ বৃষ্টি বা আবহাওয়ার যে কোন পরিবর্তনে যখন মুরগি পীড়ন জনিত সমস্যায় ভোগে তখন এরোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। অধিক মৃত্যু হারের জন্য খামারিরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় ফলে ক্ষুদ্র খামারিরা খামার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এ অবস্থা পোল্ট্রি শিল্পের জন্য হুমকি স্বরূপ। তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায় যে, দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত টিকা খামারিরা নিয়মিত ব্যবহার করেও খামারে কোন কোন ক্ষেত্রে রানীক্ষেত রোগ দেখা দিচ্ছে। টিকা ব্যবহারের পরও খামারে কখনও কখনও রানীক্ষেত রোগ দেখা দেয়ার কারণ নিম্নে দেয়া হল।

টিকা ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারজনিত ক্রটি

- সঠিক তাপমাত্রায় টিকা সংরক্ষণ করা না হলে,
- সঠিক মাত্রায় টিকা প্রয়োগ করা না হলে,
- টিকার গুণগত মান ঠিক না থাকলে,
- জীবাণুমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা না হলে,
- টিকা প্রদানকারীর ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব থাকলে।

চিত্র : রাণীক্ষেতে আক্রান্ত মুরগি

মুরগির শারীরিক ক্রটি

- টিকার জীবাণুর সাথে মুরগির দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সংবেদনশীল না হলে (Immunocompetence),
- খামারে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিধ্বংসী রোগের প্রাদুর্ভাব হলে যেমন- গামবোরো চিকেন এনিমিয়া, রিও ভাইরাস ইনফেকশন, ইত্যাদি। এরোগগুলো মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উৎপন্নকারী অঙ্গসমূহকে দুর্বল করে দেয়, ফলে মুরগি সহজেই রানীক্ষেতসহ অন্যান্য রোগের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে যায়,
- খাদ্যে আফলাটক্সিন (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট করে) এর উপস্থিতি থাকলে,
- মাত্রাতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক বিশেষ করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এন্টিবায়োটিক মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করা হলে তা মুরগির বেড়ে ওঠার পথে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

রোগ বিস্তারের কারণসমূহ

(ক) শেডে মুরগির ঘনত্ব বেশি হলে,
(খ) ঘর বা আশেপাশের পরিবেশ অপরিস্কার থাকলে,
(গ) বিভিন্ন বয়সের মুরগি একসাথে পালন করা হলে,
(ঘ) খামারে অবাধে বন্য পাখি প্রবেশ করলে,
(ঙ) অপরিকল্পিতভাবে টিকা প্রদান করলে,
(চ) অল ইন অল আউট (all in all out) পদ্ধতি অনুসরণ করা না হলে,
(ছ) সচেতনতার অভাবে মুরগির দেহে এন্টিবডির পরিমাণ নির্ণয় না করে টিকা ব্যবহার করলে,
(জ) রাণীক্ষেত আক্রান্ত মৃত মুরগি খোলা অবস্থায় যেখানে সেখানে ফেলে রাখলে।

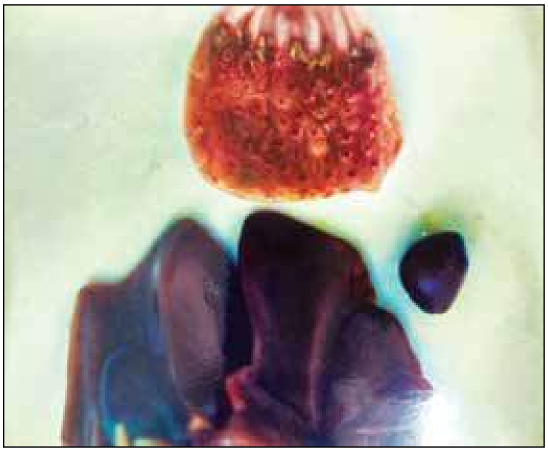

চিত্র : প্রভেন্টিকুলাসে বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণ

রানীক্ষেত রোগ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি

১. খামারে উচ্চমান সম্পন্ন জীব নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে। খামারে ব্যবহারের জন্য পৃথক কাপড় ও জুতার ব্যবস্থা থাকতে হবে যা জীবাণুমুক্তভাবে পরিস্কার রাখতে হবে। খামারে প্রবেশের পূর্বে কার্যকর জীবাণুনাশক দিয়ে হাত পা ভালভাবে ধৌত করতে হবে। গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্য ও জীবাণুমুক্ত পানি সরবরাহ করতে হবে। খামারের ভিতর এবং বাহিরের পরিবেশ পরিস্কার রাখতে হবে। ম্যানেজার, সুপারভাইজার, দর্শনার্থী, ক্রেতা, শ্রমিক, খাবার সরবরাহকারী যানবাহন ও আশেপাশের অন্যান্য লোকজনের খামারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তবে, বিশেষ প্রয়োজনে উপর্যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সীমিত সংখ্যক লোকজনের প্রবেশের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। খামার থেকে অসুস্থ ও মৃত মুরগি দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তা সৎকার করতে হবে।

২. সকল সময় অল ইন অল আউট (all in all out) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ খামারে একই বয়সের মুরগি একবারে প্রবেশ করাতে হবে এবং নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত পালন করার পর এক সাথে বের করে ফেলতে হবে। একটি খামার হতে অপর খামার কমপক্ষে ৩০০ মিটার দূরত্বে স্থাপন করতে হবে যাতে রোগজীবাণুর ক্রস ট্রান্সমিশন হতে না পারে।

৩. মুরগির দেহে রানীক্ষেত রোগের এন্টিবডি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় টিকা দিতে হবে।

৪. টিকা প্রদানের পর (জীবিত টিকার ক্ষেত্রে ১৫ দিন এবং মৃত টিকার ক্ষেত্রে ৩০ দিন পর) নিয়মিত হিমাগ্লুটিনেশন ইনহিবিশন বা এইচ. আই (Haemagglutination Inhibition) পরীক্ষা করে মুরগিতে উৎপাদিত এন্টিবডির পরিমাণ নির্ণয় করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

৫. রানীক্ষেত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বন্য এবং গৃহপালিত প্রাণীর খামারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মূল খামারের চারদিকে কমপক্ষে ৫ ফুট দূরত্বে ৫ ফুট উঁচু বেড়া দিতে হবে। বন্যপাখি প্রতিরোধের জন্য সঠিকভাবে ঘর তৈরি করতে হবে এবং প্রয়োজনে অন্য কোন ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে পরিত্যক্ত পানির বোতলে এলুমিনিয়াম ফয়েল জড়িয়ে বন্যপাখি প্রতিরোধক তৈরি করে খামারের চারিদিকে ৩ মিটার পর পর ঝুলিয়ে দিতে হবে। রানীক্ষেত রোগের প্রতি বিভিন্ন মাত্রায় সংবেদনশীল মুরগি এবং অন্যান্য বন্য ও পোষা পাখির একটি তালিকা পরের পৃষ্ঠায় দেয়া হলো-

অতি সংবেদনশীল	অল্প সংবেদনশীল	খুব কম সংবেদনশীল
		মুরগি জাতীয় পাখি
পেঙ্গুইন	পানিতে বসবাসকারী পাখি যেমন হাঁস	
কবুতর	প্যাঁচা	কোয়েল
	টিয়া পাখি	ঈগল
গাংচিল		উট পাখি
বক	সারস	
	চড়ুই	রেলিফরমিস
		অন্যান্য গানে ও গুণভুক্ত পাখি

৬. আক্রান্ত বা মৃত মুরগি, নাড়িভুঁড়ি ও মল পুড়িয়ে ফেলা উত্তম। তবে গভীর গর্ত করে এগুলো পুঁতে চুন বা ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে গর্ত বন্ধ করে রাখা যেতে পারে। বন্য প্রাণী যাতে এগুলো উপরে তুলে আনতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

৭. মুরগির সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে হবে এবং যে কোন ধরনের পীড়ন থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে হবে।

৮. রানীক্ষেত রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর টিকা প্রদান কর্মসূচি অনুযায়ী টিকা প্রদান করতে হবে। প্যারেন্ট স্টকে রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং মাতৃ পক্ষীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির জন্য বাংলাদেশের সকল হ্যাচারিতেই নিয়মিত এ রোগের টিকা প্রদান করা হয়ে থাকে। এর ফলে দেখা যায় সকল বাচ্চাই কিছু না কিছু মাতৃ পক্ষীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসহ জন্ম গ্রহণ করে যা কমপক্ষে ১৪ (চৌদ্দ) দিন পর্যন্ত এ রোগের জীবাণুকে প্রতিরোধ করতে পারে। জীবিত টিকাসমূহ সংরক্ষণ ও প্রয়োগের সময় খুবই সতর্ক থাকতে হয়। জীবিত টিকা চোখ, মুখ বা নাক দিয়ে প্রয়োগ করা যায়। তবে চোখ এবং নাক দিয়ে টিকা প্রয়োগের ক্ষেত্রে টিকা শোষণ হওয়ার পর বাচ্চাকে ছাড়তে হবে। অন্যথায় চোখ বা নাক থেকে টিকা পড়ে যাবে এবং টিকা প্রদান অকার্যকর হতে পারে। জীবিত টিকা সংরক্ষণের সুব্যবস্থা না থাকলে মৃত টিকা (Killed vaccine) ব্যবহার করা যেতে পারে। জীবিত টিকা প্রয়োগের ১৫ দিন পর এবং মৃত টিকা প্রয়োগের ৩০ দিন পর ব্যবহৃত টিকার কার্যকারিতা বা উৎপাদিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার পরিমাণ জেনে নিতে হবে।

রানীক্ষেত রোগের কার্যকর টিকা প্রদান কর্মসূচি দেয়া হলো-

ডিমপাড়া মুরগির জন্য রানীক্ষেত রোগের কার্যকর টিকা প্রদান কর্মসূচি

টিকা	বয়স (দিন)			
	৭-১০ দিন	২১ দিন	৩১-৩৫ দিন	১২০ দিন
জীবিত	১ ড্রপ চোখে/ মুখে	১ ড্রপ চোখে/ মুখে	-	-
মৃত	-	-	অর্ধেক মাত্রা চামড়ার নিচে	পুরা মাত্রা চামড়ার নিচে

অথবা

টিকা	বয়স (দিন)			
	৭-১০ দিন	২১ দিন	৩৫ দিন	৬০ দিন
বিসিআরডিভি	১ ড্রপ চোখে/ মুখে	১ ড্রপ চোখে/ মুখে	১ ড্রপ চোখে/ মুখে	-
আরডিভি	-	-	-	১ ডোজ চামড়ার নিচে

পরবর্তীতে প্রতি দুইমাস অন্তর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনে টিকা দিতে হবে। ব্রয়লার মুরগির জন্য রানীক্ষেত রোগের কার্যকর টিকা প্রদান কর্মসূচি

টিকা	বয়স (দিন)	
	৭-১০ দিন	২১ দিন
জীবিত	১ ড্রপ চোখে/ মুখে	১ ড্রপ চোখে/ মুখে

গবেষণায় দেখা গেছে যে, একটি জীবিত টিকা প্রদানের কমপক্ষে ৭ সোত) দিন পর অন্য একটি জীবিত টিকা প্রদান করা হলে ব্যবহৃত টিকাসমূহের ভাল কার্যকারিতা পাওয়া যায়।

সাবধানতা

ব্রয়লার মুরগিতে মৃত টিকা প্রদান করা উচিত নয়, কারণ এ টিকা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির পূর্বেই মুরগি বিক্রির উপযোগী হয়ে যায় এবং টিকা প্রয়োগের স্থানে প্রদাহ থাকায় মুরগির বাজারমূল্য কমে যায়।

প্যাকেজের উদ্ভাবক

ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ড. এম. জে. এফ. এ. তৈমুর এবং ডা. মোঃ মাসুদুর রহমান

মুরগির গামবোরো রোগ নিয়ন্ত্রণ

ভূমিকা

ইনফেকশাস বারসাল ডিজিজ বা গামবোরো প্রধানত ৩-৬ সপ্তাহ বয়সের মুরগির বাচ্চার একটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেলোয়ারি স্টেটের গামবোরো নামক স্থানে ১৯৫৭ সালে প্রথম এই রোগটি সাবকক্লিনিক্যাল অবস্থায় দেখা দেয়। পরবর্তীতে আশির দশকের প্রথমে আমেরিকা এবং ইউরোপের পোল্ট্রি খামারে এ রোগ মারাত্মক আকারে দেখা দেয়। ১৯৯২ সালে রোগটিকে প্রথম বাংলাদেশে সনাক্ত করা হয় এবং তারপর হতে প্রতিবছর পোল্ট্রি খামারে এ রোগের কারণে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এ রোগে মৃত্যুর হার শতকরা ২০-৯০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। গামবোরো রোগ দুই ভাবে খামারের ক্ষতি করে থাকে।

প্রথমত মুরগির ব্যাপক মৃত্যু ঘটিয়ে এবং দ্বিতীয়ত মারাত্মকভাবে মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উৎপন্নকারী অঙ্গসমূহ বিনষ্ট করে। ফলে আক্রান্ত মুরগি পরবর্তীতে রানীক্ষেত, কক্সিডিওসিস, সালমোনেলোসিস ও কলিবেসিলোসিসসহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়। বছরের যে কোনো সময় এ রোগ দেখা দিতে পারে, তবে আবহাওয়ার যে কোনো পরিবর্তনের ফলে যখন মুরগি পীড়নজনিত সমস্যায় ভোগে তখন এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। এ রোগ প্রতিকারের জন্য ফলপ্রসূ কোনো চিকিৎসা নাই, তবে জীব নিরাপত্তা এবং সঠিক সময়ে গুণগত মানসম্পন্ন টিকা প্রয়োগ করে সহজেই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। খামারিগণ আমদানিকৃত বিভিন্ন ধরনের গামবোরো টিকা ব্যবহার করে আসছেন। তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায় টিকা ব্যবহারের পরও কোন কোন ক্ষেত্রে এ রোগের প্রাদুর্ভাবে মুরগি মারা যাচ্ছে এবং খামারিগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। টিকা ব্যবহারের পরও খামারে কখনও কখনো গামবোরো রোগ দেখা দেয় এর কারণগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) টিকা ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারজনিত সমস্যা

- সঠিক তাপমাত্রায় টিকা সংরক্ষণ করা না হলে,
- সঠিক মাত্রায় টিকা প্রয়োগ করা না হলে,
- মাতৃপক্ষীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা অবস্থায় টিকা প্রদান করা হলে,
- টিকার গুণগতমান ঠিক না থাকলে,
- টিকা প্রদানকারীর ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব থাকলে।

(খ) মুরগির শারীরিক সমস্যা

- টিকার জীবাণুর সাথে মুরগির দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সংবেদনশীল না হলে,
- বাচ্চা নিম্নমানের হলে,
- একই ব্যাচে বিভিন্ন মাত্রার মাতৃপক্ষীয় এন্টিবডি থাকলে,
- মাত্রাতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক বিশেষ করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পর এন্টিবায়োটিক মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করা হলে তা মুরগির বেড়ে ওঠার পথে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়,
- খাদ্যে অতিরিক্ত আফলাটক্সিন এর উপস্থিতি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট করে।

গামবোরো রোগ বিস্তারের কারণ

(ক) ঘরে মুরগির ঘনত্ব বেশি হলে এবং বায়ু চলাচলের পর্যাপ্ত সুবিধা না থাকলে,
(খ) বন্য পাখি বা প্রাণী খামারে অবাধে আসা যাওয়া করলে। জীবিত টিকা প্রয়োগ করা হলে,
(গ) আদৌ টিকা প্রদান না করা, কার্যকারিতা হ্রাসপ্রাপ্ত টিকার ব্যবহার অথবা অনিয়মিত টিকা প্রদান করা হলে,

(ঘ) একই খামারে বিভিন্ন বয়সের মুরগি পালন করা হলে,

(ঙ) মাত্রাতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহার, যা মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে,

(চ) খামারে রোগ তৈরির উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভাইরাসের উপস্থিতি থাকলে,

(ছ) খাদ্যে আফলাটক্সিনের উপস্থিতি, যা মুরগির রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে,

(জ) গামবোরো রোগে আক্রান্ত বা মৃত মুরগি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সৎকার করা না হলে।

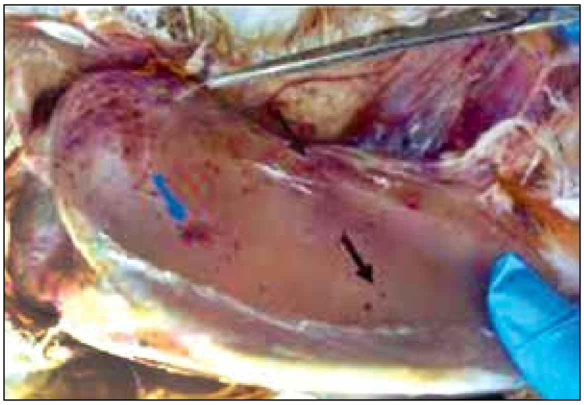

গামবোরো রোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

১. খামারে উচ্চমান সম্পন্ন জীব নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে। খামারে ব্যবহারের জন্য পৃথক কাপড় ও জুতার ব্যবস্থা করতে হবে যা জীবাণুমুক্তভাবে পরিস্কার রাখতে হবে। খামারে প্রবেশের পূর্বে কার্যকর জীবাণুনাশক দিয়ে হাত পা ভালভাবে ধৌত করতে হবে। গামবোরো ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর জীবাণুনাশক, যেমন আয়োডিন যৌগ, কমপক্ষে ৯ সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে। গুণগত মান সম্পন্ন খাদ্য ও জীবাণুমুক্ত পানি সরবরাহ করতে হবে। খামারের ভিতর এবং বাহিরের পরিবেশ পরিস্কার রাখতে হবে এবং আয়োডিন যৌগ স্প্রে করতে হবে। ম্যানেজার, সুপারভাইজার, দর্শনার্থী, ক্রেতা, শ্রমিক, খাবার সরবরাহকারী যানবাহন ও আশেপাশের অন্যান্য লোকজনের খামারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে উপর্যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সীমিত সংখ্যক লোকজনের প্রবেশের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। খামার থেকে অসুস্থ ও মৃত মুরগি দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে সৎকার করতে হবে।

২. খামারে এক বয়সের মুরগি পালন করতে হবে। অল ইন অল আউট (all in all out) পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে এই রোগ খুব ভালভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এক খামার থেকে অপর খামার কমপক্ষে ৩০০ মিটার দূরত্বে স্থাপন করতে হবে যাতে রোগজীবাণুর ক্রস ট্রান্সমিশন হতে না পারে।

৩. মুরগির স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হবে এবং সকল প্রকার পীড়ন থেকে মুক্ত রাখতে হবে। স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য পর্যাপ্ত ভিটামিন বিশেষ করে ভিটামিন সি সরবরাহ করতে হবে।

৪. পর্যাপ্ত মাতৃপক্ষীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পাওয়ার জন্য প্যারেন্ট স্টক এর এন্টিবডি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় টিকা দিতে হবে।

৫. সুস্থ বাচ্চাই কেবল পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন হতে পারে। এর জন্য সুস্থ প্যারেন্ট স্টক থেকে বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে।

৬. পোল্টি সমৃদ্ধ এলাকা, যেখানে গামবোরো রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সে সকল এলাকার ডিমপাড়া মুরগির বাচ্চাকে জীবিত টিকার সাথে মৃত টিকা দেয়া যেতে পারে। এর ফলে যদি কোনো কারণে জীবিত টিকা কার্যকর না হয় তখন মৃতটিকা গামবোরো রোগ থেকে মুরগিকে রক্ষা করবে।

ডিমপাড়া মুরগির জন্য গামবোরো রোগের কার্যকর টিকা প্রদান কর্মসূচি

টিকা	বয়স (দিন)			
	৭ দিন	১৪ দিন	২৮ দিন	৩৫ দিন
জীবিত	-	১ ড্রপ চোখে/মুখে	১ ড্রপ চোখে/মুখে	১ ড্রপ চোখে/মুখে
মৃত	অর্ধেক মাত্রা চামড়ার নিচে			

ব্রয়লার মুরগির জন্য গামবোরো রোগের কার্যকর টিকা প্রদান কর্মসূচি

টিকা	বয়স (দিন)
	১৪ দিন এবং ২৪ তম দিন
জীবিত	১ ড্রপ চোখে/মুখে

সাবধানতা

ব্রয়লারে কোনো মৃত টিকা প্রদান করা উচিত নয়, কারণ এই টিকা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির পূর্বেই মুরগি বিক্রির উপযোগী হয়ে যায় এবং টিকা প্রয়োগের স্থানে প্রদাহ হওয়ায় বাজারমূল্য কম হবে।

খামারে নতুন বাচ্চা ওঠানোর আগে মুরগির ঘর পরিষ্কার করার নিয়মাবলী

গামবোরো ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

লিটার/বিষ্ঠা বাইরে ফেলতে হবে

লিটার/বিষ্ঠাগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা জীবাণুমুক্ত করতে হবে। বিষ্ঠা ব্যবহার করে জৈবসার (কমপোস্ট) তৈরি করা যেতে পারে।

অন্যান্য দ্রব্যাদি পরিষ্কার করতে হবে/সরিয়ে ফেলতে হবে

মুরগির খাঁচা, খাবারের পাত্র, পানির পাত্র, মেঝে, দেয়াল ইত্যাদি পানির সাথে ডিটারজেন্ট মিশিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

পানি দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে

- ভালোভাবে পরিষ্কার করার জন্য উচ্চ চাপযুক্ত পানি প্রবাহ উত্তম।
- মেঝে ভিজা অবস্থায় প্রতি ১০০০ (এক হাজার) বর্গফুট জায়গার জন্য ১ কেজি ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে ৫/৬ ঘণ্টা রাখার পর পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।
- মুরগির খাঁচা, খাবারের পাত্র, পানির পাত্র, মেঝে, দেয়াল প্রভৃতি জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- গামবোরো ভাইরাস মারার জন্য ০.২-০.৫% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট বা আয়োডিন দ্রবণ ব্যবহার করা উত্তম।
- জীবাণুনাশক প্রয়োগ করার পর এক রাত্র রেখে দিতে হবে (টিন, লোহা বা তামার তৈরি পাত্রসমূহ ছাড়া)
- টিন, লোহা বা তামার তৈরি দ্রব্য সমূহ জীবাণুনাশক দেয়ার কয়েক ঘণ্টা পর ধৌত করে ফেলতে হবে।
- এরপর পানি দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করে দ্রব্যসমূহ ভালভাবে শুকাতে হবে
- আয়োডিন দ্রবণ ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- পরিশেষে মুরগির ঘর ফিউমিগেশন করতে হবে (বারো ঘণ্টা)। প্রতি ১০০০ বর্গফুট জায়গার জন্য মিশ্রণটির অনুপাত হবে, ফরমালিন ১৫০০ মিলি, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ৫০০ গ্রাম এবং পানি ৫০০ মিলি। ফিউমিগেশন শেষ হওয়ার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পর মুরগির ঘর নতুন বাচ্চা ওঠানোর জন্য প্রস্তুত হয়।

প্যাকেজের উদ্ভাবক

ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ড. এম. জে. এফ. এ. তৈমুর এবং ডা. মোঃ মাসুদুর রহমান

বাংলাদেশে গবাদিপ্রাণীর ক্ষুরারোগ দমন

ভূমিকা

ক্ষুরারোগ গবাদি প্রাণীর একটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগকে বাংলাদেশের গ্রামে ক্ষুরাচল বা বাতনাও বলা হয়। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি দ্বিখুর বিশিষ্ট প্রাণী এ রোগে আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে যে, সার্বিকভাবে গরুতে এরোগে আক্রান্তের হার শতকরা ৩৫.৫ ভাগ, মহিষে শতকরা ২৩.৩ ভাগ, এবং ছাগল/ভেড়ায় শতকরা ৫ ভাগ। এরোগে আক্রান্ত বয়স্ক প্রাণীতে মৃত্যুর হার কম হলেও মহামারী এলাকায় আক্রান্ত বাছুরের মৃত্যুর হার শতকরা ৫১ ভাগ পাওয়া গেছে। ক্ষুরারোগ এ্যাপথো-ভাইরাস নামক এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি হয়। সারাবিশ্বে এ পর্যন্ত এ ভাইরাসের ৭টি টাইপ সনাক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি টাইপের আবার অনেক সাব-টাইপ রয়েছে। এ পর্যন্ত বিশ্বে প্রায় ৭০টি সাব-টাইপ সনাক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশেও বিভিন্ন টাইপের উপস্থিতি সনাক্ত করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, বাংলাদেশে অধিকাংশ সময় বর্ষা অথবা শীতকালেই ক্ষুরারোগ হয়ে থাকে। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, বর্ষা ও শীতকালেই শুধু নয়, এদেশে প্রায় সারা বছরই ক্ষুরারোগ হয়ে থাকে। বর্ষার পর পর ক্ষুরা রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয় এবং শীতকালে ক্রমেই বেশি হয়ে বর্ষার পূর্ব পর্যন্ত সবেচ্চি অবস্থায় পৌছে। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে ব্যাপক আকারে স্মরণকালের ভয়াবহতম ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

১. গবাদি প্রাণীর মারাত্মক রোগ ক্ষুরা রোগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা সৃষ্টি হবে,

২. ক্ষুরারোগের লক্ষণ, রোগ নির্ণয় পদ্ধতি, চিকিৎসা পদ্ধতি, প্রাণী মারা গেলে করণীয়, রোগ দমন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য করণীয় সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হবে,

৩. জেলাভিত্তিক ক্ষুরারোগ ভাইরাসের বিদ্যমান টাইপ সম্পর্কে জানা যাবে, যা অতি কার্যকরী একযোজি (Monovalent) এবং বহুযোজি (Polyvalent) ইন এ্যাকটিভেটেড টিকা উদ্ভাবন এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে,

৪. ক্ষুরারোগ দমনে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

ক্ষুরারোগের লক্ষণ

১. প্রথম অবস্থায় শরীরের তাপমাত্রা (১০৪-১০৫° সে.) বৃদ্ধি পায়। মুখের ভেতরে, জিহবায়, মাড়িতে, মাজলে, দুই ক্ষুরের মাঝখানে ও দুধের বাঁটে ফোসকা উঠে। এক দিনের মধ্যেই এই ফোসকা ভেংগে গিয়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণের ফলে রোগ জটিল আকার ধারণ করে,

২. মুখ দিয়ে লালা ঝরে এবং লালা ফেনার মত হয়,

৩. পায়ের ক্ষতে মাছি বসে অনেক সময় পোকা হতে পারে,

৪. প্রাণী খেতে পারে না এবং ওজন অনেক কমে যায়,

৫. দুগ্ধবতী প্রাণীতে দুধ অনেক কমে যায়,

৬. রোগাক্রান্ত প্রাণী ১-২৬ দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠে।

৭. বাছুরের ক্ষেত্রে লক্ষণ দেখা দেয়ার আগেই বাছুর মারা যেতে পারে।

চিত্র : ক্ষুরারোগে আক্রান্ত প্রাণীর লক্ষণসমূহ

ক্ষুরারোগ নির্ণয় পদ্ধতি

রোগের ইতিহাস, ইপিডেমিওলজি ও লক্ষণ অনুযায়ী আনুমানিকভাবে ক্ষুরারোগ নির্ণয় করা যায়। তবে নিম্নলিখিতভাবে নমুনা সংগ্রহ করে বিএলআরআই বা কোনো রোগ নির্ণায়ক গবেষণাগারের মাধ্যমে ক্ষুরারোগ এবং এরোগের ভাইরাসের টাইপ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। বিএলআরআই এ ক্ষুরারোগের ভাইরাস সনাক্তকরণ এবং টাইপিং এর জন্য এলাইজা এবং কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

ক্ষুরারোগ ভাইরাস সনাক্তকরণ এবং টাইপিং

নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং রোগ-নির্ণায়ক গবেষণাগারে প্রেরণ

ক্ষুরারোগ শুরু হওয়ার প্রথম দিকে যখন শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং মুখ দিয়ে লালা ঝরা শুরু হয়, ঠিক এ সময় জিহবায় ফোসকা ওঠে। ফোসকা দুই ক্ষুরের মাঝখানেও দেখা যেতে পারে এবং পরবর্তীতে মাড়ি এবং মাজলেও উঠতে পারে। এই ফোসকা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভেংগে যায়। ফোসকা ভেংগে যাওয়ার পূর্বেই নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ভাইরাস টাইপ সনাক্ত করণের জন্য ক্ষুরারোগে আক্রান্ত গরু, মহিষ ও ছাগলের জিহবা, মাড়ি, মাজল এবং দুই ক্ষুরের মাঝখানের ফোসকা থেকে ইপিথেলিয়াল নমুনা ৫০ ভাগ বাফার্ড গ্লিসারিনে সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহের পর নমুনা ফ্রিজের ডিপ চেম্বারে (-২০°/-৮০° সেঃ) সংরক্ষণ করতে হয়। ভাইরাস সনাক্ত করণ এবং টাইপিং-এর জন্য ফ্লাক্সে বরফের মধ্যে নমুনা বিএলআরআই বা অন্য কোনো রোগ নির্ণায়ক গবেষণাগারে প্রেরণ করতে হবে।

নমুনা প্রক্রিয়াজাতকরণ

প্রতিটি নমুনা থেকে কিছু অংশ আলাদা করে ঠান্ডা ফসফেট বাফার্ড স্যালাইনে ধুয়ে পেসচল ও মোরটারে পিশে একই স্যালাইনে ১০% সাসপেনসন তৈরি করা হয়। এর পর উক্ত সাসপেনসন এর সাথে সমপরিমাণ ক্লোরোফরম মিশ্রিত করে ৩৫০০ আরপিএম-এ ১৫ মিনিট সেন্ট্রিফিউজ করা হয়। তারপর ভাইরাস টাইপিং এর জন্য সুপারন্যাটেন্ট সংগ্রহ করা হয়।

ভাইরাস টাইপিং : কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন পরীক্ষা

এ পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত প্রধান উপাদানগুলো হলোঃ প্রক্রিয়াজাতকৃত নমুনা (এন্টিজেন), টাইপ A, O, C, Asia-1 এবং A22 এর বিরুদ্ধে এন্টিসিরা, কমপ্লিমেন্ট, ভেড়ার RBC এবং ভেড়ার RBC এর বিরুদ্ধে এন্টিসিরাম (হিমোলাইসিন)। পরীক্ষায় ব্যবহারের জন্য হিমোলাইসিন এর মূল টাইটার (৪৮০০) এর ৪ গুণ ক্ষমতার হিমোলাইসিন, অর্থাৎ ১:১২০০ ডাইলুশনের হিমোলাইসিন ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষার সময় মূল এন্টিসিরামসমূহ ১:১০০ এবং মূল কমপ্লিমেন্ট ১:২৫ ডাইলুশন করে ব্যবহার করা হয়। প্রথমে প্রতিটি টাইপের এন্টিসিরামের জন্য দুটি করে টিউব অথবা মাক্রোটাইটার প্লেটে দুটি করে গর্ত চিহ্নিত করা হয়। এর পর এন্টিজেন এবং কমপ্লিমেন্ট কনট্রোল এর জন্য একটি করে টিউব বা প্লেটে গর্ত চিহ্নিত করা হয়। পরীক্ষা শুরুর পূর্বে ভেড়ার রক্ত সংগ্রহ করার পর RBC পৃথক করে পরপর কয়েক বার ধৌত করা হয় এবং স্যালাইনে ১:১ অনুপাতে সাসপেনশন তৈরি করা হয়।

উক্ত RBC সাসপেনশন থেকে আবার স্যালাইনে ৪% সাসপেনশন তৈরি করা হয়। তারপর হিমোলাইসিন (১:১২০০ ডাইলুশন) সমপরিমাণ ৪% RBC এর সংগে মিশিয়ে হিমোলাইটিক সিস্টেম তৈরি করে ৩৭° সেঃ তাপমাত্রায় ৩০ মিঃ রাখা হয়। প্রতিটি চিহ্নিত টিউবে অথবা প্লেটের গর্তে প্রথমে স্যালাইন নিয়ে পরিমাণ মত এন্টিজেন, এন্টিবডি এবং কমপ্লিমেন্ট যোগ করা হয়। এন্টিজেন কনট্রোলে শুধু স্যালাইন ও এন্টিজেন,

এবং কমপ্লিমেন্ট কনট্রোলে শুধু স্যালাইন ও কমপ্লিমেন্ট দেয়া হয়। তারপর ৩৭° সেঃ তাপমাত্রায় ৩০ মিঃ রাখা হয়। পরে সমস্ত টিউব বা গর্তে হিমোলাইটিক সিস্টেম যোগ করে ৩৭° সেঃ তাপমাত্রায় ৩০ মিঃ রাখা হয়। ফলাফল যেভাবে রেকর্ড করা হয় তা হলো- যদি RBC টিউব বা প্লেটের গর্তের তলায় হিমোলাইসিস না হয়ে জমা হয়ে থাকে তাহলে তাকে পজিটিভ ধরা হয়, আর RBC হিমোলাইসিস হওয়াকে নেগেটিভ বলা হয়। RBC হিমোলাইসিস বা তলায় জমা না হলে- এ অবস্থাকে এন্টিকমপ্লিমেনটারি বলা হয়। এন্টিজেন কনট্রোলে কোন হিমোলাইসিস না হলে হিমোলাইটিক সিসটেমের উপর প্রক্রিয়াজাতকৃত নমুনার কোন প্রতিক্রিয়া নেই বলে ধরে নেয়া হয়। কমপ্লিমেন্ট কনট্রোলে হিমোলাইসিস হওয়া প্রমাণ করে যে ব্যবহৃত কমপ্লিমেন্ট কার্যকর।

এলাইজা পরীক্ষা

ভাইরাস টাইপিং এর জন্য ইনডাইরেক্ট স্যানডউইচ এলাইজা পদ্ধতিও ব্যবহার করা যায়। যুক্তরাজ্য থেকে আমদানিকৃত কিট (ELIEA kit) এর সাথে সরবরাহকৃত প্রস্তুত প্রণালী সামান্য পরিবর্তন করে ELISA পরীক্ষা করা হয়। স্যানডউইচ এলাইজায় ব্যবহৃত প্রধান উপাদানগুলো হল : প্রক্রিয়াজাতকৃত নমুনা (এন্টিজেন); দুই ধরনের এন্টিসিরা- প্রথমটি খরগোশে তৈরি ভাইরাস টাইপ A, O, C, Asia-1 এবং A22--এর বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়টি একই টাইপ সমূহের বিরুদ্ধে গিনিপিগে তৈরি; এনজাইম সংযুক্ত এন্টিবডি (কনজুগেট); সাবসট্রেট এবং স্টপিং সলিউশন। পরীক্ষার জন্য প্রতিটি টাইপের এন্টিসিরামের জন্য একটি এলাইজা প্লেটে গর্ত চিহ্নিত করা হয়। অতপর খরগোসে তৈরি এন্টিসিরার বিভিন্ন টাইপগুলো দিয়ে এলাইজা প্লেটের সংশ্লিষ্ট গর্তগুলো ৩৭° সেঃ তাপমাত্রায় ১ ঘণ্টা রেখে কোট করা হয়। তারপর প্লেটের গর্তগুলি নিয়মাফিক ধুয়ে প্রক্রিয়াজাতকৃত নমুনা (এন্টিজেন) যোগ করে একই তাপমাত্রায় এক ঘণ্টা রাখা হয়। পুনরায় গর্তগুলো ধুয়ে গিনিপিগে তৈরি বিভিন্ন টাইপ এর এন্টিসিরা সংশ্লিষ্ট গর্তগুলোতে যোগ করে একই তাপমাত্রায় ১ ঘণ্টা রাখা হয়। এরপর প্লেট ধুয়ে হর্স রেডিসপারঅক্সিডেস সংযুক্ত এন্টিগিনিপিগ ওমএ (কনজুগেট) সমস্ত গর্তে প্রয়োগ করে একই তাপমাত্রায় ১ ঘণ্টা রাখা হয়। প্লেটটি আবার ধুয়ে টিস্যু পেপারের উপর পানি ঝরিয়ে শুষ্ক করা হয় এবং শেষে সমস্ত গর্তে সাবস্ট্রেট যোগ করে রুম তাপমাত্রায় অন্ধকারে ১৫ মিঃ রাখা হয়। এরপর পরিমাণমত স্টপিং সলিউশন দিয়ে রিঅ্যাকশন বন্ধ করা হয়। ইটের মত লাল রং ধারণকারী গর্তসমূহ পজিটিভ রিঅ্যাকশন নির্দেশ করে।

বাংলাদেশে সনাক্তকৃত ক্ষুরারোগ ভাইরাসের টাইপ ও সাব-টাইপ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত গরু, মহিষ ও ছাগলের নমুনা থেকে কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন এবং এলাইজা প্রযুক্তির মাধ্যমে ভাইরাস টাইপিং ও সাব- টাইপিং করার পর দেশে এ পর্যন্ত ৪টি টাইপ (O, A, C, Ges Asia-1) এবং একটি সাব টাহপ (A22) সনাক্ত করা হয়েছে। এই প্রথম বাংলাদেশে জেলা ভিত্তিক ভাইরাস সনাক্ত করণ এবং টাইপিং করা হয়েছে যার ফলাফল সারণী-১ এ দেখানো হলো। সাব টাইপ A22 দেশে প্রথম সনাক্ত করা হয়। এখানে উল্লেখ যে, বিজ্ঞানীদের মতে সাব টাইপ A22 একটি পৃথক টাইপ হিসাবে দেখা দিচ্ছে। টাইপ C অনেক দিন পর আবার সনাক্ত করা হয়। ভাইরাস টাইপ গুলোর মধ্যে O টাইপের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি এবং বেশিরভাগ জেলায় পাওয়া গেছে। তারপরই অংরধ-১ টাইপের অবস্থান। জেলাভিত্তিক ভাইরাস সনাক্তকরণের এই ফলাফল অতি কার্ষকরী একযোজী (Monovalent) এবং বহুযোজী (Polyvalent) ইনএ্যাকটিভেটেড টিকা উদ্ভাবন এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ক্ষুরা রোগ ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য হলো যে, এক টাইপের দ্বারা তৈরি ভ্যাকসিন অন্য টাইপকে প্রতিরোধ করতে পারে না। এ কারণেই ক্ষুরারোগ দমন করা কিছুটা সমস্যা বহুল ব্যাপার। কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন পরীক্ষায় এন্টিকমপ্লিমেনটারি প্রতিক্রিয়া প্রায় সময়ই পাওয়া যায়। কিন্তু এলাইজা পদ্ধতিতে এধরনের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়না। তুলনামূলক গবেষণায় দেখা গেছে যে, এফএমডি ভাইরাস সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে এলাইজা পদ্ধতি কমপ্লিমেন্ট ফিক্রোশনের চেয়ে ১.৫ গুণ বেশি সংবেদনশীল।

সারণি ১ : বিএলআরআই কর্তৃক জেলাভিত্তিক সনাক্তকৃত ক্ষুরারোগ ভাইরাসের টাইপ ও সাব-টাইপ

বিভাগ	জেলার নাম	ক্ষুরারোগ ভাইরাসের টাইপ ও সাব-টাইপ				
		A	O	C	Asia-1	A22
ঢাকা	ঢাকা		+			
	ময়মনসিং	+	+			
	নরসিংদী		+			
	মানিকগঞ্জ		+	+		
	গাজীপুর (টংগী)				+	

বিভাগ	জেলার নাম	ক্ষুরারোগ ভাইরাসের টাইপ ও সাব-টাইপ				
		A	O	C	Asia-1	A22
রাজশাহী	রংপুর		+			
	দিনাজপুর		+			
	লালমনিরহাট		+			
	গাইবান্ধা		+			
	কুড়িগ্রাম		+	+		
	বগুড়া					
	জয়পুরহাট	+	+			
	নওগাঁ		+			
	নাটোর		+		+	
	রাজশাহী			+	+	
	পাবনা		+			
	সিরাজগঞ্জ		+		+	
খুলনা	খুলনা		+	+		+
	বাগেরহাট			+		+
	যশোর		+			
বরিশাল	বরিশাল		+		+	
	পিরোজপুর		+			
	বরগুনা				+	
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা		+			+
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া		+		+	
	ফেনী				+	
	কক্সবাজার	+				+
সিলেট	সিলেট	+	+	+		

চিকিৎসা পদ্ধতি

ক্ষুরারোগ ভাইরাসজনিত রোগ হওয়ায় এর জন্য নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। তবে প্রাণীকে দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য সহায়ক চিকিৎসা দেয়া প্রয়োজন যার ফলে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

১. সোডিয়াম আয়োডাইড মিশ্রিত পানি (প্রায় ০.০০১%, এক লিটার পানিতে সোডিয়াম আয়োডাইড) দিয়ে মুখ এবং পায়ের ক্ষত ধুয়ে ফেলতে হবে,
২. এছাড়া ধোয়ার জন্য কপার সালফেট বা তুঁতে ১% সলিউশন অথবা ফিটকিরি বা এলাম ২-৪% অথবা খাবার সোডা ৪% অথবা সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ০.১-৫% ব্যবহার করা যেতে পারে,
৩. পায়ের এবং মুখের ক্ষত দৈনিক ৩ বার ধোয়ানো উচিত,
৪. মুখ ধোয়ার পর বোরো গ্লিসারিন ৪% অথবা বোরাক্স গ্লিসারিন ২-৪% লাগানো যায়। গ্লিসারিনের পরিবর্তে মধু বা নারিকেল তেল সমপরিমাণ ব্যবহার করা যাবে,
৫. পায়ের ক্ষতের জন্য পা ধোয়ার পর এন্টিবায়োটিক বা সালফার ড্রাগস জাতীয় পাউডার লাগাতে হবে,
৬. এরপর ক্ষতে তারপিন তেল লাগিয়ে দিলে মাছি বসবে না এবং পোকা ধরবে না,
৭. সম্ভব হলে এন্টিবায়োটিক বা সালফার ড্রাগস জাতীয় ইনজেকশন প্রয়োগ করলে ভাল হয়। এর ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে এবং প্রাণী দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে পারে।

অন্যান্য করণীয়

১. রোগাক্রান্ত প্রাণীকে সুস্থ প্রাণী থেকে আলাদা রাখতে হবে এবং মাঠে চড়ানো যাবে না,
২. প্রাণীকে সব সময় শুকনো জায়গায় রাখতে হবে,
৩. মুখের ক্ষত ভাল না হওয়া পর্যন্ত নরম খাদ্য খাওয়ান উচিত,
৪. প্রাণীর আবাসস্থল পটাসিয়াম পারম্যাংগানেট সলিউশন (০.০১%) অথবা আইওসান (১-৩%) অথবা কাপড় কাচা সোডা বা সোডিয়াম বাইকার্বনেট (৪%) সলিউশন দিয়ে পরিস্কার করতে হবে,
৫. অসুস্থ প্রাণীর বিছানা, খাদ্যের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে,
৬. যে সকল লোক অসুস্থ প্রাণীকে পরিচর্যা করবে তাদের কাপড়-চোপড় গরম পানিতে বা কাপড় কাচা সোডা দিয়ে পরিস্কার করা উচিত।

ক্ষুরারোগে প্রাণী মারা গেলে করণীয়

কোন প্রাণী ক্ষুরারোগে মারা গেলে দূরে একটি গভীর গর্ত খুঁড়ে মৃত প্রাণীকে রেখে তার উপর কাপড় কাচা সোডা বা পটাসিয়াম পারম্যাংগানেট মিশ্রিত পানি (০.০১%) ছিটিয়ে দিয়ে পুতে ফেলতে হবে, অথবা মৃত প্রাণীকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ক্ষুরারোগ দমন ব্যবস্থা

১. ক্ষুরারোগের জন্য ইনএ্যাকটিভেটেড ভ্যাকসিন ব্যবহৃত হয়। রোগ প্রতিরোধের জন্য গবাদি প্রাণীতে বছরে ২ বার ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে বহুযোজী (Polyvalent) ভ্যাকসিন দরকার অর্থাৎ আমাদের দেশে ভাইরাসের যে ৪টি টাইপ এবং ১টি সাব-টাইপ সনাক্ত করা হয়েছে তাদের সকলের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে।
২. কোন এলাকায় ক্ষুরারোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে সে এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করার পর ভাইরাস টাইপ নির্ণয় করে এ এলাকার সকল সুস্থ প্রাণীকে (দ্বি ক্ষুরাবিশিষ্ট) এবং চারপাশের সমস্ত সংবেদনশীল প্রাণীকে নির্ণীত ভাইরাস টাইপ এর বিরুদ্ধে একযোজি (Monovalent) ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে যাতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেদ করে রোগ অন্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে না পারে। এ সময় এ এলাকা এবং বাইরের এলাকার মধ্যে প্রাণী চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা প্রয়োজন এবং সম্ভব হলে মানুষ চলাচলের উপরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা দরকার।
৩. দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সংবেদনশীল সব প্রাণীকে ভ্যাকসিন দিয়ে প্রতিরোধ ব্যূহ তৈরি করা দরকার। এতে সীমান্তের পার্শ্ববর্তী দেশের ভাইরাস টাইপ জেনে সেই টাইপ বা টাইপ সমূহের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশের সংগে আঞ্চলিক সহযোগিতার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।
৪. পার্শ্ববর্তী দেশের কোন প্রাণী দেশে প্রবেশ করানোর জন্য কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা নিতে হবে। রোগাক্রান্ত প্রাণী দেশে যাতে প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।
৫. কোন প্রাণী বিদেশ থেকে দেশে প্রবেশ করার মুহূর্তে কোয়ারেন্টাইন করে অন্তত ৭-১৪ দিন পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ অবস্থায় রোগের উদ্ভব না হলে দেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। তবে এ কাজগুলো অবশ্যই রেজিস্টার্ড প্রাণী চিকিৎসক কর্তৃক সম্পন্ন করতে হবে।

প্রযুক্তি ব্যবহারে লাভ-ক্ষতি

বর্তমান প্রযুক্তি ক্ষুরারোগ দমনের ব্যাপারে একটি প্যাকেজ পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্ষুরারোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে গবাদি প্রাণীর উৎপাদন (মাংস, দুধ, চামড়া, ইত্যাদি) যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে পারে, যার মাধ্যমে কৃষকের উন্নতিসহ দারিদ্রবিমোচন কর্মসূচি সফল হয়ে দেশের

কোন ঋতুতে কোন অঞ্চলে ব্যবহারযোগ্য

বর্তমান প্রযুক্তি বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলে সব ঋতুতেই ব্যবহারযোগ্য।

প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা/বিশেষ পরামর্শ

বর্তমান প্রযুক্তি প্যাকেজ মনোযোগসহকারে পাঠ করে ক্ষুরারোগ দমন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

প্যাকেজের উদ্ভাবক

ড. শাহ মোঃ জিকরুল হক চৌধুরী, ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান এবং ড. কাজী মোঃ কমর উদ্দিন

পিপিআর রোগ দমনে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

পিপিআর ছাগলের একটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ। প্রাদুর্ভাব এলাকায় শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত ছাগল এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের মৃত্যুর হার শতকরা ৫০-৮০ ভাগ। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সব বয়সের ছাগল এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে, তবে এক বছর পর্যন্ত বয়সের ছাগল এ রোগে অতিমাত্রায় আক্রান্ত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে বাংলাদেশে পিপিআর রোগে বার্ষিক মৃত্যুর হার শতকরা ১১ ভাগ। সে অনুযায়ী ১৯৯৯ সালের তথ্যসূত্রে বাংলাদেশে পিপিআর রোগে প্রতিবছর ২২০ কোটি টাকার ক্ষতি হয় শুধুমাত্র মৃত্যুর কারণে। সুতরাং ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পিপিআর রোগ দমন করা জরুরি।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

১. ছাগলের মারাত্মক রোগ পিপিআর সম্পর্কে সম্যক ধারণা সৃষ্টি হবে,

২. পিপিআর রোগের লক্ষণ, রোগ নির্ণয় পদ্ধতি, চিকিৎসা পদ্ধতি, আক্রান্ত ছাগলে এবং ছাগল মারা গেলে করণীয় এবং রোগ দমন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হবে,

৩. পিপিআর ভ্যাকসিন পরিবহন, সংরক্ষণ এবং ভ্যাকসিন প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হবে

৪. পিপিআর প্রতিরোধে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

চিত্র : পিপিআর এ আক্রান্ত ছাগলের ডায়রিয়া

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

পিপিআর রোগের লক্ষণসমূহ

১. সুপ্তিকাল সাধারণত ৪-৫ দিন, তবে সর্বনিম্ন ৩ দিন থেকে সর্বোচ্চ ১০ দিন পর্যন্ত হতে পারে,

২. ছাগলের শরীরের তাপমাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় (১০৫°-১০৭° ফাঃ),

৩. আক্রান্ত ছাগল মাথা নিচু করে ঝিমায়,

৪. আক্রান্ত ছাগলের নাক, চোখ এবং মুখ দিয়ে প্রথমে পানির মতো তরল পদার্থ বের হয়, পরে তা গাঢ় ও হলুদ বর্ণ ধারণ করে। পরবর্তীতে এ তরল পদার্থ শুকিয়ে গিয়ে চোখ ও নাক বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং আক্রান্ত ছাগলে শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে,

৫. আক্রান্ত ছাগল খাওয়া-দাওয়া কম করে এবং রোগের মাত্রা অধিক হলে আক্রান্ত ছাগল খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিতে পারে,

৬. আক্রান্ত ছাগলের মাড়িতে, মুখের ভেতরে, চোয়ালে এবং জিহবায় ঘা হয়। এছাড়াও নাক, ভালভাসহ যোনিনালীর মধ্যেও ঘা হতে পারে।

৭. পরবর্তীতে নিউমোনিয়া দেখা দেয় এবং কাশিও হতে পারে,

৮. দুর্গন্ধযুক্ত পানির মতো ডায়রিয়া হয়, যা অনেক সময় রক্ত মিশ্রিত হতে পারে,

৯. পিপিআর রোগ হলে আক্রান্ত ছাগলে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যান্য রোগ জীবাণুর সংক্রমণের (Secondary infection) ফলে রোগ জটিল আকার ধারণ করে।

১০. উপযুক্ত চিকিৎসা না দিলে পিপিআর রোগে আক্রান্ত ছাগল ৪-১০ দিনের মধ্যে মারা যেতে পারে।

পিপিআর রোগ নির্ণয় পদ্ধতি

রোগের ইতিহাস, ইপিডেমিওলজি, লক্ষণ এবং ময়না তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী আনুমানিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়। তবে নিম্নলিখিতভাবে নমুনা সংগ্রহ করে বিএলআরআই বা কোনো রোগ নির্ণায়ক গবেষণাগারের মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষা করে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। বিএলআরআই-এ পিপিআর রোগ নির্ণয়ের জন্য এলাইজা, নিউট্রালাইজেশন, আগারজেল প্রিসিপিটেশন এবং আরটি-পিসিআর পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং রোগ-নির্ণায়ক গবেষণাগারে প্রেরণ

চোখ, নাকের এক্সুডেট (Eyes, Nasal discharge) পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত বোতলে বা কটনসোয়াবের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে। অন্যান্য নমুনা যেমন, লিম্ফনোড (Lymphnode), ইসপ্লীহা (Spleen), ফুসফুস (Lungs), জেব্রা চিহ্নযুক্ত অন্ত্রনালী (Zebra stripe in intestine), ইত্যাদি পরিষ্কার প্লাস্টিক জারে সংগ্রহ করা যেতে পারে। নমুনা সংগ্রহ করার পর ২০° সেঃ থেকে ৮০° সেঃ এ সংরক্ষণ করতে হবে। নতুন Disposable সিরিঞ্জ ও সুচের মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহ করে ১-২ ঘণ্টা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখার পর সিরাম পৃথক করে ছোট পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত বোতলে বা অন্য কোনো নতুন Disposable সিরিঞ্জে সংগ্রহ করা যায়। সিরাম সংগ্রহ করার পর ফ্রিজের ডিপ চেম্বারে (০° সেঃ থেকে -২০° সেঃ পর্যন্ত তাপমাত্রায়) সংরক্ষণ করতে হবে। তারপর ফ্লাস্কে বরফের মধ্যে বিএলআরআই বা অন্য কোনো রোগ নির্ণায়ক গবেষণাগারে নিশ্চিতভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

আক্রান্ত ছাগলের চিকিৎসা ব্যবস্থা

উপরোক্ত লক্ষণগুলো ছাগলে দেখা দেয়ার সাথে সাথে অসুস্থ ছাগলকে সুস্থ ছাগল থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে। পিপিআর ভাইরাসজনিত রোগ হওয়ায় এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। তবে লক্ষণ অনুযায়ী এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নিম্নে বর্ণিত চিকিৎসা দেয়া যেতে পারে :

১. দীর্ঘ কার্যকর (লংএক্টিং) এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে ৩ দিন পর এন্টিবায়োটিক পুনরায় প্রয়োগ করতে হবে।

২. পাতলা পায়খানা হলে প্রচুর পরিমাণে খাবার স্যালাইন অথবা হাতে বানানো গুড় ও লবণ মিশ্রিত স্যালাইন খাওয়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে বড় ছাগলের জন্য স্ট্রিনাসিন ট্যাবলেট (৫ গ্রাম) চার (৪) ভাগ করে তার এক (১) ভাগ দিনে দুই (২) বার এবং বাচ্চা ছাগলের জন্য উক্ত ট্যাবলেট আট (৮) ভাগ করে তার এক (১) ভাগ দিনে দুই (২) বার ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে। এর সাথে মেট্রোনিডাজোল জাতীয় ঔষধ (যেমন ফ্লাজিল, ৪০০ মিঃ গ্রাঃ ট্যাবলেট) দিনে দুই (২) বার করে বড় ছাগলের জন্য এবং বাচ্চা ছাগলের জন্য অর্ধেক ট্যাবলেট দিনে দুই (২) বার করে ৩-৫ দিন খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

৩. ইম্মিউন সিরাম-এন্টিবায়োটিক সমন্বিত চিকিৎসাঃ পিপিআর রোগ থেকে সেরে ওঠা অথবা টিকা প্রদানকৃত ছাগল থেকে (রোগ নিরাময় বা টিকা প্রদানের ২১-২৮ দিন পর) জীবাণুমুক্ত অবস্থায় রক্ত সংগ্রহ করে কমপক্ষে ১ ঘণ্টা সাধারণ তাপমাত্রায় রাখতে হবে যাতে রক্ত ভালোভাবে জমাট বাঁধে। এরপর খুব সাবধানে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে সিরাম পৃথক করে পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত বোতলে অথবা নতুন জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জে রাখা যেতে পারে। ইম্মিউন সিরাম ০° সেঃ বা এর কম তাপমাত্রায় ৭ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এই সিরাম পিপিআর রোগে আক্রান্ত ছাগলে দৈনিক ১০ সিসি করে শিরায় পর পর তিন দিন প্রয়োগ করতে হবে। এর পাশাপাশি উপরোক্ত এন্টিবায়োটিকসহ অন্যান্য চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। অন্যান্য সুস্থ ছাগল যেগুলো আক্রান্ত ছাগলের সংস্পর্শে ছিল তাদেরকে শুধুমাত্র সিরাম-এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে। ভালো ফল পেতে হলে মানসম্মত সিরাম, সম্ভব হলে সদ্য সংগৃহীত সিরাম ব্যবহার করতে হবে। ভালো ফল পেতে হলে মানসম্মত সিরাম, সম্ভব হলে সদ্য সংগৃহীত সিরাম ব্যবহার করতে হবে। ঘোলাটে বা অস্বচ্ছ সিরাম কোনো অবস্থাতেই ব্যবহার করা যাবে না। অল্প উষ্ণ (৩৫°-৩৭° সেঃ) সিরাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শিরায় প্রয়োগ করতে হবে, অন্যথায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

আক্রান্ত ছাগলে করণীয়

১. অসুস্থ ছাগলকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুষম খাদ্য দিতে হবে। রোগ সেরে ওঠার সাথে সাথে ভিটামিন-মিনারাল ইনজেকশন দিলে ভাল হয়।

২. আক্রান্ত ছাগলকে কোনো অবস্থায় ঠান্ডা লাগানো যাবে না। এদেরকে ঝড়-বৃষ্টির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং শুকনো জায়গায় রাখতে হবে।

৩. অসুস্থ ছাগল মাঠে চরানো যাবে না এবং ঘরে রেখে খাওয়াতে হবে। অসুস্থ ছাগল বাজারে নেয়া বা অন্য কোনো জায়গায় স্থানান্তর করা পরিহার করতে হবে।

৪. ছাগলের ঘরের মেঝে পরিষ্কার রাখা উচিত এবং সতর্কতার সাথে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা দরকার। আক্রান্ত ছাগলের মল-মুত্র ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ভাইরাসমুক্ত করে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।

চিত্রঃ সুস্থ ছাগলের পাল

ছাগল মারা গেলে করণীয়

কোনো ছাগল পিপিআর রোগে মারা গেলে দূরে একটি গভীর গর্ত (প্রায় ৬ ফুট গভীর) খুঁড়ে মৃত ছাগলকে রেখে তার ওপর ব্লিচিং পাউডার বা চুন দিয়ে পুঁতে ফেলতে হবে, অথবা মৃত ছাগলকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

রোগ দমন ব্যবস্থা

সময়মতো পূর্ব থেকে ভ্যাকসিন প্রয়োগের মাধ্যমে ছাগলকে পিপিআর রোগের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। পিপিআর ভ্যাকসিন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এ উদ্ভাবনের পর মহাখালিস্থ প্রাণিসম্পদ গবেষণাগারে অধিক মাত্রায় উৎপাদন করা হচ্ছে। পিপিআর রোগের টিকা একবার প্রয়োগের ফলে সাধারণত ৩ বছর প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে। এছাড়া রোগ দমনের জন্য নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবেঃ

১. মাঠ পর্যায় থেকে পিপিআর রোগের ত্বরিত রিপোর্টিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।
২. ত্বরিত রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. চিকিৎসা এবং অন্যান্য করণীয় ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।
৪. পিপিআর রোগে আক্রান্ত ছাগলে করণীয় ব্যবস্থাগুলো পালন করতে হবে। কোনো এলাকায় পিপিআর রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে উক্ত এলাকার চতুর্দিকে সুস্থ ছাগলের ভ্যাকসিন প্রয়োগ (Ring Vaccination) করে স্থানীয়ভাবে রোগ ওপ্রতিরোধ করতে হবে, যাতে করে রোগ অন্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে না পারে।
৫. নতুন ছাগল কেনার সময় কতগুলো সাধারণ বিষয় মেনে চলতে হবে, যা নিচে বর্ণনা করা হয়েছে।

পিপিআর ভ্যাকসিন প্রদানের নির্দেশিকা

ভ্যাকসিন পরিবহন

উৎপাদন কেন্দ্র থেকে ভ্যাকসিন অবশ্যই ভ্যাকসিন ফ্লাস্কে বরফ দিয়ে অথবা ভ্যাকসিন বহনকারী কুল ভ্যানে অন্য স্থানে বহন করতে হবে।

ভ্যাকসিন সংরক্ষণ

১. ভ্যাকসিন ০° সেঃ বা এর কম তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে।
২. ভ্যাকসিন ডায়লুয়েন্ট পরিষ্কার, শুকনো জায়গায়, সূর্য্যের আলো থেকে দূরে সংরক্ষণ করতে হবে। ভ্যাকসিন গুলানোর ২৪ ঘণ্টা পূর্বে ডায়লুয়েন্ট ৪° সেঃ তাপমাত্রায় রাখতে হবে। তবে ফাংগাস জন্মালে বা ডায়লুয়েন্ট অস্বচ্ছ হলে, তা অবশ্যই ব্যবহার করা যাবে না।

টিকা (ভ্যাকসিন) প্রদান পদ্ধতি

১. কোনো এলাকায় একটি টিকাদান কর্মসূচি পূর্ব থেকে আয়োজন করে এক দিন পূর্বে কৃষকদেরকে এ কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং পরের দিন ভ্যাকসিন প্রয়োগ না করা পর্যন্ত ছাগল তাদের বাড়িতে রাখার জন্য বলতে হবে। পরের দিন কৃষকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাগলকে ভ্যাকসিন প্রদান করতে হবে।
২. প্রথমে ১০০ সিসি ডায়লুয়েন্ট থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে ১ সি.সি. ডায়লুয়েন্ট নিয়ে ভ্যাকসিন ভালোভাবে গুলাতে হবে। তারপর উক্ত গুলানো ভ্যাকসিন ১০০ সিসি ডায়লুয়েন্ট বোতলে স্থানান্তর করে ভালোভাবে মিশাতে হবে এবং ফ্লাস্কে বরফের মধ্যে রাখতে হবে।
৩. প্রতি ছাগলে ১ মি.লি. মাত্রায় কাঁধের চামড়ার নিচে এই টিকা প্রদান করতে হবে।
৪. ছাগল গর্ভাবস্থায় থাকলে শেষ তিন সপ্তাহে টিকা প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
৫. ছাগলের বাচ্চার বয়স ৪ মাস হলে তাদেরকে অবশ্যই ভ্যাকসিন দিতে হবে। প্রাথমিকভাবে ২ মাস বয়স হলেও ভ্যাকসিন প্রদান করা যেতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রে ৬ মাস পর বোস্টার ডোজ দিতে হবে।
৬. গুলানো ভ্যাকসিন এক ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার করতে হবে এবং তা অবশ্যই ফ্লাস্কে বরফের মধ্যে রাখতে হবে। কোনো অবস্থাতেই ভ্যাকসিন ও গুলানো ভ্যাকসিন সূর্যালোকে রাখা যাবে না। ভ্যাকসিন প্রয়োগের সময়ও সূর্য্যের আলো পরিহার করতে হবে।
৭. পিপিআর-এ আক্রান্ত কোনো ছাগলকে এবং যে সমস্ত ছাগল আক্রান্ত ছাগলের সংস্পর্শে ছিল তাদের টিকা দেয়া যাবে না। পিপিআর আক্রান্ত এলাকার চতুর্দিকে সুস্থ ছাগলকে Ring vaccination এর আওতায় এনে টিকা প্রদান করতে হবে।

সতর্কতা

১. অসুস্থ বা পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত ছাগলকে পিপিআর ভ্যাকসিন না দেয়াই উত্তম।

২. একত্রে রাখা সব ছাগলকে এক সাথে টিকা প্রদান করতে হবে।

৩. ছাগল ক্রয়ের পূর্বে অবশ্যই ফার্মের বা এলাকার সব ছাগলকে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে ছাগল ক্রয় করতে হবে।

৪. ফার্মে কোনো নতুন ছাগল ক্রয় করলে অন্তত ১৪ দিন পর্যবেক্ষণে (Quarantine Observation) রেখে শুধুমাত্র রোগমুক্ত ছাগলকে টিকা প্রদান করতে হবে। কেনার ৭ দিনের মাথায় প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে।

৫. ভ্যাকসিন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নতুন জীবাণুমুক্ত disposable syringe এবং needle ব্যবহার করতে হবে।

৬. কৃষকের খামারে ভ্যাকসিন প্রদানের পর ১০ (দশ) দিনের মধ্যে কোনো ছাগল পিপিআর রোগে আক্রান্ত হলে ভ্যাকসিনের গুণগত মান ঠিক ছিল না বলা যাবে না। এ ক্ষেত্রে, প্রাথমিক ভাবে ছাগল ভ্যাকসিন দেয়ার পূর্বেই পিপিআর রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

সাধারণ লক্ষণীয় বিষয়

ছাগলের খামার স্থাপন করার পূর্বে কতগুলো বিষয় সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন হওয়া কর্তব্য, অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা রয়েছে। খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ছাগল বাজার থেকে না কিনে গ্রাম থেকে ক্রয় করা উচিত। এজন্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে খোজ নিয়ে পিপিআর ভ্যাকসিন করা গ্রাম থেকে অথবা পিপিআর অনাক্রান্ত এলাকা থেকে ছাগল ক্রয় করা উচিত। পিপিআর আক্রান্ত এলাকা থেকে কোনোভাবেই ছাগল কেনা ঠিক নয়। ছাগল কেনার পর দুই সপ্তাহ একটি আলাদা শেডে সার্বক্ষণিক নজরে রাখতে হবে। কেনার ৭ দিনের মাথায় প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। দুই সপ্তাহের মাথায় সুস্থ ছাগলে পিপিআর ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে।

প্রযুক্তি ব্যবহারে লাভ-ক্ষতি

বর্তমান প্রযুক্তি পিপিআর রোগ দমনের ব্যাপারে একটি প্যাকেজ পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে পিপিআর রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে ছাগল উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে পারে, যার মাধ্যমে খামারিদের উন্নতি হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হতে পারে।

কোন ঋতুতে কোন অঞ্চলে ব্যবহারযোগ্য

বর্তমান প্রযুক্তি বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে সকল ঋতুতেই ব্যবহারযোগ্য।

প্রযুক্তি ব্যবহারের সতর্কতা/বিশেষ পরামর্শ

১. ছাগলের খামার প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে বর্তমান প্রযুক্তি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করে জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে।

২. উল্লেখিত পরামর্শ মোতাবেক ছাগল সংগ্রহ করে পিপিআর প্রতিরোধের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

প্যাকেজ প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. শাহ মোঃ জিকরুল হক চৌধুরী, ড. এম. জে. এফ. এ. তৈমুর, ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান এবং ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম।

গবাদিপ্রাণীর কৃমি রোগ দমন মডেল
(কৌশলগত গবাদি প্রাণীর পরজীবী নিয়ন্ত্রণ মডেল)

ভূমিকা

গবাদি প্রাণী যেমন গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার বিভিন্ন ধরনের রোগের মধ্যে পরজীবী একটি দীর্ঘ মেয়াদি ক্ষতিকর রোগ। রোগটি ধীরে ধীরে প্রাণীদেহে সংক্রামিত হয় বলে খামারি প্রথমে বুঝতে পারে না, রোগটি জটিল আকার ধারণ করলে বিভিন্ন লক্ষ্যণের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে পরজীবী জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু পরজীবীর বংশ বিস্তারে সহায়ক বলে বাংলাদেশের গবাদি প্রাণীতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি। বাংলাদেশে পরজীবী প্রাণিসম্পদ শিল্পের জন্য একটি নীরব হুমকি। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ গবাদি প্রাণী কোন না কোন পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত থাকে। এই রোগের কারণে প্রতি বছর বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়। দুই ধরনের পরজীবী দ্বারা প্রাণী আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং উভয়ধরনের পরজীবীই গবাদি প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। পরজীবীর ডিম বা লার্ভা খাদ্যের সাথে বা দেহের ত্বক ছিদ্র করে গবাদি প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অনেক সময় গবাদি প্রাণী জন্মের পূর্বেই মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় গর্ভফুলের মাধ্যমেও আক্রান্ত হতে পারে। এই পরজীবী গবাদি প্রাণীর জন্য সর্বদাই ক্ষতিকর। এরা প্রাণীর দেহের রক্ত শুষে নেয়, গৃহীত পুষ্টির মধ্যে ভাগ বসায়, এছাড়া পরোক্ষভাবেও এইসব পরজীবী বিভিন্ন পরিপাক যোগ্য খনিজ পদার্থ শুষে নেয়। বহিঃপরজীবী প্রাণীর দেহের রক্ত শুষে নেয়া ছাড়াও ত্বকের ক্ষতি ও বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ছড়ায়, এতে প্রাণীর মৃত্যুও পর্যন্ত হতে পারে। এর ফলে প্রাণীর স্বাস্থ্য ও উৎপাদন ক্ষমতা আস্তে আস্তে হ্রাস পায়। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কৌশলগত ভাবে পরজীবী নিয়ন্ত্রণে পদ্ধতি প্রয়োগ করে পরজীবী দমন করা একটি উৎকৃষ্ট পন্থা। এই পদ্ধতিটি পরিপাকতন্ত্রের অন্যান্য উপকারী অনুজীব ধ্বংস না করে কেবল পরজীবীকেই ধ্বংস করে এবং এর ফলে প্রাণীর উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

চিত্রঃ পরজীবীতে আক্রান্ত বাছুর

বিভিন্ন প্রকার পরজীবীর পরিচিতি: পরজিবী প্রধানত দুই প্রকার:

ক। অন্তঃপরজীবী

খ। বহিঃপরজীবী

* অন্তঃপরজীবী

১। পাকস্থলীর কৃমি: এরা প্রাণীর রক্ত ও পুষ্টি শুষে নেয়।

২। কলিজা কৃমি: এ ধরনের কৃমির ডিম খাদ্য ও পানির সাথে মিশে দেহে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে কলিজায় অবস্থান করে ও কলিজার কোষ নষ্টকরে।

৩। অন্ত্রের কৃমি: উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এ ধরনের কৃমির বিস্তার বেশী হয়। এ ধরনের কৃমি প্রাণীদেহে বেশী পাওয়া যায়। এরা প্রাণীর রক্ত ও পুষ্টি শুষে নেয়। এ গুলিকে গোল কৃমিও বলা হয়।

৪। ফুসফুসের কৃমি: এ ধরনের কৃমির ডিম খাদ্য ও পানির সাথে মিশে প্রাণীদেহে প্রবেশ করে ফুসফুসে ও শ্বাসনালীতে বেড়ে উঠে। এর ফলে ফুসফুসেও শ্বাসনালীতে প্রদাহ দেখা দেয় এবং শ্বাসকষ্ট হয়।

৫। প্রোটোজোয়া: প্রোটোজোয়া প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে বিভিন্ন অংগে এমনকি রক্তে অবস্থান করে এবং রক্ত ও পুষ্টি শুষে নেয়

বহিঃপরজীবী

১। আঁঠালি: এরা প্রাণীদেহ থেকে রক্ত শুষে নেয়, বিভিন্ন রোগ ছড়ায় এবং কামড়ে ত্বকের ক্ষতি হয়।

২। উকুন ও মাছি: উকুন ও মাছি দেহ থেকে রক্ত শুষে নেয়, বিভিন্ন রোগ ছড়ায় এবং কামড়ে ত্বকের ক্ষতি হয়।

পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত গবাদি প্রাণীর লক্ষণ

১। প্রাণীর ওজন আস্তে আস্তে কমে যায় এবং বাছুরের বৃদ্ধি থেমে থাকে।
২। পাতলা পায়খানা পরজীবী আক্রান্ত প্রাণীর সাধারণ লক্ষণ
৩। পায়খানার সাথে মাঝে মাঝে রক্ত দেখা যেতে পারে।
৪। প্রাণী বয়ঃপ্রাপ্ত হতে অনেক সময় নেয় এতে খামার দিন দিন লোকসানের দিকে যেতে থাকে।
৫। গাভীর উর্বরতা কমতে থাকে এবং বাচ্চা দেয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায়।
৬। গাভীর দুধ উৎপাদন কমে যায়, আস্তে আস্তে ওজন কমতে থাকে ও দুর্বল হতে থাকে।
৭। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং রক্ত শূণ্যতা দেখা যায়। টীকা থেকে কাংক্ষিত ফল পাওয়া যায় না।
৮। কোন কোন পরজীবীর আক্রমণে প্রাণীর নাক দিয়ে রক্ত বা তরল নিঃসৃত হতে পারে ও কাশি হতে পারে।
৯। প্রাণীর ত্বক (চামড়া) উসকু খুসকু হয়ে যায় এবং পশম উঠে যেতে পারে।
১০। এক সময় প্রাণীর শরীরের বা গলার নিচের দিকে তরল পদার্থ জমা হতে থাকে এবং প্রাণী মারা যেতে পারে।

কৌশলগত পরজীবী নিয়ন্ত্রণে পদ্ধতি

কৌশলটি প্রয়োগের শুরুতে গবাদি প্রাণীর স্বাস্থ্যের একটি মান যাচাই করে নিতে হবে যাতে পরবর্তীতে ফলাফল মূল্যায়নে সুবিধা হয়। কৌশলগত পরজীবী নিয়ন্ত্রণে পদ্ধতিটি যথাযথ ভাবে প্রয়োগের জন্য নিম্নের বিষয় গুলি গুরুত্ব সহকারে পালন করতে হবে।

খামার ব্যবস্থাপনা

১। খামার নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে। বিশেষ করে খাদ্য ও পানির দেয়ার পাত্র ভালো ভাবে পরিস্কার করতে হবে। গোবর ও মুত্র খাদ্য ও পানির সাথে বা খাদ্য ও পানি দেয়ার পাত্রে মিশতে পারবে না, কারণ কৃমির ডিম ও লার্ভা গোবর এর মাধ্যমে খাদ্য ও পানির সাথে মিশে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং রোগ সৃষ্টি করে।
২। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গবাদি প্রাণীর গোবর সংরক্ষণ করে জৈব সার তৈরি করতে হবে।
৩। পরজীবীর লার্ভা দূরীকরণে কাটা ঘাস বা জলজ উদ্ভিদ ভালোভাবে ধৌত করতে হবে। খড় বা সাইলেজ তৈরি করে খাওয়াতে হবে। এভাবে খাওয়ালে ডিম ও লার্ভা নষ্ট হয়ে যায়, এ ধরনের খাদ্য হতে কৃমির আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।
৪। স্যাঁতস্যাঁতে এলাকায় গবাদি প্রাণীকে চড়ানোর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। জলাবদ্ধ এলাকায় গবাদিপ্রাণী চড়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে। নিচু এলাকার ঘাসও খাওয়ানো যাবে না। প্রয়োজনে সাইলেজ তৈরি করে খাওয়াতে হবে।
৫। সকালে মাঠে গবাদিপ্রাণী চড়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে এবং অন্য এলাকায় অপরিচিত প্রাণীর সাথে চড়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
৬। চারণ ভূমি বছরে দুইবার চাষ করে মাটি উলটপালট করে দিতে হবে। এর ফলে কৃমির ডিম ও লার্ভা চারণ ভূমিতে ধ্বংস হয়ে যাবে।
৭। যে সব এলাকায় পরজীবী আক্রমণের আশংকা বেশী আছে সেখানে গবাদি প্রাণী আবদ্ধভাবে পালন করা যেতে পারে।
৮। চারণ ভূমিতে প্রাণী চড়ানো ১৫ থেকে ২১ দিন বিরতি দিয়ে কারা হলে মাঠে কৃমির ডিম ও লার্ভা নষ্ট হয়ে যায়। এই বিরতিতে মাঠ নতুন ঘাসে ভরে উঠবে যা প্রাণীর স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হবে।

কৃমি নাশকের ব্যবহার

পরজীবী নিয়ন্ত্রণে কৃমি নাশকের ব্যবহার আমাদের দেশে অনেক আগে থেকে করা হচ্ছে। কিন্তু অপরিকল্পিত ভাবে এর ব্যবহারের ও সঠিক কৃমি নাশক নির্বাচন না করার ফলে কৃমি নিয়ন্ত্রণে তেমন সাফল্য পাওয়া যায় নাই, উপরন্তু কৃমি নাশকের রেজিসস্টেন্স পরিলক্ষিত হচ্ছে (Antiparasitic Resistance)।

১। পরজীবী নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচিত খামার বা এলাকার গবাদি প্রাণীর একটি পরিসংখ্যান করতে হবে, যেখানে খামারির সংখ্যা (যদি কোন এলাকায় বা গ্রামে করা হয়), গবাদি প্রাণীর সংখ্যা, বয়স, এবং প্রতিটি গবাদি প্রাণীর ওজন সংগ্রহ করতে হবে।
২। গবাদি প্রাণীর সংখ্যা, বয়স, এবং ওজন অনুসারে বহুমুখী কার্যকর (Broac-Spectrum) কৃমি নাশক নির্বাচন করে এর সংখ্যা বা পরিমাণ ও মূল্য অনুসারে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। কৃমি নাশক হিসাবে আইভারমেকটিন জাতীয় ঔষধ একই সাথে অন্তঃপরজীবী ও বহিঃপরজীবী উপর কার্যকর। তবে একই জাতীয় কৃমি নাশক বার বার ব্যবহার না করে বিভিন্ন জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা ভালো।
৩। একটি নিদৃষ্ট এলাকার বা খামারের সকল গবাদি প্রাণীকে একসাথে সর্বাত্মক চিকিৎসা (কৃমিনাশক) দিতে হবে।
৪। বৎসরে অন্ততঃ দুইবার নিয়মিতভাবে প্রাণীকে (এক সাথে) কৃমিনাশক দিতে হবে। বর্ষার শুরুতে একবার (মে-জুন মাসে) এবং শীতের শুরুতে দ্বিতীয় বার (নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে) গবাদি প্রাণীকে কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৫। যে সকল এলাকায় কৃমি রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী সে সকল এলাকায় বছরে তিনবার (৩ বার) কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে। বাছুরকে ৮ (আট) মাস পর্যন্ত প্রতি ২ মাস পরপর কৃমিনাশক প্রয়োগ করা হলে ভালো ফল পাওয়া যায়। কৃমিনাশক প্রদান ও ভ্যাক্সিনেশন ক্যালেন্ডার অনুসরণ করলে খামারে রোগ নিয়ন্ত্রণ সহজতর হয়। কৃমিনাশক প্রদানের ৩ দিন পর ভিটামিন মিনারেল খাওয়ানো প্রয়োজন। অথবা রেজিষ্টার্ড ভেটিরিনারিয়ান এর পরামর্শ অনুযায়ী সেবা গ্রহণ করতে হবে।

৬। বহিঃপরজীবী নিয়ন্ত্রণের জন্য মাসে একবার খামারের বা গ্রামের সকল গবাদি প্রাণীকে ডিপিং (উকুন, আঠালির ঔষধ সহ গোসল) করাতে হবে। প্রথম দিকে মাসে একবার এই পদ্ধতিটি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হলে, পরবর্তীতে দুই মাস পরপর করা যেতে পারে।

৭। সাধারণত বৃষ্টি/বন্যা-প্রবণ এলাকায় বছরে তিনবার (৩ বার) কৃমিনাশক প্রদান করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষায় যদি EPG 1000 এর উপরে আসলে সে ক্ষেত্রে বছরে তিনবার (৩ বার) কৃমিনাশক প্রদান করা ভালো। ১ম ডোজ কৃমিনাশক প্রদান করার ২ সপ্তাহ পরে ২য় ডোজ (বুস্টার) ডোজ প্রদান করা ভালো। মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষায় ১ম ডোজ কৃমিনাশক প্রদান করার ৭ দি পর যদি EPG 300 বা ততোধিক তাহলে ২য় ডোজ কৃমিনাশক প্রদান করা অত্যাবশ্যক। বুস্টার/ ২য় ডোজের ক্ষেত্রে ১ম ডোজ বোলাস, ২য় ডোজ ইনজেকটেবল অথবা ১ম ডোজ ইনজেকটেবল, ২য় ডোজে বোলাসে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। বোলাস/ ট্যাবলেট দানাদার খাবার বা ক্ষেত্র বিশেষে ঝোলাগুড়/নালির সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে নিউমোনিয়াজনিত ঝুঁকি থাকে না।

৮। কৃমিনাশক সকালে খালি পেটে প্রদান করা ভালো। কৃমিনাশক প্রদানের অন্তত ৩০ মিনিট খাদ্য সরবরাহ না করা ভালো। কাঁটা ঘাস/ফডার খাওয়ানোর ক্ষেত্রে মাটি হতে অন্তত ২ মুঠো (৬-৮ ইঞ্চি) পরিমাণ উঁচুতে ঘাস/ফডার কেটে খাওয়ালে কৃমির প্রকোপ কমে যায়। ঘাস ধুয়ে খাওয়ানো ভালো। গরু মাঠে চারণের ক্ষেত্রে শিশির/ কাঁদাযুক্ত ঘাস না খাওয়ানো শ্রেয়। প্রাকৃতিকভাবে গরু/মহিষ/ছাগল/ ভেড়ার সাথে যদি বক/সমগোত্রীয় পাখির সমন্বিত বিচরণ হয় তাহলে কৃমি/মধ্যবর্তী পোষক দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯। গর্ভবতী (Pregnant) প্রাণীর ক্ষেত্রে অন্যান্য জটিলতা এড়ানোর জন্য প্রজনন করার ৬০ দিন পর এবং EDD (Expected Date of Delivery) এর ৩০ দিন পূর্বে কৃমিনাশক প্রদান করা ভালো। তবে নিরাপদ কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে।

খামার ব্যবস্থাপনা ও কৃমি নাশক ব্যবহারের কার্যকারিতা মুল্যায়ন

খামার ব্যবস্থাপনা ও কৃমি নাশক ব্যবহার কতটুকু কার্যকারী হয়েছে তা নিয়মিত যাচাই করতে হবে।

১। নিয়মিত (মাসে এক বার) খামারের বিভিন্ন স্থান হতে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাকরে কৃমির ডিম ও লার্ভর উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

২। গবাদি প্রাণীকে সরবরাহ করা ঘাস ও দানাদার খাদ্য একই ভাবে পরীক্ষা করতে হবে। এগুলি যাতে পরজীবীর উৎস না হয় তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৩। কৃমি নাশকের ব্যবহারের ৭ দিন পর প্রাণীর গোবর পরীক্ষা করে কৃমি নাশকের কার্যকারিতা যাচাই করেতে হবে।

৪। ডিপিং করার দুই দিন পর নির্বাচিত কিছু গবাদি প্রাণীর শরীর পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে যে উকুন বা আঠালি তখনো আছে কি না।

গবাদি প্রাণীর কৌশলগত পরজীবী নিয়ন্ত্রণে পদ্ধতিটি প্রয়োগের সময় স্থানীয় ভেটেরিনারীয়ান কে সম্পৃক্ত করে, তার সাথে পরামর্শ করে ভাল মানের পরজীবী নাশক (ঔষধ) বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বর্তমানে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান এইসব ঔষধ (কৃমিনাশক) বাজারজাত করে থাকে। কৃমিনাশক ব্যবহারের সর্বোত্তম ফল পেতে হলে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রাণীর ওজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

পরজীবী নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা

বেশীর ভাগ কৃমিনাশকই খুব বেশী ব্যয়বহুল নয়। প্রাণীকে কৃমিনাশক প্রয়োগ করা হলে তা প্রাণী পালনকারীর জন্য খুবই সুফল বয়ে আনে। দেখা গেছে ব্যয়ের তুলনায় লাভের আনুপাতিক হার অনেক বেশী। বাছুরের মৃত্যুর হার অনেক কমে, পরবর্তীতে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। গাভীর দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং ওজন বৃদ্ধি পায়। কৃমিনাশক ব্যবহারের সাথে সমন্নয় করে খামারের টীকা প্রদান কর্মসূচী প্রস্তুত করা হলে টীকা হতে ভালো এন্টিবডি (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা) পাওয়া যায়। টিকা প্রদান পূর্বে কৃমিনাশক প্রদান করলে ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা প্রায় ১৪-১৬ ভাগ বেড়ে যায় এবং প্রাণীর উৎপাদন প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়ে যায়। প্রযুক্তিটি ব্যবহারে খাদ্য খরচ কমে আসে এবং সরবরাহকৃত খাদ্য হজমের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। প্রাণী পরজীবী মুক্ত থাকায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং খামারে রোগ সংক্রমণ কমে আসে। চিকিৎসা ব্যয় কম হয় , খামারি আর্থিক ভাবে লাভবান হয়। পরিবেশের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব নাই বরং কৃমিনাশক পরিবেশকে পরজীবী মুক্ত রেখে প্রাণী ও মানুষকে পরজীবী মুক্ত রাখতে সহায়তা করে।

সতর্কতা

সঠিক মাত্রায় কৃমিনাশক প্রয়োগ করা হলে এর দ্বারা কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। সকালে ঠান্ডা আবহাওয়ায় প্রাণীকে কৃমিনাশক প্রয়োগ করা ভালো। মুখে কৃমিনাশক খাওয়ানোর সময় সর্তক থাকতে হবে যাতে ঔষধ প্রাণীর শ্বাসনালিতে প্রবেশ করতে না পারে। গবাদি প্রাণীর কৃ

মিনাশক মানুষের জন্য একটি বিষাক্ত ঔষধ। সুতরাং অবশ্যই শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে। কৃমিনাশক প্রয়োগের পর উৎপাদনকারীর পরার্মশ মত মাংস ও দুধ বাজারজাত করা কিছু দিন বন্ধ রাখতে হবে।

উপসংহার

পৃথিবীর প্রায় সকল অঞ্চলে পরজীবীর প্রার্দূভাব লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু পরজীবীর বংশ বিস্তারে সহায়ক বলে, এমন অঞ্চলে পরজীবীর প্রার্দূভাব বেশী। বাংলাদেশের আবহাওয়া বেশীর ভাগ সময়ে উষ্ণ ও আর্দ্র থাকে, সে কারণে এ দেশের গবাদি প্রাণীতে এই রোগের প্রাদূর্ভাব অনেক বেশী লক্ষ্য করা যায়। পরজীবী মুক্তকরণের এই কৌশলটি নিয়মিতভাবে প্রয়োগের ফলে প্রাণীর দেহে পরজীবী ধ্বংস হওয়ার কারণে প্রাণীর উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায় যা খামারের আয় বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে।

চিত্রঃ পরজীবী মুক্তকরণ কৌশল প্রয়োগ না করা খামারের গরু

চিত্রঃ নিয়মিত পরজীবী মুক্তকরণ কৌশল প্রয়োগ করা খামার

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. এম. জে. এফ. এ. তৈমুর, ড. ফজলুর রহমান, ড. শাহ মোঃ জিকরুল হক চৌধুরী, ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান, ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন ও ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম। প্রযুক্তি হস্তান্তরঃ ২০০২ খ্রিঃ। প্রযুক্তিটি পুনঃসংযোজন ও ভ্যালিডেশনঃ- ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন এবং ডাঃ মোঃ জাকির হাসান; সময়কালঃ ২০২০ খ্রিঃ

কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন পরীক্ষার জন্য মূল্য-সাশ্রয়ী হিমোলাইসিন

ভূমিকা

কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন পরীক্ষা বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ভাইরাস শনাক্ত করণ এবং ভাইরাস টাইপ নির্ণয়ের জন্য এ পরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এ পরীক্ষা পদ্ধতি যে কোনো সাধারণ গবেষণাগারে কার্যকরীভাবে স্বল্প খরচে ব্যবহার করা যায়। এ পরীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে হিমোলাইসিন যা বিএলআরআইতে উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং এ হিমোলাইসিন চাহিদা অনুসারে বিএলআরআইতে তৈরি করা হয়। হিমোলাইসিন স্থানীয়ভাবে তৈরি হওয়ায় কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন পরীক্ষা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এলআরআই (মহাখালি), সিডিআইএল, এফডিআইএল এবং জেলা প্রাণী হাসপাতালসমূহে চালু করা সহজ হবে। ফলে, কোনো এলাকায় ক্ষুরারোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে স্থানীয়ভাবে ভাইরাস শনাক্ত করে এবং তার টাইপ নির্ণয় করে রোগ দমনের জন্য দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ হবে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

(ক) হিমোলাইসিন একটি রোগ নির্ণায়ক রি-এজেন্ট যা কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন পরীক্ষায় ব্যবহৃত হিমোলাইটিক সিস্টেম এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হিমোলাইসিনকে Anti-sheep RBC বা Amboceptor বলা হয়।

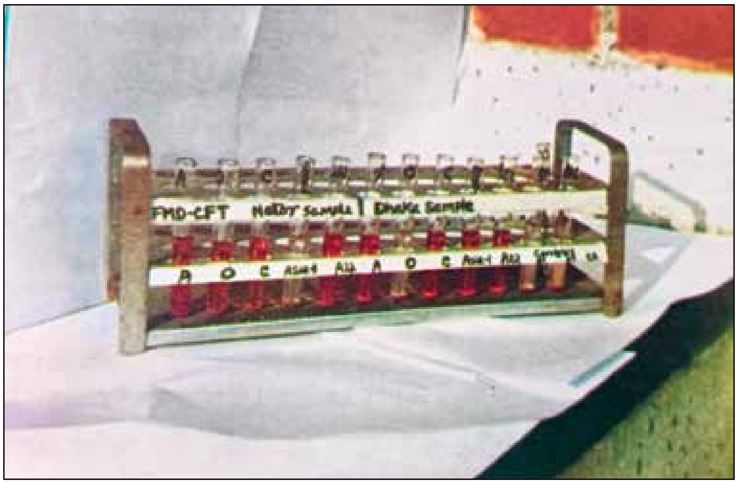

চিত্র: কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন পরীক্ষায় প্রস্তুতকৃত হিমোলাইসিন

(খ) পূর্বে হিমোলাইসিন শত শত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো এবং এজন্য কয়েক মাস সময় লাগত।

(গ) হিমোলাইসিন স্থানীয়ভাবে তৈরি করে কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন পরীক্ষাকে মূল্য সাশ্রয়ী এবং সহজতর করা হয়েছে।

(ঘ) বিদেশ থেকে আমদানীকৃত এবং দেশে প্রস্তুত হিমোলাইসিন সমান ভাবে কার্যকরী।

হিমোলাইসিন তৈরির নির্দেশিকা

একটি জীবাণুমুক্ত কনিক্যাল ফ্লাস্কে কিছু জীবাণুমুক্ত গ্লাস বিট নিয়ে ভেড়া থেকে রক্ত সংগ্রহ করে ঐ ফ্লাস্কে নিতে হবে এবং ফ্লাস্কটি ৫-১০ মিনিট অনবরত নাড়তে হবে যাতে রক্ত জমাট না বাধে। তারপর উক্ত রক্ত একটি সেন্ট্রিফিউজ টিউবে নিয়ে ২০০০ আরপি এম-এ ৫ মিনিট সেন্ট্রিফিউজ করে টিউবের নিচের অংশে তলানিপড়া লাল রং এর RBC-গুলো ছাড়া টিউবের উপরি ভাগের প্লাজমা এবং সাদা বাফি কোট অংশ পাসচার পিপেটের মাধ্যমে সংগ্রহ করে ফেলে দিতে হবে। এরপর তলানিপড়া RBC এর সাথে জীবাণুমুক্ত সাধারণ স্যালাইন যোগ করে টিউবের মুখ ভালোভাবে বন্ধ করে টিউবটি উপর নিচ করে RBC গুলো স্যালাইনে রিসাসপেন্ড করতে হবে। টিউবটি পুনরায় সেন্ট্রিফিউজ করে আগের মত তলানিপড়া RBC বাদে উপরি ভাগের স্যালাইন ফেলে দিতে হবে। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত RBC-এর উপরি ভাগের স্যালাইন স্বচ্ছ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত RBC-কে স্যালাইন দ্বারা ধৌত করতে হবে। ধৌত করার পর তলায় জমে থাকা RBC-এর সাথে সমপরিমাণ স্যালাইন যোগ করে RBC সাসপেনশন তৈরি করতে হবে। এর পর সেখান থেকে RBC নিয়ে স্যালাইনে ৪% RBC সাসপেনশন তৈরি করতে হবে। এই সাসপেনশন তিনটি রোগমুক্ত সুস্থ খরগোসের প্রতিটিতে দুইদিন পরপর ৭ টি ইনজেকশনের মাধ্যমে কানের শিরায় প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিটি ইনজেকশনে ৪% RBC-এর পরিমাণ হলো যথাক্রমে ১ম টি ০.২ মি.লি., ২য় টি ০.৩ মি.লি., ৩য় টি ০.৫ মি.লি., ৪র্থ টি ০.৭ মি.লি., ৫ম টি ০.৯ মি.লি., ৬ষ্ঠ এবং ৭ম টি ১ মি.লি. করে। শেষ ইনজেকশন প্রদানের ৭দিন পর খরগোস ৩টি জীবাণুমুক্ত পরিবেশে জবাই করে প্রতিটি খরগোসের রক্ত আলাদা ভাবে পরিস্কার জীবাণুমুক্ত বিকারে সংগ্রহ করতে হবে। বিকার ৩টি -এলুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে ঢেকে প্রথমে ২-৩ ঘণ্টা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখতে হবে। তারপর ৪০ সেঃ তাপমাত্রায় ১-২ ঘণ্টা রেখে বিকার ৩টি থেকে সিরাম সংগ্রহ করে একটি জীবাণুমুক্ত বোতলে একত্রিত করে রাখতে হবে। এই সিরাম ৫৬° সেঃ তাপমাত্রায় ৩০ মিঃ ওয়াটার বাথে রেখে এর মধ্যে থাকা কমপ্লিমেন্ট নষ্ট করতে হবে। এই কমপ্লিমেন্ট বিহীন সিরাম পরবর্তীতে হিমোলাইসিন হিসেবে ব্যবহৃত হবে। কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন পরীক্ষায় ব্যবহারের পূর্বে

হিমোলাইসিন টাইট্রেশন করে এর শক্তি জেনে নিতে হবে। হিমোলাইসিন টাইট্রেশনের জন্য কমপ্লিমেন্ট ও ভেড়ার ধৌতকৃত RBC (৪%) দরকার হবে। টাইট্রেশনের পূর্বে ৩টি রোগমুক্ত সুস্থ পুরুষ গিনিপিগ (৫০০-৭০০ গ্রাম ওজনের) থেকে পূর্বোল্লেখিত নিয়মে সিরাম সংগ্রহ করে ৩ মিঃ লিঃ গ্লাস ভায়ালে ১ মিঃ লিঃ করে ভাগ করে -২০° সেঃ-এ সংরক্ষণ করতে হবে। এই সিরামই কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

হিমোলাইসিন টাইট্রেশনের জন্য বিভিন্ন ডাইলুশনের রি-এজেন্ট নিম্ন লিখিত ভাবে তৈরি করতে হবে

- ১:১০০ ডাইলুশন হিমোলাইসিন : ৯.৯ মি.লি. স্যালাইন + ০.১ মি.লি. হিমোলাইসিন।
- ১:১৫০ ডাইলুশন হিমোলাইসিন : ২.৫ মি.লি. স্যালাইন + ৫ মি.লি. ১:১০০ ডাইলুশন হিমোলাইসিন।
- ১:২৫ ডাইলুশন কমপ্লিমেন্ট : ১৪.৪ মি.লি. স্যালাইন + ০.৬ মি.লি. কমপ্লিমেন্ট।
- ৪% RBC : ১৪.৪ মি.লি. স্যালাইন + ০.৬ মি.লি. ধৌত RBC।

উপরোক্ত বিভিন্ন ডাইলুশনের রি-এজেন্টগুলো তৈরির পর ১৭টি ৩ মি. লি. টিউব র‌্যাকে নিয়ে সেগুলোর শনাক্তকরণ নম্বর ক্রমানুসারে (১-১৭) বসাতে হবে। এর পর, ৩নং হতে ১৪নং পর্যন্ত এবং ১৭নং টিউবসমূহে ০.৫ মিঃলিঃ করে সাধারণ স্যালাইন নিতে হবে। টিউব নং ১৫ এবং ১৬-তে ১ মি. লি. করে স্যালাইন নিতে হবে। টিউব নং ১-এ ১:১০০ ডাইলুশনের ১ মি. লি. হিমোলাইসিন এবং টিউব নং ২-এ ১:১৫০ ডাইনুশনের ১ মি. লি. হিমোলাইসিন নিতে হবে। টিউব নং ১ থেকে ০.৫ মিঃ লিঃ টিউব নং ৩-এ স্থানান্তর করে ভালভাবে মিশাতে হবে এবং সেখান থেকে ০.৫ মি. লি. টিউব নং ৫- এ স্থানান্তর করে মেশাতে হবে। এভাবে টিউব নং ১৩ পর্যন্ত বেজোড় সংখ্যার টিউবগুলোতে হিমোলাইসিন ডাইলুশন করতে হবে এবং ১৩নং টিউবের মিশ্রণ থেকে ০.৫ মি. লি. ফেলে দিতে হবে। একই প্রক্রিয়ায় টিউব নং ২ হতে ১৪ পর্যন্ত হিমোলাইসিন ডাইলুশন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় ১ নং হতে ১৪ নং টিউব পর্যন্ত হিমোলাইসিনের ডাইলুশন হবে যথাক্রমে ১:১০০, ১:১৫০, ১:২০০, ১:৩০০, ১:৪০০, ১:৬০০,১:৮০০, ১:১২০০, ১:১৬০০, ১:২৪০০, ১:৩২০০, ১:৪৮০০, ১:৬৪০০ এবং ১:৯৬০০। টিউব নং ১৬-তে এক ড্রপ মূল হিমোলাইসিন যোগ করতে হবে। টিউব নং ১৫ এবং ১৬ ছাড়া সবগুলোতে ০.৫ মি. লি. কমপ্লিমেন্ট (১:২৫) যোগ করতে হবে। শেষে প্রতিটি টিউবে ০.৫ মি. লি. ৪% RBC যোগ করতে হবে। টিউব নং ১৫, ১৬ এবং ১৭ কে যথাক্রমে স্যালাইন কন্ট্রোল, হিমোলাইসিন কন্ট্রোল এবং কমপ্লিমেন্ট কন্ট্রোল হিসেবে গণ্য করতে হবে। এরপর র‌্যাকসহ টিউবগুলো ৩৭° সেঃ তাপমাত্রায় ৩০ মি. রেখে টাটট্রেশন ফলাফল রেকর্ড করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পরীক্ষা সঠিক ইলেকক্ট্রোল টিউবসমূহে হিমোলাইসিস হবে না। পূর্ণ হিমোলাইসিস হয়েছে এ ধরনের সর্বোচ্চ ডাইলুশনের রিসিপ্রক্যালই হবে হিমোলাইসিনের টিটার। ফলাফলে যদি দেখা যায় ১২ নং টিউব পর্যন্ত পূর্ণ হিমোলাইসিস হয়েছে এবং ১৩ ও ১৪ নং টিউবসমূহে RBC তলানি হিসাবে রয়েছে সেক্ষেত্রে, ১২ নং টিউবের ডাইলুশন ১:৪৮০০ হিসেবে হিমোলাইসিনের টিটার হবে ৪৮০০।

হিমোলাইসিন সংরক্ষণ

হিমোলাইসিন টাইট্রেশনের পর ৩ মি. লি. গ্লাস ভায়ালে ১ মি. লি. করে ভাগ করে ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত -২০° সেঃ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে।

হিমোলাইসিন ব্যবহার পদ্ধতি

কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন পরীক্ষায় টিটার-এর ৪ গুণ ক্ষমতা সম্পন্ন হিমোলাইসিন ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ টিটার ৪৮০০ হলে ১:১২০০ ডাইনুশনের হিমোলাইসিন ব্যবহৃত হবে। হিমোলাইসিন (১:১২০০ ডাইলুশন) সমপরিমাণ ৪% RBC এর সঙ্গে যোগ করে কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন পরীক্ষায় হিমোলাইটিক সিস্টেম তৈরির জন্য ব্যবহৃত হবে।

আয়-ব্যয় (প্রযুক্তি ব্যবহারের লাভ ক্ষতি)

এই পরীক্ষায় সাধারণ ভাবে ব্যয় : আয় = ১ : ১৫, অর্থাৎ ১ টাকা খরচ করে ১৫ টাকা আয় হতে পারে। এছাড়াও নিম্নলিখিত উপায়ে পরোক্ষভাবে (Indirect) লাভ হতে পারে।

- এই হিমোলাইসিন মূল্য সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য।
- কমপ্লিমেন্ট ফিকোশন পরীক্ষা সহজ হবে এবং সহজেই ক্ষুরারোগ ভাইরাস শনাক্তকরণ ও টাইপিং করা সম্ভব হবে, যা ক্ষুরারোগ দমনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

- অন্যান্য রোগজীবাণুর শনাক্তকরণেও কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন পরীক্ষা সহজে ব্যবহার করা যাবে।
- কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন পরীক্ষার জন্য হিমোলাইসিন বিদেশ থেকে আমদানি করার প্রয়োজন হবে না বলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

ব্যবহার সম্ভাবনা (কোন ঋতুতে কোন অঞ্চলে ব্যবহারযোগ্য)

এই প্রযুক্তি সারা বছরই ব্যবহার করা যায়। যেসব অঞ্চলে এ প্রযুক্তির ব্যবহার হতে পারে সেগুলো হলোঃ ভেটেরিনারি এবং মেডিক্যাল গবেষণা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ; প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালি, ঢাকা; কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক প্রাণীরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারসমূহ; কেন্দ্রীয় এবং জেলা ভেটেরিনারি এবং মেডিক্যাল হাসপাতালসমূহ; সারাদেশে বিভিন্ন রোগ নির্ণয় কেন্দ্রসমূহ।

প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা/ বিশেষ পরামর্শ

হিমোলাইসিন উৎপাদন করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ব্যবহৃত খরগোশগুলো অবশ্যই যেন স্বাস্থ্যবান হয়।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. শাহ মোঃ জিকরুল হক চৌধুরী, ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান এবং ড. কাজী মোঃ কমর উদ্দিন

সালমোনেলা ভ্যাকসিন

ভূমিকা

সালমোনেলা পুলোরাম নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগকে বলা হয় পুলোরাম রোগ ও সালমোনেলা গালিনেরাম ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগকে বলা হয় ফাউল টাইফয়েড। পুলোরাম রোগটি সাধারণত ছোট বাচ্চায় (০-৩ মাস) এবং ফাউল টাইফোয়েড অপেক্ষাকৃত বড় মুরগিতে দেখা যায়। সালমোনেলোসিস রোগটি ডিম বাহিত হওয়ায় একবার আক্রান্ত হলে বংশ পরম্পরায় বিস্তৃত হতে থাকে। আমাদের দেশে এই রোগে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মুরগি মারা যায়। আর্থিক ক্ষতি হয় প্রায় শত কোটি টাকা। বিএলআরআই এ রোগ দমনের জন্য দু'ধরনের টিকা উদ্ভাবন করেছে। একটি, ফরমালিন কিল্ড ইনেক্টিভেটেড টিকা (Formalin killed aluminium hydroxide gel adsorbed inactivated vaccine) এবং অপরটি, জীবন্ত টিকা (Live attenuated vaccine).

বৈশিষ্ট্য

- **ফরমালিন কিল্ড ইনেক্টিভেটেড টিকা :** এ টিকাটি ১% ফরমালিন, ২৮% অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড জেল, ১% গ্রিসারল বাফার এর সাথে ৭০% ব্যাকটেরিয়াল সাসপেনশন মিশিয়ে ১০০ সিসি বোতলে তরল অবস্থায় বাজারজাত করা হয়।
- **জীবন্ত টিকা :** এ টিকা দুইভাবে বোতলজাত করা হয়েছে।

  (ক) ফ্রিজড্রায়েড জীবন্ত টিকা: ২ মিলি ডায়লুয়েন্ট মেশানোর পর ব্যাকটেরিয়ার ঘনত্ব ৫-৫০ মিলিয়ন/ মিলি থাকে।

  (খ) এলুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড জেল জীবন্ত টিকা : এটি একটি তরল টিকা। এখানে ২৮% এলুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড জেলের সাথে ৭২% ব্যাকটেরিয়াল সাসপেনশন মিশিয়ে ১০০ সিসি বোতলে তরল অবস্থায় বাজারজাত করা হয়। এ টিকাটিতে প্রতি মিলিতে ব্যাকটেরিয়ার ঘনত্ব ৫০-১০০ মিলিয়ন।
- টিকাটির কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।
- টিকাটি বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বহুল ব্যবহৃত ৯ এম টিকাটির সমকক্ষ।
- এ টিকার উৎপাদন খরচ অত্যন্ত কম। স্থানীয় ভাবে তৈরি করতে প্রতি টিকার পিছনে ব্যয় হয় মাত্র ১০ পয়সা। সেখানে আমদানিকৃত প্রতি ডোজ টিকার মূল্য পড়ে ৫ টাকা।

টিকা ব্যবহার করার পদ্ধতি

- লাইভ এটিনিউয়েটেড টিকাটি ১০০ মিলি পানির সংগে মিশিয়ে চামড়ার নিচে বা মাংসের মধ্যে ০.২ মিলি প্রয়োগ করতে হবে। এ টিকা প্রথম মাত্রা ৬-৮ সপ্তাহ বয়সে, দ্বিতীয় মাত্রা ১০-১২ সপ্তাহ বয়সে এবং পরবর্তীতে প্রতি ৬ মাস অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।
- লাইভ এটিনিউয়েটেড এলুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড জেল টিকাটি থাকে ১০০ মিলি প্যাকেটে। মুরগি প্রতি ০.৫ সিসি চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম মাত্রা ৬-৮ সপ্তাহ বয়সে, দ্বিতীয় মাত্রা ১০-১২ সপ্তাহ বয়সে এবং পরবর্তীতে প্রতি ৬ মাস অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।
- ইনেক্টিভেটেড অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড জেল টিকাটি ১০০ মি. লি. বোতলে থাকে যা থেকে মুরগি প্রতি ১.০ মি. লি. করে ঘাড়ের চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম মাত্রা ৬-৮ সপ্তাহ বয়সে, দ্বিতীয় মাত্রা ১০-১২ সপ্তাহ বয়সে এবং পরবর্তীতে প্রতি ৬ মাস অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।

সংরক্ষণ

- ফরমালিন কিল্ড টিকাটি +২° সেঃ থেকে +৮° সেঃ তাপমাত্রায় রাখতে হবে এবং প্যাকিংয়ের ৭ দিনের মধ্যে ব্যবহার করা উত্তম।
- ফিজ ড্রায়েড টিকাটি ০° সেঃ থেকে ৪° সেঃ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। ৬ মাস থেকে ৯ মাসের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে।
- এলুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড জেল লাইভ টিকাটি ০° সেঃ থেকে ১০° সেঃ তাপমাত্রায় রাখতে হবে এবং বাজারজাত করার ১ মাসের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে।

সতর্কতা

- দুর্বল, অসুস্থ এবং ৬ সপ্তাহের কম বয়সের মুরগিকে এ টিকা প্রয়োগ করা যাবে না।
- ব্যবহারের পূর্বে এবং পরে ১৪ দিন অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা যাবে না।
- ব্যবহারের পূর্বে ভালো করে টিকা মেশাতে হবে এবং সূর্য্যের আলো থেকে দূরে রাখতে হবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. মোঃ মাহফুজুল হক এবং ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান

মুরগির সালমোনেলোসিস রোগ নির্ণায়ক এন্টিজেন

ভূমিকা

মুরগির পুলোরাম বা ফাউল টাইফয়েড এক ধরনের ডিমবাহিত মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াল রোগ যা ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে সব বয়সের মুরগিতে হয়ে থাকে। ফলে একবার কোনো ফ্লকে রোগ দেখা গেলে বংশ পরম্পরায় এর বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, প্রতিবছর আমাদের দেশে এ রোগে আক্রান্ত মুরগির মৃত্যুর হার ৪০-৫০ ভাগ, ডিম উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় ২০-৩০ ভাগ ও ডিমের উর্বরতা কমে ২০-৩০ ভাগ। এ রোগে প্রতি বছর প্রায় লক্ষ লক্ষ মুরগি মারা যায় এবং আনুমানিক ২০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়ে থাকে। এ রোগের ভয়াবহতা চিন্তা করে বিএলআরআই রোগটি নির্ণয়ের জন্য অত্যন্ত কার্যকর এন্টিজেন উদ্ভাবন করেছে।

প্রযুক্তি বৈশিষ্ট্য বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ

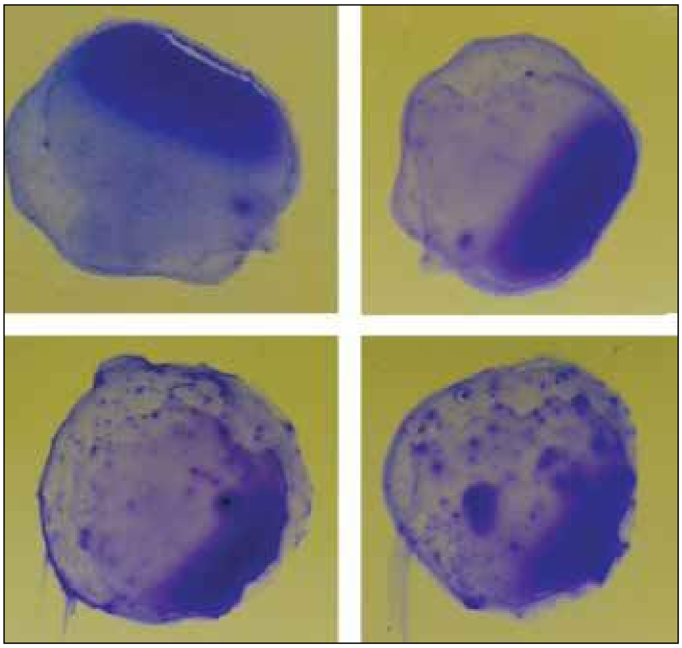

- এটি একটি ১% ফরমালিন ইনেক্টিভেটেড রঙিন এন্টিজেন। নতুন উদ্ভাবিত এই এন্টিজেনটি হেমাগ্লুটিনেশন (Haemoagglutination) পরীক্ষা পদ্ধতিতে ব্যবহার করে খুব দ্রুত সালমোনেলার (সালমোনেলা পুলোরাম ও সালমোনেলা গ্যালিনেরাম) উপস্থিতিকে শনাক্ত করতে পারবে।
- পরীক্ষা পদ্ধতি খুবই সহজ।
- যে কোনো স্থানে পরীক্ষাটি করা সম্ভব বিধায় মাঠ পর্যায়ে রোগ শনাক্তকরণের জন্য এটি ব্যবহার করা সম্ভব।
- পরীক্ষা পদ্ধতিটি নির্ঝঞ্ঝাট, ঝামেলাবিহীন এবং স্বল্প সরঞ্জাম ব্যবহার করেই এ পরীক্ষা করা যায়।
- যে কেউ সহজেই এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে রোগ নির্ণয় করতে পারবে।

ব্যবহার পদ্ধতি

- হেমাগ্লুটিনেশন (Haemoagglutination) পরীক্ষা পদ্ধতিতে এ এন্টিজেনটি ব্যবহার করা যায়।
- এক ফোঁটা রক্তরস একটি পরিস্কার কাঁচের প্লেট, যার তলদেশ হবে অ্যালুমিনেট বা একটি সাদা টাইলস্ এর ওপর নিতে হবে। তারসাথে ভালোভাবে ঝাঁকানো সমপরিমাণ এন্টিজেন যোগ করে একটি জীবাণুমুক্ত নাড়ানি দন্ড বা কাঠির সাহায্যে ভালভাবে মিশাতে হবে যা ১.৫ সে. মি. বৃত্তাকার স্থান জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।
- সালমোনেলা এন্টিজেন নির্দিষ্ট এন্টিবডির উপস্থিতিতে ছোট ছোট দানার সৃষ্টি করে যা খুব দ্রুত স্পষ্ট চোখে পড়ে এবং সহজেই বোঝা যায়।
- মেশানোর দুই মিনিটের মধ্যেই যদি এগ্লুটিনেশন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহলে এটাকে পজিটিভ বা হ্যাঁ সূচক ধরতে হবে।

সতর্কতা

- তাজা রক্ত বা রক্তরস দিয়ে পরীক্ষাটি করতে হবে।
- জমাট রক্ত বর্জন করতে হবে।
- এন্টিজেনটি ব্যবহারের পূর্বে পজিটিভ ও নেগেটিভ কন্ট্রোল রক্তরসের সাথে বিক্রিয়া করে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে হবে।

সংরক্ষণ

- ২°-৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এন্টিজেনটি রাখতে হবে।
- প্রস্তুত করার পর থেকে ৬-১০ মাস পর্যন্ত এর কার্যক্ষমতা খুব ভালো থাকে।

উপকারিতা

- বিদেশ থেকে আমদানি করা এন্টিজেন দ্বারা প্রতিটি হেমাগ্লুটিনেশন টেস্ট করতে খরচ হয় ৭০ টাকা। অথচ একই গুণসম্পন্ন এই এন্টিজেন স্থানীয়ভাবে তৈরি করতে খরচ হয় মাত্র ৫ টাকা।
- খামার ও মাঠ পর্যায়ে এর ব্যবহারের সুফল পাওয়া গেছে। সুতরাং খামারি ও কৃষকরা সহজ প্রাপ্যতায় ও স্বল্প খরচে এই এন্টিজেন রোগ নির্ণয় বা রোগ দমনে ব্যবহার করতে পারেন এবং বিপুল অর্থের সাশ্রয় করতে পারেন।
- ডিএলএস/বিএলআরআই এন্টিজেনটি নিয়মিত উৎপাদন করলে তা সহজলভ্য হবে এবং মুরগির সালমোনেলেসিস নির্ণয় করা সহজ হবে। তাই বলা যায় এন্টিজেনটি মুরগির সালমোনেলা দমনে সাফল্য জনক ভূমিকা রাখবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. মোঃ মাহফুজুল হক এবং ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান

ELISA ভিত্তিক ক্ষুরারোগ নির্ণয় পদ্ধতি

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- পদ্ধতিটি অত্যন্ত সংবেদনশীল, নিশ্চিত, সঠিক দ্রুততম এবং পুনরাবৃত্তি যোগ্য।
- ELISA পরীক্ষার মাধ্যমে আক্রান্ত প্রাণী থেকে সংগৃহীত অনেক নমুনাকে এক সংগে মাত্র ৩ ঘণ্টার মধ্যে বিশ্লেষণ করে ভাইরাস শনাক্ত করা সম্ভব।
- ভাইরাস শনাক্তকরণের এই পদ্ধতি সর্বাধুনিক, অত্যন্ত সংবেদনশীল, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত ল্যাবরেটরি ছাড়াও মাঠপর্যায়ে প্রয়োগ করা সম্ভব।

ভাইরাস সনাক্তকরণে ELISA প্রয়োগ পদ্ধতি

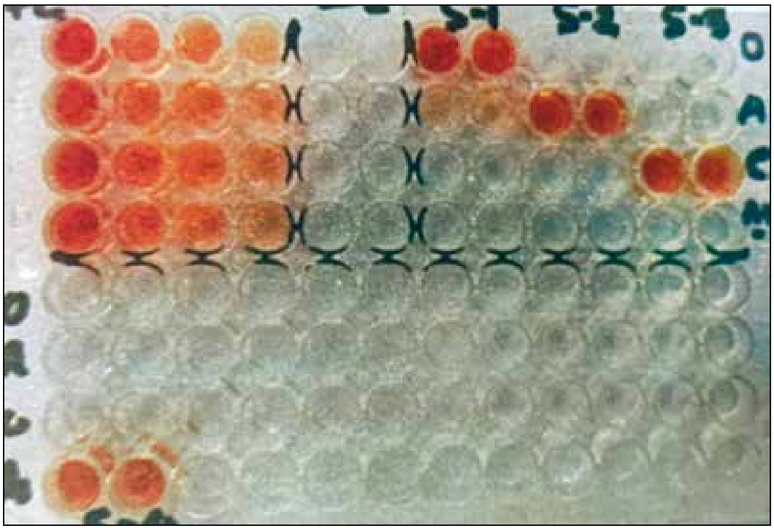

চিত্রঃ ELISA পদ্ধতিতে ক্ষুরারোগ নির্ণয়

- একটি মাইক্রোটাইটার প্লেটের গর্তগুলোকে খরগোশ থেকে তৈরি এন্টি Anti-FMD ভাইরাস সিরাম দ্বারা কোট করার জন্য এক ঘণ্টাকাল ৩৭° সে. তাপমাত্রায় রাখতে হবে।
- এর পর ওয়াশিং ডায়লুয়েন্ট দ্বারা প্লেটের গর্তগুলোকে ধৌত করে কোটেড গর্তগুলোতে আক্রান্ত প্রাণী থেকে সংগৃহীত প্রক্রিয়াজাত নমুনা দিতে হবে। ভাইরাস থাকলে এন্টিজেন আটকে যাবে। আর যদি না থাকে আটকাবে না। এ ক্ষেত্রে এই নমুনা ঋণাত্মক ফলাফল দেখাবে।
- নমুনা দেয়ার পর প্লেটটি আবার এক ঘণ্টাকাল ৩৭° সে. তাপমাত্রায় রাখতে হবে। এরপর পুনরায় ধৌত করে গিনিপিগ থেকে তৈরি Anti-FMD ভাইরাস সিরাম যোগ করে এক ঘণ্টাকাল ৩৭° সে. তাপমাত্রায় রাখতে হবে।
- আবার প্লেটটি ধৌত করে হর্স রেডিস পার অক্সিডেস এনজাইম সংযুক্ত Anti-gunieapig lgG Conjugate প্রয়োগ করে ৩৭° সে. তাপমাত্রায় ১ ঘণ্টা রাখতে হবে। প্লেটটি ধৌত করে Substrate (OPD, H2O2) প্রয়োগ করলে ১৫ মিনিটের মধ্যে Positive নমুনাতে হলুদাভ রং সৃষ্টি হবে যা পরবর্তীতে সালফিউরিক এসিড যোগ করলে কমলা রং ধারণ করবে। Negetive হলে রং এর কোনো পরিবর্তন হবে না।

উপকারিতা

- ELISA পরীক্ষার মাধ্যমে মহামারী বা আক্রান্ত এলাকায় দ্রুত ক্ষুরারোগ ভাইরাস শনাক্ত করে রিং ভ্যাকসিনেশনের মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- আক্রান্ত এলাকার আশপাশেও আগে থেকে ব্যবস্থা নেয়া যায়।
- আক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শে আসা রোগজীবাণু বহনকারী সম্ভাব্য প্রাণীর লালা, দুধ, প্রস্রাব, বীর্য ইত্যাদি আগেভাগে পরীক্ষা করেও প্রাণীর অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।
- ক্ষুরারোগের ফলে প্রাণিসম্পদ সেক্টরে ক্ষতির পরিমাণ ২০০০ সালের হিসেবে পাঁচশত কোটি টাকা। এই রোগ দমন করতে পারলে দেশের এই বিপুল পরিমাণ টাকার সাশ্রয় হবে। উপরন্তু জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে প্রাণিসম্পদ আরো বেশি পরিমাণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। ELISA পরীক্ষার পদ্ধতি ক্ষুরারোগ দমনে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. বিজন কুমার শীল, ড. এম. জে. এফ. এ. তৈমুর ও ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন

পিপিআর রোগের সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি

ভূমিকা

পিপিআর ছাগলের একটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের মৃত্যুর হার শতকরা ৫০-৮০ ভাগ। পিপিআর ভাইরাসজনিত রোগ হওয়ায় এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। তবে অ্যান্টিবায়োটিক হাইপার ইম্মিউন সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতিটি পিপিআর রোগের চিকিৎসায় বিশেষ কার্যকর। পিপিআর রোগ থেকে সেরে ওঠা অথবা টিকা প্রদানকৃত ছাগল থেকে (রোগ সারার বা টিকা প্রদানের ২১-২৮ দিন পর) সিরাম সংগ্রহ করে এই বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- ছাগলের পিপিআর রোগের জন্য এটি একটি বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ।
- এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে শতকরা ৫০ থেকে ৯০ ভাগ আক্রান্ত ছাগল সুস্থ হয়ে ওঠে।
- সরকারি ও সংগঠিত বাণিজ্যিক খামারগুলোর জন্য এই চিকিৎসা পদ্ধতি কার্যকরভাবে ব্যবহার করা সম্ভব।

চিত্র: পিপিআরে আক্রান্ত ছাগল

ব্যবহার নিদের্শিকা

- রোগের অবস্থা বা পর্যায় বুঝে এই সমন্বিত পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতে হয়।
- ছাগলের ডায়রিয়া পর্যায় চলমান অবস্থায় অ্যান্টিসিরাম ১০ মিলি পর পর তিন দিন শিরায় প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি ১০ কেজি ওজনের জন্য প্রথমদিন এক মিলি অক্সিটেট্রাসাইক্লিন এল এ এবং এর দুই দিন পর ২য় ডোজ। ডায়রিয়া বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত স্ট্রিনাসিন (৫০০ মি. গ্রা.) এবং অ্যামোডিস (৪০০ মি. গ্রা.) এবং ইন্টোভেট ট্যাবলেট এক সাথে মিশিয়ে দিনে দুইবার খাওয়াতে হবে। এছাড়াও পরিমাণ মত ওরাল স্যালাইন খেতে দিতে হবে।
- শুধুমাত্র নিউমোনিয়া লক্ষণযুক্ত অবস্থায় এন্টিসিরাম ১০ মিলি পর পর তিন (৩) দিন শিরায় দিতে হবে। একই প্রকার এন্টিবায়োটিক ১ মিলি/১০ কেজি শরীরের ওজন অনুযায়ী প্রথম ডোজের ২ দিন পর ২য় ডোজ দিতে হবে।
- তীব্র জ্বর, চক্ষু ও নাক দিয়ে তরল নিঃসরণরত অবস্থায় অ্যান্টিসিরাম ১০ মিলি পর পর তিন (৩) দিন শিরায় দিতে হবে। এর সাথে একই প্রকার এবং একই পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে।
- রোগাক্রান্ত প্রাণীর সংগে একই শেডে বসবাসরত প্রাণীর ক্ষেত্রে ১০ মিলি অ্যান্টিসিরাম পর পর দুই (২) দিন শিরায় দিতে হবে এবং উপরোক্ত নিয়ম অনুযায়ী এক (১) ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে।

উপকারিতা

- পিপিআর আক্রান্ত শতকরা ৯০ ভাগ প্রাণীকে এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করে সুস্থ করে তোলা যায়।
- এই তীব্র মরণব্যাধি শুধুমাত্র বাজারে প্রাপ্ত অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে ঠেকানো যায় না বলে এতে অ্যান্টিসিরামও যুক্ত করা হয়েছে, যা রোগের তীব্রতা কমিয়ে রোগ দমনে সহায়তা করে প্রাণীকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যায়।
- পদ্ধতিটি দ্রুত কার্যকারী বলে পিপিআর রোগে যে দ্রুত গতিতে প্রাণী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় তা রোধ করে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. বিজন কুমার শীল, ড. এম. জে. এফ. এ. তৈমুর এবং ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন

পিপিআর ভ্যাকসিন

ভূমিকা

পিপিআর বা Peste des Petits ruminants (PPR) ছাগল ও ভেড়ার একটি মারাত্মক রোগ। পিপিআর রোগে প্রাণীর মৃত্যুর হার শতকরা ৫০ থেকে ৯০ ভাগ। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত হেটারোলোগাস ভ্যাকসিন পিপিআর রোগ প্রতিরোধে ব্যর্থ হওয়ার পর দেশীয়ভাবে ভ্যাকসিন উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশীয় মাঠ পর্যায়ের ভাইরাসের ওপর নির্ভর করে পিপিআর রোগের হোমোলোগাস ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করেছে, যা খুবই কার্যকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং মাঠপর্যায়ে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে।

চিত্রঃ হস্তান্তরিত পিপিআর ভ্যাক্সিন

দেশীয় মাঠ পর্যায়ের ভাইরাসের রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতাকে (Virulence) ধাপে ধাপে কমিয়ে টিকার জন্য কাঙ্ক্ষিত (Candidate) ভাইরাস সৃষ্টি করা হয়েছে। ভাইরাসটিকে ভিরোসেলের (Vero cell) ভিতর বারবার প্যাসেজ দিয়ে ভাইরাসটির রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছে। রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত ভাইরাসটি তার প্রাকৃতিক পোষক ছাগলের দেহে কোনো রোগ সৃষ্টি করে না বরং ছাগলের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে। এই টিকাটি শতকরা ১০০ ভাগ কার্যকর ফলাফল দিয়েছে।

বৈশিষ্ট্য

- এটি একটি হোমোলোগাস ভ্যাকসিন।
- টিকাটি স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত দেশীয় ভাইরাস ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হয়েছে বিধায় আমদানিকৃত ভ্যাকসিনের মতো অকার্যকর হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।
- টিকা দেওয়ার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণীর দেহে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।
- এই টিকার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।

ব্যবহার নির্দেশিকা

- প্রতিটি প্রাণীকে ১ মিলি পরিমাণ টিকা দিতে হবে।
- সম্ভাব্য আক্রমণের পূর্বেই এই টিকা দিতে হবে।
- একত্রে রাখা সমস্ত প্রাণীকে একসাথে টিকা প্রদান করতে হবে।
- বিশেষ পরিবর্তিত ভাইরাসের টিকাটি -২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখতে হবে।
- অসুস্থ ছাগলকে এই টিকা দেয়া চলবে না।

উপকারিতা

- এই টিকা আমদানির জন্য প্রতি বছর ৬০ কোটি টাকার যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় তা সাশ্রয় হবে।
- রোগটি ভয়াবহ এবং দ্রুত শারীরিক অবস্থাকে সঙ্কটাপন্ন করে তুলে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। ফলে এই টিকা দেয়া থাকলে প্রাণীর রোগাক্রান্তের আশঙ্কা থাকবে না, মৃত্যুজনিত ক্ষতির হাত থেকে কৃষক ও খামারি উভয়েই রেহাই পাবে।
- এই টিকা নিঃসন্দেহে ছাগলকে রোগের হাত থেকে বাচিয়ে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. বিজন কুমার শীল, ড. এম. জে. এফ. এ. তৈমুর এবং ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন

মুরগির মাইকোপ্লাজমা রোগ নির্ণায়ক এন্টিজেন

ভূমিকা

বাংলাদেশ এভিয়ান মাইকোপ্লাজমা একটি ক্রম প্রসারণশীল রোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। ডিমের উৎপাদন হ্রাস, ডিম ফোটার হার হ্রাস পাওয়া (Poor hatchability) এবং ব্রয়লার মুরগিতে আনুপাতিক হারে স্বল্প খাদ্য গ্রহণ, ইত্যাদি এই রোগের প্রধান লক্ষণ। ফলে খামারগুলো অলাভজনক হয়ে পড়ে এবং বাণিজ্যিক মুরগির খামার পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করে। ক্লিনিক্যালি এই রোগ শনাক্ত করা বেশ কঠিন। সব সময়ই একে শ্বাসযন্ত্রের অন্যান্য বিভিন্ন রোগের সংগে গুলিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু নতুন উদ্ভাবন করা এন্টিজেন দ্বারা খুব সহজেই রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে এই রোগকে সনাক্ত করা যায়। নতুন উদ্ভাবিত এই এন্টিজেন খুব দ্রুত মাইকোপ্লাজমা রোগ শনাক্ত করতে পারবে। পরীক্ষা পদ্ধতি খুবই সহজ, যে কেউ সহজেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে রোগ নির্ণয় করতে পারবে। এটি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার উপযোগী।

বৈশিষ্ট্য

এটি একটি ২% বিশুদ্ধ ক্রিস্টাল ভায়োলেট ইনেক্টিভেটেড রঙিন এন্টিজেন। মাইকোপ্লাজমা ডায়াগনস্টিক এন্টিজেন ব্যবহারের মাধ্যমে খামার পর্যায়ে এই রোগটি সহজেই শনাক্ত করা যায়। রোগ শনাক্ত করার পর পরই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ব্রীডিং খামারে ডিমের মাধ্যমে রোগ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এই রোগের বিরুদ্ধে কার্যকর ঔষধ প্রয়োগ, ডিম ডিপিং, কার্যকর টিকা অথবা আক্রান্ত মুরগি অপসারণ করে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। উক্ত কার্যক্রমের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণের জন্য মুরগির খামারে এই পরীক্ষাটি নিয়মিত পরিচালনা করা উচিত।

ব্যবহার পদ্ধতি

- সিরাম প্লেট এগলুটিনেশন (Serum Plate Agglutination) পদ্ধতিতে এই এন্টিজেন ব্যবহার করা হয়।
- এক ফোঁটা তাজা রক্ত বা রক্তরস একটি পরিস্কার কাঁচের প্লেট, যার তলদেশ হবে এলুমিনেট বা একটি সাদা টাইলসের ওপর নিতে হবে। তার সাথে ভালোভাবে ঝাঁকানো সমপরিমাণ এন্টিজেন যোগ করে একটি জীবাণুমুক্ত নাড়ানি দন্ড বা কাঠির সাহায্যে ভালোভাবে মেশাতে হবে যা ১.৫ সে. মি. বৃত্তাকার স্থান জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।
- এন্টিজেন নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডির উপস্থিতিতে খুব দ্রুত ছোট ছোট দানার সৃষ্টি করে যা দেখে সহজেই বোঝা যায়।
- মেশানোর দুইম (২) মিনিটের মধ্যে যদি এগ্লুটিনেশন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহলে পজিটিভ বা হ্যাঁ সুচক ধরতে হবে।

সতর্কতা

- রক্তরস দিয়ে পরীক্ষাটি করতে হবে।
- জমাট রক্ত বর্জন করতে হবে।
- এন্টিজেনটি ব্যবহারের পূর্বে পজিটিভ ও নেগেটিভ কন্ট্রোল রক্তরসের সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে হবে।

সংরক্ষণ

২°-৮° ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এন্টিজেনটি সংরক্ষণ করতে হবে। প্রস্তুত করার পর হতে ৬-১০ মাস পর্যন্ত এর কার্যক্ষমতা খুব ভাল থাকে।

উপকারিতা

রোগ নির্ণয়ে এই এন্টিজেন খামার ও মাঠপর্যায়ে ব্যবহারের সুফল পাওয়া গেছে। সুতরাং খামারি ও কৃষকরা সহজ প্রাপ্যতায় ও স্বল্প খরচে এই এন্টিজেন রোগ নির্ণয় বা দমনে ব্যবহার করতে পারেন এবং বিপুল অর্থের সাশ্রয় করতে পারেন। নিঃসন্দেহে এন্টিজেনটি মুরগির মাইকোপ্লাজমা রোগ দমনে সাফল্যজনক ভূমিকা রাখবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক: ড. এম. জে. এফ. এ. তৈমুর, ড. আব্দুল মতিন প্রধান, ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান

এইচ আই পরীক্ষার ফিল্টার পেপারের সাহায্যে রক্ত নমুনা সংগ্রহ

ভূমিকা

হিমোগ্লুটিনেশন ইনহিবিশন (এইচ.আই) পরীক্ষা নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে রক্তে বিদ্যমান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার পরিমাণ নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি। বিশেষ করে, রানিক্ষেত রোগের ক্ষেত্রে মুরগির বাচ্চার রক্তে বিদ্যমান মাতৃপক্ষীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা মুরগিতে টিকা প্রয়োগোত্তর উৎপাদিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার পরিমাণ জানার জন্য এ পরীক্ষা করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্লাস্টিক সিরিঞ্জের সাহায্যে রক্ত নমুনা সংগ্রহ করার পদ্ধতি চালু আছে যা ব্যয় বহুল এবং যার জন্য দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন। তাছাড়া যদি এ প্লাস্টিক সিরিঞ্জ সঠিক উপায়ে ধ্বংস করা না হয় তবে তা পরিবেশ দূষণ করে। উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বিএলআরআই) জাইকার পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় দেশে প্রাপ্ত ফিল্টার পেপারের সাহায্যে রক্ত নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- এটি একটি খামারিদের জন্য উপযোগী প্রযুক্তি। প্রযুক্তিটি ব্যবহারে খরচ হয় কম এবং এ ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন নেই। খামারি নিজেই রক্ত নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে প্রেরণ করতে পারেন।
- এটি একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি। একই মুরগি থেকে ফিল্টার পেপার এবং সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত নমুনা সংগ্রহ করে এইচ আই পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে রক্ত সংগ্রহ পদ্ধতির পার্থক্যের কারণে ফলাফলের কোনো তারতম্য হয় না।
- প্রযুক্তিটি পরিবেশ বান্ধব কারণ ব্যবহারের পর ফিল্টার পেপার পরিবেশসম্মতভাবে ধ্বংস করা যায়।

এ পদ্ধতিতে সংগৃহীত রক্ত ব্যবহার করে রানিক্ষেত রোগের এইচ আই পরীক্ষা ছাড়াও মুরগির মাইকোপ্লাজমার এগ্লুটিনেশন পরীক্ষা ও অন্যান্য প্রাণীর টক্সোপ্লাজমার এগ্লুটিনেশন পরীক্ষা, জাপানিজ এনসেফালোমায়েলাইটিস এর এইচ আই পরীক্ষা, ভাইরাস নিউট্রালাইজেশন পরীক্ষা এবং হগ কলেরার ভাইরাস নিউট্রালাইজেশন পরীক্ষা করা যায়।

চিত্রঃ ফিল্টার পেপারের সাহায্যে রক্ত নমুনা সংগ্রহ

ব্যবহার পদ্ধতি

রক্ত নমুনা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় উপাদান-

(ক) জীবাণুনাশক দ্রবণ মিশ্রিত তুলা

(খ) সূঁচ

(গ) নির্দিষ্ট মাপের ফিল্টার পেপার স্ট্রিপ

রক্ত নমুনা সংগ্রহ

- হোয়াটম্যান (Whatman) ফিল্টার পেপার (কোড নং- ১১১৩৩২০, পুরুত্ব-০.৩ মিমি) থেকে ৫ সে. মি. × ১.৫ সেঃ মিঃ মাপে কেটে নিতে হবে। উক্ত মাপের প্রতিটি ফিল্টার পেপারকে একটি স্ট্রিপ বলা হয়।
- মুরগির পাখার শিরা থেকে রক্ত নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। প্রথমে পাখার শিরার ওপরের চামড়ার কিছু অংশ জীবাণুনাশক দ্রবণ মিশ্রিত তুলা দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। অতঃপর জীবাণুমুক্ত সূঁচ দিয়ে শিরা ফুটো করে সেখান থেকে ফিল্টার পেপার স্ট্রিপে রক্ত শোষণ করে ছায়ায় শুকাতে হবে। রক্ত শোষণের পর ফিল্টার পেপার স্টিপটি কোনো অবস্থাতেই সূর্য্যের আলোতে শুকানো যাবে না।
- এর পর স্ট্রিপটি খামে ভরে সংশ্লিষ্ট গবেষণাগারে প্রেরণ করতে হবে।
- স্ট্রিপটি থেকে স্টেশনারি দোকানে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট মাপের (৬ মি. মি. ব্যাসার্ধ) একক পাংচার মেশিন দিয়ে পাঁচ (৫) টি অংশ (ডিস্ক) কেটে নিতে হবে।
- প্রাপ্ত অংশ বা ডিস্ককে ০.৩ মিলি পিবিএস (PBS) এর সাথে মিশিয়ে কক্ষ তাপমাত্রায় কমপক্ষে এক (১) ঘণ্টা বা ৪° সে. তাপমাত্রায় এক রাত রেখে দিতে হবে। স্ট্রিপ থেকে রক্তের উপাদানগুলো সহজেই পিবিএস এর মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে যা মূল সিরামের ১০ গুণ (১:১০) তরলীকৃত (ডাইলুশন) হবে। উক্ত মিশ্রণকে এইচ আই পরীক্ষার জন্য নমুনা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

আয়-ব্যয় (প্রযুক্তির ব্যবহারে লাভক্ষতি)

প্রযুক্তিটি ব্যবহারে খরচ কম হয়। এক প্যাকেট ফিল্টার পেপারের ক্রয় মূল্য ৪০০-৫০০ টাকা যা দিয়ে প্রায় ৯০০০ (নয় হাজার) রক্ত নমুনা সংগ্রহ করা যাবে। অন্যদিকে প্লাস্টিক সিরিঞ্জ দিয়ে উল্লিখিত পরিমাণ রক্ত নমুনা সংগ্রহ করতে মোট খরচ হয় প্রতিটি সিরিঞ্জ ৩ টাকা হারে প্রায় ২৭,০০০ (সাতাশ হাজার) টাকা।

ব্যবহার সম্ভাবনা (কোন ঋতুতে কোন অঞ্চলে ব্যবহারযোগ্য)

সমগ্র বাংলাদেশ যেখানে মুরগি পালন করা হয়।

প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা/বিশেষ পরামর্শ

প্রতিবার রক্ত নমুনা সংগ্রহের পর সূঁচ অবশ্যই ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। অন্যথায় আক্রান্ত মুরগি থেকে সুস্থ মুরগিতে জীবাণুর বিস্তার ঘটতে পারে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ডা. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন এবং ডা. মোঃ মাসুদুর রহমান

পিপিআর ও রিন্ডারপেস্ট রোগ নির্ণয়ে EISA পদ্ধতি

ভূমিকা

এনজাইম ইমিউনো স্লাইড এসে (Enzyme Immuno Slide Assay, EISA) পদ্ধতিটি স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত এবং সুনির্দিষ্টভাবে পিপিআর এবং রিন্ডারপেস্ট রোগ নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একই সাথে পিপিআর ও রিন্ডারপেস্ট রোগ নির্ণয় এবং পৃথকীকরণ সম্ভব। এই পদ্ধতিতে পিপিআর রোগের ভাইরাস (এন্টিজেন) এর সাথে সুনির্দিষ্ট মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির বিক্রিয়া ঘটিয়ে রোগ সনাক্ত করা হয়। ব্যয়বহুল ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) পদ্ধতিতে ব্যবহৃত একবার মাত্র ব্যবহারযোগ্য ৯৬টি গর্তযুক্ত Polystyrene Plate এর পরিবর্তে বারবার ব্যবহার যোগ্য ১২টি গর্তযুক্ত কাঁচের প্লেট এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করার ফলে পরীক্ষণ খরচ বহুগুণ কমে যায়। এই পদ্ধতি গবেষণাগার এবং সেই সাথে মাঠপর্যায়ে প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত পিপিআর রোগ শনাক্ত করে রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- ব্যয়বহুল ELISA পদ্ধতিতে একবার মাত্র ব্যবহার যোগ্য ৯৬টি গর্তযুক্ত Polystyrene Plate এর পরিবর্তে বারবার ব্যবহার যোগ্য ১২টি গর্তযুক্ত কাঁচের প্লেট এই পদ্ধতিতে ব্যবহারে পরীক্ষণ খরচ বহুগুণ কমে যায়।
- এই পদ্ধতিতে একই সাথে পিপিআর ও রিন্ডারপেস্ট রোগ নির্ণয় এবং পৃথকীকরণ সম্ভব।

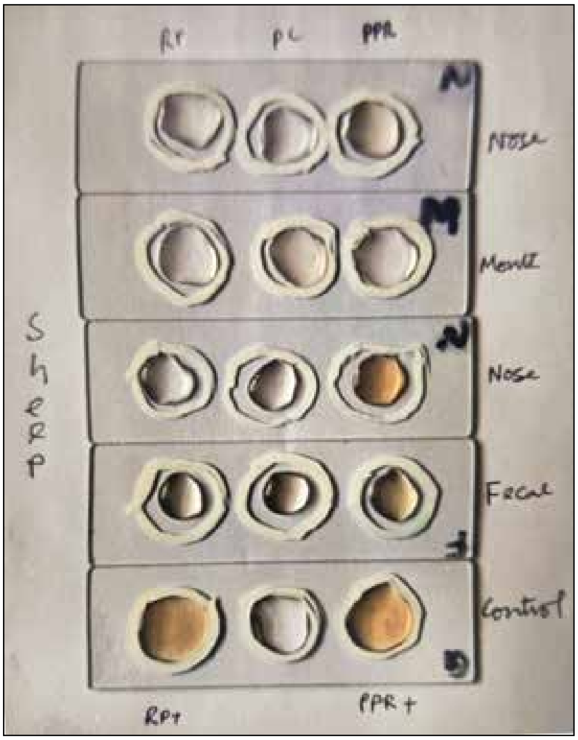

ব্যবহার পদ্ধতি

- ১২টি গর্তযুক্ত কাঁচের প্লেটের প্রথম ও দ্বিতীয় সারিতে নমুনার প্রলেপ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ সারিতে যথাক্রমে পিপিআর ও রিন্ডারপেস্ট কন্ট্রোল অ্যান্টিজেনের প্রলেপ তৈরি করে হিম-শীতল অ্যাসিটোনে ১৫ মিনিট রেখে দিতে হবে।
- বাতাসে শুকানোর পর পিপিআর এবং রিন্ডারপেস্টের নির্দিষ্ট মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় কলামে যুক্ত করতে হবে। মধ্যম কলামটিতে শুধুমাত্র ব্লকিং বাফার দিতে হবে।
- এক ঘণ্টা ইনকিউবেটরে রাখার পর হর্সরেডিস পারঅক্সিডেজ (Horse-radish Peroxidase) যুক্ত কনজুগেট (Conjugate) প্রত্যেকটি গর্তে যোগ করে এক ঘণ্টা ইনকিউবেটরে রাখতে হবে।
- হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (Hydrogen Peroxidase) যুক্ত অর্থো ফিনাইলিন ডায়ামাইন (Ortho-phenylnediamine) যোগ করার ১৫ মিনিটের মধ্যে ধনাত্মক বিক্রিয়া দেখালে গর্তসমূহ সোনালী হলুদ বর্ণ ধারণ করবে।

পদ্ধতি ব্যবহারে সুবিধা

এই পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বল্প খরচে মহামারী আক্রান্ত এলাকায় দ্রুত পিপিআর রোগ নির্ণয় করে আক্রান্ত এলাকার আশপাশে রোগ দেখা দেয়ার পূর্বেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেমন ভ্যাকসিনেশনের মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ করে বহু প্রাণীর জীবন রক্ষা করা সম্ভব।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. বিজন কুমার শীল, ড. এম. জে. এফ. এ. তৈমুর, ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন এবং ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম

এইচ আই পরীক্ষার জন্য মুরগির রানীক্ষেত নির্ণায়ক এন্টিজেন

ভূমিকা

রানীক্ষেত মুরগি তথা পাখি জাতীয় প্রাণীর ভাইরাসজনিত একটি মারাত্বক রোগ। বাংলাদেশ তথা বিশ্বের পোল্ট্রি শিল্পের জন্য এ রোগ হুমকি স্বরূপ। সকল বয়সের সকল জাতের মুরগি এ রোগের ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা (Hygienic Management) ও সঠিক সময়ে গুণগত মানসম্পন্ন টিকা প্রদানের মাধ্যমে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে টিকা প্রদানের পর মুরগির শরীরে পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে কি না তা হিমাগ্লুটিনেশন ইনহিবিশন (এইচ আই) পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন এইচ এন্টিজেন। বিদেশ থেকে এই এন্টিজেন আমদানি করে এইচ আই পরীক্ষা করা হতো বিধায় অতিরিক্ত ব্যয় হতো। বিএলআরআই ইতোমধ্যেই স্বল্প খরচে এইচ আই এন্টিজেন উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। পরীক্ষা করে নিশ্চিত করা হয়েছে যে বিএলআরআই এ উৎপাদিত অ্যান্টিজেনের মান আমদানিকৃত এন্টিজেনের সমমানের।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- বিদেশ থেকে এইচ.এ. এন্টিজেন আমদানি করে এইচ আই পরীক্ষা করা হয় বিধায় অতিরিক্ত ব্যয় হয়।
- স্বল্প খরচে এইচ. এ. এন্টিজেন উৎপাদন করা হয়েছে বিধায় কম খরচে এইচ আই পরীক্ষা করা যায়।
- আমদানিকৃত এবং দেশে প্রস্তুতকৃত এন্টিজেন সমানভাবে কার্যকর।
- প্রযুক্তিটি ব্যবহারে পরিবেশের ওপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই।

ব্যবহার পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ

- ৯-১০ দিন বয়সের মুরগির ভ্রূণ (Chicken Embryo) : বিশেষ ভাবে পালনকৃত প্যারেন্ট স্টক হতে সংগ্রহকৃত ফুটানোর উপযোগী সাদা ডিম ৯-১০ দিন ইনকিউবেট করে এই ভ্রূণ তৈরি করতে হবে।
- শনাক্তকৃত স্থানীয় ভাইরাস/টিকা ভাইরাস (Local isolate/Vaccine virus) এর ১০-৩ ডাইলুশনের নমুনা।
- ডিম ছিদ্র করার যন্ত্র (Egg driller)।
- সিরিঞ্জ ০.১ মিলি দাগ কাটা।
- স্কচটেপ বা মোম।
- জীবাণুনাশক দ্রবণ মিশ্রিত তুলা (জীবাণুনাশক হিসেবে আয়োডিন যৌগ ব্যবহার করা উত্তম)।
- ভ্রূণ পরীক্ষা করার যন্ত্র (Candler)।
- পিবিএস (Phosphate buffered saline)।
- ফরমালিন।
- সেন্ট্রিফিউজ মেশিন।
- মাল্টিচ্যানেল পিপেট, টিপস ও টেস্টটিউব।
- লাইয়োফিলাইজার/ফ্রিজ ড্রয়ার।

চিত্র : ND ভাইরাস হার্ভেস্টিং

এন্টিজেন উৎপাদন পদ্ধতি

- জীবাণুনাশক যৌগ মিশ্রিত তুলা দিয়ে ৯-১০ দিন বয়সের ভ্রূণায়িত ডিম ভালোভাবে মুছে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- ভ্রূণ পরীক্ষা করার যন্ত্রের সাহায্যে প্রথমে ভ্রূণায়িত ডিমের পূর্ণ বায়ুথলি (Air sac) অঞ্চল চিহ্নিত করতে হবে। অতঃপর ভ্রূণের যে এলাকায় রক্তনালী কম সে এলাকা বরাবর একটি উলম্ব (Vertical) দাগ দিতে হবে

- উল্লম্ব দাগটি বায়ুথলির দাগের সাথে যে জায়গায় মিলিত হয়েছে সে জায়গার ০.২৫-০.৫ ইঞ্চি উপরে ডিম ছিদ্র করার যন্ত্র দিয়ে একটি ছিদ্র করতে হবে। যন্ত্রটি অবশ্যই জীবাণুনাশক যৌগ মিশ্রিত তুলা দিয়ে ভালোভাবে মুছে নিতে হবে।
- পূর্বে টাইট্রেশন করা ১০-৩ ডাইলুশনের ভাইরাস বা ইনোকুলাম থেকে সিরিঞ্জের সাহায্যে ০.১ মিলি ইনোকুলাম ভ্রূণের এলানটোয়িক থলি (Allanotoic Sac Route) পথে ইনজেকশন করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সুঁচের অগ্রভাগ ভ্রূণের গায়ে আঘাত না করে। একই ধরনের এবং বয়সের কিছু ভ্রূণায়িত ডিম কন্ট্রোল হিসেবে রাখতে হবে যার মধ্যে শুধুমাত্র ০.১ মিলি পিবিএস প্রয়োগ করতে হবে।
- ইনজেকশনের ছিদ্রটি মোম বা স্কচটেপ দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।
- ডিমগুলোকে পুনরায় ইনকিউবেটরে স্থাপন করে ৪-৫ দিন রাখতে হবে এবং প্রত্যেক দিন পরীক্ষা করতে হবে। প্রথম ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টায় যে ভ্রূণগুলো মারা যাবে সেগুলো দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু বলে বিবেচনা করা হবে। পরবর্তীতে যে ভ্রূণগুলো মারা যাবে সেগুলো ৪° সেঃ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। পঞ্চম দিনে যে ভ্রূণগুলো জীবিত থাকবে সেগুলোকেও ৪° সেঃ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে।
- পরবর্তী দিনে ডিমগুলো থেকে এলানটোয়িক ফ্লুইড বা তরল (Allantoic Fluid) সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি ডিম থেকে প্রায় ১০মিলি ফ্লুইড সংগ্রহ করা যায়।
- ডিম পরীক্ষা করার জন্য একটি গ্লাস স্লাইডে ৫০ মাইক্রোলিটার বা ১ (এক) ড্রপ এলানটোয়িক ফ্লুইভ এবং সমপরিমাণ ৩% চিকেন RBC মেশাতে হবে। ভাইরাস প্রয়োগকৃত ডিমের ফ্লুইড চিকেন RBC এর এগ্লুটিনেশন ঘটাবে, অপরপক্ষে কন্ট্রোল ডিমের ফ্লুইড এগ্লুটিনেশন ঘটবে না।
- রানীক্ষেত রোগের ভাইরাস হিমাগ্লুটিনেশন ঘটিয়েছে কি না তা সঠিকভাবে জানার জন্য এইচ.আই পরীক্ষা করতে হবে। এজন্য ভাইরাস প্রয়োগকৃত প্রতিটি ডিমের এলানটোয়িক ফ্লুইড থেকে দুই সেট দুই ফোল্ড (Two fold) ডাইলুশন করতে হবে। এক সেটে রানীক্ষেত রোগের জানা পজিটিভ সিরাম এবং অন্য সেটে জানা নেগেটিভ সিরাম মেশাতে হবে। আধ ঘণ্টা তাপমাত্রায় রেখে সমপরিমাণ ০.৫% চিকেন RBC উভয় সেটে মেশাতে হবে। এ অবস্থায় ৩০-৬০ মিনিট রেখে ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পজিটিভ সিরাম হিমোগ্লুটিনেশনে-এ বাধা দেবে এবং নেগেটিভ সিরাম তা পারবে না।
- উক্ত ফ্লুইড বা তরল ভালোভাবে ছেঁকে নিয়ে ১:১৬০০ ডাইলুশন হিসেবে ফরমালিন যোগ করে ভালোভাবে মেশাতে হবে। অতপর ১৫০০ rpm এ ১০ মিনিট সেন্ট্রিফিউজ (Bench type) করতে হবে। পরিশেষে ওপরের ফ্লুইড সংগ্রহ করে তার এইচ এ টাইট্রেশন করে এন্টিজেনিক ক্ষমতা নির্ণয় করতে হবে।
- তরল হিসেবে উক্ত এন্টিজেন -২০° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায় অথবা লায়োফিলাইজ (Freeze Dry) করে ৪° সে. তাপমাত্রায় ট্যাবলেট আকারে সংরক্ষণ করা যায়। প্রতিটি এন্টিজেন ট্যাবলেট ১ মিলি পিবিএস-এ গুলানোর পর টাইট্রেশন করে ব্যবহার করতে হবে। এই এন্টিজেন প্রতিবার ব্যবহারের আগে অ্যান্টিজেনিক ক্ষমতা নির্ণয় করে নিতে হবে। একবার ক্ষমতা বিবেচনা না করে পুনরায় পরীক্ষা করে ক্ষমতা নির্ণয় করতে হবে।

আয়ব্যয় (প্রযুক্তি ব্যবহারে লাভ-ক্ষতি)

স্বল্প খরচে এই এন্টিজেন উৎপাদন করে এইচ আই পরীক্ষার জন্য অ্যান্টিজেনের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব, যা রানীক্ষেত রোগ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিদেশ থেকে আমদানি করা অ্যান্টিজেনের ডোজ প্রতি খরচ পড়ে ৫ টাকা অথচ একই গুণ সম্পন্ন বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত অ্যান্টিজেনের ডোজ প্রতি খরচ পড়ে মাত্র ০.১০ টাকা।

ব্যবহার সম্ভাবনা (কোন ঋতুতে কোন অঞ্চলে ব্যবহারযোগ্য)

বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট সকল গবেষণাগার যেখানে এন্টিজেন তৈরির সকল সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা/ বিশেষ পরামর্শ

শুধুমাত্র লেন্টোজেনিক বা মেসোজেনিক ভাইরাস মুরগির ভ্রূণে চাষ করে এবং ফরমালিন দিয়ে উক্ত ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় (Killed) করে এন্টিজেন উৎপাদন করতে হবে। কখনো এন্টিজেন উৎপাদনে ভেলোজেনিক ভাইরাস ব্যবহার করা যাবে না।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, ড. শাহ মোঃ জিকরুল হক চৌধুরী, ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এবং ড. এম. জে. এফ. এ. তৈমুর।

ছাগলের বসন্ত রোগের টিকা

ছাগলের বসন্ত বা গোটপক্স (Goatpox) একটি তীব্র সংক্রামক রোগ। পক্সভিরিডি (Poxviridae) গোত্রের ক্যাপ্রিপক্স (Capripox) গনের গোটপক্স (Goatpox) নামক ভাইরাস দ্বারা এ রোগটি হয়। এ ভাইরাসটি সরাসরি অসুস্থ ছাগলের সংস্পর্শে, অসুস্থ ছাগল কর্তৃক সংক্রামিত বিভিন্ন উপাদান ও পরিবেশ হতে ছড়ায়। এ রোগে সব বয়সের ছাগলই আক্রান্ত হয়ে থাকে। বাচ্চার ক্ষেত্রে সাধারণত এ রোগটি মারাত্মক প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং মৃত্যুর হার প্রায় ১০০ ভাগ, অন্যদিকে বড় ছাগলের ক্ষেত্রে মৃদু প্রকৃতির হয়ে থাকে যাতে মৃত্যুর হার প্রায় ৫০ ভাগ। মৃত্যুহার ছাড়া এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে নিরাময় হলেও প্রাণীর শারীরিক বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। ত্বকের তীব্র ক্ষতির কারণে চামড়ার মূল্য কমে যায়। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলায় প্রথম এই রোগটি দেখা যায় এবং এর থেকে রোগটি বাংলাদেশের পশ্চিম-দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাগুলোতে বিরাজমান রয়েছে এবং দেশের অন্যান্য এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়ছে। ছাগলের বসন্ত রোগটি প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো টিকা প্রদান। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশীয় মাঠ পর্যায়ের ভাইরাস ব্যবহার করে ছাগলের বসন্ত রোগের হোমোলোগাস টিকা উদ্ভাবন করেছে, যা খুবই কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।ছাগলের বসন্ত রোগের টিকা উদ্ভাবনের জন্য মাঠ পর্যায়ের রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতা সম্পন্ন (Virulent) ভাইরাসের, রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতাকে (Virulency) হ্রাস করে একটি টিকা ভাইরাস (Attenuated vaccine virus) উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই ভাইরাসের দ্বারা ছাগলের বসন্ত রোগের টিকা উৎপাদন করা হয়েছে। Verocell line বা African Green Monkey Kidney cell line -এ Attenuated virus টি ৪৫ বার প্যাসেজ (Passage) দেয়া হয়েছে। প্যাসেজকৃত ভাইরাসটির কার্যকারিতা ছাগলে দেখা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ের রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতাসম্পন্ন (Virulent) ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছে। বৃহৎ আকারে এই টিকা উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে, যার ফলে মাঠ পর্যায়ে এই টিকা প্রদান করে দেশের লক্ষ্য লক্ষ্য ছাগলের জীবন বাঁচানো সম্ভব হবে।

চিত্রঃ বসন্ত রোগে আক্রান্ত ছাগল

বৈশিষ্ট্য

- এটি দেশীয় ভাইরাস হতে তৈরি হোমোলোগাস ভ্যাকসিন।
- টিকা দেয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়।
- একবার টিকা দেয়ার পর ছাগলের দেহে ছয় মাস পর্যন্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে।
- এই টিকার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।

ব্যবহার নির্দেশিকা

- বাচ্চার চার মাস বয়সে প্রথমবার এবং প্রতি ছয় মাস মাস পর পর টিকা প্রদান করতে হবে।
- প্রতিটি প্রাণীকে ১ সিসি করে টিকা দিতে হবে।
- পালের সব প্রাণীকে একসাথে টিকা দিতে হবে।

বিশেষ সতর্কতা

- অসুস্থতা বা পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত অবস্থায় ছাগলকে বসন্তের টিকা না দেয়াই উত্তম। কারণ এতে টিকাকৃত ছাগলে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হবে না।
- পিপিআর রোগ থেকে সদ্য নিরাময় হওয়া ছাগলকে টিকা না দেয়াই উত্তম।

উপকারিতা

এই টিকা ব্যবহারের ফলে খামারিরা তাদের ছাগলের জীবন রক্ষার পাশাপাশি ছাগলের চামড়া বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক
ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম, ড. কাজী মোঃ কমরউদ্দিন
ড. শাহ মোঃ জিকরুল হক চৌধুরী, ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন এবং ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান

ছাগলের বসন্ত রোগ নির্ণয়ে EISA পদ্ধতি

ভূমিকা

ছাগলের বসন্ত বা গোটপক্স (Goatpox) একটি তীব্র সংক্রামক রোগ। পক্সভিরিডি (Poxviridae) গোত্রের ক্যাপ্রিপক্স (Capripox) গণের গোটপক্স (Goatpox) নামক ভাইরাস দ্বারা এ রোগটি হয়। এ ভাইরাসটি সরাসরি অসুস্থ ছাগলের সংস্পর্শে, অসুস্থ ছাগল কর্তৃক সংক্রামিত বিভিন্ন উপাদান ও পরিবেশ হতে ছড়ায়। এ রোগে সব বয়সের ছাগলই আক্রান্ত হয়ে থাকে। বাচ্চার ক্ষেত্রে সাধারণত এ রোগটি মারাত্মক প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং মৃত্যুর হার প্রায় ১০০ ভাগ, অন্যদিকে বড় ছাগলের ক্ষেত্রে মৃদু প্রকৃতির হয়ে থাকে যাতে মৃত্যুর হার প্রায় ৫০ ভাগ। মৃত্যুহার ছাড়া এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে নিরাময় হলেও প্রাণীর শারীরিক বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। ত্বকের তীব্র ক্ষতির কারণে চামড়ার মূল্য কমে যায়। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলায় প্রথম এই রোগটি দেখা যায় এবং এর থেকে রোগটি বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে বিরাজমান রয়েছে।

রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে ছাগলের দেহে উচ্চ তাপমাত্রা দেখা দেয় (১০৫°-১০৬° ফা.) এবং রোগটি পিপিআর রোগের মতোই মনে হয়। পরবর্তীতে দেহের পশমহীন স্থানে যেমন চোখের চারপাশে, কান, নাক, সামনের এবং পেছনের পায়ের ভেতরের দিক, মুখের সম্মুখ ভাগে, লেজের নিচে, পায়ুভাগে, ওলানে এবং বাটে বসন্তের গুটি ওঠে। তীব্র-প্রকৃতির রোগে শরীরের অন্যান্য স্থানেও বসন্তের গুটি ওঠে। লসিকা গ্রন্থি (লিম্ফনোড) ফুলে যায়। নাক দিয়ে তরল ক্ষরণ হতে হতে নাসারন্ধ্রে ঘা হয়ে যায়। আক্রান্ত ছাগল সম্পূর্ণরূপে দুর্বল না হওয়া পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করতে থাকে।

ছাগলের বসন্ত রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধের জন্য রোগ নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে ছাগলের বসন্ত রোগের ভাইরাস শনাক্তকরণের জন্য Enzyme Immuno Slide Assay (EISA) পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে স্বল্প ব্যয়ে, দ্রুত এবং সুনির্দিষ্টভাবে ছাগলের বসন্ত রোগের ভাইরাস শনাক্ত করা সম্ভব। ছাগলের বসন্ত রোগের ভাইরাসের বিরুদ্ধে তৈরিকৃত হাইপার ইম্মিউন সিরামের (অ্যান্টিবডি) সাথে বসন্ত রোগের ভাইরাসের (এন্টিজেন) বিক্রিয়া ঘটিয়ে রোগটি নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতি ব্যবহারে পরীক্ষণ খরচ ELISA পদ্ধতির চেয়ে অনেকগুণ কম। কারণ, ELISA পদ্ধতিতে একবার ব্যবহারযোগ্য ৯৬টি গর্তযুক্ত ব্যয়বহুল Polystyrene Plate এর পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের একাধিকবার ব্যবহারযোগ্য ১২টি গর্তযুক্ত কাচের (ভি, ডি, আর, এল) স্লাইড ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া, এই পদ্ধতিতে আমদানিকৃত মূল্যবান মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির পরিবর্তে দেশে তৈরি হাইপার ইম্মিউন অ্যান্টিবডি ব্যবহার করা হয়। ফলে পরীক্ষণ খরচ হয় অনেক কম। ELISA পদ্ধতিতে পরীক্ষণ নমুনা যেমনঃ অসুস্থ প্রাণীর শরীরের গুটি, চোখ, নাক দ্বারা নির্গত শ্লেষ্মা এবং মৃত প্রাণী হতে ফুসফুস, রক্তাভক্ষুদ্রান্ত্র কোনো প্রকার প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই সরাসরি ব্যবহার করা যায়। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ছাগলের বসন্ত রোগ নির্ণয় করে দ্রুত রোগ বিস্তার রোধ করা সম্ভব।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- এই পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে ছাগলের বসন্ত রোগ নির্ণয় ও পৃথকীকরণ সম্ভব।
- এই পদ্ধতিতে একই সাথে ছাগলের বসন্ত রোগ এবং পিপিআর রোগ নির্ণয় ও পৃথকীকরণ করা সম্ভব।
- এই পদ্ধতিতে মূল্যবান মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির পরিবর্তে দেশে তৈরি হাইপার ইম্মিউন অ্যান্টিবডি ব্যবহার করা হয়। ফলে পরীক্ষণ খরচ হয় অনেক কম।
- এই পদ্ধতিতে কেমিক্যাল ও রিয়েজেন্ট ELISA পদ্ধতির তুলনায় অর্ধেক খরচ হয়।
- ব্যয়বহুল ELISA পদ্ধতিতে ব্যবহৃত একবার মাত্র ব্যবহার যোগ্য ৯৬টি গর্তযুক্ত Polystrene Plate এর পরিবর্তে স্বল্প দামি বার বার ব্যবহার যোগ্য ভি ডি আর এল (১২টি গর্তযুক্ত কাঁচের স্লাইড) স্লাইড ব্যবহার করা হয়।
- এই পদ্ধতিটি মাঠ পর্যায়েও ব্যবহার করা যায়।

প্রয়োজনীয় কেমিক্যালস, রিয়েজেন্টস এবং যন্ত্রপাতি

- নমুনা (গুটি, চোখ, নাক দ্বারা নির্গত শ্লেষ্মা এবং মৃত প্রাণী হতে ফুসফুস, রক্তাভক্ষুদ্রান্ত্র)
- গোটপক্স এন্টিজেন
- পিপিআর এন্টিজেন
- গোটপক্স হাইপার ইম্মিউন অ্যান্টিবডি

- পিপিআর সুনির্দিষ্ট মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি
- কনজুগেট (অ্যান্টি-মাউস ইমিউনো-গ্লুবিউলিন জি)
- সাবস্ট্রেইট (হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড যুক্ত অর্থো ফিনাইলিন ডাইএমিন)
- ব্লকিং বাফার
- ওয়াশিং বাফার
- মাইক্রো-পিপেট
- ভিডিআরএল স্লাইড

প্রযুক্তির ব্যবহার

অসুস্থ প্রাণী হতে বিভিন্ন নমুনা যেমন চোখ, নাক দ্বারা নির্গত শ্লেষ্মা, মুখের লালা, পায়খানা, এবং মৃত প্রাণী হতে ট্রাকিয়ার ফেনাযুক্ত শ্লেষ্মা, ফুসফুস, রক্তাভক্ষুদ্রান্ত , জ্রেবা স্ট্রাইপ হতে নমুনা নিয়ে ভি ডিআর এল স্লাইডের (১২টি গর্তযুক্ত কাঁচের সাইড) প্রথম ও দ্বিতীয় সারিতে প্রলেপ তৈরি করতে হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ সারিতে পিপিআর ও রিন্ডারপেস্ট কন্ট্রোল অ্যান্টিজেনের প্রলেপ তৈরি করে স্লাইডটিকে ১৫ মিনিট হিম শীতল অ্যাসিটোনে রেখে দিতে হবে।

স্লাইডটি বাতাসে শুকানোর পর স্লাইডের প্রথম ও দ্বিতীয় কলামে যথাক্রমে পিপিআর ও রিন্ডারপেস্ট নির্দিষ্ট মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি যুক্ত করতে হবে। মধ্যম কলামটিতে শুধুমাত্র ব্লকিং বাফার দিতে হবে। এক ঘণ্টা ইনকিউবেটরে রাখার পর অ্যান্টি-মাউস ইমিউনো-গ্লুবিউলিন জি প্রত্যেক গর্তে যুক্ত করতে হবে।

এক ঘণ্টা ইনকিউবেটরে রাখার পর হাইড্রোজেন পারঅক্সাইভ যুক্ত অর্থো ফিনাইলিন ডাইএমিন (OPD) যোগ করার ১৫ মিনিটের মধ্যে ধনাত্মক নমুনাসমূহ সোনালী হলুদ বর্ণ ধারণ করবে।

পদ্ধতি ব্যবহারে সুবিধা

এই পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বল্প খরচে মহামারী বা আক্রান্ত এলাকায় দ্রুত রিন্ডারপেস্ট এবং বিশেষ করে পিপিআর রোগ নির্ণয় করে আক্রান্ত এলাকার আশপাশে পূর্বেই এই রোগের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেমন ভ্যাকসিনেশনের মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ করে বহু প্রাণীর জীবন রক্ষা করা সম্ভব।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক
ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম, ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, ড. এম. জে. এফ. এ. তৈমুর
ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান এবং ডা. মোঃ হাসান আল ফারুক

পিপিআর ভাইরাসের বিরুদ্ধে এন্টিবডি নির্ণয়ে C-EISA পদ্ধতি

ভূমিকা

পিপিআর ছাগল ও ভেড়ার একটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। ছাগলের এই রোগে আক্রান্তের হার প্রায় ৪০-১০০ ভাগ এবং মৃত্যুর হার ৪৫-৯০ ভাগ। পিপিআর রোগ প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো টিকা প্রদান। পিপিআর রোগের টিকা বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়ে বর্তমানে মাঠ-পর্যায়ে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু অনেক সময় খামারিদের কাছ হতে অভিযোগ আসে যে টিকা প্রদানের পরও ছাগলের পিপিআর রোগ প্রতিরোধ ঠিকমত হচ্ছে না। যার মানে হচ্ছে পিপিআর টিকা প্রদানের পরও ছাগলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা এন্টিবডি তৈরি হচ্ছে না, হলেও কতটুকু তৈরি হচ্ছে সেটার ওপর নির্ভর করছে ছাগলের পিপিআর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে কি নেই। ছাগলের দেহে পিপিআর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা অ্যান্টিবডি পরিমাপ করার জন্য বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবন করা হয়েছে C-EISA (Competitive Enzyme Immuno Slide Assay) পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পিপিআর ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা পরীক্ষণ ছাড়াও ছাগলের পিপিআর রোগ হয়ে যাওয়ার পর যে সব ছাগল জীবিত থাকে তাদের দেহে কি পরিমাণ অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে সেটাও জানা যাবে। তাছাড়া পিপিআর টিকাকৃত ছাগী হতে জন্ম নেয়া বাচ্চা কি পরিমাণ মেটারনাল অ্যান্টিবডি (মা হতে প্রাপ্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা) প্রাপ্ত হয়েছে সেটাও এই পদ্ধতির মাধ্যমে বের করা সম্ভব। মেটারনাল অ্যান্টিবডি নির্ণয় করা গেলে কতদিন বয়সে বাচ্চাকে টিকা দিতে হবে সেটা খুব সহজেই জানা যাবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে টিকাকৃত অথবা পিপিআর রোগ হতে সেরে ওঠা ছাগলের দেহে কি পরিমাণ অ্যান্টিবডি আছে সেটা জেনে সেই ছাগল হতে সিরাম সংগ্রহ করে পিপিআর আক্রান্ত ছাগলে রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োগ করতে পারলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় বা রোগক্রান্ত ছাগলে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠে।

চিত্র ১: C-EISA পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- এই পদ্ধতির মাধ্যমে টিকা প্রয়োগকৃত ছাগলের দেহে কি পরিমাণ অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে তা খুব সহজেই জানা যাবে।
- পিপিআর রোগ থেকে সেরে ওঠা ছাগলের পিপিআর রোগের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডির পরিমাণ জানা যাবে।
- ছাগলের বাচ্চার দেহে কী পরিমাণ মেটারনাল অ্যান্টিবডি মা ছাগল হতে প্রাপ্ত হয়েছে সেটা বের করা যাবে।
- এই পদ্ধতিতে C-ELISA পদ্ধতির চেয়ে কেমিক্যাল ও রিয়েজেন্ট অর্ধেক খরচ হয়।
- এই পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে অ্যান্টিবডির পরিমাণ বের করা যায়।

প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল এবং রিয়েজেন্টস এবং যন্ত্রপাতি

- সিরাম
- পিপিআর এন্টিজেন
- পিপিআর সুনির্দিষ্ট মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি
- কনজুগেট (অ্যান্টি-মাউস ইমিউনো-গ্লবিউলিন জি)
- সাবস্ট্রেইট (হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড যুক্ত অর্থো ফিনাইলিন ডাইএমিন)
- ব্লকিং বাফার
- ওয়াশিং বাফার
- মাইক্রো-পিপেট

চিত্র ২: C-EISA পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় ক্যামিক্যালস ও রিয়েজেন্টস

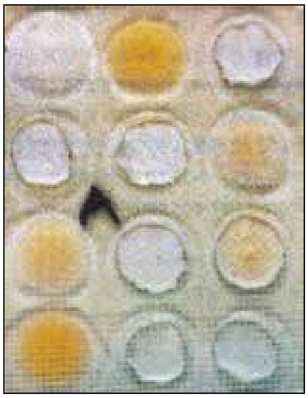

চিত্র ১: C-EISA পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফল

- ভি ডি আর এল স্লাইড
- ইলাইজা প্লেট
- ইলাইজা রিডার

C-EISA পদ্ধতি

- ভি ডি আর এল স্লাইডের (১২টি গর্তযুক্ত কাঁচের স্লাইড) প্রত্যেকটি গর্তে পিপিআর অ্যান্টিজেনের প্রলেপ দিয়ে বরফ শীতল এসিটোনে ১৫ মিনিট রেখে দিতে হবে।
- এসিটোন হতে স্লাইডটি বের করে স্লাইডের প্রথম কলামের ১নং, ২নং, ৩নং এবং ৪নং গর্তে যথাক্রমে ব্লকিং বাফার, স্ট্রং পজিটিভ পিপিআর অ্যান্টিবডি, উইক পজিটিভ পিপিআর অ্যান্টিবডি এবং পিপিআর সুনির্দিষ্ট মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি দিতে হবে। দ্বিতীয় কলামের প্রথম গর্তে পিপিআর নেগেটিভ অ্যান্টিবডি দেয়ার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলামের বাকি গর্তে পরীক্ষণ সিরাম দিতে হবে। অতঃপর প্রথম কলামের ১নং গর্ত বাদে বাকি সবগুলো গর্তে পিপিআর সুনির্দিষ্ট মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি দিয়ে ৩৭° সে. তাপমাত্রায় ইনকিউবেটরে ১ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে।
- ইনকিউবেটরে হতে বের করার পর অ্যান্টি-মাউস ইমিউনো-গুবিউলিন জি প্রত্যেক গর্তে যুক্ত করে আবার ১ ঘণ্টা ইনকিবেটরে রেখে দিতে হবে।
- পুনরায় ইনকিউবেটরে হতে বের করার পর হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড যুক্ত অর্থো ফিনাইলিন ডাইএমিন (OPD) যুক্ত করে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করার পর বিক্রিয়ার সোনালী হলুদ বর্ণের ঘণত্ব অনুসারে অ্যান্টিবডির পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। সুনির্দিষ্টভাবে অ্যান্টিবডির পরিমাণ জানার জন্য ইলাইজা রিডার -এ ৪৯২ nm। ফিল্টারের মাধ্যমে রিডিং নিতে হবে এবং প্রাপ্ত OD (Optical density) value হতে অ্যান্টিবডির পরিমাণ বের করতে হবে।

C-EISA পদ্ধতি ব্যবহারের সুবিধা

যেহেতু C-EISA পদ্ধতির মাধ্যমে টিকা প্রদানের আগে ও পরে, পিপিআর আক্রান্ত ছাগল সুস্থ হওয়ার পর এবং ছাগলের বাচ্চার মেটারনাল অ্যান্টিবডি নির্ণয় করা যায়, সেহেতু ছাগলের দেহে প্রাপ্ত অ্যান্টিবডির পরিমাণ হতে ছাগলের টিকা প্রদান সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। সুতরাং C-EISA পদ্ধতি প্রয়োগে একদিকে সুস্থ ছাগলের দেহে অ্যান্টিবডির পরিমাণ ও টিকা প্রদান সম্পর্কে ধারণা করা যাবে, অন্যদিকে পিপিআর আক্রান্ত ছাগলকে সুস্থ ছাগল থেকে পিপিআর অ্যান্টিবডি সমৃদ্ধ সিরাম প্রদান করে ছাগলের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম, ড. এম. জে. এফ. এ. তৈমুর, ডা. মোঃ গিয়াসউদ্দিন এবং ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান

তাপ সহিষ্ণু পিপিআর ভ্যাকসিন

ভুমিকা

পিপিআর বা Peste des Petits Ruminants (PPR) ছোট তৃণভোজী প্রাণীদের বিশেষ করে ছাগল ও ভেড়ার একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। সব বয়সের ছাগলই এই রোগের ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। তবে, এক বছর পর্যন্ত বয়সের ছাগল এই রোগে বেশী আক্রান্ত হয় এবং এর মৃত্যুর হারও বেশী (৯০%)। পিপিআর সর্বপ্রথম ১৯৪০ সালে আফ্রিকার আইভরি কোষ্টে সনাক্ত করা হয়। ১৯৫৪ সালে গবাদি প্রাণির রিন্ডারপেষ্ট ভাইরাসের খুব নিকট সম্পর্কীয় বলে এই ভাইরাসকে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে রোগটি আরব পেনিনসুলা হয়ে ১৯৮৭ সালে ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ছাগলের ক্ষেত্রে এই রোগের মারাত্মক ভয়াবহতার জন্য রোগটিকে 'গোট প্লেগ' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে প্রথম এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়। মহামারী হলে এই রোগে শতকরা ৯০ ভাগ থেকে ১০০ ভাগ প্রাণী আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং ৫০% থেকে ৮০% ভাগ প্রাণী মারা যায়। পিপিআর রোগটি প্রধানত, বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। আক্রান্ত প্রণীর সংস্পর্শ, খাবার অথবা পানিও রোগ ছড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভুমিকা পালন করতে পারে।

ছাগলের পিপিআর রোগ দমনের জন্য বিএলআরআই কর্তৃক ইতোপূর্বে উদ্ভাবিত পিপিআর এর তাপসংবেদনশীল টীকা মাঠ পর্যায়ে বর্তমানে ব্যবহার হচ্ছে। উক্ত টীকা সাময়িক সংরক্ষণের জন্য ২ থেকে ৪° ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণের জন্য -২০° ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। কিন্তু রোগ দমনে পূর্ণ সফলতা না আসায় উক্ত টীকার কার্যকারিতা যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং জাতীয় পর্যায়ে বিষয়টি আলোচিত হয়। সে আলোকে বিএলআরআই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পিপিআর টীকা প্রদানকৃত ছাগলের রক্ত নমুনা সংগ্রহ করে। সংগৃহীত নমুনা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে এবং এ সংক্রান্ত সংগৃহীত বিবিধ তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তাপসংবেদনশীল টীকাটি উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহনসহ কৃষকের খামারে ব্যবহার পর্যন্ত যে ধরনের ঠান্ডা অবস্থা (Cool chain) অনুসরণ করা প্রয়োজন তা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে তাপসংবেদনশীল টীকার কর্যকারিতা অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এরই প্রেক্ষাপটে পিপিআর রোগ দমনের জন্য একটি তাপসহনশীল (Thermostable) টীকার প্রয়োজনীয়তা জাতীয় পর্যায়ে অনুভূত হয়। উক্ত বিষয়গুলি বিবেচনার করে প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগের বিজ্ঞানীগণ গবেষণার মাধ্যমে পূর্বে উদ্ভাবিত টীকার ভাইরাস হতে তাপ-সহিষ্ণু টীকা তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। পরবর্তীতে এই টীকার কার্যকারিতা মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথলজী বিভাগের সাথে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উক্ত গবেষণায় দেখা যায় এই তাপ-সহিষ্ণু টীকার ৪° ডিগ্রী সেলসিয়স তাপ মাত্রায় ১৪ (চৌদ্দ) দিন পর্যন্ত রেখে দেয়ার পরও টীকার গুণগতমান বজায় থাকে। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের ৩০ এপ্রিল, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে টীকাটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে নিকট আনুষ্ঠানিক ভাবে হস্তান্তর করা হয়।

পিপিআর রোগের তাপ সহিষ্ণু টীকার মাষ্টার সীড প্রস্তুত প্রক্রিয়া

পিপিআর রোগের তাপ-সহিষ্ণু টীকার মাষ্টার সীড প্রস্তুতের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আক্রান্ত ছাগল থেকে মাঠ পর্যায়ে সক্রিয় সংক্রমণশীল ভাইরাস নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

পদ্ধতি

মাঠ পর্যায়ে ভাইরাসটির সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত মাঠ পর্যায়ের ভাইরাস (Wild virus) এর সনাক্তকরণ ও পৃথকীকরণ (Identification and Isolation) প্রক্রিয়া ঃ

নমুনা সংগ্রহ ঃ আক্রান্ত প্রাণীর নাক, কান এবং চোখের নিঃসরণ এবং মৃত প্রাণীর ফুসফুসের এলভিওলি বা শ্বাসনালীর মাংসপেশীকে নমুনা হিসাবে সংগ্রহ করা হয়। কারণ এসব নমুনাতেই সবচেয়ে বেশী ভাইরাসের ঘনত্ব পাওয়া যায়।

ভাইরাস পৃথকীকরণ ও সনাক্তকরণ: মাঠ পর্যায়ের নমুনাটিতে ভাইরাসের উপস্থিতি আছে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রথমে সংগ্রহকৃত নমুনাকে পিসিআর করার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তত করা হয়। প্রস্তুতকৃত নমুনা পিসিআর করে নমুনাটিতে পিপিআর ভাইরাসের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়।

সিড উৎপাদন: প্রথম পর্যায়ে ভাইরাস সেলের মধ্যে অভিযোজিত (adapted) হলে সেলের পরিবর্তন বা সাইটোপ্যাথিক ইফেক্ট দৃশ্যমান হয়। যে ভাইরাস যে সেলের জন্য সংবেদনশীল সেই ভাইরাসের জন্য সেই নির্দিষ্ট সেল ব্যবহার করতে হয়। যেমন পিপিআর ভাইরাসের জন্য ভেরো সেল লাইন ব্যবহার করা হয়। ভেরো সেল লাইন একটি স্থায়ী (continuous) সেল লাইন।

সেল ফ্লাস্ক

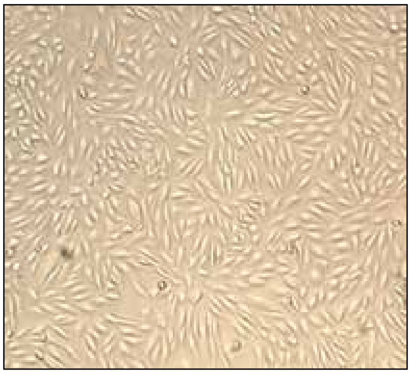

মনো লেয়ার ভেরো সেল

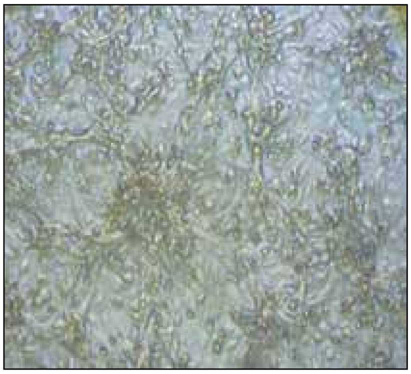

সাইটোপ্যাথিক ইফেক্ট

মাঠ পর্যায়ের পৃথকীকৃত ও সনাক্তকৃত ভাইরাসকে ভেরো সেল লাইনে ৭০ টি Passage দেওয়ার পর যখন ভাইরাসটির রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতা (virulency) স্থগিত হয়ে (attenuated) হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে তখন এটিকে সিড হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এরপর সিড ভাইরাসের সঙ্গে এডজুভেন্ট মিশিয়ে লাইফোলাইজ করে বোতলজাত করা হয়েছে।

তাপ সহিষ্ণুতা পরীক্ষা

তাপ সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির জন্য অধিকতর ট্রিহ্যালোজ (Trehalose) ব্যবহার করা হলে ভ্যাকসিনের টাইটার ভাল পাওয়া যাবে যা অধিকতর কার্যকরী হবে। গবেষণায় ভ্যাকসিনটিকে ইনকিউবেটরে বিভিন্ন তাপ মাত্রায় যেমন ৪° সে., ২৫° সে., ৩৭° সে., ৪০° সে. ভ্যাকসিনটিকে সংরক্ষণ করে এরপর ভ্যাকসিনের ভাইরাসের টাইটার নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখা গেছে ১৪ দিনের পর্যন্ত ভ্যাকসিনের টাইটার অন্য অর্থে ভ্যাকসিনের গুণগত মান সঠিক মাত্রায় রয়েছে।

ভ্যাকসিন ভাইরাস সাসপেনশনের টাইট্রেশন

ভ্যাকসিন ভাইরাস সাসপেনশন লাইফোলাইজেশন করার পূর্বে এবং পরে একবার করে $TCID_{50}$ নির্ধারণ করতে হয়। পূর্বে ১০^{৬} $TCID_{50}$/ মি:লি: এর বেশী এবং লাইফোলাইজেশনের পর যার মাত্রা কিছুটা হ্রাস পায়। এখানে রিড এবং মুয়েনচ (Reed & Muench, 1938) পদ্ধতিতে ভাইরাসের টাইটার নির্ণয় করা হয়।

লাইফোলাইজেশন

এ কার্যক্রমের একটি প্রধান অংশ হ'ল ভ্যাকসিন ফ্লুইডকে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে তাপমাত্রা, চাপ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে ভ্যাকসিন হিসাবে প্রস্তুতকরণ।

বিশেষ সর্তকতা

* লাইফোলাইজেশন চলাকালীন সময়ে নির্দিষ্ট সময় পরপর তাপমাত্রা, চাপ পর্যবেক্ষণ করে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

* যন্ত্রপাতি বৈদ্যুতিক বা অন্য কারণে কোন বিঘ্ন ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং প্রকৌশলীকে অবহিত করতে হবে।

লাইফোলাইজেশন ফ্লো-চার্ট

লাইফোলাইজেশন পূর্ব ভাইরাস টাইটার নির্ণয়

↓

ভ্যাকসিন ফ্লুইড

↓

ভ্যাকসিন ফ্লুইড + ট্রিহ্যালোজ (মিশ্রণ)

↓

ভায়ালে বন্টন ও আংশিক বন্ধকরণ

↓

ফ্রিজ ড্রায়ার চালু

↓

তাকের ৪০° সে. তাপ মাত্রা এবং কনডেনসারের তাপ মাত্রা (-৪০° সে.)

↓

ভ্যাকুয়াম পাম্প খুলে দিতে হবে

↓

চেম্বারের চাপ ৮০০ Mpa কন্ডেসারের চাপ ৫০০ Mpa রাখার জন্য ম্যাক্রো এয়ার এডমিটেন্স ভাল্ব নিয়ন্ত্রক দ্বারা স্থির করতে হবে

↓

প্রাইমারী ড্রাইং

↓

সেকেন্ডারী ড্রাইং

↓

ক্যাপিং

↓

লাইফোলাইজেশন পরবর্তী ভ্যাকসিনের টাইটার নির্ণয়

বিঃ দ্রঃ ভ্যাকসিনের ভাইরাস টাইটার কমপক্ষে ১০^{৬} $TCID_{50}$/ মিলি থাকতে হবে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- এটি একটি তাপ-সহিষ্ণু টীকা, ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১৪ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হলেও কার্যকারিতা নষ্ট হয় না।
- টীকাটি সাধারণ তাপমাত্রায় (২০ থেকে ৩৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস) সংরক্ষণ, পরিবহন এবং ব্যবহার করা যায়।
- এই তাপ-সহিষ্ণু টীকার কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই।

ব্যবহার নির্দেশিকা

- প্রতিটি প্রাণীকে ১ মিলি পরিমাণ টীকা দিতে হবে।
- একত্রে রাখা সমস্ত প্রাণীকে একসাথে টীকা প্রদান করতে হবে।
- অসুস্থ প্রাণীকে এ টীকা দেয়া যাবে না।

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তিটির আর্থ-সামাজিক উপযোগিতা

বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে দিন দিন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে গত বৎসরগুলিতে উষ্ণ দিনগুলির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। তা ছাড়া মানসম্মতভাবে টীকা সংরক্ষণ ও পরিবহনে আমাদের দেশের সক্ষমতা খুবই দুর্বল। এমতাবস্থায় তাপ-সহিষ্ণু পিপিআর টীকা উৎপাদনের পর সংরক্ষণ এবং খামারি পর্যায়ে পরিবহনের সময় যদি কোন ধরনের নিম্নতাপ বজায়ে রাখার সমস্যা হয়, তবে টীকা নস্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এর ফলে পরিবহন ও সংরক্ষণ খরচ হ্রাস পাবে। তাছাড়া বর্তমানে ব্যবহৃত টীকাটিকে তাপ-সহিষ্ণু করে ব্যবহার করা হলে এর মান ৪০° সেলসিয়াস তাপ মাত্রায় অন্তত ১৪ দিন বজায় থাকবে। ফলে এই টীকার কার্যকারিতা আরো অধিক হারে পাওয়া যাবে। আমাদের দেশের গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির এক বিরাট অংশ ছাগল পালন করে থাকে। বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের মাধ্যমেই আমাদের ছাগল ও ভেড়া বেশী পালিত হয়ে থাকে। ছাগল ও ভেড়ার প্রধান রোগ পিপিআর থেকে রক্ষা

করতে পারলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্ত করা যাবে। সেই ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের ক্ষেত্রে এই টীকা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগোষ্টির দারিদ্র্যতা লাঘবের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবে।

এছাড়া খামারি বা বিনিয়োগকারীদের ছাগল বা ভেড়া পালনের বিনিয়োগকেও আকৃষ্ট করবে এবং ছাগল ও ভেড়া পালনের মাধ্যমে সমৃদ্ধি ও সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

পরিবেশ দূষণরোধ এবং ফুড সেফটি ও পুষ্টি নিরাপত্তায় প্রযুক্তিটির অবদান

প্রযুক্তিটির পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব নাই। প্রযুক্তিটি ব্যবহারের ফলে ছাগলের মৃত্যুর হার হ্রাস পাবে এবং ছাগল ও ভেড়ার মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব

বর্তমানে (২০১৩ সাল) বাংলাদেশে প্রায় ২৭ মিলিয়ন ছাগল ও ভেড়া রয়েছে। পিপিআর রোগের ফলপ্রসূ চিকিৎসা না থাকায় টীকা প্রদানই এই রোগ নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী পদ্ধতি। পিপিআর নিয়ন্ত্রণের জন্য এই তাপ-সহিষ্ণু টীকা ব্যবহার করা যাবে। প্রতিবছর এই তাপ-সহিষ্ণু টীকা ব্যবহার করা হলে পিপিআর রোগে ছাগল ও ভেড়ার মৃত্যুজনিত ক্ষতির পরিমাণও হ্রাস পাবে। অতএব তাপ-সহিষ্ণু এই টীকা ব্যবহারের মাধ্যমে পিপিআর এ ছাগল /ভেড়ার মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে, যা প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

উপসংহার

তাপ-সহিষ্ণু পিপিআর টীকা পরিবহন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সময় নিম্ন তাপে সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না বিধায় টীকাটি সঠিক গুনগত মান বজায় রেখেই খামারি পর্যায়ে ব্যবহার করা যাবে। ফলে ছাগল ও ভেড়া পিপিআর এর হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই টীকা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

চিত্র ঃ পিপিআর রোগে আক্রান্ত ছাগল

চিত্রঃ সুস্থ ছাগল

চিত্র ঃ তাপ-সহিষ্ণু পিপিআর টিকা
(Thermostable PPR vaccine)

গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন
ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, ড. এম. জে. এফ. এ. তৈমুর এবং ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম

বিএলআরআই এফএমডি-২০১৬ (O, A এবং Asia-1) ত্রিযোজি টীকার মাস্টার সীড

ভূমিকা

ক্ষুরারোগ (Foot and Mouth Disease) একটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি দ্বিখুর বিশিষ্ট প্রাণী এই রোগে আক্রান্ত হয়। প্রাণী চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই রোগকে সবচেয়ে মারাত্মক সংক্রামক রোগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই রোগের ভাইরাস আক্রান্ত প্রাণী হতে ৭০-৮০ কি:মি: দূরবর্তী সংবেদনশীল প্রাণীকে আক্রান্ত করতে পারে। এই রোগকে কোন কোন অঞ্চলে ক্ষুরাচল বা বাতনাও বলে থাকে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে যে, সার্বিকভাবে গরুতে এই রোগে আক্রান্তের হার শতকরা ৩৫.৫ ভাগ, মহিষে শতকরা ২৩.৩ ভাগ, এবং ছাগল ও ভেড়া শতকরা ৫ ভাগ। এই রোগে আক্রান্ত বয়স্ক প্রাণীতে মৃত্যুর হার কম হলেও মহামারী এলাকায় আক্রান্ত বাছুরের মৃত্যুর হার শতকরা ৫০-৭০ ভাগ পাওয়া গেছে। গর্ভাবস্থায় এ রোগ হলে প্রায়ই গর্ভপাত হতে দেখা যায় এবং পরবর্তী গর্ভধারণে সমস্যা দেখা যায়। ক্ষুরারোগ এপথো-ভাইরাস নামক এক প্রকার অতিক্ষুদ্র ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট একটি রোগ। সারা বিশ্বে এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসের ৭টি সিরোটাইপ সনাক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি সিরোটাইপের আবার অনেক সাব-টাইপ রয়েছে। দেশে বর্তমানে ৩টি সিরো টাইপ (O, A, ও Asia-1) বিরাজ করছে। বাংলাদেশে প্রায় সারা বছরই এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। তবে বর্ষা এবং শীতকালে এফএমডির প্রকোপ বেশী দেখা যায়।

চিত্র : হস্তান্তরিত ত্রিযোজী FMD ভ্যাক্সিন

এ রোগের কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর ক্ষতির পরিমাণ ১৮০০০ কোটি টাকারও বেশী বলে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়। সংকর জাতের গরুতে এই রোগের সংক্রমণ তুলনামূলকভাবে বেশী পাওয়া যায়। এরই প্রেক্ষিতে এই রোগের কারণে বিনিয়োগ ও জাত উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে ব্যহত হচ্ছে। ক্ষুরারোগ ভাইরাসটির বৈশিষ্ট্যের কারণে, এক টাইপ দ্বারা তৈরি টীকা অন্য টাইপ দ্বারা সৃষ্ট রোগকে প্রতিরোধ করতে পারে না। এ কারণে ক্ষুরারোগ দমনের জন্য এফএমডি ত্রিযোজি (O, A এবং Asia-1) টীকার সঠিক ব্যবহার অতি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্প, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রায় পাঁচ বৎসর গবেষণা করে এফএমডি ত্রিযোজি (A, O এবং এশিয়া-১) টীকার মাষ্টার সীড প্রস্তুত করে। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে টীকাটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে এই মাষ্টার সীড দ্বারা প্রস্তুতকৃত টীকা মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ক্ষুরারোগের ত্রিযোজী (O, A এবং Asia-1) টীকার মাষ্টার সীড প্রস্তুত প্রক্রিয়া

ক্ষুরারোগের (এফএমডি) ত্রিযোজি (O, A এবং Asia-1) টীকার মাষ্টার সীড প্রস্তুতের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আক্রান্ত গরু থেকে মাঠ পর্যায়ে সক্রিয় সংক্রমণশীল ভাইরাস নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

পদ্ধতি

মলিকুলার পদ্ধতিতে যাচাই বাছাই করে দেশে বিরাজমান ভাইরাসগুলির সাথে সবচেয়ে বেশী (Closely related) সাদৃশ্য আছে এমন ভাইরাসটি নির্বাচন করা হয়। সংগৃহীত মাঠ পর্যায়ের ভাইরাস (Wild virus) এর সনাক্তকরণ ও পৃথকীকরণ (Identification and Isolation)

প্রক্রিয়া

নমুনা সংগ্রহ : আক্রান্ত প্রাণী থেকে জিহ্বার উঠে আসা ফোসকা বা উপরিভাগের পেশী (এপিথেলিয়াল টিস্যু), মুখের লালা, ক্ষুরার মাঝে ঘা কবলিত অংশ থেকে টিস্যু সংগ্রহ করা হয়। কারণ এসব নমুনাতেই সবচেয়ে বেশী ভাইরাসের ঘনত্ব পাওয়া যায়।

ভাইরাস পৃথকীকরণ ও সনাক্তকরণ: মাঠ পর্যায়ের নমুনাটিতে এফএমডি ভাইরাস বা কোন টাইপের ভাইরাসের উপস্থিতি আছে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রথমে পিসিআর করার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত নমুনা পিসিআর করে প্রথমে নিশ্চিত করা হয়, নমুনাটিতে এফএমডি ভাইরাসের উপস্থিতি আছে কি না। এ পর্যায়ে পিসিআর করতে এফএমডি ইউনিভার্সাল প্রাইমার ব্যবহার করা হয়। এরপর আরেকবার নির্দিষ্ট ভাইরাস টাইপের জন্য নির্দিষ্ট প্রাইমার দিয়ে পিসিআর করে ভাইরাসের টাইপ নির্ণয় করা হয়।

সিড উৎপাদন: প্রথম পর্যায়ে ভাইরাস সেলের মধ্যে অভিযোজিত (adapted) হলে সেলের পরিবর্তন বা সাইটোপ্যাথিক ইফেক্ট দৃশ্যমান হয়। যে ভাইরাস যে সেলের জন্য সংবেদনশীল সেই ভাইরাসের জন্য সেই নির্দিষ্ট সেল ব্যবহার করতে হয়। যেমন এফএমডি ভাইরাসের জন্য BHK_{21} সেল লাইন ব্যবহার করা হয়। BHK_{21} সেল লাইন একটি সরবরাহকৃত স্থায়ী সেল লাইন।

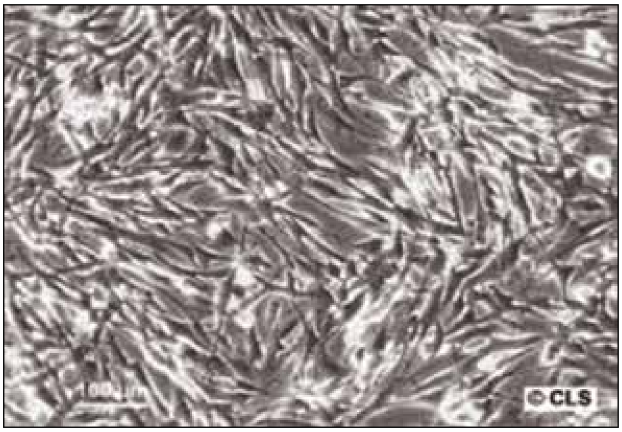

BHK21 সেল

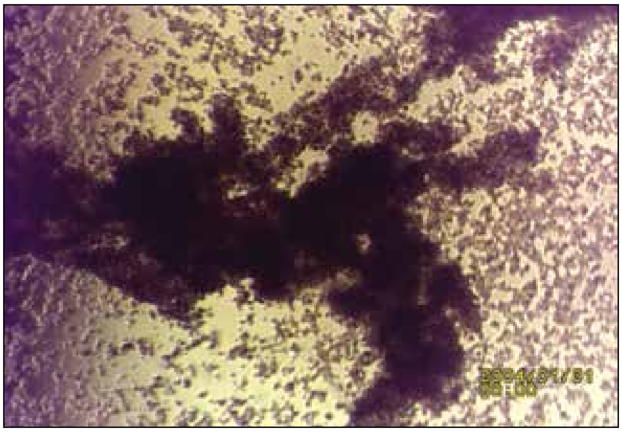

BHK21 সেলের মধ্যে এফএমডি ভাইরাসের সাইটোপ্যাথিক ইফেক্ট।

মাঠ পর্যায়ের পৃথকীকৃত ও সনাক্তকৃত ভাইরাসকে BHK_{21} সেল লাইনে ২০ টি Passage দেওয়ার পর যখন ভাইরাসটির রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতা (virulency) স্তিমিত হয়ে (attenuated) হয়েছে বলে পরীক্ষায় দেখা যায় তখন এটিকে সীড হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বর্তমানে BHK_{21} সেল লাইনে O, A এবং Asia-1 সিরো টাইপ যথাক্রমে $10^{6.5}$/ml, $10^{6.66}$/ml এবং $10^{6.75}$/ml মাত্রায় ভাইরাস পাওয়া যায়। WOAH এর নির্দেশনা মোতাবেক Vaccine potency test এর জন্য ৬ মাস বয়সের এফএমডি টীকা (Vaccine) প্রদান করা হয় নাই বা এফএমডিতে আক্রান্ত হয় নাই, এমন ১০টি বাছুরে পরীক্ষামূলকভাবে প্রস্তুত Mineral oil adjuvent (1:1) মৃত টীকা প্রদান করা হয়। টীকা প্রদানের এক মাস ও ছয় মাস পর বাছুরগুলির রক্ত পরীক্ষা করা হয় এবং পর্যাপ্ত মাত্রায় এন্টিবডি পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার প্রাদুর্ভাব এলাকা থেকে সংগৃহীত O সিরো টাইপ Wild ভাইরাস দ্বারা Challenge করা হলে কোন ধরনের সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রযুক্তিটির বৈশিষ্ট্য

১. টীকা প্রদানের নির্দেশনা

গবাদিপ্রাণীর ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণে প্রাণীদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উৎপাদনের জন্য এই টীকা ব্যবহার করা যাবে।

২. টীকা প্রয়োগ ও মাত্রা

ক) এই টীকার প্রাণীর চমড়ার নিচে বা গভীর মাংসপেশীতে দিতে হবে।

খ) লগ $10^{6.00}$/ml জীবাণু দ্বারা তৈরি টীকা বড় প্রণীতে ৩ মিলি, ৬ মাস বয়সের নিচে ২ মিলি, এবং ছাগল ও ভেড়াকে ১ মিলি দিতে হবে।

গ) প্রথম বার টীকা প্রদানের ৪ থেকে ৬ মাস পরপর এই টীকা দিতে হবে।

৩. টীকার কারিগরী তথ্য

ক) এই টীকার এডযুভেন্ট হিসাবে মন্টানাইড, এ্যলুমিনিয়াম হাইড্রো অক্সাইড, বা মিনারেল ওয়েল ব্যবহার করা যাবে।

খ) প্রতি ডোজে নুন্যতম লগ $10^{6.00}$/ml ভাইরাস থাকতে হবে।

গ) ক্ষুরারোগের (এফএমডি) ত্রিযোজী (O, A এবং Asia-1) ভাইরাস গুলি আধুনিক মলিকুলার পদ্ধতিতে characterized করে জীন ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছে।

ঘ) টীকায় O, A এবং Asia-1 এই তিন ধরনের ভাইরাস আছে।

ঙ) এই টীকার এন্টিবডি (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা) প্রাণী দেহে ৬ মাস পর্যন্ত বজায়ে থাকে।

চ) বিএলআরআই এফএমডি ত্রিযোজী (O, A এবং Asia-1) টীকাটি গরুও মহিষের ৩ মাস বয়সের বাছুকে প্রথম এবং পরবর্তীতে প্রতি ৬ মাস পরপর দেয়া যায়।

ছ) টীকা প্রদানের ৩০ দিনেই পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উৎপন্ন হয় এবং ৬ মাস পর্যন্ত এই ক্ষমতা বজায়ে থাকে।

আক্রান্ত গরুর জিহ্বা

আক্রান্ত গবাদি প্রাণী

৪. সর্তকতা

ক) ব্যবহারের পূর্বে টীকার বোতল ভলো ভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে।

খ) কেবল মাত্র স্বাস্থ্যবান প্রাণীতে এই টীকা দিতে হবে।

গ) এই টীকার সাথে অন্য কোন টীকা বা ঔষধ মিসানো যাবে না।

৫. সংরক্ষণ

ক) টীকাটি ২ থেকে ৪° সে তাপ মাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে

খ) সকল গবাদিপ্রাণীকে এই টীকা দেয়া যাবে।

এফএমডি ত্রিযোজি টীকা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর

গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন

ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, ড. মোঃ শওকত মাহমুদ, ডাঃ মোঃ জাকির হাসান, ডাঃ ইউশা ইসলাম এবং ডাঃ মোঃ রেজাউল করিম

ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ দমনে বিএলআরআই মডেল
(পুনঃসংস্করণ-২০২০, পিপিআর রোগ দমনে বিএলআরআই মডেল, OIE নির্দেশনা মোতাবেক)

ভূমিকা

পিপিআর (Peste des Petitis Ruminants) ছাগল ও ভেড়ার একটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ছাগল ও ভেড়ার শতকরা ৮০ ভাগেরই মৃত্যু হতে পারে। আফ্রিকার আইভোরি কোষ্টে ১৯৪৩ সালে সর্ব প্রথম এ রোগ সনাক্ত করা হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া জেলায় রোগটি মহামারী আকারে দেখা দেয় এবং এর পর হতে প্রায় প্রতি বৎসর এ রোগের কারণে দেশে ছাগল ও ভেড়ার ব্যাপক মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। রোগটি বর্তমানে বাংলাদেশসহ সার্কভূক্ত অঞ্চলে নিয়মিত মহামারী (Endemic disease) হিসাবে চিহ্নিত। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯৪ সাল হতে এ রোগের উপর বিভিন্ন গবেষণা করে আসছে। এ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ ১৯৯৯ সালে এই অঞ্চলে প্রথম পিপিআর হোমোলোগাস ভ্যাক্সিন উদ্ভাবন করে যা ২০০০ সালে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাখালীস্থ ভ্যাক্সিন উৎপাদন গবেষণাগারে ভ্যাক্সিনটি উৎপাদন করে সারা দেশের খামারিদের মাঝে বিতরণ করে আসছে। ভ্যাক্সিন ব্যবহারের উপর সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশনা এবং এ রোগ নিয়ন্ত্রণে কোন পরিকল্পনা বা মডেল নিয়ে তেমন গবেষণা না থাকায় অপরিকল্পিত ও বিচ্ছিন্নভাবে পিপিআর রোগের ভ্যাক্সিন প্রদান করা হচ্ছিল। ফলে দেশের বিভিন্ন এলাকায় এমনকি বাণিজ্যিক খামারেও প্রায়ই এ রোগের প্রাদুর্ভাবের তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল। আন্তর্জাতিক প্রাণিরোগ সংস্থা (OIE) ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বকে পিপিআর মুক্ত করার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর দমনের মডেল উদ্ভাবনের জন্য ‘বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা’ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অত্যাধুনিক সার্ক রিজিওনাল পিপিআর গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে এবং পিপিআর রোগের উপর বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে তাপ সহিষ্ণু পিপিআর ভ্যাক্সিন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে পিপিআর রোগের কারণে প্রতিবছর ক্ষতির পরিমাণ পায় ১২০০০ কোটি টাকা। ২০১৩ সাল হতে পিপিআর রোগ দমনের কার্যকরী কৌশল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে দেশের সর্বাধিক ছাগল সমৃদ্ধ যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার ২২টি গ্রামে এবং মানিকগঞ্জ জেলার ২টি গ্রামে গবেষণা পরিচালিত হয়। গত পাঁচ বৎসরের নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে পিপিআর রোগ দমনের কার্যকরী মডেল উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে এবং পিপিআর রোগে ছাগলের মৃত্যুর হার শূন্যের কোঠায় নামানো সম্ভব হয়েছে। ফলে গবেষণা এলাকায় উল্লেখযোগ্য হারে ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে একটি ছাগল বা ভেড়াকে পিপিআর রোগের ভ্যাক্সিন ঠিকমত দেয়া হলে এবং মডেলে উদ্ভাবিত কৌশল অবলম্বন করা হলে উক্ত ছাগলে বা ভেড়ায় সারাজীবন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় থাকে। আশা করা যায় এ মডেলের মাধ্যমে বাংলাদেশের ছাগল ও ভেড়ার মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমানো সম্ভব হবে।

বিএলআরআই উদ্ভাবিত পিপিআর রোগ দমনের মডেল বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো সন্নিবেশ করা প্রয়োজন:

১। মানসম্পন্ন গবেষণাগার:

পিপিআর দমনের জন্য দ্রুত পিপিআর রোগ সনাক্তকরণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে আক্রান্ত প্রাণী দ্রুত পৃথক করে রোগ বিস্তারের বাধা দেয়া যায়। এ ছাড়াও এন্টিবডির উপস্থিতি নির্ণয়, সংগ্রহকৃত নমুনা সংরক্ষণ, যথাযথভাবে নমুনা পরিবহন, ভ্যাক্সিন সংরক্ষণ ইত্যাদির জন্য মানসম্পন্ন গবেষণাগার আবশ্যক। সুতরাং মডেল বাস্তবায়িত হবে এমন এলাকার নিকটস্থ সরকারী বা বেসরকারী যে কোন প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে বিএলআরআই এ স্থাপিত সার্ক রিজিওনাল লিডিং ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরী ফর পিপিআর (SAARC-RLDL for PPR) গবেষণাগারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত জিনিসপত্র

২। দক্ষ জনবল :

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষ জনবলের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, যথাযথভাবে ভ্যাক্সিন প্রদান, নমুনা সংগ্রহ, গবেষণাগারে রোগ সনাক্তকরণ, বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পাদন, বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য প্রশিক্ষিত জনবলের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

৩। খামারি প্রশিক্ষণ :

আমাদের দেশের অধিকাংশ খামারির ছাগল পালন, রোগ দমন, পুষ্টির প্রাপ্যতা, জীবনিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা নেই। তাই রোগটি দমন করতে হলে প্রথমেই খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। উক্ত প্রশিক্ষণে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

ক) পিপিআর রোগের লক্ষণ -

পিপিআর রোগের লক্ষণসমূহ, রোগ প্রাদুর্ভাবের সম্ভাব্য সময়কাল এবং অন্যান্য রোগের সঙ্গে পিপিআর এর মিল এবং অমিল ইত্যাদি সম্বন্ধে খামারিদের ধারণা প্রদান করতে হবে।

পিপিআর-এর প্রধান লক্ষণসমূহ

- নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে তরল পদার্থ নিঃসরণ হতে থাকে এবং সর্দি কাশি থাকে (নিউমোনিয়া)।
- শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় (১০৫°-১০৭° ফারেনহাইট) এবং পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া শুরু হয়। দাঁতের মাড়ি ও মুখে ঘা দেখা দেয়। চিকিৎসা না হলে ৪-৯ দিনের মধ্যে ছাগল মারা যায়।

চিত্র-১ : নাক ও মুখ দিয়ে তরল পদার্থ নিঃসরণ

চিত্র-২ : আক্রান্ত অবস্থায় পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া

খ) পিপিআর রোগ কীভাবে ছড়ায় -

পিপিআর রোগটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে প্রকৃতির সংক্রামক রোগ। এ রোগের ভাইরাস বাতাসের মাধ্যমে প্রায় ৩-৪ মাইল দূরের সুস্থ ছাগল ভেড়াকে আক্রান্ত করতে পারে। এছাড়া আক্রান্ত প্রাণীর লালা, খাবার ও খাবারের পাত্র ইত্যাদির মাধ্যমে সুস্থ প্রাণী রোগাক্রান্ত হয়।

গ) ছাগলের বাসস্থান -

ছাগলের রোগ বালাই কম হলেও ছাগল একটি তাপ সংবেদনশীল প্রাণী। অল্পতেই ছাগলের ঠান্ডাজনিত অসুখ হতে পারে। তাই ছাগলের বাসস্থান কোথায় এবং কীরূপ হওয়া উচিৎ তা খামারিদের অবহিত করতে হবে। মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন করলে ছাগলও ভেড়ার রোগবালাই অনেকাংশে কমে যায়।

ঘ) খাদ্য সরবরাহ -

ছাগলের খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টির প্রাপ্যতা, খাদ্যের পরিমাণ এবং পানি প্রদানের পরিমাপের বিষয়গুলি খামারিদের কাছে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। ছাগল ও ভেড়াকে মাঠে চারণের ব্যবস্থা করলে দৈহিক ওজন বৃদ্ধি, সহ বাচ্চা উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ঙ) জীব নিরাপত্তা

গবাদি প্রাণী পালনের ক্ষেত্রে জীব নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খামারিদের মধ্যে জীব নিরাপত্তার ধারণাটি অস্পষ্ট। জীব নিরাপত্তার নিয়মকানুনগুলি মেনে কীভাবে ছাগল ও ভেড়ার খামার রোগবালাই থেকে দূরে রাখা যাবে সে সব উপায়গুলি এবং মৃত ছাগলের দেহাবশেষ সৎকারের নিয়মগুলি খামারিদের জানাতে হবে।

চ) সাধারণ বিষয়াবলী -

১) **পৃথকীকরণ** (Isolation)ঃ যেহেতু পিপিআর একটি সংক্রামক রোগ। তাই এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলেই, ছাগল ভেড়াকে আলাদা বাসস্থানে রাখতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রাণি স্বাস্থ্য কর্মী অথবা উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে তথ্য প্রদান করতে হবে।

২) **প্রাণী কোয়ারেন্টাইন (Quaraintine):** বাজার থেকে বা অন্য কোন দেশ থেকে প্রাণী সংগ্রহ করা হলে ২১ দিন প্রাণী কোয়ারেন্টাইন করে খামারে আনতে হবে।

৩) **কৃমিনাশক প্রদান** - নির্বাচিত এলাকায় ২ মাসের অধিক বয়সের সকল ছাগলকে একই সাথে বিভিন্ন ধরনের পরজীবীর উপর কার্যকর কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে। প্রথম বার কৃমিনাশক দেয়ার পর ১৪ দিন পর পুনরায় কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তীতে প্রতি ৪ মাস পর পর সকল ছাগলকে কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে। ফলশ্রুতিতে ছাগলের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং প্রদানকৃত ভ্যাক্সিন হতে ভাল এন্টিবডি পাওয়া যাবে। কৃমিনাশক প্রদানের পর ভিটামিন মিনারেল সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

গণ কৃমিনাশক প্রদান

১) পিপিআর ভ্যাক্সিন পরিচিতি, ভ্যাক্সিন প্রদান ও পরিবহনের নিয়মাবলী

বাংলাদেশে ও পাশ্ববর্তী দেশসমূহে পিপিআর ভাইরাসের Clade-4 সেরোটাইপটি পাওয়া যায়। এই ভাইরাসের ৪ টি Clade (Clade-1, 2, 3, 4) এর জেনেটিক সামঞ্জস্যতা অনেক বেশী হওয়ার PPR virus serotype-2 Clade-1(Nigeria N-75) দিয়ে বিশ্বব্যাপী ২০৩০ সালের মধ্যে পিপিআর নির্মুল কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ মডেল প্রয়োগ পদ্ধতির প্রশিক্ষণ প্রদানের সময় ভ্যাক্সিন সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত জরুরি যেমন, ভ্যাক্সিন এর কার্যকারিতা ও ভ্যাক্সিন প্রদানের নিয়মাবলী সম্বন্ধে খামারিদের অবহিত করা একান্ত প্রয়োজন।

ক) ১০০ সিসি বোতলে পিবিএস দিয়ে ভ্যাক্সিন ট্যাবলেট গোলাতে হবে। সকালে কম তাপমাত্রার সময় এ ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা ভাল।

খ) ভ্যাক্সিন গোলানোর পর ২ ঘণ্টার মধ্যে ১০০ টি ছাগলে ভ্যাক্সিন প্রদান করে শেষ করতে হবে। এজন্য ছাগলগুলি ভাগ করে ২/৩ জন ভ্যাক্সিন প্রদানকারী এক সাথে ভ্যাক্সিন প্রদান শুরু করতে পারে। এর ফলে ২ ঘণ্টার মধ্যে দ্রুত সকল গোলানো ভ্যাক্সিন ব্যবহার হয়ে যাবে। পরবর্তীতে কেবল মাত্র ২ মাস বয়সোর্ধ নতুন বাচ্চা ছাগলকে ভ্যাক্সিন প্রদান করতে হবে।

গ) পিপিআর ভ্যাকসিন চামড়ার নিচে দিতে হয়। তবে প্রিস্ক্যাপুলার লিম্ফনোড এর কাছে (সামনের পায়ের যে অংশ শরীরের সাথে

লাগানো থাকে) চামড়ার নিচে ভ্যাকসিন দিলে খুব ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। এজন্য ভ্যাক্সিন প্রদানকারী প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মী ২-৩ ভাগে বিভক্ত হয়ে অথবা একসাথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভ্যাকসিন প্রদান করতে পারে।

ঘ) ২ মাস বয়সের উপর সকল ছাগলকে একসঙ্গে একই দিনে ১ মিলি পরিমাণ গোলানো ভ্যাক্সিন প্রিস্ক্যাপুলা লিম্ফনোড এর উপরের চামড়ার নিচে প্রদান করতে হবে।

ঙ) ভ্যাক্সিন সকল সময় ফ্রিজে নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। এর জন্য গবেষণাগারে বা সংরক্ষণগারে ফ্রিজ থাকা এবং বিরতিহীন বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক।

চ) ভ্যাক্সিন পরিবহন ও সরবরাহের সময়ও সঠিক কুল চেইন (ঠান্ডা অবস্থা) এর ব্যবস্থা করতে হবে।

জ) ভ্যাক্সিন প্রদান পরবর্তী নমুনা পরীক্ষা: - ভ্যাক্সিন প্রদানকৃত ছাগলে পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাচাই করার জন্য ১ মাস, ৬ মাস ও ১ বৎসর পরে রক্ত সংগ্রহ করে এন্টিবডি লেভেল (রোগ প্রতিরোধ মাত্রা) পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সাধারণত সঠিকভাবে ১ বার পিপিআর ভ্যাক্সিন প্রদান করা হলে উক্ত প্রাণীকে আর পিপিআর ভ্যাক্সিন প্রদান করতে হয় না (ছাগল ভেড়ার গড় আয়ু ৫ বছর)।

বিএলআরআই উদ্ভাবিত পিপিআর দমন মডেল

আন্তর্জাতিক প্রাণিরোগ সংস্থা (OIE) বিশ্ব থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে পিপিআর নির্মূল করার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত পরিকল্পনার বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করে বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ ও দমনে বিএলআরআই মডেল উদ্ভাবন করেছে। এ মডেলের মাধ্যমে যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলায় ২০১৬ সাল থেকে প্রায় ১ লক্ষ ছাগলের পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

মডেল বাস্তবায়নের জন্য নিম্নের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রথমত এ মডেলের জন্য এলাকা নির্বাচন এবং গবেষণাগার নির্বাচন করতে হবে। পরবর্তীতে পিপিআর নির্মূলের জন্য OIE নির্দেশিত চার (৪) টি ধাপ অনুসরণ করতে হবে। এ ধাপগুলির কার্যক্রম নিম্নে বর্ণনা করা হল-

এলাকা নির্বাচন - একটি এলাকা (গ্রাম, ইউনিয়ন বা উপজেলা) পিপিআর মুক্ত করার জন্য নির্বাচন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এলাকাটি নির্ধারণে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকের (Natural Barrier) উপস্থিতি বিবেচনায় আনতে হবে। যেমন- কোন নদী বা খালকে এলাকার সীমানা হিসাবে বিবেচনায় নিতে হবে। প্রাথমিক ধাপ, সেখানে একটি নতুন অঞ্চলে পিপিআর এর প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। নির্বাচিত এলাকার ছাগলের পরিসংখ্যান বের করার জন্য তৃণমুল পর্যায়ে জরিপ (Baseline survey) সম্পন্ন করতে হবে। পরিসংখ্যানে ভ্যাক্সিন প্রদানের তথ্য, বয়স, আনুমানিক শুমারী (প্রতি বছর ছাগলের জন্ম, মৃত্যু, ক্রয়, বিক্রয়, জবাই ইত্যাদির কারণে ছাগলের স্থিতির পরিমাণ), রোগ প্রবণতা বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

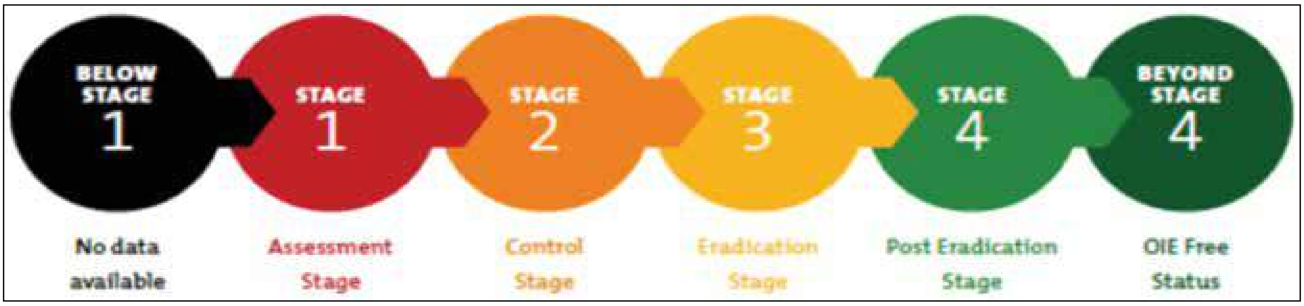

চিত্রঃ OIE নির্দেশিত পিপিআর দমনের চারটি ধাপ

OIE নির্দেশিত চারটি ধাপ ও এর কার্যক্রম নিম্নে বর্ণনা করা হলো

ধাপ-০: তথ্য বিহীন পর্যায় (No Data Stage)

পিপিআর সম্বন্ধে কোন বাস্তব তথ্য উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছেনা বা খুব সামান্য তথ্য আছে। পিপিআর রোগ সম্বন্ধে যখন কোন দেশে বা অঞ্চলে কোন তথ্য উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছেনা বা এ বিষয়ে খুব সামান্য তথ্য আছে এবং পিপিআর রোগ দমনের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি, এমন পর্যায়টিকে ধাপ শূন্য বলা হয়। পিপিআর রোগের কোন টিকা প্রদান করা হয় কিনা এ ধরনের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই।

ধাপ-১: মূল্যায়ন ধাপ (Assesment Stage)

ইপিডিমিওলজিক্যাল জরিপের মাধ্যমে, নির্বাচিত অঞ্চলের পিপিআর রোগের ঝুঁকি সনাক্ত ও প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে। জরিপের সময় বছরের কোন সময় এ অঞ্চলে পিপিআর রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, কী সংখ্যায় ছাগল, ভেড়া সংক্রামিত হয়, ও কী সংখ্যায় প্রাণী মারা যায় তার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। খামারি পিপিআর ভ্যাক্সিন দেয় কি না, চিকিৎসা সেবা পর্যাপ্ত কিনা, রোগ সনাক্তকরনের জন্য কোন গবেষণাগার আছে কি না তা বিবেচনায় আনতে হবে।

এই ধাপটিতে নিম্নলিখিত আরও কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে

ক) একটি বেজ লাইন জরিপ করে মোট ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।

খ) পিপিআর সম্পর্কে খামারি ও এলাকাবাসীর ধারণা কী, তা বিবেচনায় আনতে হবে।

গ) পিপিআর নিয়ন্ত্রণে সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা জানতে হবে

ঘ) কৃমি মুক্তকরণ ও ভ্যাক্সিন প্রদান সমন্ধে খামারির ধারণা জানতে হবে

ঙ) ছাগল ও ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে খামারির ধারণা জানতে হবে

চ) মানসম্মত পরীক্ষাগার নির্বাচন (রোগ সনাক্তকরণের জন্য) করতে হবে

ছ) দক্ষ জনবল নির্বাচন করতে হবে (পিপিআর বিশেষজ্ঞ, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ল্যাবরেটরি পার্সনেল)

জ) সিরোসার্ভিলেন্স পদ্ধতির মাধ্যমে ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর ভাইরাসের ভ্যাক্সিন পূর্ববর্তী প্রতিরোধ ক্ষমতা যাচাইকরণের জন্য দৈবচয়নের মাধ্যমে ভ্যাক্সিন প্রদানের পূর্বে রক্ত নমুনা সংগ্রহ করে এলাইজা পদ্ধতিতে এন্টিবডি লেভেল দেখতে হবে।

ঝ) পিপিআর সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা ও খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে

ঞ) প্রকল্প এলাকা থেকেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মী তৈরী করতে হবে।

ট) খামারিদের মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল ও ভেড়া পালনে পরার্মশ দিতে হবে।

ধাপ- ২: পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও নিয়ন্ত্রণ ধাপ (Planning and Control Stage)

ক) সমাজভিত্তিক রোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি :

পিপিআর রোগ দমনের জন্য প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ধর্মীয় প্রতিনিধি, বিজ্ঞানী, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মী, এবং সহযোগী সংস্থা নিয়ে একটি সমন্বিত মনিটরিং ও কার্যকরী টিম গঠন করতে হবে। এ কমিটি পিপিআর দমনে গণকৃমিনাশক ও গণ ভ্যাক্সিন প্রদান (Mass Vaccination) কর্মসূচি সমন্বয় ও বাস্তবায়ন করবে। গণভ্যাক্সিন প্রদান কর্মসূচি শুরু করার পূর্বে উক্ত প্রকল্প এলাকায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ (মাইকিং পোষ্টার, উঠান বৈঠক) করে ভ্যাক্সিন প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

খ) বাফার জোন তৈরি :

যে এলাকাটি পিপিআর মুক্ত মডেলের আওতায় থাকবে তার চারদিকে অন্ততপক্ষে এক কেজিমিটার এলাকার সকল ছাগল ও ভেড়াকে কৃমিনাশক ও পিপিআর ভ্যাক্সিনেশন এর আওতায় আনতে হবে। ধাপ-২ শুরুর অন্তত পক্ষে ১ মাস আগে বাফার জোন তৈরি করতে হবে। বাফার জোনে পিপিআর রোগের এন্টিবডি নিশ্চিত করতে হবে।

গ) গণ কৃমিনাশক প্রদান :

নির্বাচিত এলাকায় ২ মাসের অধিক বয়সের সকল ছাগল ও ভেড়াকে একই সাথে বিভিন্ন ধরনের পরজীবীর উপর বিস্তৃতভাবে কার্যকর কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে।

ঘ) পিপিআর গণ ভ্যাক্সিন প্রদান (Mass Vaccination) ও ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা যাচাই :

দুই মাস বয়সের উর্ধ্বে সকল ছাগল ও ভেড়াকে চামড়ার নিচে ১ সিসি. একবার ভ্যাক্সিন প্রদান করতে হবে। কেননা, এই ভ্যাক্সিনটি অবনমিত (Attenuated) জীবন্ত পিপিআর ভাইরাস হওয়ায় একবার দিলে আর দিতে হয় না। তবে, পিপিআর দমন কৌশলে হার্ড ইমিউনিটির জন্য ছাগল ও ভেড়াকে ১ম ডোজ দেয়ার ৬ মাস পর অধিক কার্যকারিতার জন্য (Boosting) ২য় ডোজ দিতে হবে।

চিত্র: গণ ভ্যাক্সিন প্রদান কর্মসূচী

এলাকায় নতুন ক্রয় করা ছাগল, ভেড়াগুলিকে একই নিয়মে ভ্যাক্সিন প্রদান করতে হবে। ভ্যাক্সিন সব সময় ৪° ডিগ্রী সেঃ তাপ মাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। এ ধাপের কার্যক্রমটি টানা ৩ বছর চলমান রাখতে হবে।

ঙ) **পিপিআর ভ্যাক্সিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ও ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা যাচাই :** প্রাণীর সর্বমোট সংখ্যার উপর গড় ভিত্তিক একটি সিরোলজিক্যাল জরিপ করা প্রয়োজন যা, পিপিআর ভাইরাসের বিরুদ্ধে এন্টিবডির পরিমাণ তথা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করবে। ভ্যাক্সিন প্রদানের পূর্বে ও ২১ দিন পর ছাগল ভেড়া থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে রক্ত নমুনা সংগ্রহ করে এন্টিবডির পরিমাণ যাচাই করতে হবে। উক্ত এলাকায় পিপিআর রোগের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা (হার্ড ইমিউনিটি) নিশ্চিত করতে হবে। পর পর তিন বছর ইমিউনিটি পর্যবেক্ষণ করে নির্বাচিত এলাকায় যখন পর্যাপ্ত হার্ড ইমিউনিটি পাওয়া যাবে, তখন পরবর্তী ধাপে যাওয়ার জন্য প্রস্তত হবে।

চ) **পিপিআর রোগের সংক্রমণ এবং ছাগল, ভেড়ার একই ধরনের অন্যান্য রোগ সনাক্তকরণ :**
পিপিআর বা পিপিআর সদৃশ কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত কারণ উদঘাটন করার জন্য মলিকুলার পদ্ধতি ব্যবহার করে (পিসিআর) রোগটি সনাক্ত করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ভাইরাসের সকল জেনেটিক বৈশিষ্ট্য পাওয়ার পর তা পিপিআর রেফারেন্স ল্যাবরেটরিতে সংরক্ষণ করতে হবে এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

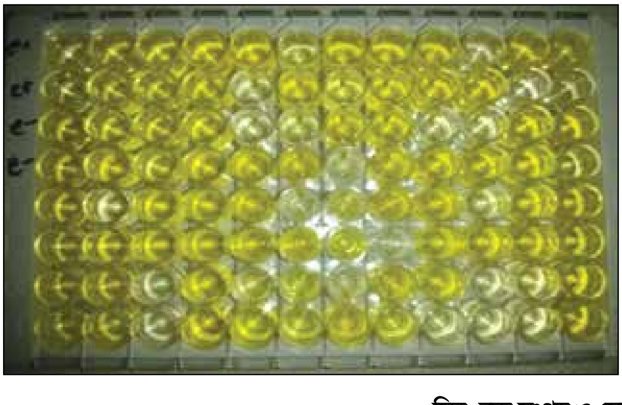

চিত্র: রক্ত সংগ্রহ ও সেরামের কার্যকারিতা যাচাই

ছ) **সাধারণ বিষয়াবলী :** রোগ দেখা দিলে খামারি তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনা, জরিপকারীদের ও নমুনা সংগ্রহকারীদের নিবিড় সহায়তা প্রদান, খামারিদের স্বাস্থ্য তথ্য সংরক্ষণ (স্বাস্থ্য কার্ড) প্রভৃতি সম্বন্ধে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ পর্যায়ে যথাযথ ভ্যাক্সিন প্রদান করার পরে এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। উল্লেখিত বিষয়গুলি ছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়ে ও খামারিকে সচেতন করতে হবে।

১) সংক্রমিত এলাকা থেকে ছাগল ভেড়া মডেল এলাকায় আনা যাবে না।

২) যদি কোন প্রাণীতে পিপিআর রোগের লক্ষণ দেখা যায় তবে তা দ্রুত আলাদা করে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শমত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়াও যে কোন রোগ দেখা দিলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে।

হেল্থ কার্ড প্রদান

৩) প্রকল্প এলাকায় ছাগলের খামার করতে গেলে হাট বা বাজার থেকে ছাগল কেনা যাবে না। এ ক্ষেত্রে পিপিআর এর ভ্যাক্সিন দেওয়া আছে এমন তথ্য নিশ্চিত হয়ে ছাগল বা ভেড়া ক্রয় করতে হবে।

৪) গণ ভ্যাক্সিনেশনের পর প্রাণীর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৫) ছাগল, ভেড়ার খামার উঁচু জায়গা কিংবা মাঁচা পদ্ধতিতে করলে ছাগলের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, রোগবালাই কম হয় এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহজতর হয়। প্রাণীর বিভিন্ন বর্জ্য যেমন, উচ্ছিষ্ট খাদ্য, গোবর, মূত্র ইত্যাদি জীব নিরাপত্তা ক্ষেত্রে হুমকি এবং বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে। এসব বর্জ্য একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে কম্পোস্ট করে পুনঃ ব্যবহারযোগ্য করা যেতে পারে।

ধাপ-৩: নির্মূল ধাপ (Eradication Stage)

ধাপ ২ (দুই) এর ৩য় বছর পর ধাপ-৩ এ নিশ্চিত করতে হবে যে চতুর্থ বছরে পিপিআর ভ্যাক্সিন দেয়ার পর নির্বাচিত এলাকায় কোন একটি ছাগল, ভেড়া পিপিআর রোগে মারা যায় নাই। পরীক্ষার রিপোর্ট এর ভিত্তিতে প্রায় শতভাগ (১০০%) পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা (হার্ড ইমিউনিটি) আছে তা নিশ্চিত হতে হবে। মডেল এলাকায় যাতে পুনরায় রোগ সংক্রমণ হতে না পারে তা নিশ্চিত হতে হবে। এক্ষেত্রে, কোন দুর্বলতা বা ত্রুটি, যা থাকলে মডেল এলাকায় পুনরায় রোগ সংক্রমণের কারণ হতে পারে তা মনিটরিং কমিটির সহায়তায় সমাধান করতে হবে। এ পর্যায়টি একটি নির্দিষ্ট সময় (১ থেকে ৩ বছর) পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখতে হবে। এ অঞ্চলের ছাগল, ভেড়াতে শতভাগ (১০০%) পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতার (হার্ড ইমিউনিটি) বিষয়ে নিশ্চিত হবে। উক্ত এলাকার আশেপাশে পিপিআর রোগের প্রাদুর্ভাব থাকলেও প্রকল্প এলাকায় পিপিআর রোগের কোন সংক্রমণ থাকবে না। এ ধাপে আঞ্চলিকভাবে উক্ত অঞ্চলকে ভ্যাক্সিন প্রদানসহ পিপিআর মুক্ত অঞ্চল (Regional PPR free Zone with vaccination) ঘোষণা করা যেতে পারে। উক্ত অঞ্চলকে পিপিআর মুক্ত অঞ্চল (PPR free zone) ঘোষণার করার জন্য OIE তে আবেদন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

ধাপ-৪: নির্মূল পরবর্তী ধাপ (Post Eradication Stage)

তৃতীয় ধাপ সফলভাবে বাস্তবায়ন করার পর ধাপ-৪ এ ব্যাপক নজরদারির মাধ্যমে পরবর্তী এক বছর আঞ্চলিক পিপিআর মুক্ত এলাকার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। মূলত বিএলআরআই পিপিআর রোগ দমনে মডেলটি একটি পাঁচ বছর মেয়াদী প্যাকেজ প্রযুক্তি। এ ধাপে এলাকাটি আঞ্চলিকভাবে 'ভ্যাকসিন প্রদান ছাড়া পিপিআর মুক্ত এলাকা (Regional PPR free Zone without vaccination)' ঘোষণা করার জন্য প্রস্তুত হবে। এ ধাপটির স্বীকৃতির জন্য OIE এর কাছে নিয়ম নীতি মেনে আবেদন করা হলে OIE পর্যবেক্ষণ দল নিরক্ষার পর সনদ দিলেই কেবল এলাকাটিকে চূড়ান্তভাবে ভ্যাকসিন ছাড়া 'পিপিআর মুক্ত অঞ্চল' ঘোষণা দেয়া যেতে পারে।

ধাপ- OIE পিপিআর মুক্ত এলাকা (OIE PPR free status)

এই ধাপটিকে ধাপ-৪ এর পরবর্তী ধাপ বুঝায় অর্থাৎ OIE পিপিআর মুক্ত এলাকা ঘোষণা করার পরের ধাপ। এই ধাপে এলাকাটি OIE পিপিআর মুক্ত এলাকা হিসেবে স্বীকৃত থাকবে। বিশ্বের মানচিত্রে উক্ত এলাকাটি ছাগল, ভেড়ার পিপিআর মুক্ত এলাকা (Green Zone) হিসেবে নির্দেশিত থাকবে। উক্ত এলাকার কোন ছাগল বা ভেড়া পিপিআর রোগে মারা যাবে না।

উপসংহার:

বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পিপিআর নিয়ন্ত্রণ মডেল ও আন্তর্জাতিক প্রাণিরোগ সংস্থা (OIE) কর্তৃক পিপিআর নির্মূল পরিকল্পনার তৃতীয় ধাপ (নির্মূল ধাপ) পর্যন্ত করণীয় বিষয়গুলি অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশের কয়েকটি অঞ্চলে পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ছাগলের মৃত্যুর হার শূন্যের কোঠায় নামানো সম্ভব হয়েছে এবং উক্ত এলাকাগুলি বর্তমানে OIE এর নির্দেশনা মোতাবেক চতুর্থ ধাপে অবস্থান করছে। প্রযুক্তিটি সারা দেশে বা কোন অঞ্চলে সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করে উক্ত অঞ্চলকে OIE এর নির্দেশনা মোতাবেক "পিপিআর মুক্ত অঞ্চল" ঘোষণা করা যেতে পারে।

পিপিআর রোগের চিকিৎসা

উপরে নির্দেশিত বিষয়গুলি অনুসরণের পরও যদি কোন প্রাণীতে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে দ্রুত ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পিপিআর রোগে এন্টিবায়োটিক সহযোগে হাইপার ইমিউন সিরাম প্রদান একটি কার্যকরী চিকিৎসা।

পিপিআর চিকিৎসার ক্ষেত্রে করণীয় -

১. দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য এন্টিবায়োটিক প্রদান করতে হবে।
২. এন্টিবায়োটিক এর সঙ্গে হাইপার ইম্মিউন সিরাম প্রয়োগ করা হলে শতকরা ৮০ ভাগ ছাগল আরোগ্য লাভ করে।
৩. ছাগলের পিপিআর চিকিৎসায় ইম্মিউন সিরাম (এ্যান্টিসিরাম) ব্যবহার ঃ

ইম্মিউন সিরামের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা বহু পুরাতন। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট অনেকদিন ধরে ইম্মিউন সিরাম দ্বারা ছাগল, ভেড়ার পিপিআর রোগের চিকিৎসায় গবেষণা করে আসছে। এ গবেষণায় দেখা যায় ইম্মিউন সিরাম দ্বারা ছাগলের পিপিআর চিকিৎসায় অত্যন্ত কার্যকরী।

ইম্মিউন সিরাম ঃ পিপিআর আক্রান্ত ছাগল সুস্থ্য হলে প্রাকৃতিকভাবে যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী হয় তা ছাগলের রক্তরসে সারাজীবন সংরক্ষিত থাকে যাকে ইম্মিউন সিরাম বলা হয়।

হাইপার ইম্মিউন সিরাম ঃ প্রাণিতে কয়েকবার ভ্যাক্সিন প্রদান করলে যে অধিক কার্যকরী রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয় তাকে হাইপার ইম্মিউন সিরাম বলে।

ইম্মিউন / হাইপার ইম্মিউন সিরাম প্রস্তুত, সংগ্রহ ও প্রয়োগ ঃ

আমাদের দেশে পিপিআর হাইপার ইম্মিউন সিরাম সহজ লভ্য নয়। প্রথম পদ্ধতিটি হ'ল, কোন ছাগল পিপিআর আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ্য হলে ঐ ছাগল থেকে রক্ত সংগ্রহ করে সেখান থেকে সিরাম আলাদা করে তা রোগাক্রান্ত ছাগলে ৩-৫ মিলি/২০ কেজি দৈহিক ওজনে শিরায় প্রয়োগ করতে হবে। একবার প্রয়োগ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। প্রয়োজনে ২-৩ দিন পর আরও একবার একই মাত্রায় ইম্মিউন সিরাম প্রয়োগ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত পদ্ধতিটি হ'ল, খামারের কয়েকটি সুস্থ ছাগলে ১ মাস অন্তর অন্তর ২ থেকে ৩ বার পিপিআর ভ্যাকসিন দেয়া হলে উক্ত ছাগলে উচ্চ মাত্রায় পিপিআর এর এন্টিবডি প্রস্তুত হবে। এ সকল ছাগল থেকে রক্ত সংগ্রহ করে তা থেকে সিরাম আলাদা করে পিপিআর

আক্রান্ত ছাগলের শিরায় প্রয়োগ করতে হবে। ২০ কেজি ওজনের একটি ছাগল হতে ৩০-৪০ মিলি লিটার রক্ত সংগ্রহ করা যায়। এই রক্ত ২-৩ ঘণ্টা ঘরের তাপমাত্রায় রেখে দিলে প্রায় ১৫-২৫ মিলি লিটার সিরাম পাওয়া যাবে যা ৩-৪টি রোগাক্রান্ত ছাগলের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা যায়। ভ্যাটেরিনারিয়ান কিংবা খামারিগণ চিকিৎসার জন্য নিজেরা তার এলাকা বা খামারে সহজেই কিছু ছাগলকে পিপিআর রোগের এ্যান্টিসিরাম ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষণ করতে পারেন। প্রয়োজনে যা থেকে সিরাম সংগ্রহ করে চিকিৎসায় ব্যবহার করা সম্ভব। এ সিরাম সংগ্রহের জন্য খাসী ব্যবহার উপযুক্ত, করণ প্রয়োজনে খাসী জবাই করে অনেক রক্ত সংগ্রহ করা সম্ভব। চিকিৎসায় ভাল ফল পেতে হলে মান সম্মত সিরামের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তবে, কোন অবস্থাতেই অস্বচ্ছ বা ঘোলাটে সিরাম ব্যবহার করা যাবে না। শিরায় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অল্প উষ্ণ (৩০° - ৩৭° সেলসিয়াস) সিরাম প্রয়োগ করতে হবে।

সিরাম পৃথকীকরণ ঃ

সাধারণত সিরিঞ্জে রক্ত সংগ্রহ করার পর একটু কাঁত করে ২-৩ ঘণ্টা ঘরের তাপমাত্রায় রেখে দিলে সিরিঞ্জের সামনের দিকে হালকা গোলাপী থেকে হালকা হলুদাভ রঙের সিরাম উঠে আসবে এবং নিচের দিকে জমাট বাঁধা রক্ত দেখা যাবে। সাবধানে সিরিঞ্জ কাত করে সিরাম এপেনডর্প টিউব বা যেকোন জীবাণুমুক্ত টিউবে সংগ্রহ করা যায়। তাছাড়াও রক্ত সংগ্রহ করার পর ল্যাবরেটরীতে ৩০০০-৪০০০ আরপিএম এ ৫ মিনিট সেন্ট্রিফিউজ করে সিরাম পৃথক করা যায়।

এ্যান্টিসিরাম-এ্যান্টিবায়োটিক সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি (Antibiotic Combind Hyperimmune Serum Treatment (ACHST) :

এটি একটি সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি যা পিপিআর এ্যান্টিসিরাম (Antiserum) এর সঙ্গে এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে পিপিআর রোগাক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা করা হয়। এই চিকিৎসার উদ্দেশ্য হ'ল, একই সঙ্গে পিপিআর রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসকে ধ্বংস করা এবং ভাইরাসজনিত আক্রমণের ফলে শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙ্গে পড়ার কারণে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ (Secondary infection) কে মোকাবেলা করা।

- খামারের কয়েকটি সুস্থ ছাগলে ১ মাস অন্তর অন্তর ২ থেকে ৩ বার পিপিআর ভ্যাকসিন দেয়া হলে উক্ত ছাগলে উচ্চ মাত্রায় পিপিআর এর এন্টিবডি প্রস্তুত হবে। এ সকল ছাগল থেকে রক্ত সংগ্রহ করে তা থেকে সিরাম আলাদা করে পিপিআর আক্রান্ত ছাগলের শিরায় ৩-৫ মিলি করে প্রয়োগ করতে হবে।
- পিপিআর আক্রান্ত প্রাণীর ডায়রিয়াজনিত পানি শূন্যতা পূরণের জন্য মুখে স্যালাইন খাওয়াতে হবে।
- ছাগল পিপিআর রোগে মারা গেলে অবশ্যই দূরে কোথাও গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে

পিপিআর নিয়ন্ত্রণে অবশ্য করণীয়

১. সংক্রমিত এলাকা বা বাজার থেকে কোন ছাগল বা ভেড়া এ এলাকায় আনা যাবে না।
২. যদি কোন প্রাণীতে এ রোগের লক্ষণ দেখা যায় তবে তা দ্রুত আলাদা করে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শমত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩. এ এলাকায় অবাধ প্রাণী চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। কারণ জীবিত প্রাণী চলাচল রোগ সংক্রমণে সহায়তা করে।
৪. বিভিন্ন উৎসবের এক মাস পূর্বে এলাকার খামারিদের সতর্ক করতে হবে। এ সময় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রাণী চলাচল বেড়ে যায় এবং রোগাক্রান্ত প্রাণীর মাধ্যমে সংক্রমণ বৃদ্ধি পায়।
৫. এলাকায় প্রাণীর প্রবেশ ও বাহির হওয়ার পথগুলিতে নজরদারি করতে হবে, যাতে কোন রোগাক্রান্ত প্রাণী এলাকায় প্রবেশ না করতে পারে। হাটবাজার থেকে ছাগল ক্রয় করে সরাসরি খামারে নেয়া যাবেনা। অন্ততঃ ২১ দিন মূল খামার থেকে দূরে পর্যবেক্ষণে (কোয়ারেন্টাইন) রাখা যেতে পারে। এরপর কৃমিনাশক ও পিপিআর রোগের ভ্যাক্সিন দিয়ে খামারের অন্যান্য ছাগলের সাথে রাখতে হবে।
৬. বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে খামারিদের গণসচেনতা সৃষ্টি করা এবং ঈদ উৎসবের পূর্বেই ভ্যাক্সিন প্রদান শুরু করা এ রোগ নিয়ন্ত্রণের একটি কৌশল।
৭. প্রাণী পরিবহন বাজারজাত করার সময় সনদপত্র সংরক্ষণ করার বিধান করার ব্যবস্থা শুরু করা যেতে পারে।

গবেষণায় ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে

ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, ডাঃ মোঃ আবু ইউসুফ, ডাঃ মোঃ জাকির হাসান, ডাঃ মোঃ জুলফিকার আলী, ড. মোঃ শওকত মাহমুদ, ডাঃ ইউশা ইসলাম এবং ডাঃ মোঃ আশরাফুল ইসলাম

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের (H5N1) এইচআই (HI) পরীক্ষার জন্য এইচএ (HA) এন্টিজেন

ভূমিকা

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা মুরগি তথা পাখি জাতীয় প্রাণীর ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগের ভাইরাসের বিস্তৃতি বিশ্বব্যাপী। পোল্ট্রি শিল্পের জন্য এ রোগ হুমকিস্বরূপ। সকল বয়সের ও সকল জাতের মুরগি এ রোগের ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে বাড়ন্ত মুরগিতে মৃত্যুর হার বয়স্ক মুরগির তুলনায় বেশী। ব্যাপকভাবে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সংক্রমণ হয়েছে এমন দেশগুলি এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকসিন দিয়ে আসছে। দেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকসিন ছাড়া অন্যান্য পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করে তেমন সাফল্য পাওয়া যায় নাই। এরই প্রেক্ষিতে এ রোগ নিয়ন্ত্রণে সরকার ভ্যাক্সিনকে সহযোগি হিসাবে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দেশের বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সঠিক ভাবে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হলে খামারিরা উপকৃত হবে এবং এ রোগ প্রত্যাশিত পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণে থাকবে। একই সাথে এ শিল্পে নতুন বিনিয়োগ হবে। বাংলাদেশ সরকার বিগত বৎসরগুলির অভিজ্ঞতা এবং এ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শে গত ২০১২ সাল হতে প্রথমে দেশের দুইটি জেলায় পরীক্ষামূলক ভাবে এ রোগের ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করে। উক্ত জেলাগুলিতে ভ্যাকসিন প্রদানের পর রোগটি নিয়ন্ত্রণে আশাব্যাঞ্জক ফল পাওয়ায় পরবর্তীতে তা সারা দেশের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু খামারে ভ্যাকসিন দেয়ার পর তার কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য মান সম্পন্ন এন্টিজেন সহজলভ্য না হওয়ায় ভ্যাকসিন পরবর্তী পর্যবেক্ষণ এবং ভ্যাকসিন এর কার্যকারিতা যাচাই করা সম্ভব হচ্ছিল না। বিষয়টি বিবেচনায় এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের এইচ আই পরীক্ষার জন্য এন্টিজেন উদ্ভাবন এর গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়।

উদ্দেশ্য

ক) দেশে বিরাজমান (Circulating) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস থেকে তৈরিকৃত এন্টিজেনের মাধ্যমে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনকৃত মুরগির এন্টিবডি যাচাই।

খ) সহজ ও স্বল্পমূল্যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এন্টিজেন তৈরি করা।

বৈশিষ্ট্য

ক) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের নমুনা থেকে RT-PCR করে H5N1 ভাইরাস সনাক্ত এবং Sequence করে নিশ্চিত করা হয়।

খ) এন্টিবডি মুক্ত মুরগির (SPF) ভ্রুণে H5N1 ভাইরাস কালচার করে এ এন্টিজেন প্রস্তুত করা হয়।

গ) কালচারকৃত মুরগির ভ্রুণের এলানটয়িক ফ্লুইড পুনরায় RT-PCR করে H5N1 ভাইরাস এর উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়।

ঘ) কালচারকৃত H5N1 ভাইরাস ফরমালিন দিয়ে নিষ্ক্রিয় করা হয়।

ঙ) প্রস্তুতকৃত এন্টিজেন এ H5N1 ভাইরাসের মাত্রা 4HA ইউনিট ২৫৬ রাখা হয়।

ভাইরাসের স্ট্রেইন নির্বাচন:

রেফারেন্স এন্টিজেন উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে বিগত ২০১৫ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিরাজমান এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের স্ট্রেইন A/H5N1 থেকে প্রজাতি (species) এবং বিরাজমান সময়ের উপর ভিত্তি করে পাঁচটি আইসোলেট নির্বাচন করা হয়।

A/H_5N_1/2015/NRL-AI/205; A/H_5N_1/2015/NRL-AI/305; A/H_5N_1/2016/NRL-AI/253; A/H_5N_1/2016/NRL-AI/700; A/H_5N_1/2017/NRL-AI/603

নির্বাচিত এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস আইসোলেটগুলির চারিত্রিক গুণাবলী (Characterization) হিমাগ্লোটিনিন (HA) এবং নিউরামিনিডেজ (NA) জিনের রিয়েল টাইম RT-PCR করে নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে হিমাগ্লোটিনিন জিনের সিকুয়েন্স ডাটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্বাচিত পাচঁটি A/H_5N_1 ভাইরাস আইসোলেটের মধ্যে যা ২.৩.২.১-এ সাব ক্লেড ভুক্ত বাংলাদেশে জিনের এবং বিরাজমান অন্যান্য ভাইরাসের সাথে শত ভাগ আইডেনটিক্যাল (A/H_5N_1/2017/NRL-AI/603)। সেই আইসোলেটটি রেফারেন্স এন্টিজেন উৎপাদনের জন্য চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচন করা হয়। ভাইরাস আইসোলেটগুলিতে অন্যান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস টাইপ 'এ' বা অপরাপর হিমাগ্লোটিনিন ভাইরাস যেমন, ইনফেকসাস ব্রঙ্কাইটিস (আই.বি.ভি), ইনফেকসাস লেরিঙ্গোট্রাকাইটিস (আই.এল.টি) এবং রাণীক্ষেত ভাইরাস (এন.ডি.ভি) মুক্ত কিনা তা রিয়েলটাইম RT-PCR পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হয়।

ভাইরাস কালচার

চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচিত A/H_5N_1/2017/NRL-AI/603 ভাইরাস আইসোলেটটি ৯-১০ দিন বয়সী ডিমের ভ্রূণে কালচার করা হয়। প্রতিটি ডিম থেকে এলানটয়িক ফ্লুইড সংগ্রহের সময় ১ ড্রপ বা ৪০ মাইক্রোলিটার একটি গ্লাস স্লাইডে নিয়ে তার সাথে সমপরিমাণ ৩% মুরগির লোহিত রক্ত কণিকা (chicken RBC) মিশানো হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস থাকলে এলানটয়িক ফ্লুইড RBC কে এগ্লুটিনেইট করবে।

প্রকারান্তরে ভাইরাস না থাকলে এবং কন্ট্রোল গ্রুপের এলানটয়িক ফ্লুইড কোন প্রকার এগ্লুটিনেশন দেখা দিবে না। অতঃপর, পজেটিভ এলানটয়িক ফ্লুয়িডে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের মাত্রা নির্ণয় করার জন্য হিমাগ্লুটিনেশন (এইচ.এ) পরীক্ষা করতে হয়। উচ্চ মাত্রা (এইচ.এ ইউনিট ২৫৬ বা তদুর্ধ্ব) টাইটার সম্বলিত এলানটয়িক ফ্লুইড -৮০° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। এন্টিজেনের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য অন্যান্য এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস A/H_7N_9 ও A/H_9N_2 রিয়েলটাইম RT-PCR এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। এরপর, অপরাপর হিমাগ্লুটিনেটিং ভাইরাস যথা আই.এল.টি, আই.বি.ভি এবং এন.ডি ভাইরাসের উপস্থিতিও রিয়েলটাইম RT-PCR এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। পরিশুদ্ধ এন্টিজেন এর সাথে ১ঃ১৬০০ ডাইলুশন হিসাবে ফরমালিন বা BEI যোগ করে ভালোভাবে মিশাতে হয়। ১০ মিনিট আল্ট্রা-সেন্ট্রিফিউজ করে সুপারনেটেন্ড সংগ্রহ করে হিমাগ্লুটিনেশন ইনহিবিটর (এইচএ) মাধ্যমে এন্টিজেনের ক্ষমতা নির্ণয় করা হয়। এন্টিজেনের ভাইরাস যথাযথভাবে নিষ্ক্রিয় হয়েছে কিনা তা পুনঃ পুন (তিন বার) এম্ব্রায়োনেটেড এগ এ ইনোকুলেশনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়।

এগ ক্যান্ডেলিং

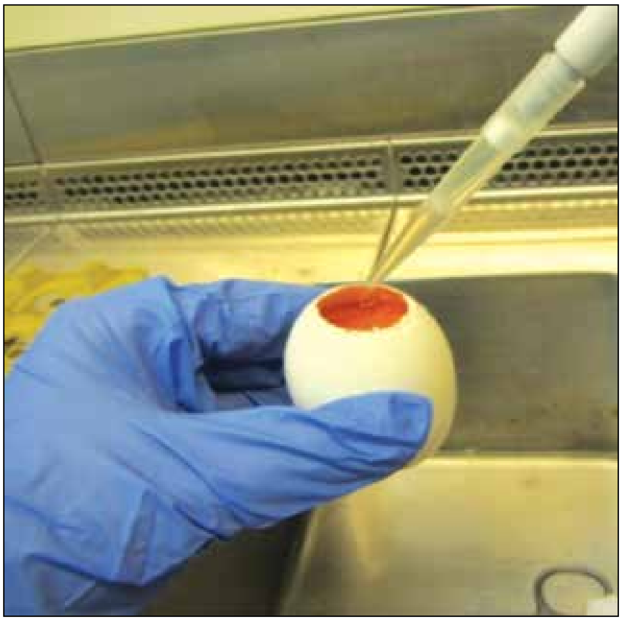

ভাইরাস হার্ভেস্টিং

উৎপাদিত এন্টিজেন ব্যাকটেরিয়া মুক্ত নিশ্চিতকরণ

ক) উৎপাদিত এন্টিজেনের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য যথা অস্বচ্ছতা (Turbidity) পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ (contamination) নির্ধারণ করা হয়।

খ) নন- সিলেকটিভ ব্যাকটেরিয়াল মিডিয়ায় (যথা-নিউট্রিয়েন্ট আগার) এক লুপ পরিমাণ এন্টিজেন নিয়ে স্প্রেড করে ৩৭° সেঃ তাপমাত্রায় ২৪ ঘণ্টা ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ইনকিউবেটরে ইনকিউবেট করা হয়। অনুজীবের কলোনি (colony) পরীক্ষণের মাধ্যমে এন্টিজেনে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

গ) কোন এন্টিজেনে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পাওয়া গেলে তা বাতিল করা হয়। কেবল মাত্র বিশুদ্ধ এন্টিজেনেই এইচ আই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়।

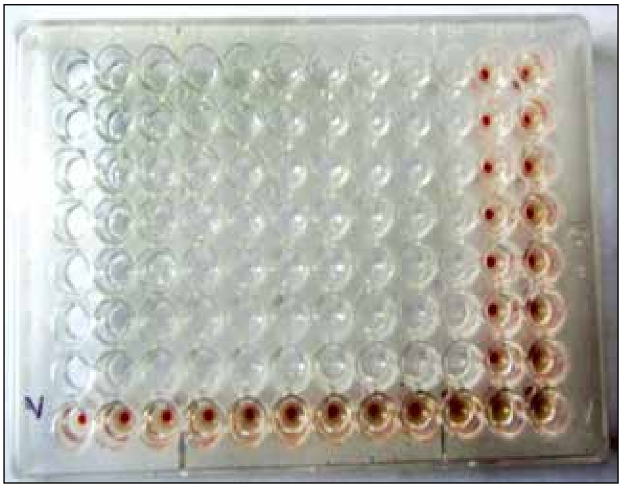

চিত্র : H5N1 এন্টিজেন এর HA unit পর্যবেক্ষণ

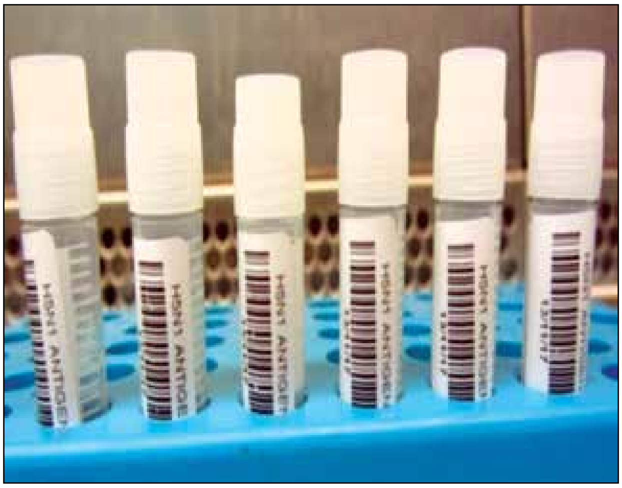

চিত্র : H5N1 এন্টিজেন

উপযোগিতা

উদ্ভাবিত HA এন্টিজেন HI পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। যে কোন গবেষণাগারে এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ।

গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবক

ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, ড. মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ, ডাঃ মোঃ রেজাউল করিম এবং ডাঃ মোঃ জুলফিকার আলী

ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণে বিএলআরআই মডেল
(পুনঃসংস্করণ-২০২০, ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণে বিএলআরআই মডেল)

ভূমিকা

ক্ষুরারোগ একটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে এ রোগকে ক্ষুরাচল বা বাতনাও বলে থাকে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি দ্বিক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণী এই রোগে আক্রান্ত হয়। প্রাণী চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ রোগটিকে সবচেয়ে মারাত্মক সংক্রামক রোগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। আন্তর্জাতিক প্রাণী রোগ সংস্থা (OIE) নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষুরারোগ এ (A) গ্রেড ভুক্ত একটি রোগ। এ রোগের ভাইরাস আক্রান্ত প্রাণী হতে ৫০-৭০ কিঃ মিঃ দূরবর্তী সংবেদনশীল প্রাণীকে আক্রান্ত করতে পারে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে যে, সার্বিকভাবে গরুতে এ রোগে আক্রান্তের হার শতকরা ৩৫ ভাগ, মহিষে শতকরা ২৩ ভাগ, এবং ছাগল ও ভেড়ায় শতকরা ৫ ভাগ। ক্ষুরারোগে আক্রান্ত বয়স্ক প্রাণীতে মৃত্যুর হার কম হলেও মহামারী এলাকায় আক্রান্ত বাছুরের মৃত্যুর হার শতকরা ৫০ ভাগ হতে পারে। গর্ভাবস্থায় এ রোগ হলে প্রায়ই গর্ভপাত হতে দেখা যায় এবং পরবর্তী গর্ভধারণে সমস্যা দেখা যায়। দুগ্ধবতী গাভীর দুধ উৎপাদন অনেক কমে যায়। ক্ষুরারোগের লক্ষণসমূহের মধ্যে রয়েছে, প্রাণীর দেহের তাপমাত্রা ১০৪°-১০৫° সে. উঠে যায়, জিহ্বা ও ক্ষুরের মাঝখানে ঘা, জিহ্বার উপরিভাগের খোলস উঠে যাওয়া এবং সাবানের ফেনার মতো মুখ দিয়ে লালা ঝরা উল্লেখযোগ্য।

ক্ষুরারোগ এপথো-ভাইরাস (Apthovirus) নামক এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র (২২-৩০ এনএম) ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট একটি রোগ। বিশ্বে এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসের ৭টি সিরোটাইপ সনাক্ত হয়েছে। প্রতিটি সিরোটাইপের আবার অনেকগুলি সাব-টাইপ রয়েছে। বর্তমানে দেশে ৩টি সিরোটাইপ (A, O ও Asia-1) বিরাজ করছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশে সাবলিনিয়েজ Ind 2001 BD1 এবং PanAsia লিনিয়েজটি বিরাজমান।

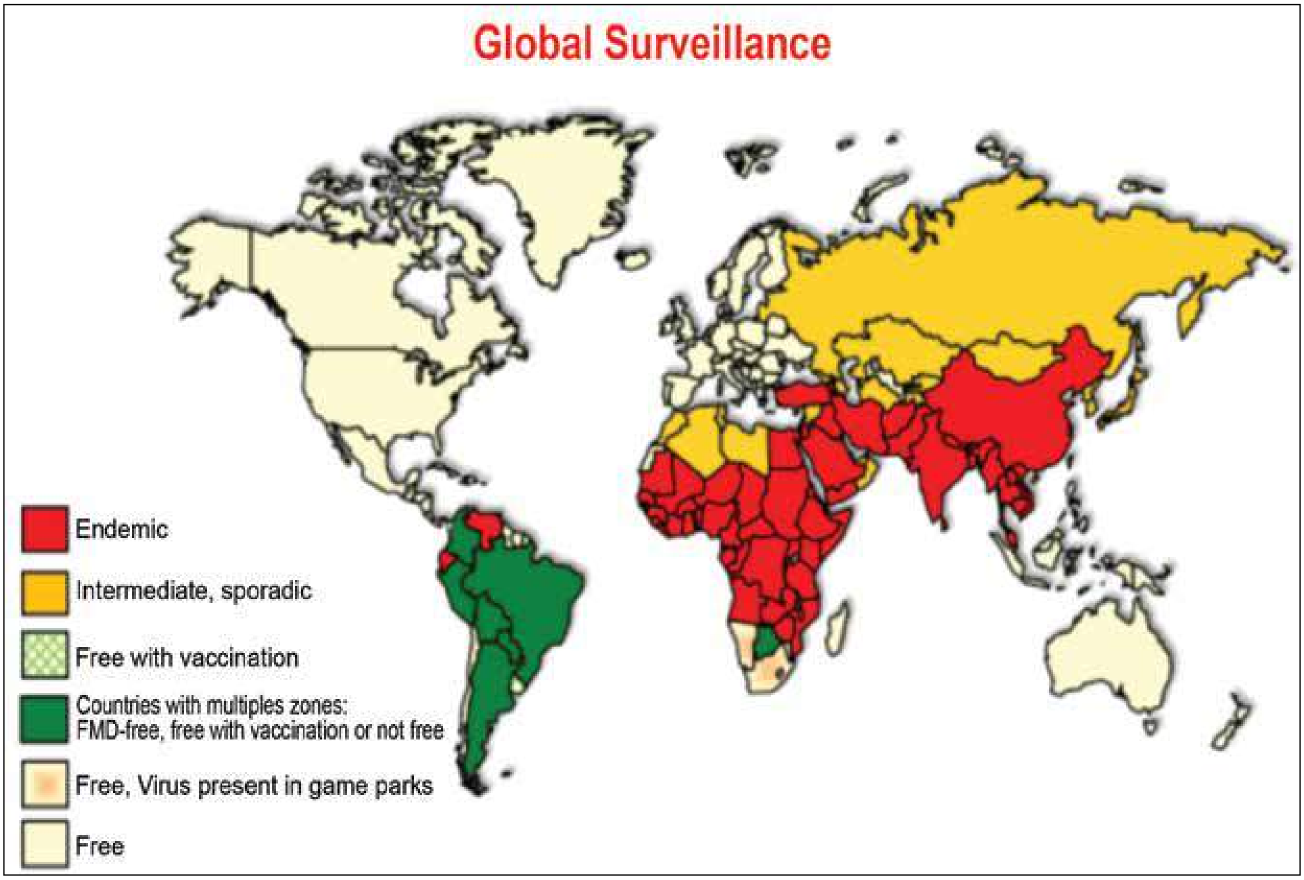

চিত্র: বিশ্বে ক্ষুরারোগের বিস্তার এবং আক্রান্ত দেশ ও অঞ্চলসমূহ

বাংলাদেশে প্রায় সারা বছরই এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। তবে বর্ষা এবং শীতকালে ক্ষুরারোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়। এ রোগের কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর ক্ষতির পরিমাণ ১৮০০০ কোটি টাকারও বেশী বলে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়। সংকর জাতের গরুতে এ রোগের সংক্রমণ তুলনামূলকভাবে বেশী পাওয়া যায়। এ রোগের কারণে প্রাণিসম্পদ খাতে বিনিয়োগ ও জাত উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে ব্যহত হচ্ছে। ক্ষুরারোগ ভাইরাসটির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে এর এক সিরোটাইপ দ্বারা তৈরি ভ্যাকসিন অন্য সিরোটাইপ দ্বারা সৃষ্ট রোগকে প্রতিরোধ করতে পারে না। ফলে কৌশলগত ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এই রোগ দমনে অতি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্প' এর মাধ্যমে FAO/OIE নির্দেশনা অনুসরণ করে কৌশলগত ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছে যা মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া গেছে।

চিত্র: ক্ষুরারোগের ভাইরাস

চিত্র: ক্ষুরারোগে আক্রান্ত অঙ্গসমূহ

ক্ষুরারোগ ভাইরাসের সিরোটাইপ ঃ

ক্ষুরারোগ প্রকল্পের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় বর্তমানে বাংলাদেশে ৩টি সিরোটাইপ (যেমন- A, O, ও Asia-1) বিচরণ করছে। গত প্রায় এক যুগ ধরে এ অঞ্চলে (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, মায়ানমার) সিরোটাইপ- C পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে সিরোটাইপ O এর সংক্রমণ (৬০-৭০%) দেখতে পাওয়া যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, যখন এক সিরোটাইপের ভ্যাক্সিন প্রাণীকে দেওয়া থাকে তখন অন্য দুইটি সিরোটাইপ (A ও Asia-1) এর আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় মহামারী এলাকায় সিরোটাইপ সমূহের মিশ্র ইনফেকশনও দেখা যায়।

ক্ষুরারোগে আক্রান্ত মৃত বাছুর

ক্ষুরারোগ মুক্ত অঞ্চলের ধারণা ঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের দেশ থেকে ক্ষুরারোগ নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছে এবং কিছু কিছু দেশ সে দেশের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল বা প্রদেশ ক্ষুরারোগ মুক্ত অঞ্চল ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছে। এ রোগের জীবাণুর সংক্রমণ ক্ষমতা অন্য ভাইরাসের চেয়ে বেশী বিধায় এই রোগ মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা বেশ কঠিন। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত সে দেশের কয়েকটি প্রদেশকে ক্ষুরারোগ মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। একই ভাবে ব্রাজিল ভ্যাক্সিন সহ ক্ষুরারোগ মুক্ত অঞ্চল ঘোষণা মাধ্যমে মাংস রপ্তানির সুযোগ তৈরি করছে। ঐ সকল দেশের অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক প্রাণী রোগ সংস্থা (OIE)-র নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্পের আওতায় দেশের কয়েকটি অঞ্চলে এই বিষয়ে গবেষণা করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া গিয়েছে।

চিত্র: প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা

ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ :

ক্ষুরারোগ দমন মডেলটি প্রয়োগের জন্য প্রাথমিকভাবে যে সকল বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে তা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো।

১। এলাকা নির্বাচন : একটি এলাকা (গ্রাম, ইউনিয়ন বা উপজেলা) ক্ষুরারোগ মুক্ত করার জন্য নির্বাচন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এলাকাটি নির্বাচনের সময় প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকের (Natural barrier) উপস্থিতি বিবেচনায় আনতে হবে। যেমন কোন নদী বা খালকে এলাকার সীমানা হিসাবে বিবেচনায় আনতে হবে। কৃত্রিমভাবে প্রতিবন্ধক তৈরী করেও এই মডেলটি প্রয়োগ করা যায়।

নির্বাচিত এলাকার প্রাণীর পরিসংখ্যান তৈরী করার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে জরিপ (Baseline survey) সম্পন্ন করতে হবে। পরিসংখ্যানে টিকা প্রদানের তথ্য, প্রাণীর বয়স, আনুমানিক শুমারী (প্রতি বছর প্রাণীর জন্ম, মৃত্যু, ক্রয়, বিক্রয়, জবাই ইত্যাদির কারণে স্থিতির পরিমাণ) রোগ সংক্রামণের প্রবণতা বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচিত এলাকার চার দিকে সম্ভব হলে ১ কি.মি ব্যাপী সংবেদনশীল প্রাণীকে অতিরিক্ত টিকা প্রদান করে বাফার জোন (Buffer Zone) তৈরি করতে হবে এবং সম্পূর্ণ নজরদারীতে আনতে হবে।

২। মানসম্পন্ন গবেষণাগার নির্বাচন :

ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য রোগটি দ্রুত সনাক্তকরা এবং সিরোটাইপ নির্ণয় করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর ফলে আক্রান্ত প্রাণী দ্রুত পৃথক করে রোগ বিস্তারে বাধা দেয়া যায়। এ ছাড়াও প্রাণী দেহে এন্টিবডির উপস্থিতি নির্ণয়, সংগ্রহকৃত নমুনা সংরক্ষণ, যথাযথভাবে নমুনা পরিবহন, ভ্যাক্সিন সংরক্ষণ ইত্যাদির জন্য দক্ষ জনবলসহ মানসম্পন্ন গবেষণাগারও আবশ্যক। অতএব মডেলটি বাস্তবায়িত হবে এমন এলাকার নিকটস্থ সরকারী প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে ক্ষুরারোগের রেফারেন্স গবেষণাগারের (BLRI) সাথে আঞ্চলিক প্রাণিরোগ গবেষণাগারের (FDIL/CDIL) সমন্বয় রাখতে হবে। গবেষণাগারে ক্ষুরারোগের উপর দক্ষ গবেষক বা বিজ্ঞানী থাকতে হবে। তাছাড়া, ক্ষুরারোগের টিকার কার্যকারিতা ও বিরাজমান ভাইরাসের সাথে সামঞ্জস্যতাও নির্ণয় করার জন্য গবেষণাগারের সহায়তা প্রয়োজন।

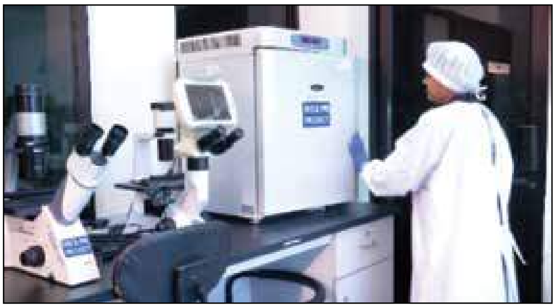

চিত্র: গবেষণাগারের কার্যক্রম

চিত্র: বিএলআরআই ক্ষুরারোগ গবেষণাগার

৩। ক্ষুরারোগের মানসম্পন্ন ভ্যাক্সিন সংস্থান করা :

ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ মডেলটির প্রধান উপকরণ হলো ক্ষুরারোগের মানসম্পন্ন ভ্যাক্সিন। প্রাণী জরিপের মাধ্যমে পর্যাপ্ত ভ্যাক্সিনের সঠিক হিসাব ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

চিত্র: ক্ষুরারোগের ভ্যাক্সিন

৪। প্রশিক্ষিত প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মী তৈরি :

মডেলটি বাস্তবায়নের জন্য প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মী প্রয়োজন হবে। প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মীবৃন্দ প্রাণীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, ভ্যাক্সিন প্রদান, কৃমিনাশক প্রদান, স্বাস্থ্য-কার্ড পূরণ, রোগের প্রাদুর্ভাব রেকর্ড ও অন্যান্য প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদান করবে। অতএব পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মী তৈরি করতে হবে।

৫। জনসচেতনতা তৈরি : করার জন্য খামারিদের মাঝে জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় জন প্রতিনিধি, প্রচার মাধ্যম ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের সহায়তায় খামারিদের ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণে বিএলআরআই মডেল

চিত্র: প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মী

OIE এর নির্দেশনা অনুসরণ করে ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণে বিএলআরআই মডেল বাস্তবায়নে ৫টি ধাপ রয়েছে। মডেলটির প্রতিটি ধাপের জন্য নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম রয়েছে।

ধাপ- ০ : শূন্য পর্যায় (তথ্য বিহীন পর্যায়)- ক্ষুরারোগ সম্বন্ধে যখন কোন দেশে বা অঞ্চলে কোন তথ্য উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছেনা বা এ বিষয়ে খুব সামান্য তথ্য আছে এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই, এমন পর্যায়টিকে ধাপ শূন্য বলা হয়।

ধাপ-১ : ইপিডেমিওলজিক্যাল জরিপ পর্যায়-

ইপিডিমিওলজিক্যাল জরিপ এর মাধ্যমে, নির্বাচিত অঞ্চলের ক্ষুরারোগের ঝুঁকি সনাক্ত ও প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে। জরিপের সময় বছরের কোন সময় এ অঞ্চলে ক্ষুরারোগ এর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, রোগটির কোন সিরোটাইপ পাওয়া যায়, কী সংখ্যায়

প্রাণী সংক্রামিত হয়, কোন জাতের প্রাণী বেশী সংক্রামিত হয় ও কী সংখ্যায় প্রাণী মারা যায় তার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। খামারি ভ্যাক্সিন দেয় কিনা, দিলে বছরে কতবার দেয়, চিকিৎসা সেবা পর্যাপ্ত কিনা, রোগ সনাক্তকরনের জন্য ল্যাব আছে কি না তা বিবেচনায় আনতে হবে।

এই ধাপটিতে ইপিডিমিওলজিক্যাল জরিপ ছাড়াও নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে-

ক) একটি বেজলাইন জরিপ চালাতে হবে। যার মাধ্যমে গবাদিপ্রাণীর সংখ্যা নির্ধারণ হবে

খ) ক্ষুরারোগ সম্পর্কে খামারি ও এলাকাবাসীর ধারণা জানতে হবে

গ) কৃমি মুক্তকরণ ও ভ্যাক্সিন প্রদান সম্বন্ধে খামারিরা কতটুকু সচেতন তা জানতে হবে

ঘ) গবাদিপ্রাণীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কোন মানের তা জানতে হবে

চিত্র: জরিপের জন্য খামারির সাথে প্রশ্নোত্তর পর্ব

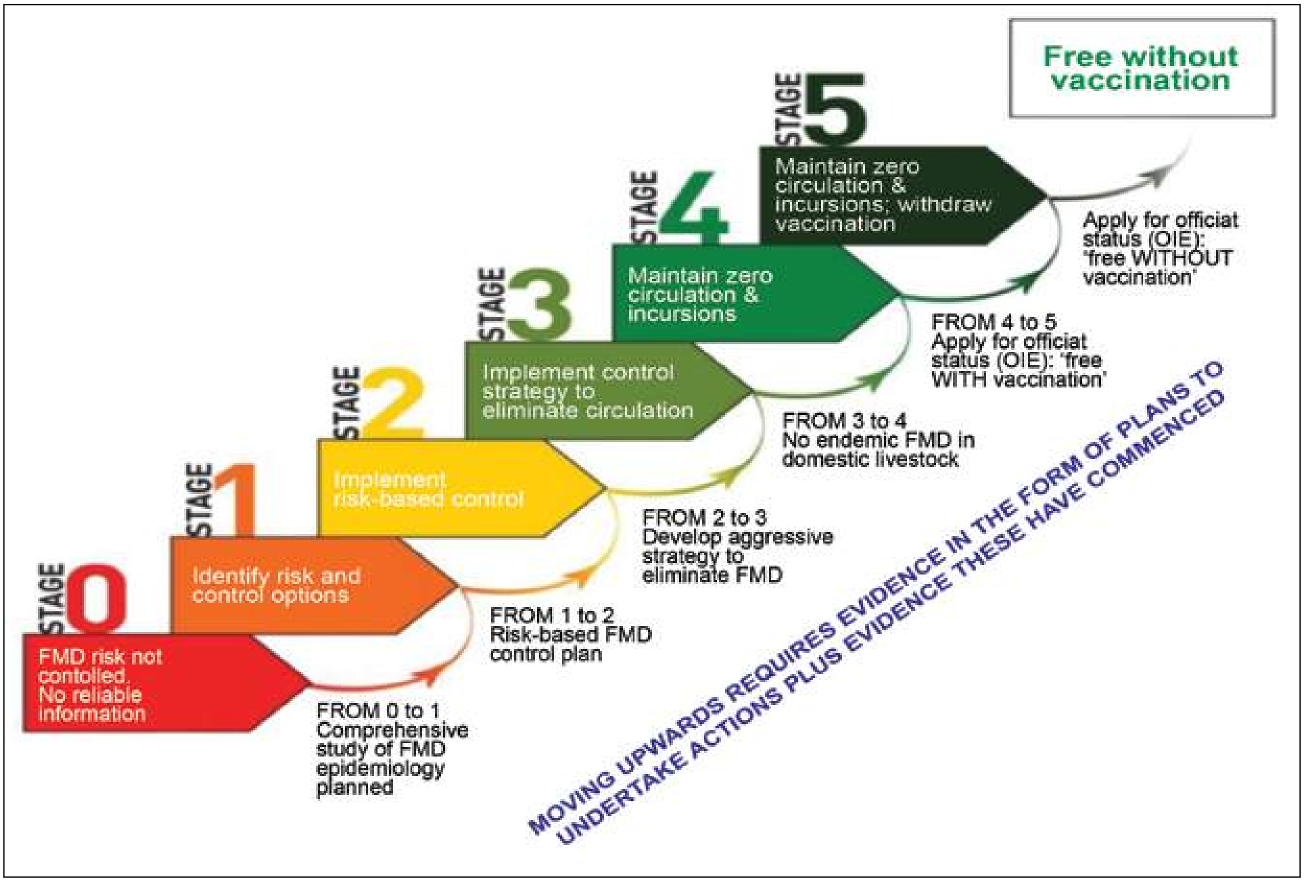

চিত্র: ওআইই (OIE) নির্দেশিত ধাপগুলি

ধাপ-২: ঝুঁকি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্যায়-

ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণে ঝুঁকি নির্ধারণ ও পরিকল্পপনা প্রণয়ন পর্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্প এলাকার দুর্বল বিষয়গুলো সনাক্ত করে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে মডেলটি বাস্তবায়ন সহজতর হবে। বিএলআরআই-এর গবেষণায় দেখা যায় প্রধান ঝুঁকিগুলোর মধ্যে রয়েছে (১) দুর্বল ভেটেরিনারি পরিসেবা (২) ভ্যাক্সিন সরবরাহে অপ্রতুলতা (৩) রোগ নিয়ন্ত্রণে খামারিদের অজ্ঞতা (৪) ক্ষুরারোগ এর সিরোটাইপ এর সিরোটাইপ অজানা (৫) অনিয়ন্ত্রিতাবে গবাদি প্রাণী চলাচল করা এবং (৬) যখন তখন প্রাণী ক্রয় ও বাজারজাত। সনাক্তকৃত ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কর্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(১) দুর্বল ভেটেরিনারি পরিসেবা ঃ মডেল এলাকার ভেটেরিনারী পরিসেবা উন্নত করার জন্য গবাদিপ্রাণীর সংখ্যা অনুপাতে প্রাণিস্বাষ্থ্য কর্মী তৈরি করতে হবে। এ সকল প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মীদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, কৃমিনাশক প্রদান, ভ্যাক্সিন প্রদান, নমুনা সংগ্রহ, প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা এবং ভেটেরিনারিয়ানকে সহযোগিতা করার বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে।

(২) ভ্যাক্সিন সরবরাহে অপ্রতুলতা ঃ নির্ধারিত এলাকার গবাদিপ্রাণির সংখ্যা অনুসারে পর্যাপ্ত মান সম্পন্ন ক্ষুরারোগের ভ্যাক্সিন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। সকল সংবেদনশীল দ্বিক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণীকে বছরে দুইবার ভ্যাক্সিন দিতে হবে। ভ্যাক্সিন দেয়ার ৪ সপ্তাহ পরে আনুপাতিক হারে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে ভ্যাক্সিন-এর কার্যকারিতা (এন্টিবডির মাত্রা) যাচাই করতে হবে। ভ্যাক্সিন প্রস্ততকারকের নির্দেশনা অনুযায়ী ভ্যাক্সিন প্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে।

(৩) রোগ নিয়ন্ত্রণে খামারিদের অজ্ঞতা ঃ রোগ নিয়ন্ত্রণে খামারিদের সহযোগিতা খুবই দরকার। খামারের জীব নিরাপত্তা, নিয়মিত সংক্রামক রোগের ভ্যাক্সিন দেয়া এবং তথ্য সংগ্রহ করা, খামারের পরিবেশ পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা, নিয়মিত কৃমিনাশক প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়ে খামারিদের সচেতন করতে হবে। খামারিকে প্রশিক্ষিত প্রাণিস্বাষ্থ্য কর্মী বা নিকটস্থ প্রাণিসম্পদ অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে উৎসাহিত করতে হবে।

(৪) ক্ষুরারোগ এর সিরোটাইপ সনাক্ত করা ঃ
ক্ষুরারোগের বিরাজমান ভাইরাসের টাইপ নির্ণয় করে ভ্যাক্সিন প্রদান করতে হবে। এর জন্য মডেল এলাকায় ক্ষুরারোগ এর নমুনা সংগ্রহ করে এর সিরোটাইপ সনাক্ত এবং জিন সিকোয়েন্স করে ভ্যাক্সিন নির্বাচন করতে হবে। এর ফলে ভ্যাক্সিন থেকে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যাবে।

(৫) নতুন সংগ্রহ করা প্রাণীর সংগনিরোধ এবং আক্রান্ত প্রাণী পৃথকীকরণ ঃ

নতুন সংগ্রহ করা প্রাণীকে প্রথমে ২ সপ্তাহ পর্যন্ত সংগনিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ক্ষুরারোগ দমন মডেলটি বাস্তবায়নের জন্য প্রাণী সংগনিরোধ বা কোয়ারেনটাইন করার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করতে হবে। যে সকল খামারি কোন কারণে এলাকায় সংবেদনশীল প্রাণী আনতে চায় অথবা কোন কারণে কোন খামারে ক্ষুরারোগ বা অন্য সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, তখন রোগাক্রান্ত প্রাণীকে দ্রুত

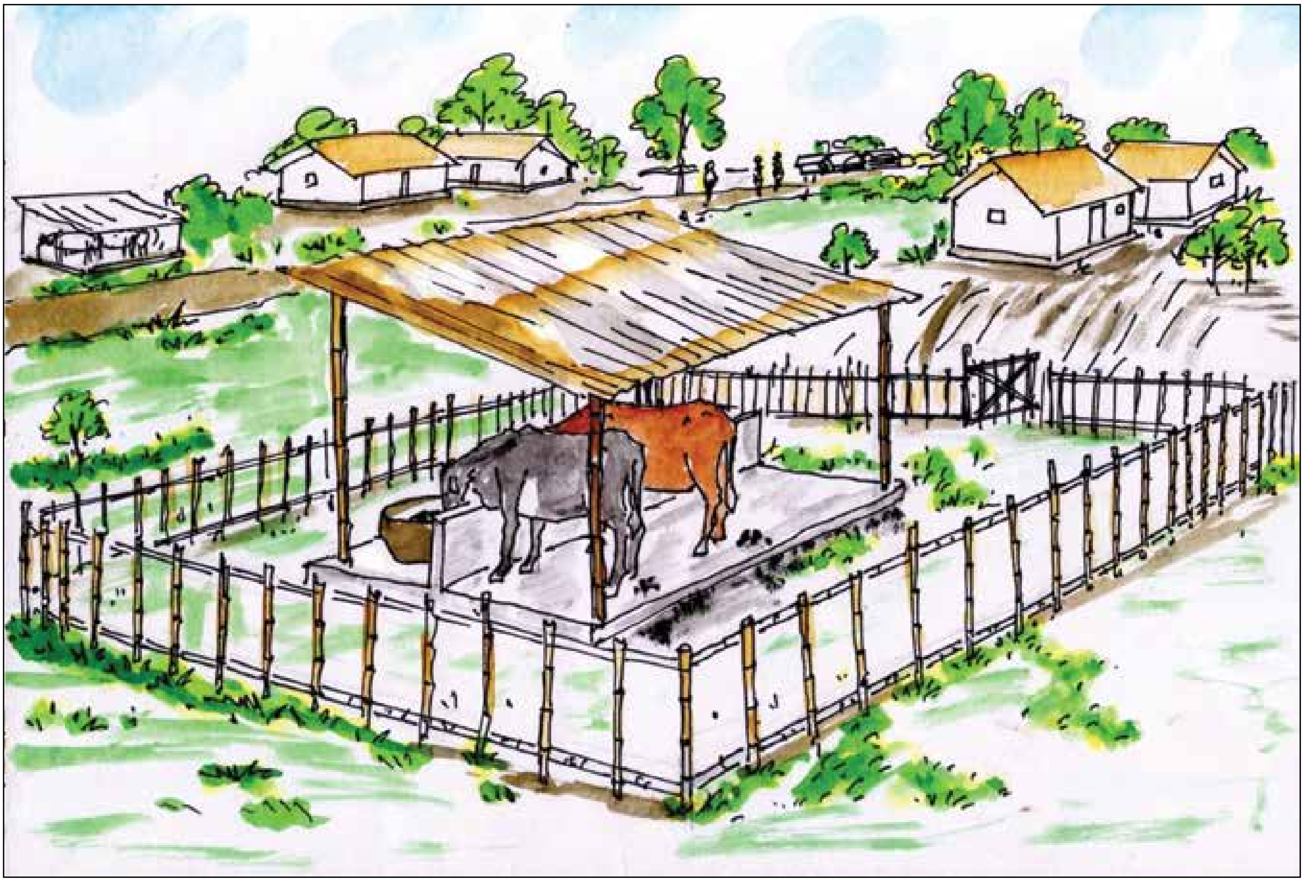

চিত্র: সংগনিরোধে রাখা প্রাণী

এই স্থানে সংগনিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ রোগাক্রান্ত প্রাণীটিকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক স্থানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন সংগ্রহ করা সংবেদনশীল প্রাণীর সংগনিরোধকালীন সময় প্রাণী আনার পরই কৃমিনাশক দিতে হবে এবং ৭ দিন পর্যবেক্ষণ করে যদি কোন রোগ লক্ষণ না দেখা দেয় তবে ক্ষুরারোগের ভ্যাক্সিন দিয়ে পরবর্তী ১৫ থেকে ২০ দিন পর্যবেক্ষণ করে সুস্থ অবস্থায় প্রাণীকে মূল খামারে স্থানান্তর করতে হবে। সংগনিরোধ করার জন্য স্থান নির্বাচনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এলাকাটিতে প্রাণী চলাচল কম থাকে এবং মূল খামার থেকে দূরে হয়। এর ফলে নতুন সংগ্রহ করা প্রাণী হতে ক্ষুরারোগ মুক্ত অঞ্চলে রোগ সংক্রামিত হওয়ায় সম্ভবনা কম থাকবে। আক্রান্ত প্রাণীকে চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৬) দক্ষ জনবল তৈরি করা

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষ জনবলের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারী, যথাযথভাবে টিকা প্রদান, নমুনা সংগ্রহ, গবেষণাগারে রোগ সনাক্তকরণ, বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পাদন, বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল নিশ্চিত করতে হবে।

(৭) খামারি প্রশিক্ষণ :

চিত্র: খামারি প্রশিক্ষণ

আমাদের দেশের অধিকাংশ খামারির প্রাণিপালন ও রোগ দমন, পুষ্টির প্রাপ্যতা, জীব নিরাপত্তা ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা কম। তাই রোগটি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে প্রথমেই খামারিকে উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রশিক্ষিত করতে হবে। উল্লেখিত বিষয়গুলি প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত জরুরি যা মডেলটি বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

(৮) প্রাণিস্বাস্থ্য কার্ড প্রদান :

প্রাণীর জন্ম, কৃমিনাশক প্রদান, ভ্যাক্সিন প্রদান সহ অন্যান্য রোগবালাই ও চিকিৎসা প্রদানের তথ্য সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি খামারিকে গবাদিপ্রাণী স্বাস্থ্যসেবা কার্ড প্রদান করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা কার্ডে খামারিগণ উপরোক্ত তথ্যবলী লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

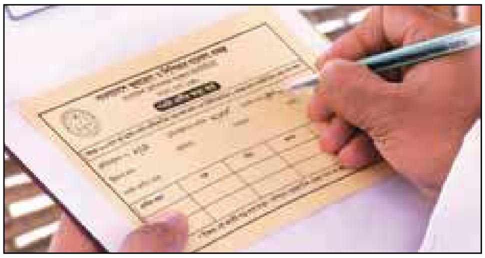

চিত্র: প্রাণীস্বাস্থ্য কার্ড

ধাপ-৩: ক্ষুরারোগের গণ ভ্যাক্সিন (Mass Vaccination) প্রদান ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যায়-

মূলত এই পর্যায়টি ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যায়। গণ কৃমিনাশক প্রদান, গণ ভ্যাক্সিন প্রদান ও ভ্যাক্সিন প্রদানের পূর্বে ও পরে এন্টিবডির মাত্রা নির্ধারণ করে হার্ড ইমিউনিটি (Herd Immunity) নিশ্চিত করা এই পর্যায়ের প্রধান কাজ। এছাড়াও ক্ষুরারোগের কোন সিরোটাইপের দ্বারা সংক্রমণ হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

১। বাফার জোন তৈরি :

যে এলাকাটি ক্ষুরারোগ মুক্ত মডেলের আওতায় থাকবে তার চার দিকে অন্তত পক্ষে এক কেজিমিটার এলাকার সকল গবাদিপ্রাণিকে কৃমিনাশক ও ভ্যাক্সিনেশন এর আওতায় আনতে হবে। ধাপ-৩ শুরুর অন্তত পক্ষে ১ মাস আগে বাফার জোন তৈরি করতে হবে। বাফার জোনে ক্ষুরারোগের এন্টিবডি নিশ্চিত করতে হবে।

২। গণ কৃমিনাশক প্রদান : নির্বাচিত এলাকায় ২ মাসের অধিক বয়সের সকল প্রাণীকে একই সাথে বিভিন্ন ধরনের পরজীবির উপর বিস্তৃতভাবে কার্যকর কৃমিনাশক (Broad spectrum) প্রদান করতে হবে। প্রথম বার কৃমিনাশক দেয়ার পর ২১ দিন পর পুনরায় কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে পরজীবি সংক্রমণের মাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। পরবর্তীতে প্রতি ৪ মাস পর পর সকল প্রাণীকে কৃমি নাশক প্রদান করতে হবে। ফলশ্রুতিতে প্রাণীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং প্রদানকৃত ভ্যাক্সিন হতে ভাল এন্টিবডি পাওয়া যাবে।

চিত্র: কৃমিনাশক প্রদান করার পদ্ধতি

চিত্র: খামারিকে কৃমিনাশক প্রদাান ক্রিমিনাশক প্রদান করার পদ্ধতি

৩। গণ ভ্যাক্সিন প্রদান (Mass Vaccination) ও ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা যাচাই ঃ দ্বিক্ষুর বিশিষ্ট দুই মাস বয়সের উর্ধ্বে সকল প্রাণীকে চামড়ার নিচে একবার ও ছয় মাস পর পর পুনরায় টিকা প্রদান করতে হবে। সাধারণত, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঈদ-উল-আযহার এক মাস আগে উৎসবমুখর পরিবেশে গণ ভ্যাক্সিন প্রদান করলে ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। তাছাড়া, উক্ত এলাকায় নতুন ক্রয় করা প্রাণীকে একই নিয়মে ভ্যাক্সিন প্রদান করতে হবে। ভ্যাক্সিন সব সময় ৪° ডিগ্রী সেঃ তাপ মাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। এর জন্য গবেষণাগারে বা সংরক্ষণগারে ফ্রিজ এবং বিরতিহীন বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে। নতুন প্রাণীর বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে যাতে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে টিকা প্রদান করা যায়।। টিকা প্রদানের ক্ষেত্রেঃ- কৃমিনাশক প্রদানের ১৪ দিন পর ভ্যাকসিন প্রদান করা শ্রেয়। যে সকল এলাকায় এনডেমিক ডিজিজ বেশী সেখানে ১ম ডোজ ভ্যাকসিন প্রদানের তিন সপ্তাহ পর ২য় ডোজ বুস্টার ভ্যাকসিনেশন করলে হার্ড ইমিউনিটি তৈরিতে সহায়ক হয়। ভ্যাকসিন প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ৫ টি বিষয় অত্যাবশ্যকীয়ঃ-

চিত্র: গবাদিপ্রাণিকে ভ্যাক্সিন প্রদান

- ✓ Quality Vaccine (মানসম্পন্ন ভ্যাকসিন)
- ✓ Cool Chain (কুল চেইন: ভ্যাকসিন উৎপাদন- ভ্যাকসিন প্রদান)
- ✓ Sound Vaccinator (দক্ষ ভ্যাকসিনেটর)
- ✓ Cool Environment (শান্ত আবহাওয়া)
- ✓ Cool Animal (শান্ত প্রাণী)

৪। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাচাই ঃ প্রাণীর সর্বমোট সংখ্যার উপর গড়ভিত্তিক একটি সিরোলজিক্যাল জরিপ করা প্রয়োজন। এখানে প্রাণীর ক্ষুরারোগ এর বিরুদ্ধে এন্টিবডির পরিমাণ তথা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করবে। ভ্যাক্সিন প্রদানের পূর্বে ও ৪ সপ্তাহ পরে প্রাণী থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে রক্ত নমুনা সংগ্রহ করে এলাইজা (ELISA) পদ্ধতিতে এন্টিবডির পরিমাণ দেখতে হবে। উক্ত এলাকায় ক্ষুরারোগের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে।

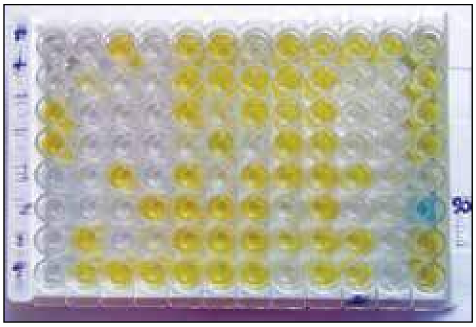

চিত্র: এলাইসা পদ্ধতিতে এন্টিবডি পরীক্ষা

৫) ক্ষুরারোগ ও একই ধরনের অন্যান্য প্রাণীরোগ নির্ণয় ঃ

মডেল এলাকায় ভ্যাক্সিন প্রদানের পূর্বে ও পরে ক্ষুরারোগের লক্ষণ প্রকাশকারী প্রাণী হতে নমুনা সংগ্রহ করে মলিকুলার পদ্ধতিতে (PCR) ক্ষুরারোগের ভাইরাস সনাক্তকরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি উক্ত এলাকায় লক্ষণ প্রকাশকারী প্রাণীতে ক্ষুরারোগের ভাইরাসের উপস্থিতি না থাকে সেটিও ঘোষণা করতে হবে। মডেল এলাকায় ধাপ-৩ এর কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব এর কারণ উদঘাটন করতে হবে। এর জন্য নমুনা সংগ্রহ করে সিরোটাইপ সনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ।

৬। জীব নিরাপত্তা ঃ গবাদি প্রাণী পালনের ক্ষেত্রে জীব নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খামারিদের মধ্যে জীব নিরাপত্তার ধারণাটি অস্পষ্ট। জীব নিরাপত্তার নিয়মকানুনগুলি মেনে কীভাবে খামার রোগ বালাই থেকে মুক্ত রাখা যাবে সে সব উপায়গুলি সহ মৃত প্রাণীর সৎকারের নিয়মগুলি খামারিদের জানাতে হবে। অচেনা নতুন প্রাণী এলাকায় আনার পূর্বে সংগনিরোধ করার পদ্ধতি খামারিকে অবগত করতে হবে। অসুস্থ প্রাণীকে বিক্রয় বা জবাই করা যাবে না।

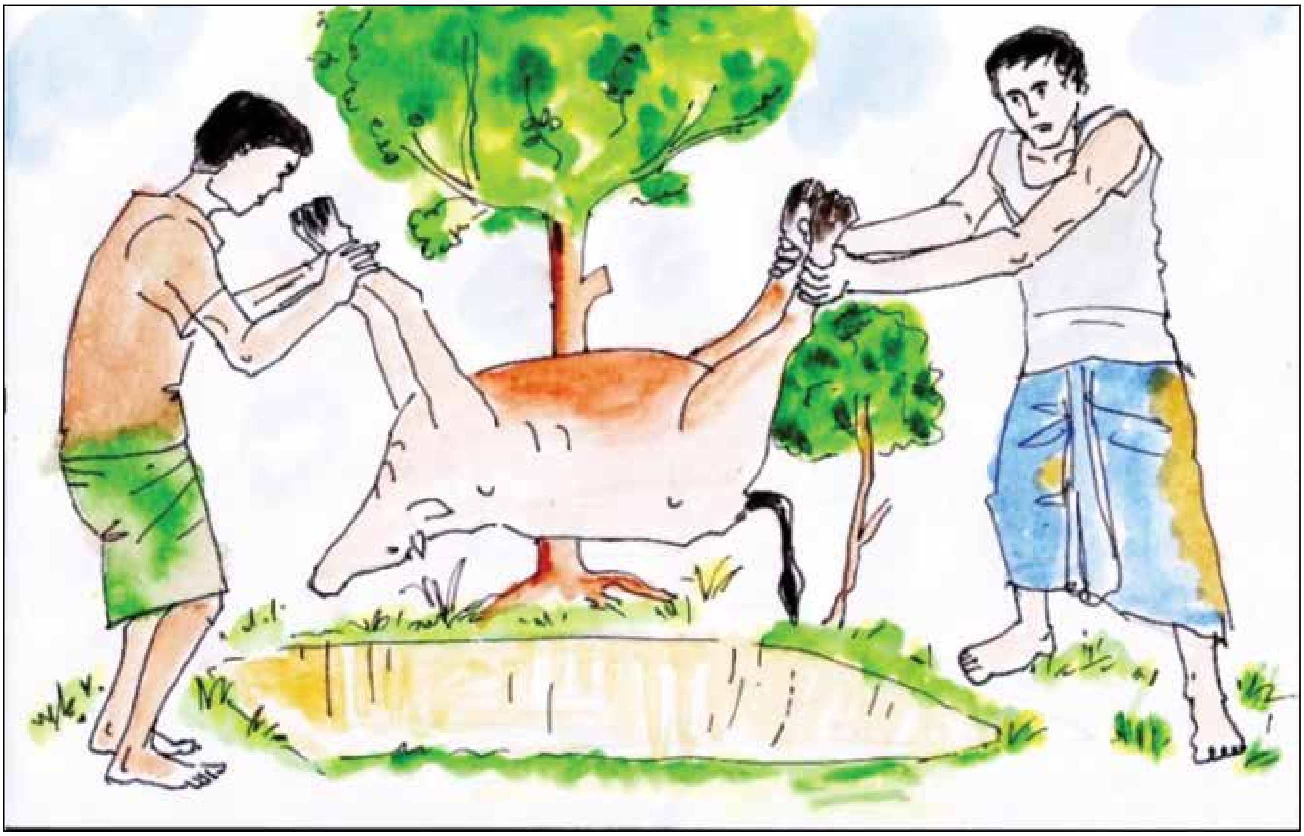

চিত্র: মাটিতে গর্ত করে মৃত প্রাণী সৎকার

৭) সাধারণ বিষয়াবলী ঃ রোগ দেখা দিলে খামারি কর্তৃক তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনা, জরিপকারীদের ও নমুনা সংগ্রহকারীদের নিবিড় সহায়তা প্রদান, খামারিদের স্বাস্থ্য তথ্য সংরক্ষণ (স্বাস্থ্য কার্ড) প্রভৃতি সম্বন্ধে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ পর্যায়ে যথাযথ ভ্যাক্সিন প্রদান করার পরে এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। এলাকায় পালিত সকল গবাদিপ্রাণীতে ক্ষুরারোগ-এর প্রাদুর্ভাব সম্পূর্ণভাবে রোধ করতে হবে। পরবর্তী ধাপে (৪নং ধাপে) উত্তীর্ণ হতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও বিবেচনায় নিতে হবে এবং সর্তকতার সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পালন করতে হবে।

ক) সংক্রামিত এলাকা বা বাজার থেকে কোন প্রাণী মডেল এলাকায় আনা যাবে না।

খ) যদি কোন প্রাণীতে ক্ষুরারোগের লক্ষণ দেখা যায় তবে তা দ্রুত আলাদা করে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শমত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়াও যে কোন রোগ দেখা দিলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে।

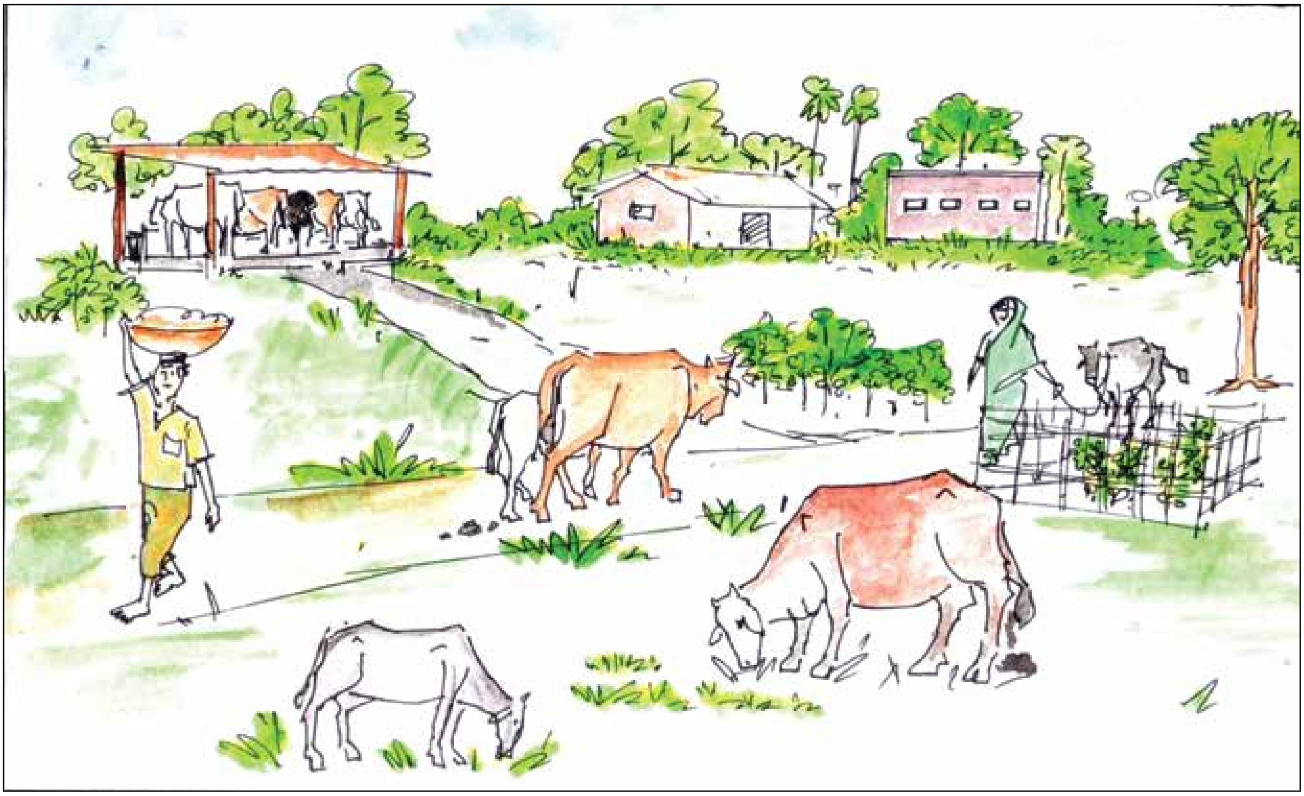

চিত্রঃ অবাধ প্রাণী চলাচল

গ) মডেল এলাকায় অবাধ প্রাণী চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। জীবিত প্রাণী পরিবহন রোগ সংক্রমণে সহায়তা করে।

ঘ) বিভিন্ন উৎসবের এক মাস পূর্বে এলাকার খামারিদের সতর্ক করতে হবে কারণ এ সময় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রাণী চলাচল বেড়ে যায় এবং রোগাক্রান্ত প্রাণীর মাধ্যমে সংক্রামণ বৃদ্ধি পায়।

ঙ) এলাকায় প্রাণীর প্রবেশ ও বাহির হওয়ার পথগুলিতে নজরদারী করতে হবে, যাতে কোন রোগাক্রান্ত প্রাণী এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে।

চ) প্রাণী পরিবহন বাজারজাত করার সময় সনদ পত্র সংরক্ষণ করার বিধান থাকবে।

ছ) গণ ভ্যাক্সিনেশনের পর প্রাণীর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

জ) খাদ্য সরবরাহ - প্রাণীর খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টির প্রাপ্যতা এবং খাবারের পরিমাণ ও পানির পরিমানের বিষয়গুলি খামারিদের কাছে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

ঝ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঃ খামারে গবাদি প্রাণীর বিভিন্ন বর্জ্য যেমন, উচ্ছিষ্ট খাদ্য, গোবর, মূত্র ইত্যাদি জীব নিরাপত্তা ক্ষেত্রে হুমকি এবং বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে। এসব বর্জ্য একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে কম্পোস্ট করে পুনঃ ব্যবহারযোগ্য করা যেতে পারে।

ধাপ- ৪: ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রিত এলাকা ঘোষণা (ভ্যাক্সিনসহ) (FMD free zone with vaccination) ঃ

ধাপ ৩ (তিন) এর পরপর নূন্যতম ৩ বছর পুনরাবৃত্তি করতে হবে। প্রাণীর চলাচল কঠোর নজরদারীতে আনতে হবে। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। পরপর চার বছর হার্ড ইমিউনিটি (ভ্যাক্সিন প্রদানসহ) নিশ্চিত করতে হবে। ৪র্থ ধাপের কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালিত করলে নির্বাচিত এলাকায় ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব শূন্য পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।

এ পর্যায়ে নিশ্চিত করতে হবে যে ভ্যাক্সিন দেয়ার পর নির্বাচিত এলাকায় কোন প্রকার ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাবের ঘটনা ঘটে নাই। এ পর্যায়টি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখতে হবে। এ ধাপটিকে বলা হয়, ভ্যাকসিন প্রদানসহ ক্ষুরারোগ মুক্ত এলাকা (**FMD Free- zone with vaccination**)। এ ধাপটির স্বীকৃতির জন্য OIE-এর কাছে নিয়ম মেনে আবেদন করতে হবে। OIE পর্যবেক্ষণ দল নীরিক্ষার পর সনদ দিলেই কেবল এলাকাটিকে ”ভ্যাকসিন প্রদান সহ ক্ষুরারোগ মুক্ত অঞ্চল” ঘোষণা করা যাবে।

ধাপ-৫: ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রিত এলাকা ঘোষণা (ভ্যাক্সিন ছাড়া) (FMD Free zone without vaccination)

৪র্থ ধাপ এর কার্যক্রম কয়েক বৎসর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পর এই ধাপে পৌঁছা যাবে। এ ধাপটি ভ্যাক্সিন প্রদান ছাড়া চুড়ান্তভাবে 'ক্ষুরারোগ মুক্ত' থাকবে। এ ধাপটির স্বীকৃতির জন্যও OIE-এর কাছে নিয়ম মেনে আবেদন করতে হবে। OIE পর্যবেক্ষক দল নীরিক্ষার পর সনদ দিলেই কেবল এলাকাটিকে চূড়ান্তভাবে ” ক্ষুরারোগ মুক্ত অঞ্চল ভ্যাকসিন ছাড়া” (FMD Free zone without vaccination) ঘোষণা দেয়া যেতে পারে। তবে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এ ধাপটিতে উত্তরণ করা কঠিন। কারণ আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলিতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে। ৫ম ধাপে পৌঁছার জন্য প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সমন্বয় করে এ রোগ নিয়ন্ত্রণের কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার

আমাদের দেশে প্রায় সারা বছরই ক্ষুরারোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের (দুই ঈদ) সময় ও পর এ রোগের প্রাদুর্ভাব সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে। অতএব বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের পূর্বে গবাদিপ্রাণীকে মান সম্পন্ন ত্রিযোজি ভ্যাক্সিন প্রদান করতে হবে। পরিকল্পিতভাবে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা গেলে মাংস রপ্তানীর সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। এর জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন ভ্যাক্সিন, গবেষণাগার, সঠিকভাবে ভ্যাক্সিন প্রদান ও স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার জন্য দক্ষ জনবল এবং সুষ্ঠ পরিকল্পনাকরে মডেলটি বাস্তবায়ন। বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্পের আওতায় ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ মডেলটি উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রান্তিক পর্যায়ে মডেলটি বাস্তবায়ন করা হলে এর অভিষ্ট SDG-2030 লক্ষ অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার আলোকদিয়া গ্রামের খামারি এবং বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র বাঘাবাড়ীর সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ, যাদের সহায়তায় বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্পের আওতায় উক্ত গ্রামের গরুতে ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ মডেলটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

গবেষণায় ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে

ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, ডাঃ মোঃ রেজাউল করিম, ডাঃ মোঃ জাকির হাসান, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ডাঃ মোঃ জুলফিকার আলী, ডাঃ মোঃ আবু ইউসুফ, ডাঃ ইউশা ইসলাম এবং ড. মোঃ শওকত মাহমুদ

দারিদ্র্য বিমোচনে ছাগল পালন

ভূমিকা

ক্রবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে দেশে পোল্ট্রি এবং মৎস্য উৎপাদন দ্রুত বাড়লেও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে প্রাণিসম্পদ বিশেষ করে ছাগলের উৎপাদন আশানুরূপ বাড়েনি। এদেশে প্রাপ্ত প্রায় ১৫ মিলিয়ন ছাগলের প্রায় ৭৬% পালন করে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ধরনের খামারিরা। বাংলাদেশে প্রাপ্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস যেমন সুস্বাদু, চামড়া তেমনি আন্তর্জাতিকভাবে উন্নতমানের বলে স্বীকৃত। তাছাড়া ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অধিক এবং তারা দেশীয় জলবায়ুতে বিশেষভাবে উৎপাদন উপযোগী।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল প্রধানত মাংস ও চামড়া উৎপাদনকারী জাত হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত। এদের গড় ওজন (১৫-২০ কেজি) ও দৈহিক ওজন বৃদ্ধির হার (২০-৪০ গ্রাম/দিন) বিশ্বের অন্যান্য স্বীকৃত মাংস উৎপাদনকারী জাত যেমনঃ বোয়ের, সুদানিজ ডেসারট, বারবারি ইত্যাদির চেয়ে অনেক কম। তবে এদের বছর অনুযায়ী বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য বিদেশী জাতের ছাগলের তুলনায় অনেক বেশি বলে সার্বিক মাংস উৎপাদনের পরিমাণও বেশি। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দুধের উৎপাদন বাচ্চার চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় বাচ্চা মৃত্যুর হার বেশি। তবে গর্ভবতী ছাগলের পর্যাপ্ত পুষ্টিসহ স্বাস্থ্য ও প্রজনন ব্যবস্থাপনা এই সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখে। ছাগল পালনের মাধ্যমে একজন ভূমিহীন বা প্রান্তিক খামারি কিভাবে বাড়তি আয় করতে পারেন এলক্ষ্যেই মডেলটি উদ্ভাবিত।

মডেলের ধরনঃ ছাগল পালন মডেলটি ১নং লেখাচিত্রে দেখানো হলো। এখানে খামারিকে একবার/দুইবার বাচ্চা দিয়েছে এরূপ দুইটি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগী ধারে সরবরাহ করতে হবে।

সেই সাথে খামারিকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে হবে। পরবর্তী ১-২ বছরে কিস্তিতে উক্ত মূল্য শোধ করতে হবে। তবে ছাগলের মৃত্যুজনিত কারণ এসময়ের পরিবর্ধন করা যাবে। তাছাড়া প্রযুক্তিগত সহায়তা খামারিগণকে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহ করতে হবে। একটি এলাকায় ১০-১৫ টি মডেল খামারির জন্য ২টি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের পাঁঠা ধারে সরবরাহ করা হবে যার দায়িত্বে থাকবেন একজন খামারি। তিনি সরবরাহকৃত পাঁঠার সাহায্যে মডেল খামারিদের ছাগীসহ অন্যান্য ছাগীর প্রজনন করাবেন। এ ক্ষেত্রে প্রতি সার্ভিসের জন্য ২৫ টাকা ফি নির্ধারণ করা হবে। প্রাপ্ত ফি থেকে উক্ত খামারি পাঁঠার মূল্য পরিশোধসহ পাঁঠার রক্ষণাবেক্ষণের অন্যান্য ব্যয় মেটাবেন। খামারিগণ তাদের খামারের আয়তন ১০-১২টি ছাগলের মধ্যে রাখবেন। এজন্য তারা খাসীকৃত ছাগলকে ৮-১২ মাসের মধ্যে এবং পাঁঠী বাচ্চাকে ৬ মাসের মধ্যে বিক্রি করবেন। এতে একজন খামারি বছরে দুইটি ছাগী থেকে গড়ে ৪টি খাসী ও ৩টি পাঁঠী বিক্রি করতে পারবেন।

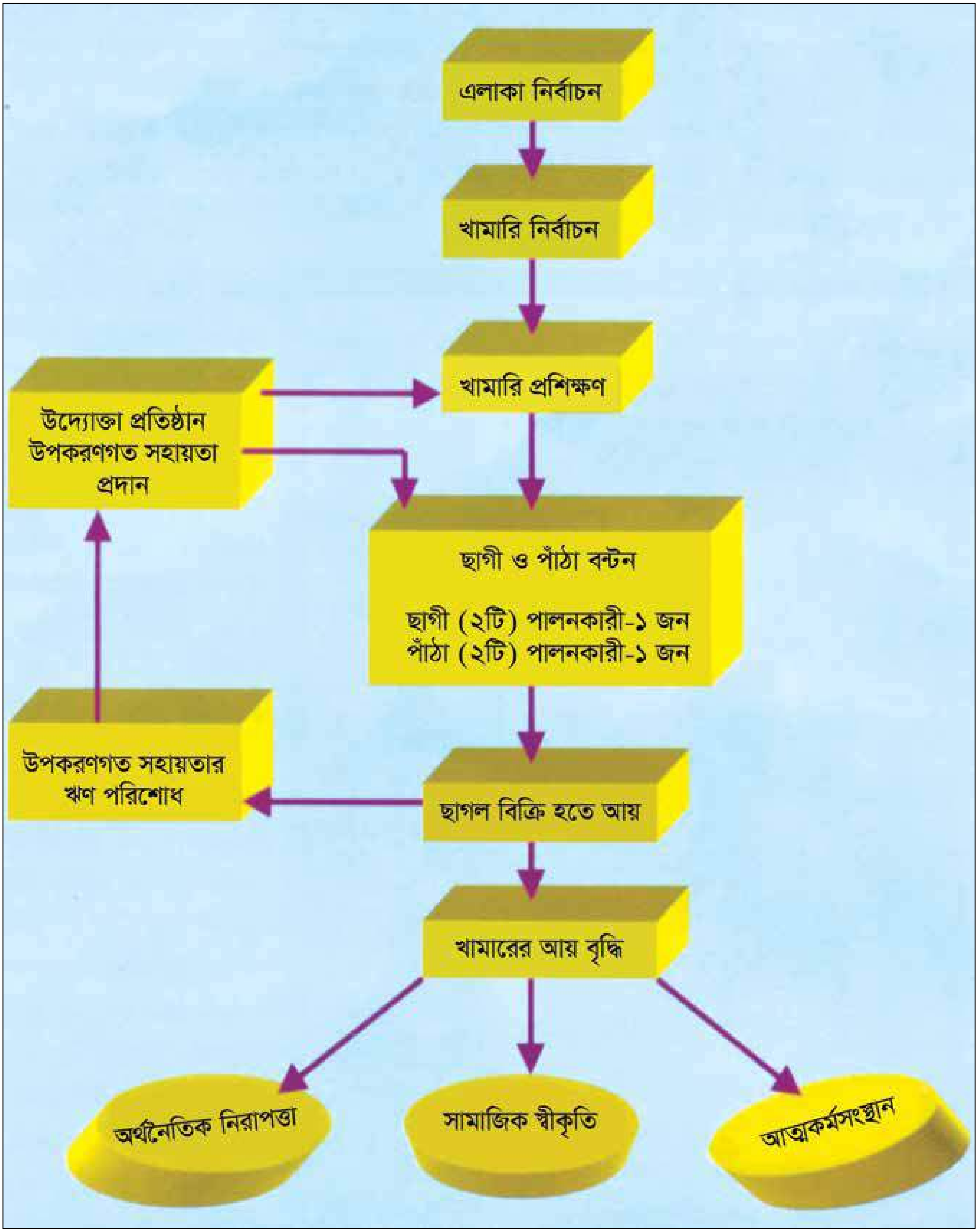

চিত্র ১: দারিদ্র্যবিমোচন ছাগল পালন পদ্ধতি

খামারি নির্বাচন

একটি এলাকায় ১০-১৫ খামারি নিম্নোক্ত যোগ্যতায় বাছাই করা হবে।

১. খামারি ভূমিহীন/প্রান্তিক হবেন,
২. দুঃস্থ মহিলা/বেকার যুবকদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে,
৩. ছাগল পালনে আগ্রহী ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে,
৪. এমন খামারি নির্বাচন করা যিনি খামারে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করতে এবং দেয়া শর্তসমূহ মেনে চলতে আগ্রহী।

খামারি প্রশিক্ষণ

নির্বাচিত খামারিদের ছাগল পালনের প্রযুক্তিগত দিক যেমন- আবাসন, খাদ্য/পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও প্রজনন সম্পর্কে ১-৩ দিনের মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা

ঘর

ছাগল সাধারণত পরিষ্কার, শুষ্ক, দুর্গন্ধমুক্ত, উষ্ণ, পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলকারী পরিবেশ পছন্দ করে। গোবরযুক্ত, স্যাঁতস্যাঁতে, বদ্ধ, অন্ধকার ও পুঁতিগন্ধময় পরিবেশে ছাগলের রোগবালাই যেমন- নিউমোনিয়া, একথাইমা, চর্মরোগ, ডায়রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় সংক্রামক ও পরজীবী রোগ হতে পারে। সেই সাথে ওজন বৃদ্ধির হার, দুধের পরিমাণ এবং প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়। সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখা একটি পূর্ণবয়স্ক ছাগলের জন্য গড়ে ৮-১০ বর্গ ফুট জায়গা প্রয়োজন। প্রতিটি বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য ৫ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন। দুটি ছাগী দ্বারা শুরু করা খামারে বছরে গড়ে ১০-১৩টি বিভিন্ন বয়সী ছাগল থাকবে। সেই হিসেবে একজন খামারিকে প্রায় ৬০ (৬×৬) বর্গ ফুট আয়তনের মাঁচা করতে হবে। এই মাঁচা খামারি ঘরের একাংশেও হতে পারে বা পরবর্তীতে আলাদা ঘরেও হতে পারে। ছাগলের ঘর ছন, গোলপাতা, খড় দিয়ে তৈরি হতে পারে। মাঁচা টি বাঁশের তৈরি হতে পারে। মাটি থেকে মাঁচা র উচ্চতা ৩ ফুট। ছাগলের বিষ্ঠা ও চনা পড়ার সুবিধার্থে বাঁশের চটা বা কাঠকে ০.৫ ইঞ্চি ফাঁকা রাখতে হবে। মাঁচা র নিচ থেকে সহজে গোবর ও প্রস্রাব সরানোর জন্য ঘরের মেঝে মাঝ বরাবর উঁচু করে দুই পার্শ্বে ঢালু (২%) রাখতে হবে। মেঝে মাটির হলে সেখানে পর্যাপ্ত বালি/ছাই দিতে হবে। বৃষ্টি যেন ঘরে না ঢুকে সে জন্য ছাগলের ঘরের চালা ১-১.৫ মি. (৩.২৮-৩.৭৭ ফুট) ঝুলিয়ে দেয়া প্রয়োজন। শীতকালে রাতের বেলায় মাঁচা র চার পাশের দেয়ালকে চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। শীতের সময় মাঁচা র উপর ১০-১২ সে.মি. (৪-৫ ইঞ্চি) পুরু খড়ের বেডিং বিছিয়ে দিতে হবে। এসময় রাতে চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যা বাচ্চাকে ঠান্ডা থেকে রক্ষা করবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনাই খামারের অন্যতম প্রধান বিষয়। বয়স ও উৎপাদন ভিত্তিতে ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিম্নরূপঃ

ছাগলের বাচ্চাকে শালদুধ ও সাধারণ দুধ খাওয়ানো

ছাগী বাচ্চা প্রসবের প্রথম তিন দিনের দুধকে কলস্ট্রাম বলে। সাধারণ দুধ ও শালদুধের কম্পোজিশন ১নং সারণিতে দেয়া হলো।

সারণি ১ : ছাগলের দুধ ও কলস্ট্রামের উপাদানের শতকরা হার

	ফ্যাট	প্রোটিন	লেকটোজ	খনিজ	মোট শুষ্ক পদার্থ
সাধারণ দুধ	৫.০৯	৩.৩৩	৬.০১	১.৬০	১৬.০৩
শালদুধ	৫.৬	৮.১০	৪.৮০	০.৮৫	২০.৩০

সাধারণত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চার জন্মের সময় ওজন ০.৮-১.৫ কেজি (গড়ে ১.০০ কেজি) হয়। বাচ্চা জন্মের পরপরই পরিষ্কার করে আধা ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের শালদুধ খেতে দিতে হবে। বাচ্চাকে খাওয়ানোর নিয়ম হলো প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম শালদুধ খাওয়ানো। এই পরিমাণ দুধ দিনে ৮-১০ বারে ভাগ করে খাওয়াতে হবে। শালদুধ খাওয়াতে দেরি হলে উক্ত দুধ হজম হয়না। শালদুধ বাচ্চার শরীরে এন্টিবডি তৈরি করে রোগ প্রতিরোধ শক্তিবৃদ্ধি করে। দুই বা ততোধিক বাচ্চা হলে প্রত্যেকেই যেন শালদুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

ছাগলের বাচ্চাকে ঘাস খাওয়ানো

টেবিল-২ এ বলা হয়েছে যে, ছাগল ছানাকে জন্মের প্রথম সপ্তাহ থেকে ঘাসের সাথে পরিচিত করে তুলতে হবে। সাধারণত শুরুতে মায়ের সাথেই ছাগল ছানা ঘাস খেতে শিখে। ভালোভাবে অভ্যস্ত করলে এক মাসের মধ্যে বাচ্চাকে কচি ঘাস যেমন-দুর্বা, সেচি আরাইলা,মাষকলাই,খেসারিসহ অন্যান্য উন্নত জাতের ঘাস যেমন- নেপিয়ার, রোজি, প্লিকাটুলাম, সেন্টোসোমা, এন্ড্রোপোগন প্রভৃতি ঘাস খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া, ইপিল ইপিল, কাঁঠাল পাতা, ধইঞ্চাপাতা ইত্যাদি খাওয়ানো যেতে পারে। এসব ঘাস পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করতে হবে যা ছাগল ছানা তাদের চাহিদানুসারে খেতে চায়।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ছানা সাধারণত ২-৩ মাসের মধ্যে দুধ ছাড়ে। জন্ম থেকে তিন মাস বয়স পর্যন্ত নিম্নোক্ত হারে ছাগল ছানাকে খাওয়ানো উচিত (সারণি-২)

সারণি ২ : ছাগল ছানার বয়সভিত্তিক খাদ্য সরবরাহ

বয়স (সপ্তাহ)	প্রতি কেজি ছাগলের জন্য দুধ (গ্রাম)	ভাতের মাড় (গ্রাম)	কচি ঘাস
০-২	২০০	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৩-৪	২৫০	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৫-৬	২৫০	১৫০	সামান্য পরিমাণ
৭-৮	২৩০	২৫০	পর্যাপ্ত পরিমাণ
৯-১০	২১০	৩০০	পর্যাপ্ত পরিমাণ
১১-১২	২০০	৩৫০	পর্যাপ্ত পরিমাণ

বিঃ দ্রঃ ছাগলকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার পানি সরবরাহ করা উচিত।

বাচ্চার অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

১. জন্মের পর পর বাচ্চাকে পরিষ্কার করে নাভি থেকে ৩-৪ সে.মি. নিচে কেটে দিতে হবে।
২. বাচ্চাকে পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুসারে জন্মের পরপরই শালদুধ/সাধারণ দুধ খাওয়াতে হবে।
৩. যে বাচ্চার মায়ের দুধের পরিমাণ কম তাদেরকে বোতলে অন্য ছাগলের দুধ/বিকল্প দুধ (মিল্ক রিপ্লেসার) খাওয়াতে হবে। এক্ষেত্রে সবসময় ৩৮-৩৯° সে. তাপমাত্রার (হালকা গরম) দুধ খাওয়ানো উচিত।
৪. শীতের সময়ে বাচ্চাকে মায়ের সাথে চট/ছালা ঢাকা মাঁচা য় ৩৮-৩৯° সে. তাপমাত্রায় রাখতে হবে।
৫. বাচ্চা যেন অতিরিক্ত দুধ না খায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। অতিরিক্ত দুধ বাচ্চার ডায়রিয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
৬. পাঁঠা বাচ্চাকে জন্মের ২-৪ সপ্তাহের মধ্যে খাসী করাতে হবে। প্রচলিত ওপেন পদ্ধতিতে খাসী করানো যায়। তবে এক্ষেত্রে যেন জীবাণু সংক্রামণ না হয় তার ব্যবস্থা নিতে হবে।
৭. বাচ্চাকে প্রতিদিন পূর্বে বর্ণিত নিয়মে কিছু কিছু কাঁচা ঘাস খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে।

বাড়ন্ত ছাগলের খাদ্যব্যবস্থাপনা

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ৩-১২ মাস সময়কালের মূল বাড়ন্ত সময় বলা যায়। এ সময়ে যেসব ছাগল প্রজনন বা মাংস উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হবে তাদের খাদ্য পুষ্টি চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। দুধ ছাড়ানোর পর থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত সময়ে ছাগলের পুষ্টি সরবরাহ অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ে থাকে। এ সময়ে একদিকে ছাগল দুধ থেকে প্রাপ্ত প্রোটিন ও বিপাকীয় শক্তি থেকে যেমন বঞ্চিত হয়। তেমনি মাইক্রোবিয়াল ফার্মেন্টেশন থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি সরবরাহও কম থাকে। এজন্য এ সময়ে পর্যাপ্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার ও আঁশ জাতীয় খাদ্য দিতে হবে। ছাগল সাধারণত তার ওজনের ৪-৫% হারে শুষ্ক পদার্থ থেকে থাকে। সরণি ৩-এ বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক দানাদার খাদ্য ও ঘাসের পরিমাণ দেয়া হলো।

সারণি ৩ : ছাগল ছানার বয়সভিত্তিক খাদ্য সরবরাহ

আনুমানিক বয়স (মাস)	ছাগলের ওজন (কেজি)	দানাদার খাদ্য দৈনিক সরবরাহ (গ্রাম)	ঘাস/পাতা সরবরাহ/ চরানো (কেজি)
২	৪	১০০	০.৪
৩	৬	১৫০	০.৬
৪	৮	২০০	০.৮
৬	১০	২৫০	১.৫
৭	১২	৩০০	২.০
৯	১৪	৩৫০	২.৫
১১	১৬	৩৫০	৩.০

দানাদার খাদ্যের পরিমাণ সবুজ ঘাসের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে। ঘাসের পরিমাণ ও গুণগত মান বেশি হলে দানাদার খাদ্যের পরিমাণ কমবে এবং পরিমাণ ও গুণগত মান কম হলে উপরোক্ত পরিমাণ দানাদার খাদ্যেই চলবে।

দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

দুগ্ধবতী ছাগল তার ওজনের ৫-৬ শতাংশ হারে খাদ্য থেকে থাকে। একটি তিন বছর বয়স্ক ২য় বার বাচ্চা দেয়া ছাগীর গড় ওজন ২০-২৫ কেজি হারে দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ০.৭৫-১.০ কেজি পরিমাণ শুষ্ক পদার্থ ঘাস থকে (২-৩ কেজি কাঁচা ঘাস) বাকি ০.২৫-০.৪০ কেজি শুষ্ক পদার্থ দানাদার খাদ্য থেকে দেয়া উচিত। যেহেতু উপযুক্ত পরিবেশে ছাগী বাচ্চা দেয়ার ১.০-১.৫ মাসের মধ্যে গর্ভবতী হয় সেজন্য প্রায় একই পরিমাণের খাবার গর্ভাবস্থায়ও ছাগলকে দিতে হবে। বিএলআরআই-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, এই হারে খাওয়ালে ছাগল-

১. দৈনিক ৪০০-১০০০ গ্রাম পর্যন্ত দুধ দেয়,
২. গড়ে বাচ্চা দেয়ার ২১ দিনের মাথায় গরম হয়,
৩. বছরে দুই বার বাচ্চা দেয়,
৪. জন্মের সময় বাচ্চার গড় ওজন (<১.০ কেজি বনাম >১.৫ কেজি) হয়।

বাড়ন্ত ছাগল, প্রজননক্ষম পাঁঠা, দুগ্ধ ও গর্ভবতী ছাগলের জন্য নিম্নলিখিত দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ ব্যবহার করা যেতে পারে (সারণি ৪)।

সারণি ৪ : ছাগলের দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ

উপাদান	পরিমাণ (%)
গম/ভুট্টা ভাঙ্গা/চাল	১২.০০
গমের ভুসি/আটা/কুঁড়া	৪৭.০০
খেসারি/মাষকালাই/অন্য ডালের ভুসি	১৬.০০
তিল/সরিষা/নারিকেল খৈল	২১.৫০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	২.০০
লবণ	১.০০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.০৫
আনুমানিক মূল্য	৮-৯ টাকা (প্রতি কেজি)

ছাগলের আঁশ জাতীয় খাবার

কাঁচা ঘাস/কাঁচা পাতা

বর্তমানে আমাদের দেশে চারণভূমি নেই বললেই চলে। খামারিগণ সাধারণত পুকুর পাড়ে, রাস্তার ধারে, জমির আইলে ছাগল চরান। এ ক্ষেত্রে সাধারণত প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাওয়া যায়না। তাই বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল ঘাস যেমনঃ নেপিয়ার, পারা, স্প্লেনডিডা, খেসারি, মাষকালাই, জার্মান ইত্যাদি ছোট (১০×৫ বর্গ মিটার) জমিতে লাগিয়ে তা থেকে প্রয়োজনীয় (বিভিন্ন বয়সের ১০-১২টি ছাগলের জন্য দৈনিক ১২-১৪ কেজি) ঘাস

সহজে সরবরাহ করা যায়। তাছাড়া বাড়ি, পুকুর পাড়, পতিত জমি ইত্যাদির পাশে ও উপরোক্ত জাতের ঘাসসহ কাঁঠাল গাছ, ইপিল ইপিল গাছ লাগিয়ে তা থেকে সারাবছর ঘাস ও পাতা সংগ্রহ করা যায়। শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করে ঘাস/পাতার উৎপাদন অব্যাহত রাখা যায়।

প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো

ছাগলকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করে প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে ৮২% খড়ের সাথে ৩% ইউরিয়া ও ১৫% চিটাগুড় মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। অথবা খড়কে ৫% ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়ানো যেতে পারে। ঘাস বা খড়কে ১.৫-২ ইঞ্চি আকারে কেটে দেয়া উচিত। শুধু খড় খাওয়ালে খড়ের সাথে অ্যালজির পানি সরবরাহ করলে প্রয়োজনীয় ভিটামিন পাওয়া যায়।

ছাগীর প্রজনন ব্যবস্থাপনা

যদিও একটি ছাগী ৫/৬ মাস বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হয় কিন্তু ৭-৮ মাস বয়স (প্রায় ১২-১২ কেজি ওজন) না হওয়া পর্যন্ত পাল দেয়া উচিত নয়। পাল দেয়ার পূর্বে ছাগী সঠিক গরমে আছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ছাগীর গরম আসার লক্ষণগুলো হচ্ছে- মিউকাস নিঃসরণ, ডাকাডাকি করবে, অন্য ছাগীর উপর উঠবে, ইত্যাদি। ছাগীর গরম নির্ণয় করলেই শুধু হবে না, জানতে হবে পাল দেয়ার সঠিক সময় কোনটি। ছাগী গরম হওয়ার ১২-৩৬ ঘণ্টার মধ্যে পাল দেয়া উচিত। অর্থাৎ সকালে গরম হলে বিকেলে, আবার বিকেলে গরম হলে পরদিন সকালে পাল দিতে হবে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খামারে রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য নিয়মিত টিকা, কৃমিনাশক ইত্যাদির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। ছাগলের সবচেয়ে মারাত্মক রোগ পিপিআর এবং গোট পক্সের ভ্যাক্সিন জন্মের ৩ মাস পরে দিতে হয়। বছরে দুবার কৃমিনাশক খাওয়ানো উচিত। এক্ষেত্রে বর্ষার প্রারম্ভে (এপ্রিল-মে) এবং বর্ষার শেষে (অক্টোবর-নভেম্বর) ব্রডস্পেক্ট্রাম কৃমিনাশক যেমনঃ নেমাফেক্স, রেলনেক্স ইত্যাদি খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া যকৃত কৃমির জন্য ফেসিনেক্স, ডোভাইন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। কোনো ছাগলের চর্মরোগ দেখা দিলে তা ফার্ম থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। যে কোনো ছাগল খামারে প্রবেশ করানোর আগে কমপক্ষে ১৫-২০ দিন অন্য স্থানে রেখে ডিপিং করানো (চুবানো) উচিত। তাছাড়া ওলান পাকাসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

পাঁঠার ব্যবস্থাপনা

প্রজননক্ষম পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা

পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা বাড়ন্ত ছাগলের মতই। তবে প্রজননে সহায়তার জন্য প্রতিটি পাঁঠাকে দৈনিক ১০ গ্রাম গাঁজানো ছোলা দেয়া প্রয়োজন। একটি পাঁঠা ১০ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত প্রজননক্ষম থাকে। কোনভাবেই পাঁঠার শরীরে বেশি চর্বি জমতে দেয়া উচিত নয়। ২৮-৩০ কেজি ওজনের পাঁঠার দৈনিক সর্বোচ্চ ৪০০ গ্রাম পরিমাণ দানাদার খাবার দিতে হবে।

পাঁঠার প্রজনন ব্যবস্থাপনা

একটা পাঁঠা সাধারণত ৩/৪ মাস বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হয় কিন্তু আট/নয় মাস বয়সের পূর্বে পাল দেবার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কোন পাঁঠার শারীরিক দুর্বলতা, পঙ্গুত্ব বা কোনো যৌন অসুখ সমস্ত পালকে নষ্ট করে দিতে পারে। তাই সেদিকে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে। দশটি ছাগীর জন্য একটি পাঁঠাই যথেষ্ট। একটি পাঁঠাকে সপ্তাহে ৭-১০ বারের বেশি প্রজনন কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়।

বাজারজাতকরণ

উৎপাদিত ছাগলের বাজারজাত খামারি সরাসরি নিজেই করবেন। এক্ষেত্রে পাঁঠীকে ৬-৭ মাসের মধ্যে এবং খাসীকে ১২ মাসের মধ্যে বিক্রি করবেন।

ছাগল খামারের আয়-ব্যয়

ছাগলের খামারে অর্জিত আয় ব্যয়ের হিসাব ৫ নং সরণিতে দেয়া হলো। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, স্বল্প সংখ্যক (১০-১২টি) ছাগল পালনের মাধ্যমে দ্বিতীয় বছর হতে অর্জিত আয় আনুমানিক বছরে ৪,০০০-৬,০০০ টাকা। তবে ছাগল পালন পরিবারে বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করবে এবং প্রয়োজনে বিশেষত বিভিন্ন বিপদাপদ, পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান 'জীবন্ত ব্যাংক' হিসেবে কাজ করবে। এতে খামারির অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।

সারণি ৫ : ছাগলের খামারে ৫ বছরে বিভিন্ন বয়সের ছাগলের সংখ্যা ও আয়-ব্যয়

	বছর				
	১	২	৩	৪	৫
বছরের শুরু					
ছাগী	২	২	৪	৪	৪
বাড়ন্ত	-	১	৩	২	১
বাচ্চা	-	৪	৪	৬	৬
মোট	২	৭	১১	১২	১১
মৃত্যুঃ ছাগী					
বাড়ন্ত					
বাচ্চা	১	২	৩	৩	৩
বছরের শেষে					
ছাগী	২	৪	৪	৪	৫
বাড়ন্ত	৩	৭	৯	৮	৮
বাচ্চা	৪	৪	৬	৬	৮
মোট	৯	১৫	১৯	১৮	২১
বিক্রি					
খাসী	-	২	৩	৪	৪
বাড়ন্ত ছাগী	২	২	৪	৩	৪
ছাগল বিক্রি থেকে আয়	২×৬০০=১২০০	২×৬০০=১২০০ ২×২০০০=৪০০০	৪×৮০০=৩২০০ ৩×২০০০=৬০০০	৩×৮০০=২৪০০ ৪×২০০০=৮০০০	৪×৮০০=৩২০০ ৪×২০০০=৮০০০
মোট	**১,২০০**	**৫,২০০**	**৯,২০০**	**১০,৪০০**	**১১,২০০**
খরচ (বার্ষিক)					
ছাগল					
খাদ্য	২,০০০	৩,০০০	৪,৫০০	৪,৫০০	৪,৫০০
ঔষধ	২০০	২০০	৩০০	৩০০	৩০০
অন্যান্য	১০০	১৫০	২০০	২০০	২০০
মোট	**৬,৩০০**	**৩,৩৫০**	**৫,০০০**	**৫,০০০**	**৫,০০০**
নীট লাভ		১,৮৫০	৪,২০০	৫,৪০০	৬,২০০

প্যাকেজের উদ্ভাবক

ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগল পালন

স্টল ফিডিং পদ্ধতি

বাংলাদেশে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে সাধারণত ছাগলকে ছেড়ে বা মাঠে বেঁধে খাওয়ানো হয়। গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিজ্ঞানভিত্তিক বাসস্থান, খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অনুসারে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় ছাগল পালনের প্যাকেজ প্রযুক্তিকে স্টলফিডিং পদ্ধতি বলা হয়।

স্টল ফিডিং পদ্ধতির করণীয়

ছাগল নির্বাচন

এ পদ্ধতিতে ছাগলখামার করার উদ্দেশ্যে ৬-১৫ মাস বয়সী স্বাভাবিক ও রোগমুক্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের পাঁঠা/ছাগী সংগ্রহ করতে হবে। পাঁঠার বয়স ৫-৭ মাস হতে পারে।

চিত্র: ছাগলের ঘর / স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগল পালনের ছবি

ছাগলের ঘর

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে পালনে প্রতিটি বয়স্ক ছাগলের জন্য প্রায় ৭-১০ বর্গফুট ঘরের জায়গা প্রয়োজন। ঘরটি বাঁশ, কাঠ বা ইটের তৈরি হতে পারে। শীতের রাতে ঘরের বেড়া চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং মেঝেতে খড় বিছিয়ে দিতে হবে।

ছাগলকে ঘরে থাকতে অভ্যস্ত করানো

ছাগল সংগ্রহের সাথে সাথেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখা উচিত নয়। প্রথমে ছাগলকে দিনে ৬-৮ ঘণ্টা চরিয়ে বাকি সময় আবদ্ধ অবস্থায় রেখে পর্যাপ্ত খাদ্য (ঘাস ও দানাদার খাদ্য) সরবরাহ করতে হবে। এভাবে ১-২ সপ্তাহের মধ্যে চরানোর সময় পর্যায়ক্রমে কমিয়ে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে। তবে বাচ্চা বয়স থেকে আবদ্ধ অবস্থায় রাখলে এ ধরনের অভ্যস্ততার প্রয়োজন নেই।

বাচ্চার পরিচর্যা

জন্মের পরপরই বাচ্চাকে পরিষ্কার করে শালদুধ খাওয়াতে হবে। এক মাস পর্যন্ত বাচ্চাকে দিনে ১০-১২ বার দুধ খাওয়াতে হবে। বাচ্চার চাহিদার তুলনায় কম দুধ থাকলে প্রয়োজনে অন্য ছাগী থেকে দুধ খাওয়াতে হবে। তাছাড়া দুধ না পাওয়া গেলে বাচ্চাকে মিল্ক রিপ্লেসার (সারণি ১) খাওয়াতে হবে। মিল্ক রিপ্লেসার তৈরির ক্ষেত্রে এক ভাগ মিল্ক রিপ্লেসারের সাথে ৯ ভাগ পানি মিশিয়ে অন্তত ৫ মিনিট ফুটিয়ে আগে ফিডার, নিপলসহ আনুষাংগিক জিনিসপত্র পানিতে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। ১-১.৫ কেজি ওজনের একটি ছাগল ছানার দৈনিক ২৫০-৩৫০ গ্রাম দুধ প্রয়োজন। ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

সারণি ১ : মিল্ক রিপ্লেসারের সম্ভাব্য উপাদান

উপাদান	পরিমাণ (%)
ননীমুক্ত গুঁড়া দুধ	৭০
চাল, গম বা ভুট্টার গুঁড়ি	২০
সয়াবিন তৈল	৭
লবণ	১.৫
ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	১.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫

বাচ্চার বয়স ৬০-৯০ দিন হলে দুধ ছেড়ে দেবে। বাচ্চার ৬০ দিন হতে ৯০ দিন পর্যন্ত গড়ে দৈনিক প্রায় ৪০০-৫০০ গ্রাম দুধ প্রয়োজন। সাধারণত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগীকে প্রয়োজনমত খাওয়ালে বাচ্চার প্রয়োজনীয় দুধ পাওয়া যায়। বাচ্চার ১ মাস বয়স থেকেই ধীরে ধীরে কাঁচা ঘাস এবং দানাদার খাদ্যে অভ্যস্ত করতে হবে।

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলকে খাওয়ানো

ছাগল সাধারণত তার ওজনের ৪-৫% হারে খেয়ে থাকে। এর মধ্যে ৬০-৮০% আঁশ জাতীয় খাবার (ঘাস, লতা, পাতা, খড় ইত্যাদি) এবং ২০-৪০% দানাদার খাবার (কুঁড়া, ভুসি, চাল, ডাল ইত্যাদি) দিতে হবে।

সারণি ২ : ছাগলের দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ (%)

উপাদান	পরিমাণ (%)
গম/ভুট্টা ভাঙ্গা/চাল	১২.০০
গমের ভুসি/আটা/কুঁড়া	৪৭.০০
খেসারি/মাষকালাই/অন্য ডালের ভুসি	১৬.০০
সয়াবিন/তিল/সরিষা/নারিকেল/সরিষা/খৈল	২০.০০
শুঁটকি মাছের গুঁড়া/ প্রোটিন কনসেন্ট্রেট	১.৫০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	২.০০
লবণ	১.০০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০
বিপাকীয় শক্তি (মেগাজুল/ কেজি)	১০.০০
বিপাকীয় প্রোটিন (গ্রাম/কেজি)	৬২.০০

একটি বাড়ন্ত খাসীকে দৈনিক ৩-৩.৫ কেজি কাঁচা ঘাস এবং ২০০-২৫০ গ্রাম দানাদার খাবার (সারণি ২) দিতে হবে। দুই থেকে তিন বাচ্চা বিশিষ্ট ২৫ কেজি ওজনের ছাগীর দৈনিক প্রায় ৩.৫-৪.৫ কেজি কাঁচা ঘাস এবং ৩৫০-৪৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন হয়। একটি প্রাপ্তবয়স্ক পাঁঠার দৈনিক ৩.৫-৪.৫ কেজি কাঁচা ঘাস এবং ২০০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন।

ছাগলের জন্য ঘাস চাষ

ঘাস সরবরাহের জন্য বিভিন্ন জাতের দেশী ঘাস খাওয়ানো যায়। ইপিল ইপিল, কাঁঠাল পাতা, খেসারি, মাষকালাই, দুর্বা, বাকসা ইত্যাদি দেশী ঘাসগুলো বেশ পুষ্টিকর। এছাড়া উচ্চ ফলনশীল নেপিয়ার, স্প্লেনডিডা, এন্ড্রোপোগন, প্লিকাটুলুম ইত্যাদি ঘাস আবাদ করা যেতে পারে। ঘাস চাষের জন্য জমি ভালভাবে তৈরি করে হেক্টর (২.৪৭ একর) প্রতি ১৫-২০ টন জৈব সার এবং ৫০, ৭০ এবং ৩০ কেজি যথাক্রমে ইউরিয়া, টিএসপি এবং এমপি প্রয়োগ করতে হবে। ঘাস লাগানোর এক মাস পর এবং প্রতিবার ঘাস কাটার পর হেক্টর প্রতি ৮০ কেজি ইউরিয়া ছিটাতে হবে। ছাগলের জন্য ৩নং সারণিতে বর্ণিত উচ্চ ফলনশীল ঘাসগুলো সাধারণত ২৫-৩০ দিন পর কাটা যায়।

সারণি ৩ : বিভিন্ন ধরনের উচ্চ ফলনশীল ঘাসের উৎপাদনশীলতা

ঘাস	হেক্টর প্রতি প্রয়োজনীয় কাটিং (হাজার)	কাটিং লাগানোর দূরত্ব (মিটার) লাইন-লাইন × কাটিং-কাটিং	উৎপাদন (টন/হে./বছর)
নেপিয়ার(এরোসা)	২৫-২৬	১×০.৫	১৫০-২০০
নেপিয়ার(বাজরা)	২৫-২৬	১×০.৫	১৫০-২০০
নেপিয়ার(হাইব্রিড)	২৫-২৬	১×০.৫	১৭৫-২২০
স্প্লেন্ডিডা	৩৫-৪০	০.৭×০.৩৫	১০০-১৩০
পি-কাটুলুম	৪০-৪৫	০.৭×০.৩৫	৭৫-১০০
এন্ড্রোপোগন	২৮-৩০	১×০.৫	১০০-১৩০

ছাগলকে খড় খাওয়ানো

ঘাস না পাওয়া গেলে খড়কে ১.৫-২.০ ইঞ্চি (আঙ্গুলের দুই কর) পরিমাণে কেটে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়ানো যেতে পারে। এজন্য ১ কেজি খড়ের সাথে ২০০ গ্রাম চিটাগুড়, ৩০ গ্রাম ইউরিয়া, ৬০০ গ্রাম পানির সাথে মিশিয়ে ইউএমএস তৈরি করে খাওয়ানো যেতে পারে। মোলাসেস বা চিটাগুড় না পাওয়া গেলে ছোট ছোট করে কেটে ০.৫ কেজি ইউরিয়া ১০ কেজি পানিতে গুলে সেই পানি ১০ কেজি শুকনো খড়ের সাথে মেশাতে হবে। ইউরিয়া ও পানি মিশ্রিত খড়কে বায়ু রুদ্ধাবস্থায় ১২-১৫ দিন রেখে ছাগলকে খাওয়াতে হবে। তবে ইউএমএস এবং অ্যালজি খাওয়ানোর জন্য ছাগলকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করতে হবে। একটি ছাগল দৈনিক ১.০-২.০ লিটার পানি খায়। এজন্য পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে।

খাসী করানো

যেসব পাঁঠা বাচ্চা প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হবে না তাদেরকে জন্মের ২-৪ সপ্তাহের মধ্যে খাসী করানো উচিত। খাসী করার জন্য বার্ডিজোস কেস্ট্রেটর, রাবার রিং বা অন্ডকোষ কাটা পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। খাসী করানোর পর ক্ষতস্থানে মাছি বা অন্য কোন পোকা বা আঠালি যেন না বসে সেজন্য টিংচার অব আয়োডিন দিয়ে পরিষ্কার করে সালফানিলামাইড পাউডার ছিটিয়ে দিতে হবে।

পাঁঠার ব্যবস্থাপনা

পাঁঠাকে যখন প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হয় না তখন তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে শুধু ঘাস খাওয়ালেই চলে। তবে যখন প্রজনন কাজে ব্যবহারের সময় ওজন ভেদে ঘাসের সাথে ২০০-৫০০ গ্রাম পরিমাণ দানাদার খাবার দিতে হবে। পাঁঠাকে প্রজননক্ষম রাখার জন্য প্রতিদিন ১০ গ্রাম পরিমাণ গাঁজানো ছোলা দেয়া উচিত। পাঁঠাকে কখনই চর্বিযুক্ত হতে দেয়া যাবে না। প্রয়োজনে দানাদার খাদ্য বাদ দিতে হবে।

ছাগলের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

সব ছাগলকে বছরে দু'বার (বর্ষার শুরু এবং শীতের শুরুতে) কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। ছাগলের মারাত্মক রোগ, যেমনঃ পিপিআর, গোটপক্স হলে অতি দ্রুত নিকটস্থ প্রাণী হাসপাতালে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। পিপিআর সহজে চেনার উপায় হলো এ রোগে শরীরের তাপ বৃদ্ধি পাবে (১০৪° থেকে ১০৭° পর্যন্ত), নাক দিয়ে পাতলা তরল পদার্থ নির্গত হবে এবং পরবর্তীতে নিউমোনিয়া (শ্বাস কষ্ট) ও পাতলা পায়খানা হবে। এ রোগে আক্রান্ত এলাকায় ছাগলের ব্যাপক মৃত্যু হতে পারে। এছাড়া ছাগলে তড়কা, হেমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া, এন্টিরোটক্সিমিয়া, বিভিন্ন কারণে পাতলা পায়খানা এবং নিউমোনিয়া হতে পারে। সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসার মাধ্যমে এ সকল রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে সুস্থ ছাগলের জন্য নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখিত টিকাদান কর্মসূচি অনুসরণ করতে হবে।

সারণি ৪ : ছাগলের বিভিন্ন বয়সে টিকা প্রদানের ছক

রোগ	জন্মের ৩য় দিন	১৫-২০ দিন	৪ মাস	৫ মাস	৬ মাস
একথাইমা	১ম ডোজ	২য় ডোজ			
পিপিআর			১ ডোজ		
গোটপক্স				১ ডোজ	
এন্টারোটক্সিমিয়া					১ ডোজ

জীব নিরাপত্তা

খামারে কোন নতুন ছাগল আনতে হলে অবশ্যই রোগমুক্ত ছাগল সংগ্রহ করতে হবে এবং ১৫ দিন খামার থেকে দূরে অন্যত্র রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোনো রোগ দেখা না দিলে ১৫ দিন পর পিপিআর ভ্যাকসিন দিয়ে ছাগল খামারে রাখা যাবে। অসুস্থ ছাগল পালের অন্য ছাগল থেকে দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। ছাগলের ঘর নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। সকল ছাগলকে মাসে অন্তত একবার ০.৫% ম্যালাথায়ন দ্রবণে চুবিয়ে চর্মরোগমুক্ত রাখতে হবে। প্রজননশীল পাঁঠা ও ছাগীকে বছরে দু'বার ১-১.৫ মি.লি. ভিটামিন এ, ডি অথবা ই ইনজেকশান দিতে হবে।

ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা

পাঁঠী ১২-১৩ কেজি ওজন (৭-৮ মাস বয়স) হলে তাকে পাল দেয়া যেতে পারে। পাঁঠী বা ছাগী গরম হওয়ার ১২-২৪ ঘণ্টা পর পাল দিতে হয়। অর্থাৎ সকালে গরম হলে বিকেলে এবং বিকেলে হলে পরদিন সকালে পাল দিতে হবে। পাল দেয়ার ১৪২-১৫৮ দিনের মধ্যে সাধারণত বাচ্চা দেয়। পাল দেয়ার জন্য নির্বাচিত পাঁঠা সব সময় নিঃরোগ, ভাল বংশের ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের হতে হবে। 'ইনব্রীডিং' এড়ানোর জন্য ছাগীর বাবা বা দাদা বা ছেলে বা নাতিকে দিয়ে প্রজনন করানো যাবে না।

ছাগলের বাজারজাতকরণ

সুষ্ঠু খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় ১২-১৫ মাসের মধ্যে খাসী ২০-২২ কেজি ওজনের হয়। এ সময় খাসী বিক্রি করা যেতে পারে। অথবা খাসীর মাংস প্রসেস করেও বিক্রি করা যেতে পারে। অসুস্থ ছাগল বাজারে বিক্রি করা উচিত নয়।

প্যাকেজের উদ্ভাবক

ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, ড. টি এন নাহার এবং ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন

সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন

ভূমিকা

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে দেশে পোল্ট্রি এবং মাংস উৎপাদন দ্রুত বাড়লেও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে প্রাণিসম্পদ বিশেষ করে ছাগলের উৎপাদন আশানুরূপ বাড়েনি। এদেশে প্রাপ্ত প্রায় ১৫ মিলিয়ন ছাগলের প্রায় ৭৬ ভাগ পালন করে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ধরনের খামারিরা। বাংলাদেশে প্রাপ্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস যেমন সুস্বাদু চামড়া তেমনি আন্তর্জাতিকভাবে উন্নতমানের বলে স্বীকৃত। তাছাড়া ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অধিক এবং তারা দেশীয় জলবায়ুতে বিশেষভাবে উৎপাদন উপযোগী। এসব গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাণিজ্যিক উৎপাদন এদেশে এখনো প্রসার লাভ করেনি। এর অন্যতম কারণ ইন্টেনসিভ বা সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল প্রধানত মাংস ও চামড়া উৎপাদনকারী জাত হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত। এদের গড় ওজন (১৫-২০ কেজি) ও দৈহিক ওজন বৃদ্ধির হার (২০-৪০ গ্রাম/দিন)। বিশ্বের অন্যান্য স্বীকৃত মাংস উৎপাদনকারী জাত যেমনঃ বোয়ের, সুদানিজ ডেসারট, বারবারি ইত্যাদির চেয়ে অনেক কম। তবে এদের বছর অনুযায়ী বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য বিদেশী জাতের ছাগলের তুলনায় অনেক বেশি হলেও দুধের উৎপাদন বাচ্চার চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় বাচ্চা মৃত্যুর হার অনেক বেশি। ফলে এদের উৎপাদন সম্ভাবনা প্রায়ই অর্জিত হয়না। এজন্য বাণিজ্যিকভাবে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল উৎপাদনের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত অধিক বাচ্চা উৎপাদনসহ বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে বাণিজ্যিকভাবে সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের উপর গবেষণা কার্যক্রম চলছে। গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের কারিগরি বিষয়সমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

ঘর

ছাগল সাধারণত পরিষ্কার, শুষ্ক, দুর্গন্ধমুক্ত, উষ্ণ, পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলকারী পরিবেশ পছন্দ করে। গোবরযুক্ত, স্যাঁতস্যাঁতে, বদ্ধ, অন্ধকার ও পুঁতিগন্ধময় পরিবেশে ছাগলের রোগবালাই যেমন- নিউমোনিয়া, একথাইমা, চর্মরোগ, ডায়রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় সংক্রামক ও পরজীবী রোগ হতে পারে। সেই সাথে ওজন বৃদ্ধির হার, দুধের পরিমাণ ও প্রজনন দক্ষতা কমে যায়।

(ক) ঘর নির্মাণের স্থান

পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বী, দক্ষিণ দিক খোলা স্থানে ঘর নির্মাণ করা উচিত। খামারের তিন দিকে ঘেরা পরিবেশ বিশেষ করে উত্তর দিকে গাছপালা লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে কাঁঠাল গাছ, ইপিল ইপিল, কাসাভা ইত্যাদি লাগানো যেতে পারে যাতে ওই সব গাছের পাতা ছাগলের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। ছাগল খামারে স্থান নির্বাচনে অবশ্যই অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং উত্তম পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(খ) ঘরের আয়তন

প্রতিটি পূর্ণ বয়স্ক ছাগলের জন্য গড়ে ৮-১০ বর্গ ফুট জায়গা প্রয়োজন। প্রতিটি বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য গড়ে ৫ বর্গ মিঃ জায়গা প্রয়োজন।

(গ) ঘরের ধরন

ছাগলের ঘর ছন, গোলপাতা, খড়, টিন বা পাকা হতে পারে। তবে যে ধরনের ঘরই হোক না কেন ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাঁচা তৈরি করে তার উপর ছাগল রাখতে হবে। মাঁচা র উচ্চতা ১.৫ মিটার (৫ ফুট) এবং মাঁচা থেকে ছাদের উচ্চতা ১.৮-২.৪ মিটার (৬-৮ ফুট) হবে। গোবর ও প্রস্রাব পড়ার সুবিধার্থে বাঁশের চটা বা কাঠকে ১ সে.মি. (২.৫৪ ইঞ্চি) ফাঁকা রাখতে হবে। মাঁচা র নিচ থেকে সহজে গোবর ও প্রস্রাব সরানোর জন্য ঘরের মেঝে মাঝ বরাবর উঁচু করে দুই পাশে ঢালু (২%) রাখতে হবে। মেঝে মাটির সাথে হলে সেখানে পর্যাপ্ত বালি মাটি দিতে হবে। ছাগলের ঘরের দেয়াল, মাঁচা র নিচের অংশ ফাঁকা এবং মাঁচা র উপরের অংশ এম এম ফ্লুযাক্সিবল নেট হতে পারে। বৃষ্টি যেন সরাসরি না ঢুকে সে জন্য ছাগলের ঘরের চালা ১-১.৫ মি. (৩.২৮-৩.৭৭ ফুট) ঝুলিয়ে দেয়া প্রয়োজন। শীতকালে রাতের বেলায় মাঁচা র উপর দেয়ালকে চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। শীতের সময় মাঁচা র উপর ১০-১২ সে.মি. (৪-৫ ইঞ্চি) পুরু খরের বেডিং বিছিয়ে দিতে হবে। চিত্রে একটি ছাগলের ঘরের লেআউট দেখানো হলো।

(ঘ) ঘরের বিন্যাস

বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন ধরনের ছাগলকে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে রাখা উচিত। পাঁঠাকে সব সময় ছাগী থেকে পৃথক করে রাখা উচিত। দুগ্ধবতী, গর্ভবতী ও শুষ্ক ছাগীকে একসাথে রাখা যেতে পারে। তবে বাচ্চা দেয়ার সাত দিন পর্যন্ত ছাগীর সাথে (চরানোর সময় ছাড়া) বাচ্চাকে রাখা উচিত। বাড়ন্ত ছাগল ও খাসী একই জায়গায় রাখা যেতে পারে। তবে তাদের পৃথক খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। শীতকালে বাচ্চাকে রাতের বেলা মায়ের সাথে ব্রুডিং পেনে রাখতে হবে।

(ঙ) ব্রুডিং পেন

ব্রুডিং পেন একটি খাঁচা বিশেষ যা কাঠের বা বাঁশের তৈরি হতে পারে। এর চারপাশে চটের বস্তা দিয়ে ঢাকা থাকে। খাঁচার মেঝে সাধারণ ছাগলের ঘরের মত মাঁচা বিশিষ্ট কিন্তু সেখানে ৩-৪ ইঞ্চি পুরু খড় বিছানো থাকে। ২×১.৮×২ ঘন ফুট আয়তনের ব্রুডিং পেনে ২টি ছাগীসহ ৪-৬টি বাচ্চা রাখা যায়। তাপমাত্রা ১৫° সে. এর নিচে নামলে সেখানে প্রতি খাঁচায় ১০০ ওয়াটের একটি বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা ২০-২৫° সে.-এ রাখা যায়।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনাই খামারের অন্যতম প্রধান বিষয়। ইন্টেনসিভ এবং সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ছাগলের খাদ্যের পরিমাণ ও গুণগত মান নির্ভর করে চারনভূমিতে প্রাপ্ত ঘাসের পরিমাণ ও গুণগত মানের উপর। বয়স ও উৎপাদনভিত্তিতে ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিম্নরূপঃ

(ক) ছাগলের বাচ্চাকে কলস্ট্রাম (শালদুধ) ও দুধ খাওয়ানো

ছাগী বাচ্চা প্রসবের প্রথম তিন দিনের দুধকে কলস্ট্রাম বলে। সাধারণ দুধ ও কলস্ট্রামের কম্পোজিশন ১ নং সারণিতে দেয়া হলো।

সারণি ১ : ছাগলের দুধ ও কলস্ট্রামের উপাদানের শতকরা হার

	ফ্যাট	প্রোটিন	লেকটোজ	খনিজ	মোট শুষ্ক পদার্থ
সাধারণ দুধ	৫.০৯	৩.৩৩	৬.০১	১.৬০	১৬.০৩
কলস্ট্রাম					

সাধারণত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চার ওজন ০.৮-১.৫ কেজি (গড়ে ১.০০ কেজি) ওজন হয়। বাচ্চা জন্মের পরপরই পরিষ্কার করে আধা ঘণ্টার মধ্যেই মায়ের শালদুধ খেতে দিতে হবে। ছাগলের বাচ্চার প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম শালদুধ খাওয়ানো। এই পরিমাণ দুধ দিনে ৮-১০ বারে খাওয়াতে হবে। শালদুধ খাওয়াতে দেরি হলে উক্ত দুধ হজম হয়না। শাল দুধ বাচ্চার শরীরে এন্টিবডি তৈরি করে রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে। দুই তা ততোধিক বাচ্চা হলে প্রত্যেকেই যেন শালদুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ছানা সাধারণত ২-৩ মাসের মধ্যে দুধ ছাড়ে। জন্ম থেকে তিন মাস বয়স পর্যন্ত নিম্নোক্ত হারে ছাগল ছানাকে খাওয়ানো উচিত (সারণি ২)।

সারণি ২ : ছাগল ছানার বয়সভিত্তিক খাদ্য সরবরাহ

বয়স (সপ্তাহ)	প্রতি কেজি ছাগলের জন্য দুধ (গ্রাম)	প্রতি কেজি ছাগলের জন্য দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	কচি ঘাস
০-২	২০০	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৩-৪	২৫০	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৫-৬	২৫০	২০	সামান্য পরিমাণ
৭-৮	২৩০	৪০	পর্যাপ্ত পরিমাণ
৯-১০	২১০	৬০	পর্যাপ্ত পরিমাণ
১১-১২	২০০	১০০	পর্যাপ্ত পরিমাণ

বিঃ দ্রঃ ছাগলকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার পানি সরবরাহ করা উচিত।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দুধ উৎপাদন কম হওয়ায় ২-৩ ছানাবিশিষ্ট ছাগীর দুধ কখনো কখনো বাচ্চার প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারেনা। এক্ষেত্রে ছানাকে উল্লেখিত পরিমাণে ৩৭-৩৮° সে. তাপমাত্রায় অন্য ছাগলের দুধ বা মিল্ক রিপ্লেসার (সারণি ৩) খাওয়ানো উচিত।

সারণি ৩ : সম্ভাব্য মিল্ক রিপ্লেসারের উপাদান (%)

উপাদান	পরিমাণ (%)
স্কিম মিল্ক পাউডার	৭০
চাল, গম বা ভুট্টার গুঁড়ি	২০
সয়াবিন তৈল	৭
লবণ	১.৫
ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	১.০০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০

এক অংশ মিল্ক রিপ্লোসার ৯ অংশ (৩৯-৪০° সে.) পানিতে মিশিয়ে ছাগল ছানাকে ২ নং টেবিলে বর্ণিত পরিমাণ অনুসারে খাওয়ানো যেতে পারে।

(খ) ছাগল ছানার ফিড স্টার্টার

ছাগলের বাচ্চার দানাদার খাদ্য মিশ্রণে কম আঁশ, উচ্চ প্রোটিন, উচ্চ বিপাকীয় শক্তি সম্পন্ন হতে হয়। ৪ নং সারণিতে এ ধরনের কয়েকটি সম্ভাব্য মিশ্রণ দেয়া হলো।

সারণি ৪ : ছাগল ছানার (০-৩ মাস) কিড স্টার্টারে সম্ভাব্য মিশ্রণ (%)

খাদ্য	মিশ্রণ-১	মিশ্রণ-২	মিশ্রণ-৩
গম/চাল/ভুট্টা ভাংগা	২৫.০	২৫.০	২৫.০
মাষকালাই/খেসারি ভাংগা	২৫.০	২৫.০	২৫.০
গমের ভুসি/ঢেঁকিছাটা কুঁড়া	২৫.০	২৫.০	২৫.০
তিলের খৈল	১০.০	৫.০	-
সয়াবিন খৈল	৮.০	১০.০	১৭.০

খাদ্য	মিশ্রণ-১	মিশ্রণ-২	মিশ্রণ-৩
শুঁটকি মাছের গুঁড়া/ প্রোটিন কনসেনট্রেট	-	২.০	-
চিটাগুড়	৪.০	৫.০	৫.০
সয়াবিন তেল	১.০	১.০	১.০
লবণ	১.০	১.০	১.০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫	০.৫	০.৫
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	০.৫	০.৫	০.৫
মোট	১০০	১০০	১০০
বিপাকীয় শক্তি (MJ/Kg)	১২.০ প্রায়	১২.০ প্রায়	১২.০ প্রায়
প্রোটিন (g/Kg)	১৭.৫০	১৮.৫০	১৮.৮০

(গ) ছাগলের বাচ্চাকে ঘাস খাওয়ানো

সরণি ২ এ বলা হয়েছে যে, ছাগলের বাচ্চাকে জন্মের প্রথম সপ্তাহ থেকে ঘাসের সাথে পরিচিত করে তুলতে হবে। সাধারণত শুরুতে মায়ের সাথেই বাচ্চা ঘাস খেতে শিখে। অভ্যস্ত করলে সাধারণত দুই সপ্তাহ থেকেই বাচ্চা অল্প অল্প ঘাস খেতে শিখে। এ সময়ে বাচ্চাকে কচি ঘাস যেমনঃ দুর্বা, নেপিয়ার, স্প্লেনডিডা, রোজি, প্লিকাটুলাম, সেন্টোসোমা, এন্ড্রোপোগন প্রভৃতি ঘাস খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া, ইপিল ইপিল, কাঁঠাল পাতা, ধইঞ্চা ইত্যাদি পাতা খাওয়ানো যেতে পারে। ছাগলের বাচ্চা চাহিদানুসারে খেতে পারে এভাবে সবুজ ঘাস সরবরাহ করা যেতে পারে।

বাড়ন্ত ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ৩-১২ মাস সময় কালকে মূল বাড়ন্ত সময় বলা যায়। এ সময়ে যেসব ছাগল প্রজনন বা মাংস উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হবে তাদের খাদ্য পুষ্টি চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। দুধ ছাড়ানোর পর থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত সময়ে ছাগলের পুষ্টি সরবরাহ অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ে থাকে। এ সময়ে একদিকে ছাগল দুধ থেকে প্রাপ্ত প্রোটিন ও বিপাকীয় শক্তি থেকে যেমন বঞ্চিত হয় তেমনি মাইক্রোবিয়াল ফার্মেন্টেশন থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি সরবরাহও কম থাকে। এজন্য এ সময়ে পর্যাপ্ত প্রোটিনসমৃদ্ধ দানাদার ও আঁশ জাতীয় খাদ্য দিতে হবে। ছাগল সাধারণত তার ওজনের ৪-৫% হারে শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে। সারণি ৫-এ বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক দানাদার খাদ্য ও ঘাসের পরিমাণ দেয়া হলো। এভাবে খাওয়ালে একটি খাসী ১ বছরেই ২০-২২ কেজি ওজনের হতে পারে। এজন্য ৯-১২ মাসের মধ্যে ছাগলকে বাজারজাত করা যায়। দানাদার খাদ্যের পরিমাণ সবুজ ঘাসের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে। ঘাসের পরিমাণ ও গুণগত মান বেশি হলে দানাদার খাদ্যের পরিমাণ কমবে এবং পরিমাণ ও গুণগত মান কম হলে উপরোক্ত পরিমাণ দানাদার খাদ্যেই চলবে।

সারণি ৫ : বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ

ছাগলের ওজন		
(কেজি)	দানাদার খাদ্য দৈনিক সরবরাহ (গ্রাম)	ঘাস/পাতা সরবরাহ/ চরানো (কেজি)
৪	১০০	০.৪
৬	১৫০	০.৬
৮	২০০	০.৮
১০	২৫০	১.৫
১২	৩০০	২.০
১৪	৩৫০	২.৫
১৬	৩৫০	৩.০

প্রজননক্ষম পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা

পাঁঠার খাদ্য ব্যবস্থাপনা বাড়ন্ত ছাগলের মতই। তবে প্রজননে সহায়তার জন্য প্রতিটি পাঁঠাকে দৈনিক ১০ গ্রাম ভিজানো ছোলা দেয়া প্রয়োজন। একটি পাঁঠা ১০ মাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত প্রজননক্ষম থাকে। কোনোভাবেই পাঁঠাতে চর্বি জমতে দেয়া উচিত নয়। ২৮-৩০ কেজি ওজনের পাঁঠার জন্য দৈনিক ৪০০ গ্রাম পরিমাণ দানাদার খাবার দেয়া প্রয়োজন।

দুগ্ধবতী ও গর্ভবতী ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

দুগ্ধবতী ছাগল তার ওজনের ৫-৬ শতাংশ হারে শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে। একটি তিন বছর বয়স্ক ২য় বার বাচ্চা দেয়া ছাগীর গড় ওজন ৩০ কেজি হারে দৈনিক ১.৫-১.৮ কেজি শুষ্ক পদার্থ খেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ১-১.৫ কেজি পরিমাণ শুষ্ক পদার্থ ঘাস থেকে (৩-৫ কেজি কাঁচা ঘাস) বাকি ০.৫-০.৫ কেজি শুষ্ক পদার্থ দানাদার খাদ্য থেকে দেয়া উচিত। যেহেতু ছাগী বাচ্চা দেয়ার ১.৫-২.০ মাসের মধ্যে গর্ভবতী হয়। সেজন্য প্রায় একই পরিমাণের খাবার গর্ভাবস্থায়ও ছাগলকে দিতে হবে। বিএলআরআই-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, নিয়মিত হারে খাওয়ালে ছাগল-

১. দৈনিক ৪০০-১০০০ মি. লি. পর্যন্ত দুধ দেয়,
২. গড়ে বাচ্চা দেয়ার ২১ দিনের মাথায় গরম হয়,
৩. বছরে দুইবার বাচ্চা দেয়,
৪. জন্মের সময় বাচ্চার গড় ওজন (<১.০ কেজি বনাম >১.৫ কেজি) হয়।

বাড়ন্ত ছাগল, প্রজননক্ষম পাঁঠা, দুগ্ধ ও গর্ভবতী ছাগলের জন্য নিম্নলিখিত দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ ব্যবহার করা যেতে পারে (সারণি ৬)।

সারণি ৬ : ছাগলের দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ (%)

উপাদান	পরিমাণ (%)
গম/ভুট্টা ভাঙ্গা/চাল	১২.০০
গমের ভুসি/আটা/কুঁড়া	৪৭.০০
খেসারি/মাষকালাই/অন্য ডালের ভুসি	১৬.০০
সয়াবিন/তিল/সরিষা/নারিকেল/সরিষা/খৈল	২০.০০
শুঁটকি মাছের গুঁড়া/ প্রোটিন কনসেন্ট্রেট	১.৫০
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট/ হাড়ের গুড়া	২.০০
লবণ	১.০০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০

ছাগলের চরানো

ঘাস সরবরাহের জন্য নেপিয়ার, স্প্লেনডিডা, প্লিকাটুলুম, রোজি, পারা, জার্মান ইত্যাদির চাষ করা যেতে পারে। ঘাস সরবরাহের পাশাপাশি ছাগলকে চরানোর জন্য চারণভূমি উন্নয়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে চারণভূমিতা প্যাঙ্গোলা ঘাসের চাষ করা যেতে পারে। মাঠের চারপাশে ইপিল ইপিল গাছ লাগানো যেতে পারে। তাছাড়া বর্ষাকালে চারণভূমিতে ঘাসের সাথে মাষকালাই ছিটিয়ে দিলেও ঘাসের খাদ্যমান অনেক বেড়ে যায়। শীতকালে অনেক সময় পর্যাপ্ত ঘাস পাওয়া যায় না। এজন্য এ সময়ে ছাগলকে ইউএমএস (ইউরিয়া ৩%, মোলাসেস ১৫%, খড় ৮২%) এর সাথে অ্যালজির পানি খাওয়ানো যেতে পারে।

প্রজনন ব্যবস্থাপনা

একটা পাঁঠায় সাধারণত ৩/৪ মাস বয়সেই যৌবন প্রাপ্তির লক্ষণ দেখা দেয়, কিন্তু আট/নয় মাস বয়সের পূর্বে পাল দেবার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কোনো পাঁঠার শারীরিক দুর্বলতা, পঙ্গুত্ব বা কোনো যৌন অসুখ সমস্থ পালকে নষ্ট করে দিতে পারে। তাই সেদিকে মনোযোগী হতে হবে। দশটি ছাগীর জন্য একটা পাঁঠাই যথেষ্ট। ছাগী যখন প্রথমবারে (৫-৬ মাস বয়সে) গরম (heat) হয় তখন তাকে পাল না দেয়া উচিত। পাল দেয়ার পূর্বে ছাগী সঠিক হিট এ আছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ছাগীর হিটে আসার লক্ষণগুলো হচ্ছে- মিউকাস নিঃসরণ, ডাকাডাকি করবে, অন্য ছাগীর উপর উঠা ইত্যাদি। ছাগী হিটে আসার ১২-৩৬ ঘণ্টার মধ্যে পাল দেয়া উচিত। অর্থাৎ সকালে হিটে আসলে বিকেলে এবং বিকেলে হিটে আসলে পরদিন সকালে পাল দিতে হবে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের খামারে রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য নিয়মিত পিপিআর টিকা, কৃমিনাশক ইত্যাদির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ছাগলের সবচেয়ে মারাত্মক রোগ পিপিআর এবং গোটপক্সের ভেক্সিন জন্মের ৩ মাস পরে দিতে হয়। বছরে দুবার বর্ষার প্রারম্ভে (এপ্রিল-মে) কৃমিনাশক এবং বর্ষার শেষে (অক্টোবর-নভেম্বর) ব্রডস্প্রেকট্রাম কৃমিনাশক খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া যকৃত কৃমির জন্য হেক্স ফ্লোরোফেন, নাইট্রোক্সিসিল ইত্যাদি ব্যবহার করা প্রয়োজন। কোনো ছাগলের চর্মরোগ দেখা দিলে তা ফার্ম থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। যে কোনো নতুন ছাগল খামারে প্রবেশ করানোর আগে কমপক্ষে এক সপ্তাহ অন্য স্থানে রেখে তা পর্যবেক্ষণ করা উচিত। খামারের সকল ছাগলকে ১৫-৩০ দিন পর পর ০.৫% মেলাথায়ন সলিউশনে ডিপিং করানো (চুবানো) উচিত। তাছাড়া ম্যাসটাইটিসসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া বাঞ্ছনীয়।

বাচ্চার ডায়রিয়া

বাচ্চাই ছাগলের খামারের আসল ফসল। কিন্তু বাচ্চা বয়সে ডায়রিয়া এবং নিমোনিয়া বাচ্চা মৃত্যুর অন্যতম কারণ। এজন্য বাচ্চাকে সব সময় পরিচ্ছন্ন জায়গায় এবং পরিমাণ মতো দুধ খাওয়াতে হবে। কখনোই ঠান্ডা, বাসী দুধ বা মিল্ক রিপ্লোসার খাওয়ানো যাবে না। ফিডার ও অন্যান্য খাদ্যপাত্র সবসময় পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ডায়রিয়া হলে বারবার স্যালাইন (প্রতিবারে ২০-৩০ মি. লি.) খাওয়াতে হবে। স্যালাইনের পাশাপাশি সাধারণ খাদ্য দিতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় পশু চিকিৎসকের পরামর্শ মত চিকিৎসা করা যেতে পারে।

বাচ্চার ব্যবস্থাপনা

১. জন্মের পর পর বাচ্চাকে পরিষ্কার করে নাভি থেকে ৩-৪ সে.মি. নিচে কেটে দিতে হবে।
২. বাচ্চাকে পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুসারে জন্মের পরপরই শালদুধ/ সাধারণ দুধ খাওয়াতে হবে।
৩. যে বাচ্চার মায়ের দুধের পরিমাণ কম তাদেরকে বোতলে অন্য ছাগলের দুধ/বিকল্প দুধ (মিল্ক রিপ্লোসার) খাওয়াতে হবে। এক্ষেত্রে সবসময় ৩৮-৩৯° সে. তাপমাত্রার (হালকা গরম) দুধ খাওয়ানো উচিত।
৪. শীতের সময়ে বাচ্চাকে মায়ের সাথে ব্রুডিং পেনে রেখে ২৫-২৮° সে. তাপমাত্রায় রাখতে হবে।
৫. বাচ্চা যেন অতিরিক্ত দুধ না খায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। অতিরিক্ত দুধ বাচ্চার ডায়রিয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
৬. সেসব পাঁঠা বাচ্চা প্রজনন কাজে ব্যবহৃত হবে না তাদেরকে ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে খাসী করাতে হবে।
৭. বাচ্চাকে প্রতিদিন পূর্বে বর্ণিত নিয়মে কিছু কিছু কাঁচা ঘাস খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে।

প্যাকেজের উদ্ভাবক

ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী

কাঁঠাল গাছের পাতা ছাটাইয়ের মাত্রা ও ছাগলের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার

ভূমিকা

কাঁঠাল একটি বহুবর্ষজীবী গুচ্ছ ফল জাতীয় উদ্ভিদ। এটি বাংলাদেশের জাতীয় ফল। এ দেশে এমন কোনো বাড়ি পাওয়া যাবে না যেখানে কাঁঠাল গাছ নেই। তাছাড়া মধুপুর গড় এলাকা এবং সিলেট ও চট্টগ্রামের বন এলাকায় কাঁঠালের চাষ করা হয়। কাঁঠাল একটি মূল্যবান অর্থকরী ফসল। এর কোনো কিছুই বাদ পড়ে না। তাছাড়া কাঠ অত্যন্ত মূল্যবান। এর ফল এবং বীজ মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলের খোসা ও পাতা গো-খাদ্য বিশেষ করে ছাগলের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য এবং কান্ড জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাঁঠালের এই বহুবিধ ব্যবহার একে একটি স্বতন্ত্র গাছ হিসেবে বৈশিষ্ট্যায়িত করেছে। এক হিসাব অনুযায়ী দেখা গেছে, দেশে প্রতিবছর ১,০৭,০০০ মেঃ টন কাঁঠাল বর্জ্য উৎপাদিত হয়।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট/সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. কাঁঠাল উৎপাদন হ্রাস না করে অধিক পরিমাণ পাতা ছাটাই এবং এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।
২. কাঁঠাল গাছ থেকে মানুষের খাদ্য, ছাগল/ভেড়ার খাদ্য এবং জ্বালানি পাওয়া যায়।
৩. কাঁঠাল গাছ দেশের প্রতিটি বাড়িতে ২-৭ টি বিদ্যমান। তবে মধুপুর গড় এলাকা যেমন সাভার, গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও টাংগাইলের কিছু এলাকায় ছোট বড় মিলিয়ে বাড়ি প্রতি গড়ে ৪৭ টি কাঁঠাল গাছ বিদ্যমান।

ব্যবহার পদ্ধতি

গাছের বর্ণনা

কাঁঠাল গাছ লম্বায় ১০-১৫ মিঃ এবং পাশে ২-৩ মিঃ হতে পারে। অন্যান্য ফলের ন্যায় কাঁঠাল সাধারণত কান্ডের ডগায় ধরে না বরং গাছের গুঁড়ি বরাবর এই ফল ধরে। তবে বড় বড় কান্ড বরাবরও এই ফল ধরে। ফলের আকার ডিম্বাকৃতি ও খোসার উপরিভাগ মোঁচা কৃতি কিন্তু ভোতা। সাধারণত ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মোঁচা ধরে এবং জ্যৈষ্ঠ হতে আশ্বিন পর্যন্ত পাকা ফল পাওয়া যায়। সাধারণত গাছ লাগানোর ৫-৬ বছর পর থেকে ফল ধরা শুরু করে এবং ১২-১৫ বছর পর্যন্ত ভালো উৎপাদন পাওয়া যায়।

ডাল-পাতা বাছাই

কাঁঠাল কর্তন করার পর এ দেশের প্রায় সব খামারিই গাছ ছাটাই করেন। বেশিরভাগ খামারিই বিশ্বাস করেন যে, কাঁঠাল গাছ থেকে কাঁঠাল সংগ্রহ করার পর পরই ডাল-পাতা ছাটাই করলে পরবর্তী বছর কাঁঠালের ফলন ভালো হয়। খামারিগণ সাধারণত আগস্ট থেকে অক্টোবরের প্রথমদিক পর্যন্ত সময়ে গাছ ছাটাই করে থাকেন। এ সময়টিতে দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং গো-খাদ্য বিশেষ করে ছাগলের খাবারের তীব্র সঙ্কট দেখা দেয়। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে এ সময়ে জ্বালানিরও সঙ্কট দেখা দেয়। এ সময়টি গাছ ছাটাই করার উপযুক্ত সময়। কিন্তু একটি গাছ থেকে কী পরিমাণ পাতা/কান্ড ছাঁটাই করা যায় সে সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। গবেষণায় দেখা যায় যে, ১২-১৫ বছর বয়সের একটি গাছ থেকে ২০০-৪০০ কেজি বায়োমাস (পাতা ও কান্ড) পাওয়া যায়। এ রকম একটি গাছের ৪০% পর্যন্ত বায়োমাস ছাটাই করে পাতা ও জ্বালানি পাওয়া যায়। অর্থাৎ বছরে একটি গাছ থেকে ৮০ কেজি থেকে ১৬০ কেজি পাতা ও জ্বালানি সংগ্রহ করা যায়। কাঁঠাল গাছে ছাটাইকৃত পাতা ও জ্বালানির পরিমাণ মোটামুটি ১:১। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৪০% পর্যন্ত ছাটাই করলে কাঁঠাল উৎপাদন হ্রাস পায় না।

কাঁঠাল পাতা বিভিন্নভাবে ছাগলকে খাওয়ানো যায়। প্রথমত গাছ থেকে ছোট ছোট কান্ডসহ পাতা কেটে ঝুলিয়ে দিতে হয়। ছাগল যেহেতু ব্রাউজিং করে খেতে পছন্দ করে তাই ঝুলানো খাবার খেতে তার সমস্যা হয় না। প্রসঙ্গত ছাগল বাছাই করে খেতে পছন্দ করে সুতরাং কচিপাতা ও ডগা পুরোপুরিই খেয়ে ফেলে কিন্তু পরিপক্ব পাতার শক্ত অংশ ও শক্ত শিরা উপশিরাসমূহ পরিত্যক্ত রয়ে যায়। দ্বিতীয়ত চিটাগুড় দিয়ে কাঁঠাল পাতাকে প্রক্রিয়াজাত করেও ছাগলকে খাওয়ানো যায়। এ পদ্ধতিতে কান্ড থেকে পাতা এবং ডগা আলাদা করে ৮% (শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে) হারে চিটাগুড় দিয়ে মিশ্রিত করা হয়। এ ক্ষেত্রে পাতার ওজনের ৮% চিটাগুড় একটি পাত্রে মেপে নিয়ে ঘন চিটাগুড়ের মধ্যে ১:১ অথবা ৪:৩ পরিমাণে পানি মিশালে উক্ত মিশ্রণ পাতার ওপর ছিটানোর উপযোগী হবে। কাঁঠাল পাতা একটি পলিথিন বা পাকা মেঝেতে বিছিয়ে চিটাগুড়ের দ্রবণটি আস্তে আস্তে ঝরণা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং সাথে সাথে কাঁঠাল পাতাকে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে কাঁঠাল পাতা দ্রবণটি শুষে নেয়। এই চিটাগুড় মিশ্রিত পাতা একটি পাত্রে খেতে দেয়া হয়। তৃতীয়ত কাঁঠাল পাতা দিয়ে সাইলেজও তৈরি করা যায়। এ ক্ষেত্রে একটি সাইলো পিট বানাতে হয়।

সাইলো পিটের বর্ণনা

সাইলো পিটটি অবশ্যই উচু জায়গায় হতে হবে এবং পিটের তলায় ও চারদিকে পুরু করে পুরানো খড়কুটা বা পলিথিন বিছাতে হবে। তারপর স্তরে স্তরে চিটাগুড় মিশ্রিত কাঁঠাল পাতা পিটে সাজাতে হবে এবং পা দিয়ে চেপে ভেতরের বাতাস যথাসম্ভব বের করে দিতে হবে। যত এঁটে সাজানো যাবে তত ভালো সাইলেজ তৈরি হবে। তারপর পিট পূর্ণ করে এমনভাবে পলিখিন দিয়ে ঢেকে দিতে হয় যাতে বাতাস না ঢুকতে পরে। এ সাইলেজ দুই সপ্তাহ পরই খাওয়ানো যেতে পারে।

খাদ্য গ্রহণ

কাঁঠালপাতা একটি পুষ্টিকর খাদ্য। কাঁঠাল পাতায় শতকরা প্রায় ৩৯ ভাগ শুষ্ক পদার্থ থাকে। উক্ত অংশের শুষ্ক পদার্থে শতকরা ৮৮ ভাগ জৈব পদার্থ এবং ১৭ ভাগ আমিষ থাকে। সবুজ পাতা ঝুলিয়ে অথবা চিটাগুড় মিশ্রিত কাঁঠালপাতা অথবা চিটাগুড় মিশ্রিত কাঁঠালপাতার সাইলেজ দিলে ছাগল তার শরীরের ওজনের ৪% হারে খেয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে ছাগলকে পর্যাপ্ত পরিষ্কার পানি দিতে হয়। ছাগল (৮-৯ কেজি ওজন) সাধারণত প্রতিদিন ১০০-৫০০ মি.লি. পানি খেয়ে থাকে। ছাগল কাঁঠালের পরিপক্ব পাতার তুলনায় কচিপাতা খেতে পছন্দ করে। কচি পাতায় পুষ্টিমান বেশি, তাছাড়া পাতায় ট্যানিন নামক এক ধরনের ক্ষারীয় যৌগ থাকে যা ছাগলের জন্য উপকারী।

সারণি ১ : কাঁঠাল পাতা প্রাণীখাদ্যের রাসায়নিক গঠন

সবুজ অবস্থায় শুষ্ক পদার্থ	জৈব পদার্থ	আমিষ	ফাইবার
৩৯%	৮৮%	১৭%	৩৬%

কাঁঠাল পাতার বাজার

উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু জায়গা যেমন দিনাজপুর ও বগুড়া শহরে প্রতিদিন আঁটি হিসেবে কাঁঠালপাতা বিক্রি হয়। আধা থেকে এক কেজি পরিমাণ এক আঁটি কাঁঠাল পাতা (কান্ডসহ) দুই টাকায় বিক্রি হয়। এ থেকে খাদ্য হিসেবে কাঁঠালপাতার চাহিদা প্রতীয়মান হয়। দিনাজপুর শহরের বাজারে সকাল এবং বিকেলে কাঁঠাল পাতা বিক্রি হয়।

আয়-ব্যয়

১. শ্রমিক খরচ ও মোলাসেস ক্রয় ব্যতীত অন্য কোনো খরচ নেই।
২. প্রতি ৮-৯ কেজি দৈহিক ওজনের একটি ছাগল প্রতিদিন ১.৮ কেজি কাঁঠাল পাতা অথবা ১.৪ কেজি চিটাগুড় মিশ্রিত কাঁঠাল পাতা অথবা ১.৩ কেজি চিটাগুড় মিশ্রিত কাঁগল পাতার সাইলেজ খেতে পারে, যার দ্বারা প্রাণীর শরীরের রক্ষণাবেক্ষণসহ দৈহিক ওজনও দৈনিক ২০-৩২ গ্রাম বৃদ্ধি পায়।
৩. কাঁঠাল উৎপাদনের পাশাপাশি কাঁঠাল পাতা সরাসরি অথবা চিটাগুড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যায় অথবা পরবর্তী সময়ে খাওয়ানোর জন্য সাইলেজ করেও রাখা যায়।

ব্যবহারের সম্ভাবনা

প্রযুক্তিটি সাধারণত আগস্ট থেকে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কৃষকরা ব্যবহার করতে পারে। দেশে সব অঞ্চলে ব্যবহার করা যাবে।

প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা/বিশেষ পরামর্শ

মচমচে বিধায় ছাগল কাঁঠাল পাতা খুব পছন্দ করে। কিন্তু কাঁঠাল পাতায় ক্যালসিয়াম অক্সালেট রয়েছে। সে জন্য বেশি দিন যাবৎ বেশি পরিমাণ কাঁঠাল পাতা খাওয়ানো ঠিক নয়। সে জন্য ছাগলকে কাঁঠাল পাতা পছন্দ মতো সরবরাহ না করে অল্প পরিমাণে অর্থাৎ সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা ভালো।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. রফিকুল ইসলাম এবং মোঃ হাসানুজ্জামান

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল খামার স্থাপনে উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন ছাগল নির্বাচন কৌশল

ভূমিকা

লাভজনক ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের খামার স্থাপনে উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন ছাগী ও পাঁঠা সংগ্রহ একটি মূল দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত। মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন বয়সী উন্নত কৌলিক গুণাবলি সম্পন্ন ছাগী ও পাঁঠা নির্বাচনের জন্য প্রযুক্তিগত তথ্যাদি সরবরাহ অত্যাবশ্যক। সে উদ্দেশ্যেই গবেষণালব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে আলোচ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য/সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলাদেশে বর্তমানে বাণিজ্যিক ছাগল প্রজনন খামার না থাকায় মাঠপর্যায় থেকে ছাগল সংগ্রহ করতে হবে। মাঠপর্যায়ে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চা ও দুধ উৎপাদন ক্ষমতায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উক্ত ভিন্নতা বংশ অথবা/এবং পরিবেশগত কারণ বা স্বতন্ত্র উৎপাদন দক্ষতার জন্য হতে পারে। সে প্রেক্ষাপটে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল খামার প্রতিষ্ঠার জন্য বংশ বিবরণ এবং নিজস্ব উৎপাদন/পুন:উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলির ভিত্তিতে বাছাই প্রক্রিয়া বিবেচনায় রেখে ছাগল নির্বাচন করা যেতে পারে।

বংশগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বাছাই

মাঠপর্যায়ে বংশ বিবরণ পাওয়া দুরূহ। কারণ খামারিরা ছাগলের বংশ বিবরণ লিখিত আকারে সংরক্ষণ করেন না। তবে তাদের সাথে আলোচনা করে একটি ছাগী বা পাঁঠার বংশের উৎপাদন ও পুন:উৎপাদন দক্ষতা সম্বন্ধে ধারণা নেয়া যেতে পারে। ছাগীর মা/দাদি/নানির প্রতিবারে বাচ্চার সংখ্যা, দৈনিক দুধ উৎপাদন, বয়:প্রাপ্তির বয়স, বাচ্চার জন্মের ওজন ইত্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব। পাঁঠা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাঁঠার মা/দাদি/নানির তথ্যাবলির ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। একটি উন্নত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগী/পাঠার বংশীয় গুণাগুণ নিম্নরূপ হওয়া প্রয়োজন-

সারণি ১ : ছাগী/পাঠার বংশীয় উৎপাদন/ পুন:উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলি

প্রাণীর প্রকার	উৎপাদন ও পুনঃউৎপাদন গুণাগুণ	
ছাগী/পাঁঠা (মা/দাদী এবং নানীর বৈশিষ্ট্য বিবেচনায়)	ন্যূনতম বাচ্চা উৎপাদন	৪ টি প্রতিবছর
	ন্যূনতম দৈনিক দুধ উৎপাদন	১০০০ মি: লি:
	ন্যূনতম প্রতিটি বাচ্চার জন্ম ওজন	১ কেজি
	বয়ঃপ্রাপ্তিকাল	৪.৫-৫ মাস

নিজস্ব উৎপাদন/পুন:উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলির ভিত্তিতে বাছাই

এ ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। ছাগী ও পাঁঠার উৎপাদন এবং পুন:উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলি এবং এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলি (Phenotypic characteristics)। পাঁঠা নির্বাচনের ক্ষেত্রে উৎপাদন এবং পুন:উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলি তার মা/দাদি/নানির গুণাগুণের উপর নির্ভর করবে। তবে পাঁঠার দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলির বিবেচনায় নির্বাচন করা যেতে পারে। ছাগী নির্বাচনে উৎপাদন ও পুন:উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ হবে।

ছাগীর নিজস্ব উৎপাদন ও পুন:উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলির ভিত্তিতে নির্বাচন

এ ক্ষেত্রে ছাগীর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।

সারণি ২ : ছাগীর উৎপাদন/ পুন:উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলি

উৎপাদন ও পুন:উৎপাদন গুণাগুণ	
ঘন ঘন বাচ্চা দেয়ার ক্ষমতা	বছরে ২ বার এবং প্রতিবার কমপক্ষে ২টি বাচ্চা
ন্যূনতম দৈনিক দুধ উৎপাদন	১০০০ মি:লি:
প্রতিটি বাচ্চার জন্ম ওজন	কমপক্ষে ১ কেজি
বয়ঃপ্রাপ্তির বয়স	৪.৫ -৫ মাস
বয়ঃপ্রাপ্তির ওজন	১০ কেজি
দুগ্ধ প্রদানকাল	৩ মাস

২.২ দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলির ভিত্তিতে ছাগী (১ ও ২ নং সারণিতে উল্লেখিত গুণাবলিসম্পন্ন জাতের ছাগী) এবং পাঁঠা (১ নং সারণিতে উল্লেখিত গুণাবলিসম্পন্ন জাতের পাঁঠা) নির্বাচন :

২.২.১ ছাগী নির্বাচন

লাভজনক ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ১ ও ২ সারণিতে উল্লেখিত জাতের ছাগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দৈহিক যে সমস্ত গুণাবলি বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন তা নিম্নরূপ। বিভিন্ন বয়সে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য হয়। সে কারণে একটি ছাগীর ৬-১২ মাস, ১২-২৪ মাস এবং ২৪ মাসের উর্ধ্বে বয়সের দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলি ভিন্নভাবে তুলে ধরা হলো-

সারণি ৩ : ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগী নির্বাচনের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যাবলি

বৈশিষ্ট্যাবলি	৬-১২ মাস (গড় এবং ব্যবধান)	১২-২৪ মাস (গড় এবং ব্যবধান)	২৪ মাসের উর্ধ্বে (গড় এবং ব্যবধান)
মাথার দৈর্ঘ্য (সে.মি)	১৪ (১৩-১৪)	১৬ (১৫-১৬)	১৭ (১৬-১৭)
মাথার প্রস্থ (সে.মি)	৯ (৮-৯)	১০ (৯-১১)	১১ (১১-১২)
দেহের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	৪২ (৪১-৪৫)	৫০ (৪৭-৫২)	৫৫ (৫২-৫৬)
দেহের ওজন (কেজি)	১১ (১০-১২)	১৭ (১৪-২০)	২৫ (২০-২৬)
পিঠের উচ্চতা (সেমি)	৪৪ (৪৩-৪৬)	৫০ (৪৮-৫২)	৫৩ (৫২-৫৪)
কানের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	১১ (১০-১২)	১২ (১১-১২)	১২ (১১-১২)
কানের প্রস্থ (সে.মি)	৫ (৫-৬)	৬ (৫-৬)	৬ (৬-৭)
সামনের পায়ের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	৩২ (৩০-৩৩)	৩৫ (৩৩-৩৮)	৩৮ (৩৮-৩৯)
পিছনের পায়ের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	৩৮ (৩৫-৪০)	৪২ (৪০-৪৪)	৪৪ (৪৪-৪৫)
ওলানের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	৮ (৬-৯)	১২ (১০-১২)	১৪ (১৩-১৫)
ওলানের কেন্দ্রীয়াশের ব্যাস (সে.মি)	৬ (৫-৭)	৮ (৭-৮)	৮ (৮-৯)
বাটের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	৩ (২-৩)	৪ (৩-৫)	৪ (৫-৬)
বাঁটের বেড় (সে.মি)	৪ (৩-৪)	৫ (৪-৫)	৬ (৬-৭)

উক্ত সারণি মতে উন্নত গুণাগুণ সম্বলিত একটি ছাগীর-

১. মাথা : চওড়া ও ছোট হবে
২. দৈহিক গঠন : শরীর কৌণিক এবং অপ্রয়োজনীয় পেশিমুক্ত হবে
৩. বুক ও পেট : বুকের ও পেটের বেড় গভীর হবে
৪. পাঁজরের হাড় : পাঁজরের হাড় চওড়া এবং দুইটি হাড়ের মাঝখানে কমপক্ষে এক আঙ্গুল
৫. ওলান : ওলানের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকবে। বাটগুলো হবে আঙ্গুলের মতো একই আকারের এবং সমান্তরালভাবে সাজানো। দুধের শিরা উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যাবে
৬. বাহ্যিক অবয়ব : আকর্ষণীয় চেহারা, ছাগী সুলভ আকৃতি, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

২.২.২ পাঁঠা নির্বাচন

লাভজনক ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ১ নং সারণিতে উল্লেখিত জাতের পাঁঠা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দৈহিক যে সমস্ত গুণাবলী বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন তা নিম্নরূপ। বিভিন্ন বয়সে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য হয়। সে কারণে একটি পাঠার ৬-১২ মাস, ১২-২৪ মাস এবং ২৪ মাসের উর্ধ্বে বয়সের দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলি ভিন্নভাবে তুলে ধরা হলো-

সারণি ৪ : ব্ল্যাক বেঙ্গল পাঁঠা নির্বাচনের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যাবলি

বৈশিষ্ট্যাবলি	৬-১২ মাস (গড় এবং ব্যবধান)	১২-২৪ মাস (গড় এবং ব্যবধান)	২৪ মাসের উর্ধ্বে (গড় এবং ব্যবধান)
মাথার দৈর্ঘ্য (সে.মি)	১৫ (১৪-১৬)	১৬ (১৬-১৭)	১৭ (১৭-১৮)
মাথার প্রস্থ (সে.মি)	৯ (৯-১০)	১১ (১০-১১)	১২ (১১-১২)
দেহের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	৪৫ (৪৩-৪৮)	৫১ (৪৮-৫৪)	৬১ (৫৫-৬১)
দেহের ওজন (কেজি)	১৩ (১১-১৬)	২০ (১৭-২৩)	৩০ (২৯-৩০)
পিঠের উচ্চতা (সে.মি)	৪৮ (৪৬-৫০)	৫৫ (৫০-৫৬)	৬০ (৫৭-৫৯)
কানের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	১১ (১০-১১)	১১ (১১-১২)	১১ (১১-১২)
কানের প্রস্থ (সে.মি)	৫ (৫-৬)	৬ ৫-৬)	৬ (৫-৬)
সামনের পায়ের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	৩৩ (৩১-৩৪)	৩৭ (৩৫-৩৮)	৩৮ (৩৮-৩৯)
পিছনের গায়ের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	৪০ (৩৮-৪৩)	৪৬ (৪৪-৪৮)	৪৯ (৪৮-৪৯)
অন্ডকোষের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	৯ (৮-৯)	৯ (৯-১০)	১০ (১০-১১)
অন্ডকোষের কেন্দ্রীয়াশের ব্যাস (সে.মি)	৭ (৬-৮)	৭ (৬-৮)	৭ (৬-৮)

উক্ত সারণি মতে উন্নত গুণাগুণ সম্বলিত একটি পাঁঠার-

১. **চোখ :** পরিষ্কার, বড় ও তীক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন হবে
২. **ঘাড় :** খাটো ও মোটা থাকবে
৩. **বুক :** গভীর ও প্রশস্ত হবে
৪. **পিঠ:** প্রশস্ত হবে
৫. **লয়েন :** প্রশস্ত ও পুরু এবং রাম্প এর উপরিভাগ সমতল ও লম্বা থাকবে
৬. **পা :** সোজা, খাটো এবং মোটা হবে। বিশেষ করে পেছনের পাদ্বয় সুঠাম ও শক্তিশালী হবে এবং একটি হতে অন্যটি বেশ পৃথক থাকবে
৭. **অন্ডকোষ :** শরীরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ঝুলানো থাকবে
৮. **বয়স :** অধিক বয়স্ক (২ বছর বয়সের বেশি) পাঠা নির্বাচন করা যাবে না।

আয়-ব্যয়

প্রযুক্তিটি ব্যবহারের ফলে ছাগলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, রোগব্যাধি এবং মৃত্যুহার কমে যাবে, উৎপাদন খরচ-হ্রাস পাবে। ফলে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে।

ব্যবহারের সম্ভাবনা

সব ঋতুতে এবং সমগ্র বাংলাদেশে ব্যবহার উপযোগী।

প্রযুক্তি ব্যবহারের সতকর্তা/ বিশেষ পরামর্শ

শুধুমাত্র উপরোল্লেখিত বৈশিষ্ট্যাবলির ওপর ভিত্তি করে ছাগী এবং পাঁঠা নির্বাচন করলে একটি খামার লাভবান হবে না। বরং উন্নত ছাগল নির্বাচনসহ খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি সুষ্ঠু খামার ব্যবস্থাপনা করা হলে লাভজনক খামার প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. মোঃ আবদুল জলিল, ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী, ড. মোঃ গউজ মিয়া, ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার এবং সালমা আক্তার

ছাগলের বাচ্চা প্রতিপালন

ভূমিকা

ছাগল বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিজ সম্পদ। 'গরিবের গাভী' বলে পরিচিত ছাগল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের অন্যতম উৎস। দেশে প্রাপ্ত প্রায় দুই কোটি ছাগলের অধিকাংশই ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের, কিছু যমুনাপারি ছাগলও এদেশে পাওয়া যায়। দ্রুত প্রজননশীল, উন্নত মাংস ও চামড়ার জন্য ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বিশ্ব বিখ্যাত। কিন্তু এর বাচ্চার মৃত্যুর হার ট্রপিক্যাল অঞ্চলে খুবই বেশি (৩০%)। মৃত্যুর প্রধান কারণ ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন না হওয়া; কম বয়সের পাঠাকে কম বয়সের পাঠীর সাথে পাল দেয়া; সুষম খাবার সরবরাহ না করা এবং সঠিকভাবে গর্ভবতী ছাগী ও বাচ্চার যত্ন না নেয়া ইত্যাদি। বাচ্চা পালনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

বাচ্চা পালনের পূর্বে করণীয় বিষয়সমূহ

গর্ভকালীন সময়ে গর্ভাস্থায় বাচ্চার যত্ন : গর্ভকালীন সময়ে গর্ভাবস্থা বাচ্চার যত্ন প্রকৃতপক্ষে গর্ভবতী মায়ের যত্নের ওপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মেনে চলা উচিত।

- গর্ভবতী ছাগীর খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- গর্ভবতী মায়ের খাদ্যে হঠাৎ পরিবর্তন আনা যাবে না। যেমন- কোনো ছাগী যদি কাচা ঘাসে অভ্যস্ত থাকে তাকে হঠাৎ ইউএমএস দেয়া যাবে না। এতে ছাগীর খাদ্য গ্রহণ তথা পুষ্টি সরবরাহ কমে যায়। ফলে অনেক সময় ছাগীর প্রেগনেন্সি টক্সিমিয়া দেখা দিতে পারে। এতে মা ও বাচ্চা উভয়ই মারা যেতে পারে।
- গর্ভবতী ছাগীকে নিম্নমানের আঁশ জাতীয় খাবার (শুকনো অপ্রক্রিয়াজাত খড়, নাড়া, খুব বয়স্ক শক্ত ঘাস) দেয়া যাবে না। এতে পুষ্টির অভাবে প্রেগনেন্সি টক্সিমিয়া অথবা ইউর্তেরাইন প্রলাপস হতে পারে।

- গর্ভবতী ছাগীর দানাদার খাদ্যে প্রয়োজনীয় ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম মিশ্রিত করতে হবে এবং দানাদার খাদ্যকে সমান দুভাগে ভাগ করে সকালে ও বিকালে দুবার সরবরাহ করতে হবে।
- গর্ভবতী ছাগীকে গর্ভের ৪ সপ্তাহ বয়সে ১-২ মি. লি. ভিটামিন AD3E এবং গর্ভের ১৯ সপ্তাহে ১-১.৫ মি. লি. ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ইনজেকশন দিয়ে বাচ্চার ভিটামিন সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রাপ্তি সাপেক্ষে ছাগীকে কোসট্রিডিয়াল ভ্যাকসিন দিয়ে মায়ের জরায়ু প্রদাহ, বাচ্চার আমাশয়, টিটেনাস ইত্যাদি রোধ করতে হবে।
- গর্ভের শেষ চার সপ্তাহ ছাগীকে স্থানান্তর বা অন্য কোনো ধরনের মানসিক বা শারীরিক পীড়নযুক্ত (Stressful condition) অবস্থায় রাখা যাবে না।
- গর্ভবতী ছাগীকে পাঁঠা থেকে আলাদা রাখতে হবে। ঠাসাঠাসি অবস্থায় অনেক গর্ভবতী ছাগী এক সাথে রাখা যাবে না।

প্রসবের সময় মা ও বাচ্চার ব্যবস্থাপনা

- সম্ভাব্য প্রসবের তারিখের ২/৩ দিন আগ থেকেই ছাগীর প্রসবের প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।
- প্রসবের লক্ষণ (যেমন- প্রসব বেদনা, ব্যথার কারণে ছাগী ওঠা-বসা করবে, যোনিদ্বারে পাতলা স্বচ্ছ মিউকাস দেখা দেবে, ছাগীর ওলান দুধে ভরে উঠবে) প্রকাশ হওয়ার পর ছাগীর কাছে উপস্থিত থেকে তাকে প্রসবে সহায়তা করতে হবে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল সাধারণত ২-৪ টি পর্যন্ত বাচ্চা দেয়। একটি বাচ্চা হওয়ার পর যদি আরো বাচ্চা থাকে তাহলে ছাগী পুনরায় প্রসবের প্রস্তুতি নিয়ে পরবর্তী বাচ্চা প্রসব করবে।
- এ সময় কাছাকাছি পরিষ্কার শুষ্ক খড়, স্যালাইন গোলানো পানি, নাভী কাটার কাঁচি বা ছুরি, আয়োডিন (যেমন- পভিসেপ) বা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ রাখতে হবে। তাছাড়া ছাগীর খাবারের জন্য চাল/ভুট্টা/গম এর জাউ রাখতে হবে।
- প্রসবের সাথে সাথে বাচ্চার সমস্ত শরীরে বিশেষত নাকে শ্লেষ্মা সরিয়ে নাকের মধ্যে ফুট দিয়ে বাচ্চার শ্বাসপ্রশ্বাসে সহায়তা করতে হবে।
- পায়ের ক্ষুর এবং নাভি কাটার (শরীর থেকে দুই আঙ্গুল নিচে) পর সেখানে টিংচার-অব-আয়োডিন দিয়ে মুছে দিতে হবে।
- বাচ্চাকে মায়ের সামনে রাখতে হবে যাতে মা সহজে বাচ্চাকে চেটে পরিষ্কার করতে পারে। প্রয়োজনে শুকনো খড় বা গামছা দিয়েও বাচ্চাকে দ্রুত পরিষ্কার করা যেতে পারে।
- বাচ্চাকে মোটামুটি পরিষ্কার করে দ্রুত শালদুধ খাওয়াতে হবে। প্রসবের প্রথম তিন দিন যে দুধ পাওয়া যায় তাকে সাধারণত শালদুধ বলে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি বাচ্চা যেন শালদুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। সাধারণ দুধের তুলনায় এই দুধে প্রোটিন এবং খনিজ পদার্থ বেশি থাকে।

ছাগলের সাধারণ দুধ ও শাল দুধের পুষ্টিমান (%)

দুধ	মোট শুষ্ক পদার্থ	চর্বি	প্রোটিন	লেক্টোজ	খনিজ
সাধারণ দুধ	১৪.৬১	৪.৮৫	৩.৫৮	৫.২২	১.৪৪
শাল দুধ	২০.৩০	৪.৫০	৯.১০	৪.৫০	১.৯০

- শীতকালে যখন তাপমাত্রা ২০° সে. এর নিচে থাকে অথবা বাচ্চা যদি শীতে কাঁপতে থাকে তখন বাচ্চাকে সাথে সাথে উষ্ণ স্থানে (তাপমাত্রা ৩০° সে.) বা রোদে রেখে গরম করতে হবে।
- বাচ্চা প্রসবের পর ছাগীকে স্যালাইন গোলানো পানি (প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম চিটাগুড় এবং ২ গ্রাম লবণ) ২-৩ লিটার হারে পান করতে দিতে হবে। ছাগীকে এ সময়ে জাউসহ ভাল ঘাস সরবরাহ করতে হবে।
- ছাগলের প্রসবে যদি কোনো ধরনের অসুবিধা হয় তবে এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ খামারি বা প্রয়োজনে ডাক্তারের সাহায্য নিতে হবে।

বাচ্চা প্রসবের পর করণীয় বিষয়সমূহ

সদ্য প্রসূত বাচ্চার সমস্যা চিহ্নিতকরণ : সদ্য প্রসূত বাচ্চার সমস্যা প্রধানত পুষ্টি, শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং সংক্রামক রোগ।

পুষ্টি

সদ্য প্রসূত বাচ্চার পুষ্টির অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে শক্তি (energy)। যদিও প্রোটিনসহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদান বাচ্চার বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বাচ্চার জন্মের প্রথম কয়েকদিন (এক সপ্তাহ) বেঁচে থাকার জন্যই অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন। এ সময়ে বাচ্চার শরীরে যদি মজুদ শক্তির পরিমাণ কম থাকে তাহলে প্রয়োজনীয় শক্তি খাদ্যের মাধ্যমেই সরবরাহ করতে হবে। এ সময়ে বাচ্চার একমাত্র খাদ্য হচ্ছে মায়ের দুধ। ওজন ভেদে বাচ্চার ২৫০-৪৫০ গ্রাম পর্যন্ত দুধ প্রয়োজন। তবে বাচ্চা দুর্বল হলে বিশেষত ১ কেজি এর নিচে ওজন হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি ২০-৪০ গ্রাম পরিমাণ চিনির সিরা/ডেক্সট্রোজ স্টমাক টিউব দিয়ে দিনে ৩ থেকে ৪ বার খাওয়াতে হবে। বাচ্চার চাহিদার তুলনায় মায়ের দুধ অপর্যাপ্ত হলে অন্য ছাগলের দুধ, পাউডার মিল্ক ও গরুর দুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাচ্চাকে বোতলে দুধ খাওয়ানোর আগে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যেমনঃ

- ফিডার, নিপলসহ আনুষাঙ্গিক জিনিস ফুটন্ত পানিতে রেখে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- কখনোই ঠান্ডা বা বাসি দুধ খাওয়ানো যাবে না।
- যিনি দুধ খাওয়াবেন তার হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন।

সরণি ২ : বয়স ও ওজন ভেদে বাচ্চার (০-৪ মাস) প্রয়োজনীয় খাদ্য (গ্রাম)

বয়স (সপ্তাহ)	ওজন (কেজি)	মায়ের দুধ (সাকলিং)/ বিকল্প দুধ	দানাদার খাদ্য	কচি ঘাস/লতা পাতা	ইউএমএস বা প্রক্রিয়াজাত ঘাস
০	১.৫	২৯০	-	-	-
৪	৩.১	৫০০	১৫	সামান্য পরিমাণ	-
৬	৪.০	৬০০	২৫	১৫০	প্রায় ১০ গ্রাম
৯	৫.০	৫৫০	৪০	১৭৫	৩০
১০	৫.৪	৫০০	৫০	২০০	৩০
১২	৬.১	২০০	৯০	৩০০	৪০
১৪	৬.৯	১০০	২০০	৪০০	৭০
১৬	৭.৭	-	২০০	৫০০	১০০

শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ

বাচ্চার ক্ষেত্রে ওজনের তুলনায় শরীরে পরিধির আয়তন বয়স্ক ছাগীর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেশি। ফলে বাচ্চা তার শরীর থেকে বয়স্ক ছাগীর তুলনায় বেশি হারে তাপ হারায়। যদি বাচ্চার এই তাপ হারানোর পরিমাণ শরীরে উৎপাদিত তাপের চেয়ে বেশি হয় তবে বাচ্চার শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক (১০২° ফা. বা ৩৮.৮° সে.) থেকে দ্রুত নীচে নামতে থাকে। ১০০° ফা. (৩৭.৭° সে.) তাপমাত্রায় বাচ্চা কাঁপতে শুরু করে এবং যখন তাপমাত্রা ৯৮° ফা. (৩৬.৬° সে.) এ পৌঁছায় তখন বাচ্চা নিস্তেজ হয়ে এক সময় মারা যায়। এ ধরনের মৃত্যুকে হাইপোথারমিয়া বা শীতলতাজনিত মৃত্যু বলে। যে সব কারণে বাচ্চার শরীরের তাপ উৎপাদনের চেয়ে তাপ হারানোর হার বেশি অর্থাৎ হাইপোথারমিয়া হয় এবং সে কারণে খামারে ৩৫-৫৫% বাচ্চা মৃত্যুর জন্য দায়ী তা নিম্নের ছকে দেখানো হলো। এই অবস্থায়, বিশেষত শীতকালে যখন তাপমাত্রা ২০° সে. এর নিচে থাকে অথবা বাচ্চা যদি শীতে কাঁপতে থাকে তখন বাচ্চাকে সাথে সাথে উষ্ণ স্থানে (তাপমাত্রা ৩০° সে.) বা রোদে রেখে গরম করতে হবে। এ কারণে তাপ সরবরাহের জন্য চতুষ্কোণ বৈদ্যুতিক ব্রুডার/বৈদ্যুতিক হিটার বা বাল্ব/কিড বক্স ব্যবহার করতে হবে। মাসহ বাচ্চাকে ব্রুডারের নিচে ৭ দিন পর্যন্ত রাখা যেতে পারে। এরপর ব্রুডার থেকে সরিয়ে ফ্লোরে খড়ের ওপর চট বিছিয়ে দিতে হবে। ঘরে কৃত্রিম আলো এবং বেশি ভোল্টের বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজনীয় তাপ ও আর্দ্রতা পরীক্ষার জন্য ঘরে থার্মোমিটার ও হাইগ্রোমিটার রাখতে পারলে ভালো।

ছাগলের বাচ্চার হাইপোথারমিয়া বা শীতল হয়ে যাওয়ার কারণ এবং এর প্রতিকার বর্ণনা করা হলো

কারণ	প্রতিকার
• ক্ষীণ দুর্বল, কম (১ কেজি বা তার চেয়েও কম) ওজনের বাচ্চা	• গর্ভাবস্থায় ছাগীকে পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করা • কমপক্ষে ১৫ কেজি বা তর্ধ্ব ওজনের ছাগীকে প্রজননে ব্যবহার করা
• জন্মের পর দীর্ঘক্ষণ (৪-৬ ঘণ্টা) পর্যন্ত শাল দুধ না খাওয়ানো	• বাচ্চাকে জন্মের আধা ঘণ্টার মধ্যেই শাল দুধ খাওয়ানো এবং তা প্রতি ঘণ্টায় খাওয়ানো নিশ্চিত করা • দুর্বল বাচ্চাকে শাল দুধ খেতে সহায়তা করা
• ভিজা অবস্থায় ঠান্ডা বাতাসে বাচ্চাকে দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখা	• জন্মের পরপরই বাচ্চাকে দ্রুত শুকিয়ে রোদে বা গরম স্থানে মাসহ স্থানান্তর করা
• বাচ্চার দুধের প্রাপ্তি কম হওয়া	• মায়ের পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করা যা তার দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে • প্রয়োজনে বাচ্চাকে অন্য ছাগলের/গরুর দুধ অথবা মিল্ক রিপ্লেসার খাওয়ানো • বাচ্চাকে স্টমাক টিউব বা সিরিঞ্জ দিয়ে চিনির সিরা/ডেক্সট্রোজ (২০-৪০ গ্রাম) খাওয়ানো
• শীতকালে (তাপমাত্রা <২০° সে.) শীতের কারণে	• বাচ্চাকে ল্যাম্প ব্রুডার বা বাচ্চার খাঁচায় রেখে গরম করা

সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ

বস্তুত বাচ্চার যখন জন্ম হয় তখন সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে এর কোনো প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। সাধারণত মায়ের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তথা এন্টিবডি বাচ্চা শালদুধ গ্রহণের ম্যাধমে পেয়ে থাকে। বাচ্চার অন্ত্রে ১২ ঘণ্টার পর থেকে শালদুধে বিদ্যমান অ্যান্টিবডি শোষণের হার কমে যায়। এজন্য জন্মের পর থেকে অন্তত ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত বাচ্চাকে বারে বারে শালদুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করতে হবে। মায়ের শালদুধের মাধ্যমে প্রাপ্ত এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কার্যকারিতা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। এজন্য নিম্নের ৩নং টেবিলে বর্ণিত নিয়মে বাচ্চাকে বিভিন্ন টিকা দিতে হবে। ছাগলের বাচ্চার রোগসমূহের মধ্যে অন্যতম রোগ হচ্ছে ডায়রিয়া। এ ক্ষেত্রে বাচ্চা পাতলা পায়খানা করে, অনেক সময় পায়খানার সাথে রক্তও যেতে পারে। সাধারণত ডায়রিয়ায় পানিশুন্যতা অথবা রক্ত প্রবাহে জীবাণুর বিষ ছড়িয়ে পড়ার কারণে বাচ্চা মারা যায়। এ ক্ষেত্রে বাচ্চাকে দিনে ৩/৪ বার খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া যেতে পারে। এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, বাচ্চার ডায়রিয়া নিরাময় ৯০ ভাগই নির্ভর করে বাচ্চার যত্নের ওপর এবং ঔষধের ভূমিকা মাত্র ১০ ভাগ। অনেক সময় বাচ্চার আমাশয় হয়। এই রোগ ক্লোসট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেন্স টাইপ-বি নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়। এ ক্ষেত্রে কোনো লক্ষণ বুঝা যাওয়ার আগেই বাচ্চা মারা যায়। সাত দিনের কম বয়সী বাচ্চার সাধারণত নিউমোনিয়া হয় না। তবে অনেক সময় দুর্বল বাচ্চাকে বোতলে দুধ খাওয়ানোর সময় কিছু পরিমাণ দুধ শ্বাস নালীতে চলে গেলে সেখানে ইনফেকশন হয়ে নিউমোনিয়া দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোনো কিছু টের পাওয়ার আগেই বাচ্চা মারা যায়। এজন্য দুর্বল বাচ্চাকে বোতলে দুধ না খাইয়ে স্ট্রমাক টিউব দিয়ে খাওয়ানো উচিত।

সারণি ৩ : বাচ্চার বিভিন্ন বয়সে টিকা প্রদান

রোগ	৩য় দিন	১০-১৪ দিন	৩ মাস	৪ মাস	৫ মাস	৬ মাস
একথাইমা	১ম ডোজ	২য় ডোজ				
ক্ষুরা রোগ			১ম ডোজ (পলিভ্যালেন্ট টিকা)			
পিপিআর				১ম ডোজ		
গোটপক্স					১ম ডোজ	
অ্যান্টারোটক্সিমিয়া						১ম ডোজ

বাচ্চাকে খাসী করানো

ছাগলের খামারে সাধারণত ৫০:৫০ অনুপাতে পুরুষ : স্ত্রী বাচ্চার জন্ম হয়। প্রজননের জন্য খামারে ১০ : ১ অনুপাতে ছাগী : পাঁঠার প্রয়োজন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থাৎ প্রজনন কাজে ব্যবহৃত হবে না এ ধরনের পুরুষ বাচ্চাকে খাসী করানো যেতে পারে। পাঁঠাকে নিম্নোক্ত উপায়ে খাসী করানো যায়। যেমন- বার্ডিজো পদ্ধতি এবং অন্ডকোষ কাটা পদ্ধতি।

বার্ডিজো ক্যাসট্রেটর পদ্ধতি : দুই/তিন সপ্তাহের বাচ্চার অন্ডকোষের উপরের অংশের স্পারমেটিক কর্ড বা অন্ডকোষ নালীকাকে বার্ডিজো ক্যাসেট্রেটরের সাহায্যে চাপ প্রয়োগ করে ছিড়ে দেয়া হয়। দেশের বিভিন্ন উপজেলা প্রাণিস্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে এ পদ্ধতিতে খাসী করা যায়।

অন্ডকোষ কাটা পদ্ধতি : এ ক্ষেত্রে ২-৪ সপ্তাহ বয়সী বাচ্চার অন্ডকোষ কেটে খাসী করানো হয়।

বাচ্চাকে দুধ ছাড়ানো

- ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের বাচ্চা ৩-৪ মাসের মধ্যেই দুধ ছেড়ে দেয়।
- বাচ্চা ৩-৪ মাসের মধ্যেই সাধারণত ৩-৪ কেজি ওজন হয়। এই সময় তাদের ঘাস জাতীয় খাদ্য হজম করার শক্তি পুরোপুরি হয় না। এ সময় ৪নং সারণি অনুসারে বাচ্চাকে খাওয়ানো যেতে পারে।

সারণি ৪ : দুধ ছাড়ানোর আগে ও পরে বাচ্চার খাদ্য

বয়স (মাস)	বাচ্চার ওজন কেজি	দৈনিক ওজন বৃদ্ধির হার (গ্রাম)	ভাতের মাড় (গ্রাম)	দুধ (প্রতিদিন/ বাচ্চা) (গ্রাম)	দানাদার খাদ্য	কাঁচা ঘাস
১-১.৫	২-২.৫	৫০	৫০-১০০	৩০০-৪০০	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ (মায়ের সাথে চরানো)
১.৫-২	২.৫-৩	৬০	১০০-২০০	৪০০-৫০০	২০ গ্রাম	সামান্য পরিমাণ (মায়ের সাথে চরানো)
২-২.৫	৩-৪	৬০	২০০-২৫০	৪০০-৫০০	৩০ গ্রাম	সামান্য পরিমাণ (ডাল জাতীয় ঘাস/ পাতা যেমনঃ ইপিল ইপিল, খেসারি, দুর্বা ইত্যাদি)
২.৫-৩	৪-৫	৫৫	২৫০-৪০০	১০০-২০০	৫০ গ্রাম	ঐ
৩-৪.৫	৫-৬	৫০	৩৫০-৪০০	-	১০০ গ্রাম	ঐ

পাঠা বাচ্চাকে মায়ের দুধ ছাড়ানোর পর থেকেই পাঠী বাচ্চা থেকে আলাদা রাখতে হবে। ৮-৯ মাস বয়সে পাঁঠা বাচ্চাকে প্রজনন কাজে ব্যবহার করা যাবে। তবে ১২ মাস অর্থাৎ ১ বছর বয়সের পরই ব্যবহার করা উত্তম। যখন তার ওজন হবে ১৬-১৮ কেজি।

সারণি ৫ : ছাগল বাচ্চার সম্ভাব্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ

উপাদান	মিশ্রণ-১ (%)	মিশ্রণ-২ (%)	মিশ্রণ-৩ (%)
চাল ভাঙ্গা	২৫	-	-
গম ভাঙ্গা	-	৩০	-
ভুট্টা ভাঙ্গা	-	-	৩০
মাসকালাই/ খেসারি ভাঙ্গা	২৫	১৫	২০
গমের ভুসি/ঢেঁকি ছাঁটা বা আটা কুঁড়া	২৫	২৫	২৫
সয়াবিন খৈল	১৬	২০	১৫
প্রোটিন কনসেন্ট্রেট	২	২	-
ফিসমিল	-	-	২
সয়াবিন তেল	১	১	১
চিটাগুড়	৪	৫	৫
লবণ	১	১	১
ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫	০.৫	০.৫
ড্রাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	০.৫	০.৫	০.৫
মোট	১০০	১০০	১০০

(প্রতি কেজি মিশ্রণে সম্ভাব্য প্রোটিন প্রায় ২০০ গ্রাম এবং বিপাকীয় শক্তি প্রায় ১১ মে. জুল, বিপাকীয় প্রোটিন ৬৭ গ্রাম)

জন্মের ১৫-২০ দিন পর থেকেই ছাগল ছানাকে আশ জাতীয় খাবার যেমন, কাঁচা ঘাস ইত্যাদিতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করাতে হবে। সাধারণত দানাদার খাদ্য খাওয়ানো শেষে ছাগলকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খাওয়াতে হয়। একটি বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক ০.৫-০.৭ কেজি পানি পান করতে পারে। তবে কাঁচা ঘাস বেশি পরিমাণ খাওয়ালে পানির পরিমাণ কম লাগবে। ইউএমএস বা ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় এবং কাঁচা ঘাস মিশিয়ে বা আলাদাভাবে খাওয়ানো যেতে পারে।

উপসংহার

গুণগত মানসম্পন্ন বাচ্চাই পরবর্তীকালে অধিক উৎপাদনক্ষম ছাগী অথবা উন্নত কৌলিক গুণ সম্পন্ন পাঁঠা অথবা খাসীতে মাংস) পরিণত হয়। তাই বাণিজ্যিকভাবে ছাগল পালন অথবা উন্নত কৌলিক গুণ সম্পন্ন পাঁঠা উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বাচ্চা থেকেই শুরু করতে হবে এবং এই লক্ষ্যেই বাচ্চা পালন এবং এর বিজ্ঞানভিত্তিক সঠিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অতীব প্রয়োজন।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার, ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান এবং সালমা আখতার

স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগল ও ভেড়া পালনে "সাশ্রয়ী কমপ্লিট প্যালেট ফিড" এর ব্যবহার

ভূমিকা

জলবায়ু ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্তমানে ছাগল ও ভেড়া চারণের খুব কম সুযোগ রয়েছে, যার ফলস্বরূপ নিম্ন উৎপাদনশীলতা এবং প্রাণীর দুর্বল প্রজনন ঘটে। সম্পূর্ণ পেলেট ফিড বাণিজ্যিক ছাগল এবং ভেড়া পালনের জন্য স্টল-ফিডিং পদ্ধতির বিকাশ করতে এবং পাশাপাশি পুরো পেলেট ফিডের বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য ফিড উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে পারে। খাদ্য ব্যবস্থাপনার এই পদ্ধতিটি সুষম পুষ্টির সরবরাহ নিশ্চিত করে, খাদ্য অপচয় হ্রাস করে ও খাদ্য খরচ কমায় এবং নিম্নমানের কৃষি উপজাত গুলোকেও সুস্বাদু এবং উচ্চ পুষ্টিকর খাবারে রূপান্তর করে সর্বাধিক উৎপাদন নিশ্চিত করে।

কমপ্লিট প্যালেট ফিড কি

ছাগল ও ভেড়া পালনে ঘাস জাতীয় (আঁশ) ও দানাদার খাবার প্রয়োজন। কমপ্লিট প্যালেট ফিড একটি পূর্ণাংগ খাবার যা ঘাস (খড়) ও দানাদার খাবারে মিশ্রণে পেলেটিং মেশিনের মাধ্যমে সুস্বাদু পেলেট আকারে তৈরি করা হয়।

প্রযুক্তির বিবরণ

- প্যালেট তৈরিতে ৪০% রাফেজ (ধানের খড়) এবং ৬০% দানাদার মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়।
- রাইস পোলিশ ৫০%, ভুট্টা ক্রাশ ১৬%, সয়াবিন খাবার ২০%, মোলাসেস ১০%, লবণ ২%, ডিসিপি ১%, ভিটামিন-খনিজ প্রিমিক্স ০.৫%, পেলিট বাইন্ডার ০.৫% দ্বারা দানাদার মিশ্রণ প্রস্তুত করা।
- ধানের খড় ১-৫ মিলি আকারে গুড়া করে দানাদার মিশ্রণের সাথে মিশ্রিত করে প্রয়োজনীয় পরিমাণে পানি (১:২) যোগ করে ভালভাবে মিশ্রিত করা উচিত যেন পরে প্যালেটগুলি তৈরি করার জন্য পেলেটিং মেশিনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে।
- এই প্যালেট তৈরিতে দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি বা স্বয়ংক্রিয় প্যালেট তৈরির মেশিন ব্যবহার করা যেতে পারে।
- এরপরে আর্দ্র প্যালেটগুলি রৌদ্র শুকিয়ে ছাগল/ভেড়াকে খাওয়ানোর জন্য সংরক্ষণ করা হয়।
- ছাগল/ভেড়াকে সম্পূর্ণ প্যালেট ফিড প্রতিদিন দু'বার (সকাল ৯ টা এবং বিকাল ৪ টা) পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা হয়।

প্রযুক্তির উপযোগিতাঃ সারা দেশব্যাপী

প্রযুক্তির আর্থিক সুবিধা এবং জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা

- প্যালেট ফিড ছাগল/ভেড়ার খাদ্য রূপান্তরের দক্ষতা বাড়ায় এবং ঘাসের অপ্রতুলতার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়
- কমপ্লিট পিলেট ফিড খাওয়ানোর ফলে দৈনিক ওজন বৃদ্ধির হার ছাগলে ৫২.৪৬ ও ভেড়ায় ১০০.৬৭ গ্রাম যা প্রচলিত পদ্ধতিতে ১৭.৭৬ এবং ২২.৪২ গ্রাম
- প্যালেটফিড দ্বারা ছাগলের প্রতি কেজি ওজন বৃদ্ধিতে খরচ হয় ১২৪.২২ টাকা যেখানে বিদ্যমান পদ্ধতিতে খরচ হয় ২১৪.৭৪ টাকা।
- ছাগলের জন্য প্যালেট ফিড ব্যাবহারে প্রচলিতভাবে খাওয়ানো তুলনায় যথেষ্ট কম এফসিআর ৫.৭ (৮.৩২) বেশি বিসিআর ১.৯৩ (১.১৬) পাওয়া যায়।
- যদিও ভেড়ার ক্ষেত্রে, প্যালেট ফিড ও প্রচলিতভাবে খাওয়ানোয় এফসিআর এবং বিসিআর কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়নি তবে কোন নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি।
- নিবিড়/স্টল ফীডীং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ছাগল ও ভেড়া উৎপাদনের জন্য সম্পূর্ণ প্যালেট ফিড বিকল্প খাদ্য হতে পারে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. ছাদেক আহমেদ, রেজাউল হাই রাকিব

ভেড়ার প্রজনন ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

খামারিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিবেচনায় ভেড়া পালন বাংলাদেশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর সফলতা প্রজনন ব্যবস্থাপনার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। প্রজনন ব্যবস্থাপনা এক দিকে যেমন খামারে ভেড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করে, প্রজনন ঘটিত সমস্যা সমাধান করে, অন্য দিকে তেমনি ভেড়ার কৌলিক মানের উন্নয়ন ঘটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। জেনেটিক বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে এ দেশীয় ভেড়ী খুবই উর্বর, যাহা ১/২ পালেই গর্ভধারণ করে, বছরে ২বার বাচ্চা দেয় এবং প্রতিবারে ২-৩ টি বাচ্চা পাওয়া যায়।

প্রজনন করার উপযুক্ত সময়

ভেড়ার প্রজনন করানোর উপযুক্ত বয়স নির্ভর করে এর জাত ও ওজনের উপর। এ দেশীয় ভেড়ী সাধারণত ৬-৮ মাস বয়সে প্রজননক্ষম হয়। এই সময় এদের ওজন ১২-১৩ কেজির মতো হয়ে থাকে। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় ভেড়ার পাঠা-বাচ্চা ৬-৯ মাসের মধ্যেই বয়ো-প্রাপ্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। তবে তাদেরকে ১২ মাস বয়সের আগে (কমপক্ষে ১৮-২০ কেজি) পাল দেয়ার কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়। ভেড়ী উপযুক্ত দৈহিক ওজন না হলে কম ওজনের বাচ্চা হয়, যার মৃত্যুর হার অনেক বেশি এবং এই সময়ে তার প্রজননতন্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করে না। ভেড়ী যখন প্রথমবার গরম হয় তখন তাকে পাল না দেয়াই ভাল। পাল দেয়ার পূর্বে ভেড়ী ঠিকমতো গরম হয়েছে কি না তাহা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

প্রজনন উপযোগী ভেড়া নির্বাচন

সুস্থ সবল ও গুণগত মানসম্পন্ন বাচ্চা পাওয়ার পূর্বশর্ত হলো উপযুক্ত বাবা-মা বাছাই করা। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে।

- পাঠা ১২-১৪ মাস বয়সী এবং যৌনরোগ মুক্ত হতে হবে। অন্ডকোষের আকার বড় এবং সুগঠিত হতে হবে।
- ভেড়া অধিক উৎপাদনশীল বংশের, আকারে বড় ও আকর্ষণীয় গঠনের অধিকারী হতে হবে।
- নির্বাচিত ভেড়ার মা, দাদি ও নানিকে অধিক দুধ উৎপাদনশীল, অধিক বাচ্চাদানে সক্ষম এবং যতদূর সম্ভব সকল প্রকার রোগ জীবাণুমুক্ত হতে হবে।
- নির্বাচিত ভেড়ী কিছুটা ত্রিকোণাকার, ওলানগুলো সুসংগঠিত, পেট তুলনামূলকভাবে বড় ও পাজরের হাড় সম্প্রসারিত হবে।

প্রজনন উপযোগী ভেড়ী নির্বাচন

- নির্বাচনের সময় ভেড়ীর বয়স ৯-১৩ মাসের হওয়া উচিত।
- নির্বাচিত ভেড়ী অধিক উৎপাদনশীল বংশের, আকারে বড়, আকর্ষণীয় গঠনের হতে হবে।
- নির্বাচিত ভেড়ীর মা, দাদি ও নানির বছরে ২ বার এবং প্রতিবারে নূন্যতম ২টি বাচ্চা দিতে হবে।
- নির্বাচিত ভেড়ী কিছুটা ত্রিকোণাকৃতি, পা সামঞ্জস্যপূর্ণ, ওলান অধিক দুধ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন, বাট সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছুটা ভেতরের দিকে বাকানো হবে।
- নির্বাচিত ভেড়ীর পেট তুলনামূলক বড়, পাঁজরে হাড় সম্প্রসারণশীল। দুই পাঁজরের হাঁড়ের মাঝে কমপক্ষে এক আঙ্গুল ফাঁক হবে। এতে ভেড়ী পর্যাপ্ত আঁশ জাতীয় খাবার এবং দুই বা ততোধিক বাচ্চা ধারণ করতে পারবে।

ভেড়ীর গরম হওয়ার লক্ষণসমূহ

- ভেড়ী গরম হলে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, লেজ বাঁকিয়ে রাখে এবং ঘন ঘন লেজ নাড়ে।
- ভেড়ীর যোনিদ্বার লাল ও ফোলা হবে এবং যোনিদ্বার দিয়ে সাদাটে মিউকাস বের হবে।
- ভেড়ীর খাওয়া দাওয়া কমে যায়, ডাকাডাকি করে।
- গরম হওয়া ভেড়ী ভেড়ার পাঁঠার গা ঘেঁষে অবস্থান করে।।
- অন্যান্য প্রজাতি যেমন ছাগী অন্য ছাগীর ওপর লাফ দেয় কিন্তু ভেড়ার ক্ষেত্রে তা সাধারণত দেখা যায় না।

ভেড়ার প্রজনন

সাধারণত ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিগণ প্রাকৃতিক প্রজনন ব্যবস্থা ব্যবহার করেন। তবে বৃহদাকার বাণিজ্যিক খামার ভেড়ার কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে পাল রাখার হার সাধারণত ৫০-৮০% হয়ে থাকে।

ভেড়ার প্রাকৃতিক প্রজনন

যখন একটি ভেড়ী তার গরমকালে ও পাঁঠার সাথে প্রাকৃতিক নিয়মে মিলিত হয়।

সুবিধা

- কনসেপশন রেট বেশি হয়।
- ইনব্রীডিং হওয়ার প্রবণতা কম।
- ভালো টেকনিশিয়ানের প্রয়োজন নেই।

অসুবিধা

- পাঁঠা পালা ও খাবার দেয়ার ঝামেলা থাকে।
- বিভিন্ন রকমের সংক্রামক রোগের সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।
- পাঁঠার অনাকাংখিত বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মে যায় যদি ভালোভাবে বাছাই না করা হয়।

ভেড়ার কৃত্রিম প্রজনন

যখন একটি ভেড়ীকে তার গরমকালে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা ব্যবহার করে প্রজনন করা হয়।

সুবিধাসমূহ

- অতি অল্প সময়ে জাত বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি খুবই ফলপ্রসূ।
- ভালো পাঁঠা মারা যাওয়ার পরও সিমেন বহু বছর সংরক্ষণ করা এবং প্রজনন করা যায়।
- পাঁঠা যত্নের ফলে রোগ কন্ট্রোল করা যায়।
- পাঁঠা পালা ও খাবার দেয়ার ঝামেলা থাকে না।

অসুবিধাসমূহ

- গরম হওয়া শনাক্তকরণ এবং ইনসেমিনেশন টাইমের ওপর নির্ভর করে ভালো উর্বরতা।
- ইনব্রীডিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কারণ পাঁঠার সংখ্যা লিমিটেড থাকে।
- পাঁঠার ঠিকমত যত্ন না নিলে অপ্রত্যাশিত জেনেটিক সমস্যা অথবা সংক্রামক রোগ দেখা দিতে পারে।

ভেড়ীর পাল দেয়ার সঠিক সময়

ভেড়ী গরম হওয়ার ১২-২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাল দিতে হয়। অর্থাৎ সকালে গরম হলে বিকেলে এবং বিকেলে গরম হলে পরদিন সকালে পাল দিতে হবে। সম্ভব হলে ১২-২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২ বার পাল দিতে পারলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

প্রসব পূর্ববর্তী ও প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

- আবদ্ধাবস্থায় পালিত ভেড়ীকে গর্ভধারণের শেষ এক সপ্তাহে মেটারনিটি প্যান বা প্রসব ঘরে রাখতে হবে। প্রসব ঘর/খাঁচা শুষ্ক, ময়লা আবর্জনামুক্ত পর্যাপ্ত আলো বাতাস এবং খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা সমন্বিত হতে হবে। মেটারনিটি প্যান বা প্রসব খাঁচার আয়তন কমপক্ষে ভেড়ী প্রতি ২০ বর্গফুট হতে হবে।
- চরে খাওয়া গর্ভবর্তী ভেড়ীকে গর্ভাবস্থার শেষ ২ সপ্তাহে বিশেষ নজরে রাখতে হবে।
- প্রসবের লক্ষন (যেমন-প্রসব বেদনা, ব্যাথার কারণে ভেড়ী ওঠাবসা করবে, যোনিদ্বারে পাতলা স্বচ্ছ মিউকাস দেখা দেবে, ভেড়ীর ওলান দুধে ভরে উঠবে) প্রকাশ হওয়ার পর ভেড়ীর কাছে উপস্থিত থেকে তাকে প্রসবে সহায়তা করতে হবে। এ সময় কাছাকাছি শুষ্ক খড়, স্যালাইন গোলানো পানি, নাভি কাটার কাঁচি বা ছুরি, আয়োডিন (যেমন-পভিসেপ) বা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ রাখতে হবে। তাছাড়া ভেড়ীর খাবারের জন্য চাল/ভুট্টা/গম এর জাউ রাখতে হবে।
- প্রসবের সাথে সাথে বাচ্চার সমস্ত শরীরে বিশেষত নাকে শ্লেষ্মা সরিয়ে নাকের মধ্যে ফুট দিয়ে বাচ্চার শ্বাস প্রশ্বাসে সহায়তা করতে হবে।
- পায়ের ক্ষুর এবং নাভি কাটার (শরীর থেকে দুই আঙ্গুল নিচে) পর সেখানে টিংচার-অব-আয়োডিন দিয়ে মুছে দিতে হবে।
- বাচ্চাকে মায়ের সামনে রাখতে হবে যাতে মা সহজে বাচ্চাকে চেটে পরিষ্কার করতে পারে। প্রয়োজনে শুকনো খড় বা গামছা দিয়েও বাচ্চাকে দ্রুত পরিষ্কার করা যেতে পারে।
- দুই বা ততোধিক বাচ্চা প্রদানের ক্ষেত্রে মা প্রতিটি বাচ্চা প্রসবের পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে।
- বাচ্চাকে মোটামুটি পরিষ্কার করে দ্রুত শালদুধ খাওয়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি বাচ্চা যেন সমহারে শালদুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।
- শীতকালে যখন তাপমাত্রা ২০° সেঃ এর নিচে থাকে অথবা বাচ্চা যদি শীতে কাপতে থাকে তখন বাচ্চাকে সাথে সাথে উষ্ণ, স্থানে (তাপমাত্রা ৩০° সেঃ) বা রোদে রেখে গরম করতে হবে।
- বাচ্চা প্রসবের পর ভেড়ীকে স্যালাইন গোলানো পানি (প্রতিলিটার পানিতে ২০ গ্রাম চিটাগুড় এবং ২ গ্রাম লবণ) ২-৩ লিটার হারে পান করতে দিতে হবে। ভেড়ীকে এ সময়ে জাউসহ ভালো ঘাস সরবরাহ করতে হবে।

ভেড়ী বারবার গরম হওয়ার কারণ

- ভেড়ী গরম থাকার সময় ২০-৩৬ ঘণ্টা। উক্ত সময়ের মধ্যে ভেড়ীকে পাল না দিলে ভেড়ী বার বার গরম হতে পারে।
- পাঁঠার ত্রুটিপূর্ণ শুক্রাণু ও ভেড়ীর ত্রুটিপূর্ণ ডিম্বানুর কারণে।
- প্রজনন ঘটিত রোগ যেমন-ব্রুসেলোসিস, ভিব্রিওসিস আক্রান্ত হওয়ার কারণে।
- হরমোনের অসামঞ্জস্যতার কারণে।
- ভেড়ী অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত হলে ডিম্বাণুর ডিম অনেক সময় নিষিক্ত হয় না অথবা নিষিক্ত হলেও তা ডিম্বনালীতে পড়ে না।
- অতিরিক্ত গরম বা অসহনীয় অবস্থার কারণে
- অপুষ্টিজনিত কারণে-যেমন অপর্যাপ্ত আমিষ, শক্তি, ফসফরাস ও অন্যান্য খনিজ, ভিটামিন, -এ, ই ইত্যাদি।
- প্রজনন অঙ্গের প্রদাহের কারণে।

ভেড়ী বারবার গরম হওয়ার প্রতিকার

- ভেড়ীকে সময়মতো পাল দিতে হবে এবং কোনো প্রকার যৌনরোগ থাকলে তার চিকিৎসা করাতে হবে।
- ভেড়ী যাতে অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত না হতে পারে এবং সঠিক ও পর্যাপ্ত পুষ্টি পায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- একই পাঁঠা দিয়ে বারবার পাল না দিয়ে পাঠা পরিবর্তন করতে হবে।
- ভেড়ীর থাকার পরিবেশ আরামদায়ক এবং ঘরে সহনীয় তাপমাত্রা থাকতে হবে।

ভেড়ার প্রজনন সমস্যা ও প্রতিকার

ভেড়ীর গর্ভপাত (Abortion)

খামারে ভেড়ীর গর্ভপাতের হার যদি ৫% এর ওপরে হয় তবে একে অস্বাভাবিক বলে ধরে নিতে হবে। নিম্নোক্ত কারণে ভেড়ীর গর্ভপাত হতে পারে।

- অপুষ্টিজনিত কারণে বিশেষত পর্যাপ্ত বিপাকীয় শক্তি, ভিটামিন এ, ম্যাঙ্গানিজ এবং আয়োডিনের অভাবে ভেড়ীর গর্ভপাত হতে পারে।
- গর্ভধারণকালের শেষ ভাগে ভেড়ী কোনো কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হলে এবোরশন হতে পারে।

- ব্রুসেলোসিস, ভিব্রিওসিস, লিস্টোরিওসিস, টক্সোপ্লাজমোসিস প্রভৃতি রোগের কারণে গর্ভপাত হতে পারে।
- গর্ভবর্তী ভেড়ী বিষাক্ত আগাছা খেলে এবোরশন হতে পারে।।
- এছাড়াও ভেড়ী কম বয়সে অর্থাৎ উপযুক্ত বয়স ও ওজনের আগেই গর্ভধারণ করলে গর্ভপাত হতে পারে।

ভেড়ীর গর্ভপাতের প্রতিকার-

- গর্ভবতী ভেড়ীকে নিয়মিত ব্রুসেলোসিস, ভিব্রিওসিস, লিস্টেরিওসিস, টক্সোপলাজমোসিস প্রভৃতি রোগের জন্য পরীক্ষা করে উপযুক্ত চিকিৎসা করা উচিত। তবে এ ধরনের রোগে আক্রান্ত ভেড়ীকে খামার থেকে ছাটাই করা উত্তম।
- গর্ভবতী ভেড়ীকে পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ভেড়ীর ওজন ন্যূনতম ১৩ কেজি হওয়ার পূর্বে প্রজনন না করানো।
- বিষাক্ত আগাছাযুক্ত মাঠে ভেড়ীকে না চরানো।
- ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন প্রতিকূল (Stress) অবস্থায় ভেড়ীকে না রাখা।

ঋতুচক্রের অস্বাভাবিকতা

প্রজননশীল ভেড়ীতে অনেক সময় ঋতুহীনতার লক্ষণ দেখা যায় যা এর বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতাকে বিলুপ্ত করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ভেড়ীর গরম হওয়ার লক্ষণ দেখা যায় না। বিভিন্ন কারণে ভেড়ীতে ঋতুহীনতার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এর মধ্যে অপুষ্টি, যৌনরোগ, হরমোনের অসামঞ্জস্যতা, অধিক বয়স, দীর্ঘ দুগ্ধ প্রদান কাল, ক্ষীণ স্বাস্থ্য এবং জন্মগত বন্ধ্যাত্ব অন্যতম।

ডিসটোকিয়া বা প্রসবের সময় বাচ্চা আটকে যাওয়া

ভেড়ীর গর্ভে বাচ্চা অস্বাভাবিক বড় হওয়ার কারণে, মায়ের জরায়ুতে সঠিক অবস্থানে না থাকা, জরায়ুর অসারতা ইত্যাদির কারণে ডিসটোকিয়া হতে পারে।

গর্ভফুল আটকানো বা রিটেনশন অব প্লাসেন্টা

সাধারণত বাচ্চা প্রসবের ৬-১২ ঘণ্টার মধ্যেই গর্ভফুল আপনা আপনি পড়ে যায়। কিন্তু অনেক সময় ১২ ঘণ্টার পরেও গর্ভফুল থেকে যায়। এ অবস্থাকে গর্ভফুল আটকানো বা রিটেনশন অব প্লাসেন্টা বলে। সাধারণত যে সকল কারণে গর্ভফুল আটকাতে পারে তা হলো অপুষ্টি (বিশেষ করে ক্যালসিয়ামের অভাবে) অপরিপক্ব গর্ভফুল, গর্ভপাত, অপরিপক্ব প্রসব, জরায়ুর অসারতা, সংক্রামক গর্ভপাত (ব্রুসেলোসিস), বাচ্চা আটকে যাওয়া ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে জ্বর দেখা না গেলে ভেড়ীকে গর্ভফুল না পড়া পর্যন্ত অক্সিটোসিন ইনজেকশন (প্রতি ১০ কেজির জন্য ১-২ মিঃ লিঃ) ৫ মিনিট পর পর ২-৩ বার দিতে হবে। জ্বর দেখা গেলে পেনসিলিন, এম্পিসিলিন, জেন্টামাইসিন এর যে কোনো একটি মাংসে ইনজেকশন করতে হবে। এই সময় অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ট্যাবলেট জরায়ুতে ক্যাথেটারের সাহায্যে প্রয়োগ করতে হয়। জোর করে আটকেপড়া গর্ভফুল টানাটানি করলে জরায়ু থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে, ফলে ভেড়ীর জরায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে বেশি সময় লাগে।

জীব নিরাপত্তা

গর্ভবতী ভেড়ীকে পাঠা ও অন্যান্য ভেড়ী থেকে আলাদা করে রাখতে হবে। ঠাসাঠাসি অবস্থায় এক সাথে অনেক গর্ভবতী ভেড়ী রাখা যাবে না। গর্ভের শেষ চার সপ্তাহে ভেড়ীকে স্থানান্তর বা অন্য কোনো ধরনের মানসিক বা শারীরিক পীড়নযুক্ত (Stressful condition) অবস্থায় রাখা যাবে না। গর্ভবতী ভেড়ীর ঘর নিয়মিত পরিষ্কার ও শুষ্ক রাখা দরকার। গর্ভবতী ভেড়ীকে মাসে অন্তত একবার মেলাথিয়ন (০.৫%) দ্বারা গোসল করাতে হবে।

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, প্রাণিজ প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ ও দারিদ্র্যবিমোচনে ভেড়া পালন বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রামীণ পরিবেশে ভূমিহীন, দুস্থ মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভেড়া পালনই একমাত্র সহজলভ্য আয়ের উৎস। ভেড়া পালন ব্যবসাকে লাভজনক করতে হলে প্রজনন ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

প্যাকেজের উদ্ভাবক

ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার, ড. মোঃ এরসাদুজ্জামান, ড. মোঃ রাকিবুল হাসান এবং ড. মোঃ জিল্লুর রহমান

দেশি ভেড়া হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে "বাংলা ল্যাম্ব" (ভেড়ার মাংস) উৎপাদন

ভূমিকা

সুস্থ সবল ও মেধাবী জাতি গঠনে প্রাণিজ আমিষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস মাংস। বাংলাদেশ এখন চাহিদা ভিত্তিক মাংস উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। যদিও উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের গড় মাংস গ্রহণের তুলনায় আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি। বর্তমানে দেশে ৩৪.৬৮ লক্ষ ভেড়া রয়েছে যা গবাদিপ্রাণীর সংখ্যানুপাতে তৃতীয়। আমাদের দেশে গরু ও ছাগলের মাংস খুবই জনপ্রিয়। মাংসের গুনগতমান যাচায়ে ভেড়ার মাংসও (বিশেষ করে ল্যাম্ব মিট) সমান বা অধিক গুরুত্বের দাবিদ্বার। গুণগত মান ও স্বাদের ভিত্তিতে সারা বিশ্বে ল্যাম্বের মাংস খুবই জনপ্রিয়। ল্যাম্ব বলতে সাধারণত এক বছরের কম বয়সী হৃষ্টপুস্টকৃত বাড়ন্ত ভেড়াকে বুঝায় এবং এই ভেড়ার মাংসকেও ল্যাম্ব বলে, যা খুবই সুস্বাদু। গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশে যেসব ভেড়া মাংসের জন্য জবাই হয় তাদের গড় বয়স ১৫ মাস। যাদের বেশির ভাগই বয়স্ক এবং পাল থেকে বাদ দেয়া ভেড়া। ফলে এদের মাংসের গুনাগুণ এবং স্বাদ আশানুরূপ নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই মাংস ছাগলের মাংসের সাথে মিশিয়ে বিক্রি করা হয়। তাই উন্নত গুনাগুণ সম্পন্ন ভেড়ার মাংস উৎপাদন ও এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিকল্পে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ল্যাম্ব উৎপাদন ও বিপণন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ল্যাম্ব উৎপাদনে স্থানীয় জাতের ভেড়া

আমাদের দেশে সাধারণত তিন ধরণের স্থানীয় জাতের ভেড়া পাওয়া যায়। তবে কিছু সংকর জাতের ভেড়াও রয়েছে। দেশে তিন ধরণের স্থানীয় জাতের ভেড়া রয়েছে। এগুলো হলো- বরেন্দ্র এলাকার ভেড়া, যমুনা নদী অববাহিকার ভেড়া, উপকূলীয় অঞ্চলের ভেড়া। বিএলআরআই পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে এই তিন ধরণের ভেড়াই বাণিজ্যিক ল্যাম্ব উৎপাদনে উপযোগী। তবে উপকূলীয় অঞ্চলের ভেড়া তুলনামূলকভাবে বেশি লাভজনক।

ল্যাম্ব উৎপাদনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

আমাদের দেশে সাধারণত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরাই ভেড়া পালন করে থাকে। বর্তমানে ভেড়ার বাণিজ্যিক খামারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশি ভেড়ার খামারের প্রধান উৎপাদ হলো বাচ্চা বা ল্যাম্ব। ল্যাম্ব উৎপাদনের জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো- বাচ্চার জন্ম ওজন, ভেড়ীর দুধ উৎপাদন, বাচ্চার ওজন বৃদ্ধির হার অর্থাৎ সঠিক সময়ে সঠিক ওজন অর্জন। এ জন্য ভেড়ীর গর্ভকালীন খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা বিশেষকরে গর্ভাবস্থার শেষ দুই মাসের পুষ্টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময়ে গর্ভস্থ বাচ্চার ওজন বৃদ্ধি ৮০% ঘটে। এই সময়ে অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে বাচ্চার জন্ম ওজন, পরবর্তী ওজন বৃদ্ধির হার, এবং ভেড়ীর দুধ উৎপাদন কমে যায়, যা বাচ্চা মৃত্যুর অন্যতম কারণ। আবার বাচ্চা জন্মের পর মায়ের সুষম খাদ্যের ঘাটতি হলে বাচ্চার পরবর্তী ওজন বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, মায়ের দুধ উৎপাদন, সময়মত গরম হওয়া ও গর্ভধারণ ব্যহত হয়। ফলে খামার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই মানসম্মত ল্যাম্ব উৎপাদনে (মাংস) ভেড়ীর গর্ভাবস্থা হতে শুরু করে বাচ্চা জন্মের পর ও বাচ্চা জবাই উপযোগী হওয়া পর্যন্ত খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে উপযুক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গুনগত মানসম্পন্ন ও নিরাপদ ল্যাম্ব (মাংস) উৎপাদন এখন সময়ের দাবী।

ল্যাম্ব উৎপাদনে গর্ভবতী ভেড়ীর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

গর্ভস্থ বাচ্চার যত্ন প্রকৃতপক্ষে গর্ভবতী ভেড়ীর যত্নের উপর নির্ভর করে। গর্ভবস্থার প্রথম ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত ভেড়ী সাধারনত তার বাচ্চার জন্য দুধ উৎপাদন করে থাকে। আবার গর্ভাবস্থার শেষ ৮ সপ্তাহে গর্ভস্থ বাচ্চার বৃদ্ধি দ্রুত হয়, তাই গর্ভধারণ ও দুধ উৎপাদনের জন্য পুষ্টি চাহিদা বেশি থাকে। অতএব, পুরো গর্ভধারণকালেই সুষম খাদ্য বাবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশি ভেড়া হতে বাণিজ্যিক ল্যাম্ব উৎপাদনের জন্য গর্ভকালীন ও দুগ্ধকালীন সময়ে ভেড়ীকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস/সাইলেজ/ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (ইউএমএস) ও দানাদার খাবার সরবরাহ করতে হবে। কাঁচা ঘাস হিসাবে প্রাকৃতিক ভাবে উৎপন্ন ঘাস বা চাষকৃত ঘাস সরবাহ করতে হবে। চাষকৃত ঘাসের মধ্যে ওটস, জাম্বু, ভুট্রা, জার্মান, নেপিয়ার দেয়া যেতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে এ সময়ে একটি দেশি ভেড়ী দৈনিক প্রায় ৩.০-৩.৫০ কেজি কাঁচা ঘাস বা সমপরিমাণ সাইলেজ বা ৭৫০-১০০০ গ্রাম ইউএমএস খায়। ঘাসকে ১.০-১.৫ ইঞ্চি পরিমাণে কেটে সরবরাহ করতে হবে। আবদ্ধ অবস্থায় পালনের ক্ষেত্রে পরিমাণ মত ঘাস দুই ভাগে ভাগ করে সকালে ও বিকালে সরবরাহ করতে হবে।

বাণিজ্যিক ল্যাম্ব উৎপাদনের জন্য এই সময়ে ভেড়ীকে কাঁচা ঘাস/সাইলেজ/ ইউএমএস এর সাথে পর্যাপ্ত প্রোটিন ও বিপাকীয় শক্তিসম্পন্ন দানাদার খাবার সরবরাহ করতে হবে। আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে সরবরাহকৃত দানাদার মিশ্রণে শতকরা ১৮ভাগ প্রোটিন ও ১২ মেগাজুল বিপাকীয় শক্তি/কেজি শুষ্ক পদার্থ থাকলে ভেড়ী ও বাচ্চার উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। নিচের টেবিলে এরকম একটি দানাদার মিশ্রণের নমুনা দেয়া হলো।

টেবিল-১. দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ

ক্রমিক নং	উপাদান	শতকরা হার
১	ভুট্রা ভাঙা	৪০.০০
২	সয়াবিন মিল	২৬.০০
৩	গমের ভুসি	২২.০০
৪	চালের কুড়া	১০.০০
৫	লবণ	১.০০
৬	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫
৭	ডিসিপি	০.৫

উল্লেখিত উপাদান সমূহ ভালোভাবে মিশিয়ে গর্ভবতী ভেড়ীর শারীরিক ওজনের ১.৫% হারে সমান দুই ভাগে সকালে ও বিকালে সরবরাহ করতে হবে।

জন্মের পর বাচ্চার যত্ন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা

আজকের বাচ্চা আগামী দিনের মাংস উৎপাদনকারী ল্যাম্ব, ভালো ভেড়ী বা উৎকৃষ্ট পাঁঠা হবে। তাই বাচ্চার মৃত্যুহার কমানোর জন্য বাচ্চার সঠিক যত্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খামার লাভজনক হবে কিনা তা এই সময়ের ব্যবস্থাপনার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

- প্রসবের সাথে সাথে বাচ্চাকে দ্রুত শাল দুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করতে হবে। বাচ্চা সাধারণত মায়ের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা এন্টিবডি মায়ের শালদুধ হতে পেয়ে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে সদ্য প্রসূত বাচ্চার অন্ত্রে শাল দুধ হতে যে এন্টিবডি পাওয়া যায় তা ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত দ্রুত শোষিত হয়। এরপর এই শোষণের হার অনেক গুণ কমে যায়।
- একাধিক বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলে প্রতিটি বাচ্চাই যেন সমান ভাবে শাল দুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।
- চাহিদার তুলনায় মায়ের দুধ কম হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি গরুর দুধ বা ভাতের মাড়ও দেয়া যেতে পারে। দুধ দিনে কমপক্ষে ৩-৪ বার খাওয়াতে হবে। গরুর দুধ বা ভাতের মাড় কুসুম গরম অবস্থায় (৩৯° সে তাপমাত্রা) খাওয়াতে হবে।

বাচ্চাকে ক্রিপ রেশন সরবরাহ

অধিক বিপাকীয় শক্তি সম্পন্ন ও সহজ পরিপাচ্য দানাদার মিশ্রণকে ক্রিপ রেশন বলে। ল্যাম্ব উৎপাদনের জন্য বাচ্চার বয়স দুই সপ্তাহ পূর্ণ হওয়ার পর মায়ের দুধের পাশাপাশি বাচ্চাকে ক্রিপ রেশন সরবরাহ করা উচিত। টেবিল-২ তে ক্রিপ মিশ্রণের একটি নমুনা দেয়া হলো। এই দানাদার মিশ্রণ দৈনিক ২০ গ্রাম করে সকালে ও বিকালে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দিতে হবে। প্রতি সপ্তাহ অন্তর অন্তর এই মিশ্রণের পরিমাণ বাচ্চা প্রতি ১০ গ্রাম করে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত বাড়াতে হবে। আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে ক্রিপ ফিডিং করালে উইনিং কালে অর্থাৎ দুধ ছাড়ার সময় বাচ্চার ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে ২০-৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। বাচ্চার বয়স ৪ সপ্তাহ হলে বাচ্চাকে অল্প করে কচি ঘাস সরবরাহ করতে হবে।

টেবিল-২. বাচ্চার জন্য ক্রিপ মিশ্রণ

ক্রমিক নং	উপাদান	শতকরা হার
১	ভুট্টা ভাঙা	৬৮.০০
২	সয়াবিন মিল	৩০.০০
৫	লবণ	১.০০
৬	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	১.০০

উপরোক্ত ব্যবস্থাপনায় ভেড়ী ও বাচ্চা প্রতিপালন করলে দেশি ভেড়া হতে সাধারণত ২.০ কেজি ওজনের বাচ্চা পাওয়া যায়। ভেড়ীর দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় (প্রায় ২০০ গ্রাম/দিন), এবং পরবর্তী প্রজননের জন্য ভেড়ীর গরম হওয়ার সময় কমে (প্রায় ২৫ দিন)। ফলে বাচ্চা মৃত্যুহার কমে, পরবর্তী ওজন বৃদ্ধি দ্রুত হয় (১০০ গ্রাম/দিন) এবং উইনিং এর সময় (তিন মাস বয়সে) প্রায় ১০ কেজি ওজনের ল্যাম্ব পাওয়া যায়।

দুধ ছাড়ানোর পর হতে জবাই/বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বাচ্চার ব্যবস্থাপনা

দুধ ছাড়ানোর পর উইনিং স্ট্রেস বা দুধ ছাড়ান জনিত পীড়নের কারণে ল্যাম্বের ওজন বৃদ্ধির হার সাধারণত কম হয়। কিন্তু উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তিতে পালন করলে ল্যাম্ব তার ওজন বৃদ্ধির হার ধরে রেখে উইনিং স্ট্রেসকে সফল ভাবে মোকাবেলা করতে পারে। দুধ ছাড়ানোর পর হতে জবাই/বাজারজাতকরণ পর্যন্ত ল্যাম্বকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস/ইউএমএস/সাইলেজ সরবরাহের পাশাপাশি টেবিল-৩ এ উল্লেখিত দানাদার খাবার শারীরীক ওজনের ১.৫% হারে সকালে ও বিকেলে দুই ভাগ করে সরবরাহ করতে হবে।

টেবিল-৩. দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ

ক্রমিক নং	উপাদান	শতকরা হার
১	ভুট্টা ভাঙা	৬৮.০০
২	সয়াবিন মিল	৩০.০০
৫	লবণ	১.০০
৬	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০
৭	ডিসিপি	০.৫০

ল্যাম্ব জবাই বা বাজারজাতকরণের বয়স

এই প্রযুক্তিতে ভেড়ী এবং ল্যাম্ব প্রতিপালন করলে দেশি ভেড়া হতে ৬, ৯ এবং ১২ মাস বয়সে যথাক্রমে ১৬, ২০ এবং ২৪ কেজি ওজনের ল্যাম্ব উৎপাদন সম্ভব। গবেষণায় দেখা গেছে ৬, ৯ বা ১২ মাস যেকোন বয়সেই ল্যাম্বকে বাজারজাত করলে তা খামারির জন্য লাভজনক হয়। এই প্রযুক্তিতে ভেড়ী এবং ল্যাম্ব প্রতিপালন করলে ৬, ৯ এবং ১২ মাস বয়সে ১ কেজি মাংস উৎপাদনে যথাক্রমে মোট ২৮০, ৩৬০ এবং ৪১০ টাকা খরচ হয়, যা প্রায় ৬০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা সম্ভব। অতএব, ৬ মাস বয়সে ল্যাম্বকে জবাই বা বাজারজাত করলে খামারি সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে পারবে। তবে আমাদের দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ল্যাম্বকে ৯ মাস বয়সে বাজারজাত করাই উত্তম।

ভেড়ী ও ল্যাম্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

এই পদ্ধতিতে পালিত ভেড়ীকে গর্ভধারণের ১ মাসের মধ্যে ১.৫ মিলি ভিটামিন-এ,ডি,ই এবং গর্ভের শেষ দুই সপ্তাহে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ইনজেকশন দিলে প্রেগনেন্সি টক্সেমিয়ার সম্ভাবনার ঝুঁকি কমে যায়। ভেড়ী এবং ল্যাম্বকে নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী পিপিআর এবং ক্ষুরারোগের ভ্যাক্সিন দিতে হবে।

টেবিল-৪. ভ্যাক্সিন ও এর ব্যবহার

ভ্যাক্সিনের নাম	বয়স	কতবার দিতে হবে
পিপিআর	বাচ্চা ৩ মাস, ভেড়ী ১ বার	১ বার
ক্ষুরা রোগ	বাচ্চা ৩ মাস বয়সে, ভেড়ী যেকোন সময়	৬ মাস পরপর

প্রতি তিন/চার মাস পরপর ভেড়ী এবং বাচ্চাকে (তিন মাস বয়স হতে) কৃমিনাশক দিতে হবে। উকুন আটালী, মায়াসিস, মেইঞ্জ ইত্যাদি প্রতিরোধে ল্যাম্ব (৩ মাস বয়স হতে) এবং ভেড়ীকে প্রতিমাসে একবার ০.০৫-০.১% মেলাথিয়ন দ্রবণে গোসল করাতে হবে। এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় খামার অনেকাংশে রোগমুক্ত রাখা সম্ভব হবে।

উপসংহার

উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতি কেজি ল্যাম্ব (মাংস) উৎপাদনের জন্য ২৮০-৪১০ টাকা খরচ হয়। বর্তমানে প্রতি কেজি ল্যাম্ব মাংসের বাজার মূল্য প্রায় ৬০০ টাকা। অর্থাৎ ফলে প্রতি কেজি ল্যাম্ব উৎপাদনের মাধ্যমে একজন খামারি ১৯০-৩২০ টাকা পর্যন্ত মুনাফা অর্জন করতে পারে। অতএব, উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ল্যাম্ব উৎপাদনের মাধ্যমে লাভজনক ভেড়ার খামার পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং গুনগত মানসম্পন্ন ও নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে ভূমিকা রাখবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. ছাদেক আহমেদ, মোঃ রেজাউল হাই রাকিব, মোঃ আবু হেমায়েত, মোর্শেদা ইয়াসমিন এবং ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান

পাহাড়ী অঞ্চলে ভেড়া পালন কৌশল

ভূমিকা

প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে এদেশের হতদরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব। অন্যান্য গবাদিপ্রাণী ও হাঁস-মুরগির পাশাপাশি ভেড়া পালন দরিদ্র মানুষের আয় বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৩৪.০১ লক্ষ ভেড়া রয়েছে, যার অধিকাংশই দেশীয় জাতের (ডিএলএস, ২০১৮)। গবাদিপ্রাণী পালনের ক্ষেত্রে ভেড়া সারাবিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রাণী। ভেড়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অন্যান্য গবাদি প্রাণির থেকে তুলনামূলকভাবে বেশী। ভেড়া থেকে আমরা মাংস, লোম, দুধ, চামড়া ও সার (মল মূত্র) পেয়ে থাকি। ভেড়ার মাংস তুলনামূলকভাবে নরম, রসাল ও সুস্বাদু। ভেড়ার পশম থেকে উন্নতমানের শীতবস্ত্র তৈরি হয়। বাংলাদেশে ভেড়ার মাংসের চাহিদা কম। কারণ, মানুষ ভেড়ার মাংস খেতে অভ্যস্থ নয়। উন্নত ব্যবস্থপনার মাধ্যমে দেশী ভেড়া উৎপাদন করে দেশের মাংসের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানী করা যেতে পারে। এছাড়াও পশম উৎপাদনকারী ভেড়া পালনের মাধ্যমে উলের বস্ত্র সামগ্রী তৈরি করা সম্ভব। ভেড়া সাধারনত বৎসরে ২ বার বাচ্চা দিয়ে থাকে এবং প্রতিবারে ২-৩টি বাচ্চা প্রদান করে। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই কম-বেশী ভেড়া পাওয়া যায়। ভেড়া অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির। দলবদ্ধভাবে থাকে এবং সহজেই যেকোন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে। ভেড়া দলবদ্ধভাবে চড়ে খেতে পছন্দ করে। এরা পাহাড়, পাহাড়ের ধার, টিলা, চরাঞ্চল, সমতল ভূমি সকল জায়গাতেই চড়ে খায়। পাহাড়ী অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ভেড়া পালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। বিশ্বের পাহাড়ী এলাকা সমৃদ্ধ দেশগুলোতে ভেড়ার চাষ করা হলেও, বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় কোন ভেড়ার অস্তিত্ব ছিল না। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) ২০১২ সনে প্রথম বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় খামারি পর্যায়ে প্রথম দেশীজাতের ভেড়ার বিতরণ ও গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে। প্রতি খামারি ৫ টি ভেড়া (১টি পুং ভেড়া ও ৪ টি ভেড়ী) এবং ভেড়া পালনের কারিগরি পরামর্শ প্রদান করেন। ফলশ্রুতিতে ভেড়া গুলো পাহাড়ী লতাপাতা ও গুল্ম জাতীয় খাবার খেয়ে অতি স্বল্পসময়ে পাহাড়ী অঞ্চলে খাপ খেয়েছে এবং উৎপাদন ও পুনঃউৎপাদনে ভাল ফলাফল দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকার মানুষ পাহাড়ের ঢালে বসবাস করে। ঐ পরিবেশে বসবাস করা খুবই কষ্টকর। পাহাড়ি জনগন দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে তুলনামূলকভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে কিছুটা পিছনে এবং তাদের অনেকে বহু কষ্টে জীবন-যাপন করে। তাদের আয়ের উৎস্য অত্যন্ত সীমিত এবং জীবন যাত্রার মান নিম্নমানের। এই অবস্থা হতে উত্তরনের জন্য পাহাড়ি এলাকার জনগন বিজ্ঞান ভিত্তিক যুগোপযুগী ও উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশীয় ভেড়া লালন-পালন করে সুখী ও সমৃদ্ধ এবং সাবলম্বী হতে পারে।

পাহাড়ী অঞ্চলে ভেড়া পালনের সুবিধা

১। বাংলাদেশের মোট পাহাড়ি জমির পরিমাণ প্রায় ১.৮১ মিলিয়ন হেক্টর। পাহাড়ি জেলা বিশেষ করে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, বৃহত্তর সিলেটের উত্তরাংশ এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত (কৃষি পরিবেশগত জোন-২৯)। মূলতঃ পাহাড়ি অঞ্চলে দু'ধরনের জমি বিদ্যমান-পাহাড়ি ঢাল এবং পাদদেশের সমতল জমি। পাহাড়ের পাদদেশের সমতল জমি। পাহাড়ের পাদদেশের সমতল জমিতে সাধারনত ধান চাষ করা হয়। তবে নভেম্বর হতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়ে এ সমতল জমিতে রবি শস্যের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ঘাস যেমন, নেপিয়ার, পারা, পাকচং, স্প্লেনডিডা ইত্যাদি এবং মিশ্র ঘাস যেমন, ভুট্টা ও কাউপির মিশ্র চাষ করা যেতে পারে।

অপর দিকে পাহাড়ের ঢালগুলোতে জুম চাষ করার কারণে পাহাড়গুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই গাছপালা নেই বরং আগাছায় পূর্ণ। এতে করে জমি গুলো হতে কোন ফসল ও হচ্ছে না, উপরন্তু মৌসুমী বৃষ্টির পানিতে মাটি ও বালি ক্ষয় হয়ে পরিবেশের ভারসাম্যতা নষ্ট হচ্ছে। সাধারনত, পাহাড়ি ঢালে ডিসেম্বর হতে মার্চ পর্যন্ত পানির অভাবে কোন ফসল ফলানো সম্ভব নয়। তবে, বাকী মাসগুলোতে বৃষ্টির পানিতে প্রচুর ঘাস উৎপাদন করার মাধ্যমে একদিকে যেমন এই সমস্ত ঘাসের গুচ্ছমূল পাহাড়ি জমির উপরিভাগ এবং গভীরে বিস্তৃতি লাভ করে মাটিকে শক্তভাবে ধরে রাখে যা মাটি ও বালির ক্ষয়রোধ করে পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষা করে; অন্যদিকে ভেড়া বা অন্য গবাদি প্রাণীর খাদ্যের ও যোগান দিবে।

২। যেহেতু ভেড়ার খাদ্য বাছ-বিচার তুলনামূলক ভাবে কম, সেহেতু পাহাড়ি অঞ্চলে স্থানীয় ঘাস, লতাপাতা, শুকনা পাতা এবং ফসলের কান্ড অথবা অবশিষ্ট সকল কিছুই ভেড়ার খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

৩। বনভূমি সমেত এরূপ জায়গা ফসল উৎপাদনের চেয়ে চারনভূমি হিসাবে ব্যবহার সহজ ও লাভজনক। তাই এরূপ জায়গায় চড়ে খাওয়ার জন্য ভেড়া একটি উৎকৃষ্ট প্রাণী।

৪। অন্যান্য ব্যবসার চেয়ে প্রাথমিক পুঁজি বা বিনিয়োগ যেমন কম তেমন ভেড়া লালন পালনের জন্য প্রতিদিনের খরচও কম।

৫। ভেড়ার খামার পরিচালনা, প্রতিদিনের কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য বাড়ির ছেলে-মেয়ে এবং মহিলারাও এ কাজ সহজে সম্পাদন করতে পারে।

পাহাড়ি অঞ্চলে ভেড়া পালনের অসুবিধা

১। বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে ভেড়া লালন-পালনের প্রচলন ছিল না।

২। ভেড়া পালনের আধুনিক প্রযুক্তি, রোগ ব্যাধির চিকিৎসা সম্বন্ধে অধিকাংশ খামারিরাই অজ্ঞ।

৩। ভেড়ার বাজারজাতকরণ সম্পর্কে খামারিদের পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব।

৪। কিছু কিছু পাহাড়ি অনেক দূর্গম স্থানে বসবাস করেন। ফলে প্রতিকূল পরিবেশে তাদের ভেড়া/প্রাণী স্থানীয় চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবা থেকে অনেক সময় বঞ্চিত থাকে।

৫। সাংসারিক অভাবের কারণে বাজারজাতকরনের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ভেড়া বিক্রি করা।

ভেড়ার বাসস্থান

ভেড়া পালনের ক্ষেত্রে সাধারনত মুক্তঘর বা খোলামেলা ঘর ব্যবহার করা হয়। ঘরটি লম্বালম্বিভাবে পূর্ব-পশ্চিম মুখী এবং পার্শ্বিকভাবে উত্তর-দক্ষিণমুখী হতে হবে, যাতে পর্যাপ্ত আলো এবং বাতাস পায়। আশ-পাশ স্যাঁতস্যাঁতে থাকলে চলবে না। ঘরের কাঠামো শক্ত হওয়া বাঞ্চনীয়। ঘরের স্থান বন্য প্রাণিমুক্ত থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ১০টি ভেড়া পালনের জন্য নিম্নোক্ত হিসেবে ঘর তৈরি করা যায়ঃ

- ঘরের মাঁচা মাটি থেকে ২-৩ ফুট উপরে হবে।
- ভেড়ার ঘর = ৮ ফুট দৈর্ঘ্য × ৬ ফুট প্রস্থ × ৮ ফুট উচ্চতা
- খুঁটির সংখ্যা = ৮টি (১৬ ফুট লম্বা)
- চাল= কাঠ/টিন/ছন
- ঘরের চতুর দিকে আলো বাতাস চলাচলের জন্য ৩ফুট নেট/ ২ ইঞ্চি ফাকা করে কাঠের ব্যবহার করতে হবে।

ভেড়ার সংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ন্ত ভেড়া/ ভেড়ীর জন্য আলাদা ঘর তৈরি করতে হবে।

ভেড়ার খাদ্যাভাস এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনা

সকল গবাদি প্রাণীর মূল খাবার হলো সবুজ ঘাস। ভেড়ার ক্ষেত্রেও কোন ভিন্নতা নেই। পর্যাপ্ত ঘাস পাওয়া না গেলে বেঁচে থাকার জন্য তারা বিকল্প খাদ্যের সন্ধান করে এবং তাতেই তারা অভ্যস্থ হয়ে যায়। বিকল্প খাদ্যগুলো হলো, ফসলের উচ্ছিষ্টাংশ, গাছের পাতা, লতাগুল্ম ইত্যাদি। ভেড়া সাধারনত দলবদ্ধভাবে মাঠে চড়ে সবুজ ঘাস খায়। এরা বাড়ীর আঙ্গিনা, পতিত জমি, চারনভূমি, পুকুরপাড়, পাহাড়ের ঢাল, উচু-নিচু পাহাড় এসব জায়গায় দলবদ্ধভাবে চড়ে বেড়ায় ও খেয়ে থাকে। ভেড়ার আদর্শ খাদ্য বলতে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি, সবুজ ঘাস, খড় বা অন্যান্য শস্যের উচ্ছিস্টাংশ, দানাদার খাদ্য বা খাদ্যের অংশবিশেষ যেমন গম বা ভুট্টা ভাঙ্গা, ভাঙ্গা চাল বা খুদ, চালের কূড়া, গমের ভুসি ইত্যাদি। এসব খাদ্যের সাথে ক্যালসিয়াম-ফসফরাস, ভিটামিন-মিনারেল অত্যাশক। ভেড়ার বাড়ন্তকাল, গর্ভকাল এবং উৎপাদনকাল ভিটামিন-মিনারেল সরবরাহ করা প্রয়োজন। তাছাড়াও প্রাণিকে সুস্থ রাখা এবং রোগের আক্রমনের হাত থেকে রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে পানির সাথে বা দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে ঔষধ খাওয়ানোর প্রয়োজনও হতে পারে।

খরা মৌসুমে সাধারনত সবুজ ঘাসের সংকট দেখা দেয়। তাই যখনই সবুজ ঘাসের সংকট দেখা দিবে তখনই ভেড়ার জন্য বিকল্প খাদ্যও সরবরাহ করতে হবে। ভেড়ার পুষ্টি ঘাটতি পূরনে খাবারের সাথে অবশ্যই প্রত্যেহ কিছু কিছু দানাদার খাদ্য প্রদান করতে হবে।

নিম্নে দানাদার খাদ্যের মিশ্রনের একটি নমুনা/ফর্মুলা প্রদান করা হলো (১০ কেজি)

ক্র. নং	উপাদান	পরিমাণ	বিপাকীয় শক্তি	ক্রুড প্রোটিন (CP)
১।	ভুট্টা/গম ভাঙ্গন	২ কেজি	২৬০০ কেজি ক্যালরি	১৬.৫%
২।	চালের কুড়া	১.৫ কেজি		
৩।	ডালের ভুসি	০.৫ কেজি		
৪।	গমের ভুসি	৪ কেজি		
৫।	তিল/সরিষা খৈল	০.৫ কেজি		
৬।	সয়াবিন খৈল	১.৩৫০ কেজি		
৭।	লবন	১০০ গ্রাম		
৮।	ডিসিপি	৩০ গ্রাম		
৯।	ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স	২.৫ কেজি		
	সর্বমোট	১০ কেজি		

ভেড়ার বিকল্প খাদ্য হিসেবে সাজনা পাতার ব্যবহার

বিভিন্ন পরীক্ষায় এবং গবেষণায় প্রমানিত যে, শুধুমাত্র পর্যাপ্ত পরিমাণ সাজনা পাতার উপর নির্ভর করে বাণিজ্যিকভাবে ভেড়া পালন সম্ভব। সাজনা পাতার রয়েছে গড়ে ২৪-২৮% ড্রাই ম্যাটার এবং গড়ে ড্রাইম্যাটার ২৩-২৬% ক্রুড প্রোটিন। সাজনা পাতার প্রতি কেজি ড্রাই ম্যাটার থেকে প্রায় ১১ মেগাজুল শক্তি পাওয়া যায় (০১ কেজি দানাদার খাদ্যের মিশ্রনে ১০.৮৩ মেগাজুল শক্তি থাকে)। সাজনা পাতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এতে আছে অতিরিক্ত মাত্রার মিনারেল বা খনিজ উপাদান যা কোন কাঁচা ঘাসে পাওয়া সম্ভব নয়।

সাজনা পাতা ভেড়ার খাদ্যে অন্তর্ভুক্ত করার দ্বারা ভেড়ার খাদ্যাভাসের উন্নতি, ওজন বৃদ্ধি হয় কোন কৃত্রিম হরমোন বা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার ছাড়াই। গবেষণায় দেখা যায় যে, ভেড়াকে সাজনা পাতা ও কান্ড খাওয়ানোর ফলে দৈহিক ওজন ৩০-৩২% বৃদ্ধি পায় এবং হজম প্রক্রিয়ারও যথেষ্ট উন্নতি হয়। সাধারনত চারা রোপণের ৭৫ দিন বয়সে ভূমি থেকে ৩-৫ ফুট উচ্চতায় কেটে তা চপিং করে সরাসরি ফ্রেস অথবা শুকিয়ে গ্রাইন্ডিং করে ভেড়ার সম্পূর্ণ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও ৭৫ দিন বয়সের সাজনা গাছ সাইলেজ করেও খাওয়ানো যেতে পারে। যেকোন বাড়ীর আঙ্গিনায় তার আশেপাশে সাজনা গাছ ছাড়াও প্রচুর পরিমানে ইপিল ইপিল, কাঁঠাল গাছ, নিম গাছ, মেহগনি গাছ লাগানো যেতে পারে। এসব গাছের পাতাও সবুজ ঘাসের বিকল্প হিসেবে দৈনিক ভেড়াকে খাওয়ানো যেতে পারে।

ভেড়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

সুস্থ্য ভেড়া লাভজনক খামার পরিচালনার পূর্ব শর্ত। রোগের কারণে বিভিন্নভাবে খামার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। রোগাক্রান্ত ভেড়ার দৈহিক বৃদ্ধি, বাচ্চা ও দুধ উৎপদান কমে যায়। এই জন্য ভেড়ার খামারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ভেড়ার সুস্থ্যতার লক্ষণসমূহ

- ভেড়া দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে
- সাধারণতঃ পালের একটি ভেড়া যে দিকে চলে দলের জন্য ভেড়া তাকে অনুসরণ করে
- সুস্থ্য ভেড়া এক মনে খাদ্য গ্রহণ করে
- সুস্থ্য ভেড়ার মাথা শরীরের সাথে সমান্তরালভাবে থাকে এবং সবসময় সাবলীল ভঙ্গিতে চলাফেরা করে
- কোন আগন্তুক এলে সাবলীল ভঙ্গিমায় মাথা উঁচু করে তাকাবে এবং কিছুক্ষণ পর পুণরায় খাদ্য গ্রহণ শুরু করবে
- নাক এবং চোখ পরিচ্ছন্ন থাকবে এতে কোন ময়লা থাকবে না
- স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে পালিত সুস্থ্য ভেড়ার চামড়া বিশেষ করে যে সকল অংশ পশমে আবৃত নয় সে সকল অংশ উজ্জ্বল নরম থাকে
- এদের পা'গুলি শক্ত ও সুঠাম গড়নের হবে
- কোন রকম খুঁড়িয়ে চলবে না
- সুস্থ্য ভেড়ার পায়খানা দানাদানা (গুটি গুটি) হবে এবং পায়ু অঞ্চল পরিচ্ছন্ন থাকবে
- প্রশ্রাবের রং থাকবে শুকনা খড়ের রংয়ের মত
- দুধের বাঁট এবং ওলান নরম ও স্পঞ্জের মত হবে
- বাঁটে বা ওলানে কোন দানা বা শক্ত কিছু থাকবে না।

ভেড়ার প্রধান প্রধান রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার

ভেড়া আশেপাশের পরিবেশ হতে অনবরত বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিকাংশ সময় ভেড়া এই সকল জীবণুর আক্রমন থেকে রক্ষা পায়। যদি দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক্ষতিকর জীবাণু প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয় তখন ভেড়া রোগাক্রান্ত হয়। অতএব ভেড়াকে সুস্থ্য রাখতে হলে খামারে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ রাখতে হবে।

পাহাড়ী এলাকায় দেশীয় ভেড়ার রোগবালাই সাধারণত খুবই কম হয়। নিম্নবর্ণিত কিছু প্রাত্যাহিক, সাপ্তাহিক মাসিক, বাৎসরিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিয়ম মেনে চললে একটি স্বাস্থ্যসম্মত ভেড়ার খামার গড়ে তোলা সম্ভব।

টিকা প্রদান

স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে টিকা প্রয়োগ করে ভেড়াকে বিভিন্ন মারাত্মক রোগের আক্রমন থেকে রক্ষা করা যায়-

ক্রমিক নং	রোগের নাম	টিকা দেয়ার বয়স
১।	পিপিআর	১ম ডোজ ৩ মাস বয়সে অথবা যে কোন বয়সে তারপর প্রতি ৩ মাস পর বুষ্টার ডোজ
২।	ক্ষুরা রোগ	১ম ডোজ ৩ মাস বয়সে এবং তারপর ৩ মাস পর পর

কৃমি নাশক

কৃমি ভেড়ার শরীরে পুষ্টি শুষে ভেড়াকে দুর্বল করে দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে ভেড়ার মোট সরবরাহকৃত পুষ্টির বিশেষত প্রোটিনের ২০ শতাংশ কৃমি শুষে নেয় এবং মিউকাস আকারে প্রোটিন শরীর থেকে বের করে দেয়। এছাড়া ভেড়ার হজমেও এরা বাধা প্রদান করে থাকে। বহিঃ পরজীবি দেহের চামড়া ও পশমের মান নষ্ট করে। এজন্য নিয়মিতভাবে ৩ মাস পর পর কৃমিনাশক দিতে হবে।

ডিপিং

বছরের বিভিন্ন সময়ে ভেড়া উকুন, আটালী, মায়াসিস, মেইঞ্জ ইত্যাদি বহিঃ পরজীবি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সকল বহিঃ পরজীবি থেকে ভেড়াকে মুক্ত রাখার জন্য প্রতি মাসে নূন্যতম একবার ০.৫% ম্যালাথিয়ন দ্রবণে (১০০ লিটার পানিতে ০.৫ লিটার ম্যালাথিয়ন) ডিপিং/গোসল করাতে হবে। খামারে চর্ম রোগে আক্রান্ত কোন ভেড়া থাকলে তাকে আলাদা রাখতে হবে এবং চিকৎসকের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ২-৩ দিন পর পর রোগ সারা না পর্যন্ত ম্যালাথিয়ন ডিপিং/গোসল করতে হবে। (বিঃদ্রঃ সব ধরনের রোগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক ঔষধ সেবন করানোই বাঞ্জনীয়)।

শেয়ারিং/উল কর্তন

ভেড়ার পশম কাটার প্রক্রিয়াকে শেয়ারিং বলে। সাধারণতঃ ভেড়ার পশমে সহজেই বহিঃপরজীবি যেমন-টিক্স (উকুন), মাইটস্ (আঠালি) আক্রমন করে এবং রক্ত চুষে ভেড়ার ক্ষতি করে। এছাড়াও ভেড়ার পশমে গোবর, ধুলাবালি, কাদামাটি লাগার দরুন ভারী জট পাকিয়ে যায়, যার দরুন শরীরের রক্তচলাচলের বিঘ্ন ঘটে। এ সকল কারণে নির্দিষ্ট সময় পরপর ভেড়ার পশম কাটা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের দেশে সাধারণতঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ও ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল মাসে ভেড়ার পশম কাটা হয় এবং ভেড়ার পশম কাটার ফলে ভেড়া সুস্থ্য থাকে ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

খামারে বায়ো-সিকিউরিটি বা জীব নিরাপত্তা

বায়ো-সিকিউরিটি বা জীব নিরাপত্তা হল সমন্বিত কৌশল ও প্রয়াস যা খামারের ভেতরে বা আশেপাশে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর অনুপ্রবেশ, বিস্তার এবং ভেড়ায় কোন রকম সংক্রামণ ঘটানো অথবা বিপদগ্রস্থ করা তেকে বিরত রাখে।

পাহাড়ী এলাকায় সমতল ভূমির দেশীয় ভেড়াকে খাপ খাওয়ানোর ফলাফল

বর্তমানে পাহাড়ী এলাকার পরিবেশের সাথে ভেড়া প্রায় পুরোটাই খাপ খাইয়ে নিয়েছে। সমতল ভূমির ভেড়া যখন সর্বপ্রথম পাহাড়ি এলাকায় নেয়া হয় তখনকার চেয়ে বর্তমানের উৎপাদন দক্ষতা প্রায় সমান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা বেশী।

সমতল ভূমির ভেড়াকে পাহাড়ি এলাকায় খাপ খাওয়ানোর ধারাবাহিক ফলাফল (উৎপাদন দক্ষতার ভিত্তিতে)

বৈশিষ্ট্য	২০১২-১৩	২০১৪-১৫	২০১৬-১৭	২০১৮-১৯
বাচ্চার সংখ্যা	১.৪৬+০.০৪	১.৭৪+০.০৩	১.৭৬+০.০২	১.৮৬+০.০৬
বাচ্চার জন্ম ওজন (কেজি)	১.৩৪+০.০৫	১.৪২+০.০৪	১.৫২+০.০৭	১.৬৮+০.০৩
নয় মাসে ভেড়ার ওজন (কেজি) (বাজারজাতকরনের বয়স)	১৩.৮২+০.০২	১৪.৪৫+০.০১	১৪.৮+০.০৫	১৫.৬+০.০৪
প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার ওজন (কেজি) (১৪ মাস বয়সে)	-	১৮.৬+০.০৬	১৯.৫+০.০২	২০.৪৬+০.০৩

খামারে প্রতিদিনের নিয়মিত কাজ

১। প্রত্যহ সকালে ঘরের দরজা খুলে ভেড়ার দল বাইরে আনতে হবে। ভেড়া বের করার সময় তাকিয়ে দেখতে হবে সকল ভেড়া ঠিকমত দাড়ায় কি-না? যদি কোন ভেড়া না দাড়িয়ে বসে থাকে ভাবতে হবে তার কোন সমস্যা থাকতে পারে। যদি ভেড়া অসুস্থ্য হয় তার জন্য প্রয়োজন মত ব্যবস্থা নিতে হবে।

২। মাঠে যাওয়ার আগে কিছু দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে। গরমকাল হলে পানির সাথে মিশিয়ে এবং শীতকালে শুকনা অবস্থায় খাওয়াতে হবে। শীতকালে কুসুম গরম পানি খাওয়ানো ভালো।

৩। দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ পূর্বের দিন মিশিয়ে রাখতে হবে। দানাদার খাদ্য এক সাথে ১০ দিনের খাবার মিশ্রণ করা যায় তবে তা এমনভাবে রাখতে হবে যাতে অন্য প্রাণি তা স্পর্শ করতে না পারে। যেমনঃ এর প্রধান শত্রু ইঁদুর, তেলাপোকা ও টিকটিকি।

৪। খাদ্য দিলে সকল ভেড়া দৌড়ে এসে খাওয়া শুরু করে কি-না দেখতে হবে। যদি কোন ভেড়া খেতে কম আগ্রহ প্রকাশ করে তবে ভেড়াটি অসুস্থ্য হতে পারে। তার জন্য সাথে সাথেই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

৫। প্রতিদিন ভেড়ার ঘর বা মাঁচা ঘর হলে ঘরের নিচ থেকে ভেড়ার মলমূত্র পরিষ্কার করে একটা নির্দিষ্ট গর্তে রাখতে হবে।

৬। মাঁচা ঘর কাপড় কাঁচা সোডার পানিতে সপ্তাহে ১ দিন ধুয়ে দিতে হবে। ১ কেজি বা ১ লিটার পানিতে ১০-২০ গ্রাম সোডা মিশাতে হবে।

৭। টীকা বা কৃমির ঔষধ দেওয়ার তারিখ মনে রাখতে হবে। তারিখের পূর্বেই টীকা বা কৃমির ঔষধ সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

৮। সবুজ ঘাস উৎপাদনের পরিকল্পনা করতে হবে এবং প্রয়োজন মত সবুজ ঘাস চাষ করতে হবে।

৯। কোন ভেড়ী গরম হয়েছে কি-না বা তা ডাকে আসার সম্ভাবনা আছে কি-না তা খেয়াল রাখতে হবে এবং নিজের পালে পাঁঠা না থাকলে পার্শ্ববর্তী কোন পালের পাঁঠা দিয়ে ডাকে আসা ভেড়ীকে পাল দিতে হবে।

১০। ভেড়ীকে পাল দেওয়ার তারিখ লিখে রাখতে হবে এবং সে মোতাবেক কোন ভেড়ীটা কোন দিন বাচ্চা দিবে তা মনে রাখতে হবে।

ভেড়ার খামার লাভজনক করতে করণীয় বিষয়

ভেড়ার খামার লাভজনক করতে হলে খামারকে রোগমুক্ত রাখতে হব। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাই রোগমুক্ত রাখার প্রধান উপায়। ভেড়ার খামার রোগ মুক্ত রাখতে হলে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে।

১। খামারের চারদিকে বেষ্টনী/বেড়া দিতে হবে।

২। খামারে ইঁদুর, বিড়াল ও অন্যান্য পোকা-মাকড় প্রবেশ থেকে বিরত রাখতে হবে।

৩। প্রতিদিন ঘর পরিস্কার, শুকনা রাখা ও ভালো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা রাখা।

৪। প্রতিদিন নিয়ম করে পরিস্কার পানি ও সুষম খাদ্য দেয়া।

৫। পঁচা, বাসি ও দুর্গন্ধযুক্ত খাবার দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬। সপ্তাহে একদিন ভেড়ার ঘর, খাবার ও পানির পাত্র জীবাণুনাশক দিয়ে পরিস্কার করতে হবে।

৭। নিয়মিত টিকা দিতে হবে।

৮। অসুস্থ্য ভেড়াকে সুস্থ্য ভেড়া থেকে আলাদা রাখতে হবে।

৯। বাজার বা অন্য খামার থেকে নতুন ভেড়া এলে নিজের খামারের অন্যান্য ভেড়ার সাথে রাখা যাবে না এবং অন্তত ১৪-২১ দিন আলাদা রেখে পরীক্ষা করে তারপর খামারে রাখা যাবে।

১০। মৃত প্রাণীকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা গভির গর্তে পুতে রাখতে হবে এবং গর্তের চারদিকে শুকনা চুনা ছিটিয়ে দিতে হবে।

১১। বয়স ও লিঙ্গ অনুসারে বাচ্চা ও বয়স্ক ভেড়াগুলোকে আলাদাভাবে রাখতে হবে।

১২। খামার থেকে কিছু দূরে অসুস্থ্য ও রোগাক্রান্ত ভেড়া রাখার জন্য আলাদা ঘর তৈরি করতে হবে।

১৩। অসুস্থ্য ভেড়া চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করতে হবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. মোঃ আব্দুল জলিল

নিরাপদ মাংস উৎপাদনে দেশী উপকূলীয় মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি

ভূমিকা

মহিষ দেশের উপকূলীয় অঞ্চল, হাওড়-বাওড়, পাহাড় এবং যমুনা নদী বিধৌত অঞ্চলের খামারিদের জীবিকা নির্বাহের একটি উপযোগ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকলেও উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও সঠিক লালন-পালন পদ্ধতি না জানায়, খামারিরা অঞ্চলভিত্তিক বিদ্যমান পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক মহিষ লালন পালন করে থাকেন। নিম্নমানের খাদ্য ও ব্যবস্থাপনার কারণে খামারিরা মহিষ থেকে সর্বোচ্চ উপযোগীতা গ্রহণ করতে পারেন না। উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির প্রথম শর্তই হচ্ছে উন্নত খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ। দেশী গরুর তুলনায় মহিষের দৈহিক আকার বড় (Body frame size)। বিদ্যমান মহিষ ষাঁড় ব্যবহারে দেশের মাংস উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। মহিষ অধ্যুষিত উপকূলীয়, হাওড়-বাওড়, পাহাড় এবং যমুনা নদী বিধৌত অঞ্চলের খামারিরা অতীতে কৃষিকাজে ষাঁড়/বলদ ব্যবহার করতেন। তা এখন হ্রাস পেয়েছে। উক্ত মহিষ ষাঁড়গুলো সহজেই হৃষ্টপুষ্ট করা যেতে পারে। পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা হলে এদের হৃত উৎপাদন ক্ষমতা খুব কম সময়ে পুষিয়ে নিতে সক্ষম। এর ফলে খামারিগণ লাভবান হবেন। উন্নত লালন-পালনের মাধ্যমে মহিষের নিরাপদ মাংস উৎপাদন তথা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ হবে। মহিষের মাংস সম্বন্ধে ভোক্তাদের ভুল ধারনা দুর করাও প্রয়োজন। সে লক্ষ্যেই বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা ২০১৫ হতে ২০১৯ পর্যন্ত বিএলআরআই এর পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

হৃষ্টপুষ্টকরণে প্রাণী নির্বাচন: মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রক্রিয়ায় মহিষ নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বয়স, লিংগ, দৈহিক ওজন, এবং মহিষের স্বাস্থ্য অবস্থা বা Body Condition Score (BCS) ইত্যাদি বিষয়গুলি মহিষ নির্বাচনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণে নির্বাচিত মহিষের স্বাস্থ্য অবস্থা বা Body Condition Score (BCS) ৩.০ এর নীচে হলে ভালো (BCS, 1-6 Scale)। হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য সাধারনত ২.০-২.৫ বৎসর বয়সী মহিষ নির্বাচন করাই উত্তম তবে এর চেয়ে বেশী বয়সের মহিষও নির্বাচন করা যেতে পারে। কোন খামারি যদি একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট করতে আগ্রহী হন, সে ক্ষেত্রে কম বয়সী মহিষ অর্থাৎ ১.০-১.৫ বছর বয়সী মহিষ নিয়ে শুরু করতে পারেন।

সারণী-১ঃ নেপিয়ার এবং ভুট্টাঘাসের সাইলেজের পুষ্টিমান এবং উৎপাদন খরচ

সাইলেজ	শুষ্ক বস্তু (%, ফ্রেশ বেসিস)	পুষ্টিমান (%, শুষ্কবস্তুর ভিত্তিতে)				গ্রোস এ্যানার্জি (মেগাজুল/কেজি শুষ্ক বস্তু)	উৎপাদন খরচ (টাকা/কেজি)	
		জৈব বস্তু	ক্রুড আমিষ	এডিএফ	এনডিএফ		ফ্রেশ	শুষ্ক
নেপিয়ার	১৮.৪৬	৯৩.০০	৭.৯৮	৫৯.০৬	৮৬.৯২	১৬.০০	১.২০	৬.৫০
ভুট্টা	৩১.৬৩	৯১.৮০	৭.৫১	৪৩.৬৭	৭০.৮৭	১৫.৮২	২.১০	৬.৬১

সাধারণত ১.৫, ২.০ বা ২.৫ বছর বয়সী দেশী মহিষের গড় দৈহিক ওজন যথাক্রমে প্রায় ২০০.০, ২৪০.০ এবং ৩১৫.০ কেজি হয়ে থাকে। খামারি পর্যায়ে মহিষ সংগ্রহ, বিক্রি ইত্যাদি কাজে মহিষ ওজন দেয়া বা নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। সঠিক পদ্ধতিতে ব্যালেন্স ব্যবহারে ওজন গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, মাঠ পর্যায়ে ব্যালেন্স ব্যবহার সহজসাধ্য নয় বলে বিভিন্ন সুত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। সুত্র ব্যবহারে কাছাকাছি ওজন নির্ণয় করা যায়। মহিষ ওজনের বিশেষভাবে প্রচলিত একটি সুত্র হচ্ছে- মহিষের ওজন (কেজি)= { মহিষের দৈর্ঘ্য (উরুর হাড়ের মাথা হতে ঘাড়ের হাড়ের মাথা পর্যন্ত দুরত্ব, ফুট) × বুকের বেড় (ফুট) × বুকের বেড় (ফুট)}/৬৬০।

মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ সময়কালঃ সাধারণত মহিষ হৃষ্টপুষ্ট করার সময়কাল ৬০-১০৫ দিন হতে পারে।

হৃষ্টপুষ্টকরণে আঁশ ও দানাদার খাদ্যের ব্যবহারঃ মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণে খামারিরা অঞ্চলভিত্তিক সহজলভ্য যে কোন আঁশ খাদ্য যেমন সবুজ ঘাস (ভুট্টা, নেপিয়ার ইত্যাদি) বা ঘাসের সাইলেজ (কর্ণ, নেপিয়ার সাইলেজ ইত্যাদি) অথবা প্রক্রিয়াজাত খড় (ইউএমএস) বা গাঁজনকৃত ভুট্টাদানা ভাংগা সহ খড়ের মিশ্রণ (ফার্মেন্টেড কর্ণ মিক্সার) ব্যবহার করতে পারেন। মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণে উপরোক্ত আঁশ খাদ্যের পাশাপাশি ১৭-১৮ শতাংশ ক্রুড প্রোটিন (শুষ্ক বস্তুর ভিত্তিতে) এবং ১৩-১৪ মেগাজুল (প্রতি কেজি শুষ্ক খাদ্যে) শক্তি সমৃদ্ধ দানাদার খাদ্য মিশ্রণ (কনসেনট্রেট মিক্সার) ব্যবহার করা উত্তম। সহজলভ্যতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে খামারিরা মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণে দানাদার খাদ্য মিশ্রণ তৈরি করতে সারণী -১ এ উল্লেখিত খাদ্য উপাদানগুলো ব্যবহার করতে পারেন। তবে, খাদ্য খরচ হ্রাসের লক্ষ্যে প্রাণি পুষ্টিবিদের সাথে পরামর্শ করা জরুরি।

চিত্রঃ উপকূলীয় অঞ্চলে (ভোলা জেলা) ভুট্টা ঘাস চাষাবাদ এবং কর্ণ সাইলেজ তৈরি

সারণী ২: মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণে দানাদার খাদ্য মিশ্রণ তৈরিকরণে ব্যবহৃত খাদ্য উপাদান, পরিমাণ (শতাংশ), দানাদার খাদ্য মিশ্রণের পুষ্টিমান এবং উৎপাদন খরচ

ক্রমিক নং	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
খাদ্য উপাদান	গম ভাংগা/ চাল ভাংগা	গমের ভুসি	খেসারী ভূষি/ চালের কূড়া	সয়াবিন মিল/ তিল বা সরিষার খৈল	ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট (ডিসিপি)	লাইমস্টোন	লবণ	মিনারেল-প্রিমিক্স
পরিমাণ (কেজি/১০০ কেজি দানাদার মিশ্রণ)	২০.০	৪০.০	২০.০	১৫.০	৩.০	১.০	১.০	০.১
দানাদার খাদ্য মিশ্রণের পুষ্টিমান							উৎপাদন খরচ (টাকা/কেজি)	
শুষ্ক বস্তু,% ফ্রেশ	জৈব বস্তু, %	আমিষ, %	এডিএফ, %	এনডিএফ, %	খনিজ, %	গ্রোস এ্যানার্জি (মেগাজুল/কেজি শুষ্ক বস্তু)	ফ্রেশ	শুষ্ক
৮৭.৭৩	৯২.২৫	১৮.২১	১৪.৫৩	৩১.৩৪	৭.২৫	১৬.৪৮	৩২.০০	৩৬.০০

কৃমি মুক্তকরণ ও টিকা প্রদানঃ প্রাণীর খাদ্য নালীতে ক্ষতিকর পরজীবি বাস করে। এদের কারণে প্রাণী ঠিকমত পুষ্টি না পেয়ে দিন দিন রুগ্ন হয়ে যায় এবং একসময়ে উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মহিষের খাদ্য নালীতে পরজীবি সনাক্ত করে কৃমির ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। প্রাণীর দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে কৃমির ঔষধ ব্যবহার বাঞ্চনীয়। সেক্ষেত্রে, মহিষকে লিভামিসোল (Levamisol BP-600) জেনেরিক গ্রুপের ঔষধ ২০ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি দৈহিক ওজন হিসেবে খাওয়ানো যেতে পারে। এজন্য অবশ্যই নিকটস্থ একজন রেজিষ্টার্ড প্রাণি চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। হৃষ্টপুষ্টকরণের উদ্দেশ্য মহিষ নির্বাচন পূর্বক সংগ্রহের পর পরই পালের সব মহিষকে একসাথে কৃমিমুক্ত করা উচিত। এছাড়াও মহিষকে খামারের সংগ্রহের ১০-১৪ দিন পর সুস্থ্যতা সাপেক্ষে ক্ষুরারোগ (এফএমডি), তরকা (এনথ্রাক্স), বাদলা ইত্যাদি রোগের টিকা প্রদান করা যেতে পারে। মহিষকে একটি সংক্ষিপ্ত সময়কালের জন্য (৬০-১০৫ দিন) হৃষ্টপুষ্টকরণ করা হলে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্ষুরারোগের টিকা প্রদান করা যেতে পারে। হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য মহিষকে প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান এবং টিকা প্রাপ্তির বিষয়টি জানতে খামারিদেরকে অবশ্যই স্থানীয় একজন রেজিষ্টার্ড প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। আশঁজাতীয় গো-খাদ্যের সহজলভ্যতা বা প্রাপ্যতার ভিত্তিতে মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণের বিভিন্ন ধরণের গো-খাদ্য প্রযুক্তির বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো-

ক) ঘাস/সাইলেজ ভিত্তিক গো-খাদ্য প্রযুক্তি: আঁশজাতীয় খাদ্য ও দানাদার মিশ্রণ হৃষ্টপুষ্টকরণে বহুল ব্যবহৃত প্রধান দু'টি অনুসঙ্গ। মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণে আশঁজাতীয় খাদ্য হিসেবে বিভিন্ন ধরণের সবুজ ঘাস যেমন নেপিয়ার, ভুট্টাঘাস বা এদের সাইলেজ ব্যবহার করা যেতে পারে। গবেষণায় ব্যবহৃত নেপিয়ার এবং ভুট্টাঘাসের সাইলেজের পুষ্টিমান এবং উৎপাদন খরচ সারণী-১ এ দেখানো হলো। ঘাস/সাইলেজের প্রকারভেদ, উৎপাদন এবং বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানে পার্থক্যহেতু মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণে মাংসের উৎপাদন ব্যয় ও দক্ষতা কিছুটা কম বা বেশী হয়ে থাকে। পাশাপাশি দানাদার খাদ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের মূল্য মাংসের বাজার মূল্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। গবেষণায় ব্যবহৃত দানাদার খাদ্য মিশ্রণ তৈরিকরণে ব্যবহৃত খাদ্য উপাদান, উহাদের পরিমাণ (শতাংশ), দানাদার খাদ্য মিশ্রণের পুষ্টিমান এবং উৎপাদন খরচ সারনী-২ এ দেখানো হলো। সাধারনত স্বল্প সময়ে লাভজনক ও মূল্যসাশ্রয়ী মাংস উৎপাদনের জন্য হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রমে মহিষকে দৈনিক মোট খাদ্য চাহিদার ৬০ঃ ৪০ হারে সবুজ ঘাস/সাইলেজ ও দানাদার মিশ্রণ (ঘাস ও দানাদার মিশ্রণের শুষ্কবস্তুর ভিত্তিতে) সরবরাহ করা উত্তম। নেপিয়ার ঘাস/ সাইলেজ ভিত্তিক হৃষ্টপুষ্টকরণ ব্যবস্থাপনায় মহিষকে প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য প্রতি দিন প্রায় ২.৩০-২.৫০ কেজি শুষ্ক খাদ্য (ঘাস এবং দানাদার মিশ্রণ সহযোগে) প্রদান করা দরকার। এ হিসেবে মহিষকে প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য প্রতিদিন ৭.০-৮.০ কেজি নেপিয়ার ঘাস/সাইলেজ এবং ১.১০-১.১৫ কেজি সারনী-১ এ উল্লেখিত দানাদার খাদ্য মিশ্রণ সরবরাহ করতে হবে। এছাড়াও ভূট্টা ঘাস/সাইলেজ ভিত্তিক ভিত্তিক হৃষ্টপুষ্টকরণ ব্যবস্থাপনায় মহিষকে প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য প্রতি দিন প্রায় ২.৬০-২.৭৫ কেজি শুষ্ক খাদ্য (ঘাস এবং দানাদার মিশ্রণ সহযোগে) প্রদান করা দরকার। এ হিসেবে মহিষকে প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য প্রতিদিন ৭.০-৮.০ কেজি ভুট্টা ঘাস/সাইলেজ এবং ১.১৫-১.২০ কেজি সারনী-১ এ উল্লেখিত দানাদার খাদ্য মিশ্রণ সরবরাহ করতে হবে। উল্লেখ্য, স্বল্প সময়কালীন সময়ে (৬০ দিন) হৃষ্টপুষ্টকরণে খামারিরা ৫০ঃ৫০ অনুপাতে ঘাস ও দানাদার খাদ্য মিশ্রণও ব্যবহার করতে পারেন।

নেপিয়ারঘাস

নেপিয়ারঘাস হার্ভেস্টিং

নেপিয়ারঘাস চপিং

নেপিয়ারঘাস পরিবহন

সাইলো পিট

সাইলো পিটে ঘাস ভর্তি করা

সাইলো পিটে ঘাস ভর্তি করা

সাইলো পিট পলিথিন দিয়ে ঢাকা

নেপিয়ার সাইলেজ

চিত্র ১ঃ নেপিয়ার সাইলেজ তৈরির বিভিন্ন ধাপ

খ) খড় ভিত্তিক (ইউএমএস) খাদ্য প্রযুক্তিঃ খাদ্য সংকট গবাদিপ্রাণী উন্নয়নের একটি অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এদেশে গবাদিপ্রাণীর প্রয়োজনীয় আঁশজাতীয় খাদ্যে চাহিদার প্রায় ৭৫-৮০ শতাংশ পূরণ করে ধানের খড় থেকে। অধিকাংশ খামারি শুধুমাত্র খড় খাইয়ে গরু, মহিষসহ অন্যান্য গবাদিপ্রাণী লালন পালন করে থাকে। খড় একটি নিম্নমানের আঁশযুক্ত বা ছোবরা জাতীয় খাদ্য এবং এতে আমিষের ভাগ যেমন কম তেমনি একে হজম করাও অত্যন্ত কষ্টকর। আমাদের দেশে বিশেষকরে উপকূলীয় এলাকায় মহিষকে চড়ানোর পাশাপাশি কোন কোন সময় শুধুমাত্র খড় খাওয়ানো হয়। এতে করে মহিষ থেকে আশানুরূপ দুধ বা মাংস উৎপাদন পাওয়া যায় না। খড়কে ইউরিয়া দিয়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করা হলে এর খাদ্যমান প্রায় দিগুণ বাড়ানো সম্ভব। এ প্রক্রিয়ায় খড় খাওয়ালে মহিষ সমপরিমাণের সাধারণ খড় অপেক্ষা অধিক পুষ্টি পেয়ে থাকে। এবং মহিষের খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাংসের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

ইউএমএস তৈরিঃ ইউএমএস হলো একটি মিশ্রিত খাবার। খাদ্যটিতে খড়, ইউরিয়া ও চিঁটাগুড় বা মোলাসেস এর অনুপাত থাকে যথাক্রমে ৮২ ঃ ৩ ঃ ১৫। অর্থাৎ ১০০ ভাগ ইউএমএস এর শুষ্ক পদার্থের মধ্যে ৮২ ভাগ খড়, ৩ ভাগ ইউরিয়া এবং ১৫ ভাগ মোলাসেস থাকতে হবে। সে হিসাব মতে ১০০ কেজি শুকনো খড়, ঘনত্বের উপর নির্ভর করে ২১-২৪ কেজি মোলাসেস বা চিঁটাগুড় এবং ৩ কেজি ইউরিয়া মিশালেই চলবে। ধানের খড় কাচিঁ দিয়ে ছোট করে কেটে বা চপিং মেশিনের সাহায্যে কেটে খাওয়ানো ভালো তবে আস্তখড় দিয়েও ইউএমএস তৈরি করা যাবে। প্রথমে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়ার পরিমাণ মেপে নিতে হবে। এরপর প্রতি ১০০ কেজি খড়ের জন্য ৫০-৬০ কেজি পরিমাণ পানি মেপে নিতে হবে। মোলাসেস ও ইউরিয়া সার ওজনের পর প্রয়োজনীয় পরিমাণ পরিস্কার পানিতে ভালোভাবে মিশাতে হবে। এবার শুকনো খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে ইউরিয়া-মোলাসেস দ্রবণটি আস্তে আস্তে একটি ঝড়ণা ব্যবহার করে বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে

হবে, এবং সাথে সাথে খড়কে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে খড় দ্রবণ চুষে নেয়। এভাবে স্তরে স্তরে খড় সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণ সমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ওজন করা খড়ের সাথে পুরো দ্রবণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিলেই ইউএমএস মহিষকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। এভাবে তৈরি ইউরিয়া মোলাসেস খড় (ইউএমএস) সঙ্গে সঙ্গে মহিষকে খওয়ানো যায় অথবা একবারে ২/৩ দিনের তৈরি খড় সংরক্ষন করে আস্তে আস্তে খাওয়ানো যায়। এক্ষেত্রে খড়কে অবশ্যই একটি পলিথিনে ব্যাগে রেখে বা পলিথিন কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। তবে কোন অবস্থাতেই খড় বানিয়ে তিন দিনের বেশী রাখা যাবে না। কারণ তাতে খড়ে ইউরিয়া এবং মোলাসেস উভয়ের পরিমাণই কমতে থাকবে।

চিত্র ২ঃ ইউএমএস তৈরির বিভিন্ন ধাপ

ইউএমএস এর পুষ্টিমান ও উৎপাদন খরচ: বিএলআরআই এর খামার গবেষণাসহ মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় ব্যবহৃত ইউএমএস বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এতে শুস্কবস্তু (Dry matter): ৫৬.২৩-৫৭.৮০%, জৈব বস্তু (Organic matter): ৮২.৪০-৮৫.৫০%, আমিষ (Crude protein): ৯.১১-১০.৩১%, খনিজ পদার্থ (Mineral): ১৪.৫০-১৭.৬০%, এডিএফ: ৪২.৮২-৪৫.১৫% এবং এনডিএফ: ৬৭.২৪-৬৭.৬৯% বিদ্যমান। এছাড়াও খাদ্যটির প্রতিকেজি শুস্ক বস্তুতে ২০.০০-২০.৬৪ মেগাজুল এ্যানার্জি এবং প্রতি কেজির উৎপাদন খরচ (শুস্ক বস্তুর ভিত্তিতে) পড়ে ৯.৮০-১১.৬০ টাকা।

গবেষণা লব্ধ ফলাফল: খড় অর্থাৎ ইউএমএস ভিত্তিক মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রমে মহিষকে দৈনিক মোট খাদ্য চাহিদার ৬০ঃ৪০ হারে যথাক্রমে ইউএমএস ও দানাদার মিশ্রণ (শুষ্ক বস্তুর ভিত্তিতে) সরবরাহ করা ভালো। এধরণের হৃষ্টপুষ্টকরণ ব্যবস্থাপনায় মহিষকে প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য প্রতি দিন ২.৫০-২.৬৫ কেজি শুষ্ক খাদ্য (ইউএমএস এবং দানাদার মিশ্রণ সহযোগে) প্রদান করা দরকার। এ হিসেবে মহিষকে প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য প্রতিদিন ২.৭৫-৩.০০ কেজি পরিমাণ ফ্রেশ ইউএমএস এবং ১.১০-১.১৫ কেজি পরিমাণ দানাদার খাদ্য মিশ্রণ (সারনী -১ এ বর্ণিত খাদ্য মিশ্রণ) সরবরাহ করতে হবে। বিএলআরআই এর খামার গবেষণাসহ মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় দেখা গেছে বাড়ন্ত ষাঁড়কে (২-৩ বছর বয়সী ষাঁড়; গড় ওজন ৩০০ কেজি) উল্লেখিত পরিমাণ ইউএমএস এবং দানাদার মিশ্রণ সরবরাহ করলে দৈনিক ৯০০ গ্রাম থেকে ১০০০ গ্রাম হারে ওজন বৃদ্ধি (Daily live weight gain) পায়। মহিষ অত্যন্ত দক্ষতার সহিত খাদ্য ও পুষ্টি হজম করতে পারে এবং খাদ্যের মাধ্যমে গৃহীত পুষ্টিকে কাজে লাগিয়ে অতি দ্রুততার সহিত মাংস উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। গৃহীত খাদ্যের ধরণ, গুনাগুন ও পুষ্টির উপর ভিত্তি করে মহিষের খাদ্য পরিপাচ্যতা (Nutrient digestibility), খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা (Feed conversion efficiency; FCR) এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধির (Live weight gain) হার নির্ভর করবে। মহিষ কর্তৃক গৃহীত ইউএমএস ভিত্তিক খাদ্যের ড্রাইমেটার ও প্রোটিনের পরিপাচ্যতা যথাক্রমে ৬৪.০ এবং ৬৭ শতাংশ। এধরণের খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণে ৯০ দিন হৃষ্টপুষ্টকরণে মহিষের খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা (FCR) ৮.৩০-৮.৫০ হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রতি এক (১) কেজি দৈহিক ওজন বৃদ্ধির জন্য ৮.৩০-৮.৫০ কেজি পরিমাণ খাদ্যের (মোট শুষ্ক খাদ্য) প্রয়োজন হয়। খড় সহ অন্যান্য দানাদার খাদ্য উপাদানের বর্তমান বাজার মূল্য বিবেচনায় মহিষের উল্লেখিত খাদ্যরূপান্তর দক্ষতা খামারিদের জন্য লাভজনক।

গ) গাঁজনকৃত ভুট্টা মিশ্রণ (ফার্মেন্টেড কর্ণ মিক্সার) ভিত্তিক খাদ্য প্রযুক্তি: ক্ষুদ্র খামারি থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক খামারিগণ এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাশ্রয়ীমূল্যে মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ করতে পারেন। যে সকল অঞ্চলে দানাভুট্টা উৎপাদনের উদ্দেশ্য বাণিজ্যিকভাবে ভুট্টা চাষাবাদ করা হয় সেই সকল অঞ্চলের খামারিরা বিশেষকরে এ খাদ্য প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ করে লাভবান হতে পারেন। 'ফার্মেন্টেড কর্ণ

মিক্সার’ হলো একধরণের গাঁজনকৃত খাদ্য যা তৈরিতে ভুট্টাদানা, খড়, চিঁটাগুড়, ইউরিয়া এবং পানির প্রয়োজন হয়। হৃষ্টপুষ্টকরণে মহিষকে ‘ফার্মেন্টেড কর্ণ মিক্সার’ এর সাথে সম্পূরক হিসেবে সামান্য পরিমাণে ‘প্রোটিন মিশ্রণ’ সরবরাহ করতে হয়।

ফার্মেন্টেড কর্ণ মিক্সার তৈরির পদ্ধতি ও উপাদান সমূহের অনুপাতঃ ফার্মেন্টেড কর্ণ মিক্সার তৈরির জন্য ভুট্টাদানাকে গ্রাইন্ডার মেশিনের সাহায্যে গুড়োঁ করে নিতে হয়। খড়সমূহ চপারমেশিনের সাহায্যে ছোট ছোট (২-৪ সেমি) টুকরো করে কেটে নিতে হবে। ফার্মেন্টেড কর্ণ মিক্সার তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহের অনুপাত হবে যথাক্রমে খড়-৫০ কেজি, ভুট্টার গুঁড়ো-১০০ কেজি, ইউরিয়া-৩ কেজি, মোলাসেস বা চিঁটাগুড়-১০ কেজি, পানি-১০০ কেজি। মিক্সারটি তৈরির পূর্বে উল্লেখিত প্রতিটি উপাদান মেপে নিতে হবে। উল্লেখিত অনুপাত ব্যবহার করে আমাদের ইচ্ছা মাফিক যে কোন পরিমাণ ফার্মেন্টেড কর্ণ মিক্সার তৈরি করতে পারি। প্রথমে একটি ড্রাম বা বালতিতে পানি ওজন করে এর সাথে ইউরিয়া ভালোভাবে মিশাতে হবে। অতপর এই মিশ্রণে চিঁটাগুড় মিশিয়ে নিতে হবে। খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে এর উপর ভুট্টার গুঁড়োও সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া-মোলাসেস দ্রবণটি আস্তে আস্তে একটি ঝড়ণা ব্যবহার করে বা হাত দিয়ে খড়সহ ভুট্টার গুঁড়োর উপর ছিটিয়ে দিতে হবে, এবং সাথে সাথে খড়সহ ভুট্টার গুঁড়ো উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে দ্রবণ চুষে নেয়। এভাবে স্তরে স্তরে খড় ও ভুট্টার গুঁড়ো সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণ সমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ওজন করা খড় এবং ভুট্টার গুঁড়োর সাথে পুরো দ্রবণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এই মিশ্রণ প্লাস্টিকের ড্রামে অথবা ইটের তৈরি পাকা চৌবাচ্চা বা গর্তে পরিপূর্ণ করতে হবে। অবশ্যই মিশ্রণটি ড্রাম বা গর্তে চেপে চেপে পূর্ণ করতে হবে যাতে ড্রাম বা গর্তের কোন জায়গা ফাকা না থাকে। এবার ড্রামের মুখ ভাল ভাবে লাগিয়ে অথবা গর্তের উপর পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে বাহিরের বাতাস ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। এভাবে মিশ্রণটি ড্রাম বা গর্তের ভিতর ২১ দিন রাখতে হবে। এই ২১ দিনের মধ্যে মিশ্রনটির গাঁজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যাবে। অর্থাৎ ২১ দিন পর থেকে মিশ্রণটি অর্থাৎ ফার্মেন্টেড কর্ণ মিক্সার মহিষকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়।

ভুট্টার গুঁড়া/ভাংগা (১০০ কেজি)

খড় (৫০ কেজি)

ইউরিয়া (৩ কেজি)

চিটাগুঁড় (১০ কেজি)

পানি (১০০ কেজি)

খড় বিছানো ও ভুট্টার গুঁড়া ছিছানো

চিটাগুঁড়, ইউরিয়া ও পানির মিশ্রণ ছিটানো

ভালোভাবে মিশানো

ড্রামে ভর্তিকরণ

ড্রামে চাপিয়ে চাপিয়ে ভর্তিকরণ

ড্রামের মুখ লাগানো

ড্রাম কমপক্ষে ২১ দিন সংরক্ষণ

চিত্র ৩: ফার্মেন্টেড কর্ণ মিক্সার তৈরির বিভিন্ন ধাপ

ফার্মেন্টেড কর্ণ মিক্সার এর পুষ্টিমান ও উৎপাদন খরচ: ফার্মেন্টেড কর্ণ মিক্সার এ শুস্কবস্তু (Dry matter) থাকে গড়ে-৬১.৭৯%, জৈব বস্তু (Organic matter)- ৯১.৫১%, আমিষ (Crude protein)- ১৫.৯১%, খনিজ পদার্থ (Mineral)- ৮.৪৯%, এডিএফ-১৫.১৮% এবং এনডিএফ-৪৯.৫৪%। এছাড়াও খাদ্যটির প্রতিকেজি শুস্কবস্তুতে ২৪.১৩ মেগাজুল এ্যানার্জি এবং প্রতিকেজির উৎপাদন খরচ (শুস্কবস্তুর ভিত্তিতে) পড়ে ১৪.৭১ টাকা।

প্রোটিন মিশ্রণ বা প্রোটিন মিক্সার তৈরিঃ প্রোটিন মিশ্রণ (Protein mixture) তৈরির জন্য সাধারনত সয়াবিন মিল, ভুট্টার গুঁড়ো, ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট (DCP), পাথর চুন (Lime stone) এবং লবণ এর প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে, ৫০% সয়াবিন, ৩৫% ভুট্টার গুঁড়ো, ৫% ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট, ৫% পাথর চুন এবং ৫% লবণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।

প্রোটিন মিক্সার এর পুষ্টিমান ও উৎপাদন খরচ: এধরণের প্রোটিন মিক্সার এ শুস্কবস্তু (Dry matter) থাকে গড়ে-৮৯.১৮%, জৈব বস্তু (Organic matter)- ৮৩.৩৪%, আমিষ (Crude protein)- ২২.৯২%, খনিজ পদার্থ (Mineral)- ১৬.৬৬%, এডিএফ-১০.৬৫% এবং এনডিএফ-৩০.১৮%। এছাড়াও খাদ্যটির প্রতিকেজি শুস্কবস্তুতে ২৪.২৬ মেগাজুল এ্যানার্জি এবং প্রতিকেজির উৎপাদন খরচ (শুস্কবস্তুর ভিত্তিতে) পড়ে ৩৩.৪২ টাকা।

গবেষণা লব্ধ ফলাফল: এধরণের হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রমে মহিষকে প্রতিদিন তাঁর দৈহিক ওজনের ১.০০ শতাংশ হারে ফার্মেন্টেড কর্ণ মিক্সার এবং ০.২৫ শতাংশ হারে প্রোটিন মিক্সার এর পাশাপাশি ৬-৭ শতাংশ হারে সবুজ ঘাস বা সাইলেজ সরবরাহ করতে হয় (ফ্রেশ বেসিস)। অর্থ্যাৎ প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য ১.০০ কেজি ফ্রেশ ফার্মেন্টেড কর্ণ মিক্সার এবং ০.২৫ কেজি পরিমাণ প্রোটিন মিক্সার প্রদানের পাশাপাশি মহিষকে ৬-৭ কেজি পরিমাণ সবুজ ঘাস বা সাইলেজ সরবরাহ করতে হয়। বিএলআরআই এর খামার গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে, এ ধরণের খাদ্য ব্যবস্থাপনায় হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য মহিষকে প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য প্রতি দিন ১.৯-২.০ কেজি শুষ্ক খাদ্য বা ড্রাইমেটার (ফার্মেন্টেড কর্ণ মিক্সার, প্রোটিন মিক্সার এবং ঘাস সহযোগে) প্রদান করা দরকার। দুই থেকে তিন বছর বয়সী বাড়ন্ত একটি মহিষ ষাঁড়কে (গড় ওজন ৩০০ কেজি) উল্লেখিত পরিমাণ ফার্মেন্টেড কর্ণ মিক্সার, প্রোটিন মিক্সার এবং সবুজ ঘাস বা সাইলেজ সরবরাহ করলে দৈনিক ৮০০ গ্রাম থেকে ৯০০ গ্রাম হারে ওজন বৃদ্ধি (Daily live weight gain) পায়। মহিষ অত্যন্ত দক্ষতার সহিত খাদ্য ও পুষ্টি হজম করতে পারে এবং খাদ্যের মাধ্যমে গৃহীত পুষ্টিকে কাজে লাগিয়ে অতি দ্রুততার সহিত মাংস উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। মহিষ কর্তৃক গৃহীত ফার্মেন্টেড কর্ণ মিক্সার ভিত্তিক খাদ্যের ড্রাইমেটার ও প্রোটিনের পরিপাচ্যতা যথাক্রমে ৬৫.০ এবং ৬৮ শতাংশ। এধরণের খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণে ৯০ দিন হৃষ্টপুষ্টকরণে মহিষের খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা (FCR) ৭.০০-৭.২০ হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রতি কেজি দৈহিক ওজন বৃদ্ধির জন্য ৭.০০-৭.২০ কেজি পরিমাণ খাদ্যের (মোট শুষ্ক খাদ্য) প্রয়োজন হয়। ফার্মেন্টেড কর্ণ মিক্সার, প্রোটিন মিক্সার তৈরির উপাদানসহ সবুজ ঘাস/সাইলেজের বর্তমান বাজার মূল্য বিবেচনায় মহিষের উল্লেখিত খাদ্যরূপান্তর দক্ষতা খামারিদের জন্য লাভজনক।

চিত্র ৪: হৃষ্টপুষ্টকৃত দেশী মহিষ

মহিষের মাংসের গুনাগুণ: গরুর মাংসের তুলনায় মহিষের মাংসে চর্বি ও কলেস্টেরলের পরিমাণ কম, ভিটামিন বি-১২, আয়রন, জিন্‌ক, এ্যামাইনো এসিড ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের পরিমাণ বেশী থাকে। গরুর মাংসে চর্বির পরিমাণ যেখানে ১.৫৮ শতাংশ সেখানে মহিষের মাংসে চর্বির পরিমাণ মাত্র ০.৪৮ শতাংশ (সারণী-২)।

সারণী-২ঃ মহিষের মাংসের পুষ্টি উপাদান, পিএইচ, ড্রিপ এবং কুক লস

নিয়ামক সমূহ							
% পানি	% শুষ্ক বস্তু	% প্রোটিন	% চর্বি	% মোট খনিজ	মাংসের পিএইচ	% ড্রিপ লস	% কুক লস
৭৩.৮৯	২৬.১১	১৯.০৪	০.৪৮	৪.২৯	৬.০৭	১১.১১	১৮.৭২

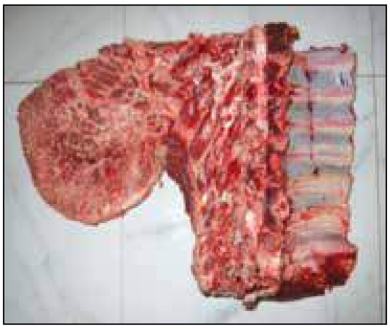

চিত্র: মহিষের মাংসের বিভিন্ন কাট

অর্থনৈতিক উপযোগীতাঃ বর্তমান বাজার দরে মহিষের প্রতি কেজি দৈহিক ওজন বৃদ্ধির জন্য ঘাসের সাইলেজ বাবদ খরচ ২৪.০-২৮.০ টাকা, দানাদার খাদ্য মিশ্রণ বাবদ খরচ ৮৩.০- ৯৯.০ টাকা এবং খাদ্য অপচয় বাবদ খরচ হয় ৩.০- ৪.০ টাকা অর্থাৎ প্রতি কেজি দৈহিক ওজন বৃদ্ধির জন্য মহিষের মোট খাদ্য বাবদ খরচ পড়বে ১১৪.০০-১২৭.০০ টাকা। খাদ্যসহ অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে, মাংসের বর্তমান বাজার মূল্যর উপর ভিত্তি করে এই পদ্ধতিতে ১০৫ দিন সময় পর্যন্ত একটি মহিষ হতে খামারি অনায়াসেই কমপক্ষে ১৩,০০০.০০ হতে ১৫,০০০.০০ টাকা নীট মুনাফা অর্জন করতে পারেন।

উপসংহারঃ উদ্ভাবিত মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ খাদ্য প্রযুক্তিটি ব্যবহারে দেশে- ১) মহিষ পালন অর্থনৈতিকভাবে টেকসই হবে ২) নিরাপদ খাদ্য (মাংস) উৎপাদন/বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে ৩) উপকূলীয় অঞ্চল, হাওড়-বাওড় সহ মহিষ পালনকারী সকল অঞ্চলের খামারিরা আর্থিকভাবে লাভবান হবে ৪) কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং ৫) বায়ুদূষণ হ্রাস করবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. বিপ্লব কুমার রায়, ড. খান শহীদুল হক, ড. নাথু রাম সরকার, ড. নাসরিন সুলতানা এবং নাজমুল হুদা

মহিষের ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশন প্রযুক্তি

ভূমিকা

জাতীয় দুধ ও মাংস উৎপাদনে মহিষের অবদান হচ্ছে যথাক্রমে শতকরা প্রায় ৫.০ এবং ০.৯৪ শতাংশ। যেখানে ভারতের মোট দুধের শতকরা ৫৬.০ ভাগ এবং মাংসের শতকরা ২৩.৩৩ ভাগ মহিষ যোগান দিয়ে থাকে। জাতীত দুধ ও মাংস উৎপাদনে মহিষের অবদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিক উৎপাদনশীল মহিষের জাত উদ্ভাবনের নিমিত্ত দেশে প্রথমবারের মত কৃত্রিম প্রজনন শুরু করা হয়েছে। কিন্তু মহিষের গরম হওয়া বা হিটে আসার লক্ষণগুলো দুর্বল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরব হিট প্রদর্শন করায় খামারি পর্যায়ে মহিষে কৃত্রিম প্রজননের হার অনেক কম। এমতাবস্থায়, বিএলআরআই মহিষের কৃত্রিম প্রজননের হার বাড়ানোর লক্ষ্যে কাংখিত সময়ে কৃত্রিমভাবে অনেকগুলো মহিষকে হিটে আনার লক্ষ্যে ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশন প্রযুক্তির উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করেছে। সাধারনভাবে প্রজননক্ষম বকনা/গাভী মহিষকে হরমোন প্রয়োগ করে কৃত্রিমভাবে হিটে আনার প্রক্রিয়াকে ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশন (Estrus synchronization) বলা হয়। ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশন প্রযুক্তিটি ছোট, বড় সব ধরণের খামারি এবং সকল বয়সের (বকনা/গাভী) মহিষে ব্যবহারযোগ্য।

মহিষের ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশন প্রযুক্তিটির উদ্দেশ্য

১. একই সঙ্গে অনেকগুলো মহিষকে হিটে এনে উন্নত জাতের মহিষের সিমেন দ্বারা প্রজনন করিয়ে বছরের কাংখিত সময়ে অনেকগুলো অধিক উৎপাদনশীল মহিষের বাছুর পাওয়া।
২. বছরের কাংখিত সময়ে অনেকগুলো মহিষকে হিটে আনা যায়।
৩. ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশনে হরমোন ব্যবহার করা হলেও পরবর্তীতে ঋতুচক্রে মহিষ প্রাকৃতিকভাবে হিটে আসে।

ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশন পদ্ধতি

বকনা/গাভী মহিষ বাছাই

প্রজননক্ষম রোগমুক্ত বকনা অথবা গাভী মহিষ বাছাই করা হয়। বকনাগুলোর দৈহিক ওজন ২৫০-৩৫০ কেজি এবং গাভীর দৈহিক ওজন ৩০০-৩৫০ কেজি এবং বডি কন্ডিশন স্কোর ২.৫-৩.৫। এছাড়াও, রেকটাল পালপেশনের মাধ্যমে অঙ্গের স্বাভাবিক গঠন নিশ্চিত হতে হবে।

ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশনের জন্য হরমোন প্রয়োগ

বর্তমানে মহিষে বিভিন্ন ধরণের ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশন পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। খামারের ব্যবস্থাপনা স্বক্ষমতা এবং খামারির চাহিদার উপর ভিত্তি করে ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশনের জন্য প্রোজেস্ট্রন অথবা প্রোস্টাগ্লান্ডিন এফ২আলফা (পিজিএফ২α) এককভাবে অথবা অন্যান্য হরমোন যেমন-ইস্ট্রোজেন, গোনাডোট্রফিন রিলেজিং হরমোন, ইত্যাদি এর সাথে সমন্বয় করে ব্যবহার করা হয়। ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশনের জন্য বিএলআরআই মহিষ গবেষণা খামারের দেশী মহিষের উপর প্রাথমিকভাবে ৪টি প্রটোকল প্রয়োগ করা হয় (ছবি-১)। প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি প্রটোকলের জন্য ৩টি করে গাভী মহিষ বাছাই করা হয়। খাত্রী পর্যায়ে ব্যবহারের সম্ভাব্যতা বেশী থাকায় ৩ নম্বর প্রটোকলটিকে পরবর্তীতে আরও ১৫টি গাভী মহিষে প্রয়োগ করা হয়। ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশনের ব্যবহৃত হরমোন সমূহের বিবরণ সারণি-১ এবং ছবি-২ তে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রটোকল-১

বকনা/গাভী মহিষের জরায়ুতে সিডর প্রতিস্থাপন করার পর ১ম ডোজ জিএনআরএইচ প্রয়োগ করা হয় (দিন-০)। ৮ দিন পর জরায়ু থেকে সিডর বের করা হয় (৭০ দিন) এবং পিজিএফ২α প্রয়োগ করা হয়। মহিষগুলো ৮-১২ দিনের মধ্যেই হিটে আসে এবং হিটে আসা নিশ্চিত হয়ে কৃত্রিম প্রজনন করা হয় (ছবি-৩)। কৃত্রিম প্রজননের পরপর ২য় ডোজ জিএনআরএইচ প্রয়োগ করা হয়।

সারণি-১ ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশনে ব্যবহৃত হরমোন সমূহের বিবরণ ও প্রয়োগ বিধি

হরমোনের নাম	সংক্ষিপ্ত নাম	বাণিজ্যিক নাম	ডোজ (মিলিলিটার)	প্রয়োগ পদ্ধতি
গোনাডেট্রপিন রিলিজিং হরমোন	জিএনআরএইচ	ওভুরেলিন/ফারাটাজিল	২.০	মাংসপেশীতে প্রয়োগ
পোস্টাগ্লান্ডিনএফ২আলফা	পিজিএফ২α	ওভোপ্রোস্ট/ ইস্ট্রমেট	২.০	মাংসপেশীতে প্রয়োগ
প্রেগন্যান্ট মেয়ার সিরাম গ্রোনাডোট্রোপিন	পিএমএসজি	ফলিগন	২.০	মাংসপেশীতে প্রয়োগ
সিআইডিআর ইন্ট্রাভ্যাজাইন্যাল প্রোজেস্টেরন রিলিজিং ডিভাইস	প্রোজেস্টেরন	সিডর	২.০	জরায়ুতে স্থাপন

প্রটোকল-২

এই পদ্ধতিটি ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশনে ব্যবহৃত প্রটোকল-১ এর প্রায় অনুরূপ। শুধুমাত্র সিডর স্থাপনের ৫ম দিনে এক ডোজ বাড়তি পিএমএসজি প্রয়োগ করা হয়।

প্রটোকল-৩

এই পদ্ধতিতে যেসকল বকনা/গাভী মহিষের ডিম্বাশয়ে ০.৫ সেমি বা বড় আকারের করপাস লুটিয়াম থাকে তাদেরকে পিজিএফ২α প্রয়োগ করা হয়। পিজিএফ২α প্রয়োগের ৭২-৯৬ ঘণ্টার মধ্যে মহিষ হিটে আসে এবং হিটে আসা নিশ্চিত হওয়ার পর কৃত্রিম প্রজনন করা হয়। এই পদ্ধতিতে ২ বার কৃত্রিম প্রজনন করালে গর্ভধারণের হার অনেক বেড়ে যায়।

প্রটোকল-৪

বকনা/গাভী মহিষের প্রজনন চক্রের যে কোন দিন জিএনআরএইচ প্রয়োগ করা হয়। জিএনআরএইচ প্রয়োগের ৭ম দিন পর মহিষ পুনরায় হিটে আসে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং কৃত্রিম প্রজননের ৬০ দিন পর রেকটাল পালপেশন করে গর্ভধারণ নিশ্চিত করা হয়।

ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশনে ব্যবহৃত ৪টি প্রটোকলই ১০০% ক্ষেত্রে মহিষকে হিটে আনতে সক্ষম। তবে প্রটোকল ভেদে কৃত্রিম প্রজননে গর্ভধারণের হার ৩৩.৩৩ থেকে ৩৮.৮৯% (সারণি-২)। তৃতীয় প্রটোকলটিতে গর্ভধারণের হার তুলনা মূলকভাবে বেশী। মহিষ প্রতি ব্যয় এবং প্রয়োজনীয় সময়ের বিবেচনায় ৩য় প্রটোকলটিকে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় খামারি পর্যায়ে ১০টি মহিষে প্রয়োগ করা হয় (সারণি-২)। উল্লেখ্য যে, ১০টি মহিষ হিটে আসে এবং কৃত্রিম প্রজননের ফলে ৮টি মহিষ গর্ভধারণ করে। অর্থাৎ গর্ভধারণের হার ছিল ৮০%। খামারি পর্যায়ে মহিষে ২ বার করে কৃত্রিম প্রজনন করায় গর্ভধারণের হার বেশী ছিল।

সারণি-২ মহিষের ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশন সংক্রান্ত অন-স্টেশন গবেষণা ফলাফল

প্রটোকল	গাভী মহিষের সংখ্যা	গরম হওয়ার হার (%)	গর্ভধারণ হার (%)	গাভী প্রতি খরচ (টাকা)	মোট সময় (দিন)
১	৩	১০০	৩৩.৩৩	২৭৬৬.০০	১৩
২	৩	১০০	৩৩.৩৩	২৭৩৭.০০	১৩
৩	১৮	১০০	৩৮.৮৯	৪৩২.০০	৪
৪	৩	১০০	৩৩.৩৩	৫৭৬.০০	১০

আর্থ-সামাজিক প্রভাব:

ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশনের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন করার ফলে ব্যয় কিছুটা বাড়লেও এক বছরে কাংখিত সময়ে অধিক উৎপাদনশীল অনেকগুলো বাছুর উৎপাদনের কারণে বাছুর প্রতিপালন ব্যয় কম এবং খামারিগণ দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।

পরিবেশের উপর প্রভাব:

ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশনে ব্যবহৃত হরমোনগুলো গাভীর শরীরবৃত্তীয় কার্যক্রমের অংশ বিশেষ। ফলে, বাহ্যিকভাবে এসকল হরমোন প্রয়োগ করলে প্রাণীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা অনেক কম। তাই প্রযুক্তিটি ব্যবহারে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই। তবে সঠিক মাত্রায় এবং সঠিক সময়ে হরমোন ব্যবহার করতে না পারলে পরবর্তীতে মহিষের স্বাভাবিক প্রজনন চক্র বাধাগ্রস্থ হতে পারে।

উপসংহার:

খামারি পর্যায়ে মহিষে ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশনের মাধ্যমে কাংখিত সময়ে একসংগে অনেকগুলো বেশী উৎপাদনশীল বাছুর উৎপাদনের জন্য তিন নম্বর প্রটোকলটি ব্যবহার করা যেতে

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. টি এন নাহার, ড. গৌতম কুমার দেব, মোছাঃ ফারহানা আফরোজ এবং ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন

প্রজননের জন্য মহিষ ষাঁড় নির্বাচন ও পালন ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

গরু, ছাগলের মত মহিষও বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় গৃহপালিত প্রাণী। এ দেশের সকল এলাকায় কম-বেশী মহিষ পাওয়া যায়। সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের মোট মহিষের প্রায় ৪৫% রাজশাহী, রংপুর এবং খুলনা অঞ্চলে; ৩৯.৯% উপকূলীয় এলাকায়; ১১.৮% জলাভূমি এলাকায় এবং ৩.৩% পাহাড়ী এলাকায় রয়েছে। গৃহপালিত প্রাণীদের লালন-পালনের প্রধান অন্তরায় রোগবালাই; বিশেষ করে, নবউদ্ভূত ব্যাধি-যা দুর্বল শারীরিক অবস্থার জন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে না। মহিষের বেলায় সুঠাম দৈহিক গঠন ও শারীরিক স্বক্ষমতার জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীগুলির চেয়ে বেশী। মহিষের মৃত্যুহারও কম। মহিষের মাংস ও দুধে কোলেস্টরালের পরিমাণ কম থাকে; তাই, সকল বয়সের মানুষের খাদ্য তালিকায় এটি যুক্ত হওয়া আবশ্যক। ভারবাহী প্রাণী হিসেবে মহিষ খ্যাত হওয়ায় এর নানাবিধ ব্যবহারও রয়েছে। গৃহপালিত প্রাণী লালন-পালনের ক্ষেত্রে খাদ্য সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহিষের ক্ষেত্রে পালনকারীদের একটি বিশেষ সুবিধা রয়েছে, তাহলো, মহিষ উচ্চ আঁশযুক্ত খাবার সহজে হজম করতে পারে; তাই, যেকোনো আঁশযুক্ত খাদ্য একে সহজে খেতে দেয়া যায়। ভূ-প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশে মহিষ পালন একটি সহজ ব্যাপার। বর্তমানে বাংলাদেশে ১.৪৪ মিলিয়ন মহিষ রয়েছে। জনসংখ্যার বিবেচনায় এই সংখ্যা খুবই কম; তাই, যত দ্রুত সম্ভব মহিষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা জরুরি। সংখ্যা বৃদ্ধির সহজ উপায় হচ্ছে কৃত্রিম প্রজনন অথবা ইনভিট্রো এম্ব্রায়ো প্রোডাকশন পদ্ধতি অনুসরণ। উভয় প্রোডাকশন পদ্ধতির ক্ষেত্রেই ষাঁড় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি ভালোমানের ষাঁড় নির্বাচনের মধ্য-দিয়েই আমরা ভালো বীজ পেতে পারি। ভালো বীজ দ্বারা উৎপাদিত মহিষ থেকেই আমরা দ্রুত মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারি। এভাবেই আমরা জনসংখ্যাবহুল এ দেশের মানুষের আমিষের চাহিদার ক্ষেত্রে যে ঘাটতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারি এবং অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হতে পারি।

ভালো জাতের ষাঁড় নির্বাচনের সুবিধা :

১. উন্নত মানের বীজ পাওয়া সম্ভব
২. গবাদি প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করা সম্ভব
৩. দুধ উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি করা সম্ভব
৪. সার্ভিস পার কনসেপসান রেট বাড়ানো সম্ভব
৫. প্রজনন জনিত রোগ এর প্রকোপ কমানো সম্ভব
৬. সুস্থ-সবল ও ভালো জাতের বাচ্চা পাওয়া সম্ভব
৭. দুর্বল ও অপ্রয়োজনীয় ষাঁড় বাছুর পূর্ব অবস্থায় বাছাইয়ের মাধ্যমে বাদ দিয়ে অনাকাঙ্খিত ক্ষতির হাত থেকে বাঁচা সম্ভব।

চিত্রঃ ভালো জাতের মহিষ ষাঁড়

ষাঁড় নির্বাচন পদ্ধতি :

সাধারণত চার পদ্ধতিতে ষাঁড় নির্বাচন সম্ভব

১. ষাঁড়ের উৎপাদন দক্ষতা গুণাবলি বিবেচনার মাধ্যমে
২. পূর্ব পুরুষের উৎপাদন দক্ষতা বিবেচনার মাধ্যমে
৩. পরবর্তী প্রজন্মের উৎপাদন দক্ষতা বিবেচনার মাধ্যমে ও
৪. সমন্বিত পদ্ধতির অর্থাৎ, উপরের ৩টি পদ্ধতি একত্রে বিবেচনায় এনে।

ষাঁড়ের উৎপাদন দক্ষতা বিবেচনার মাধ্যমে :

একটি ষাঁড়ের নিজস্ব উৎপাদন দক্ষতার মাধ্যমে সহজেই নির্বাচন করা সম্ভব। ষাঁড়ের উৎপাদন দক্ষতা ভালো হলে সেই ষাঁড়কে নির্বাচন করার পদ্ধতিই হচ্ছে নিজস্ব দক্ষতার মাধ্যমে নির্বাচন পদ্ধতি। ভালো ষাঁড়ের উৎপাদন দক্ষতা পালের অন্যান্য ষাঁড়ের উৎপাদন দক্ষতা থেকে উন্নত হতে হবে। এই পদ্ধতির অসুবিধা হচ্ছে বাহ্যিক গুনাবলি বিবেচনায় নিয়ে আনা হলেও কৌলিক গুনাবলি বা জেনোটাইপ বিবেচনায় আনা সম্ভব হয় না। এতে ষাঁড় নির্বাচনে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পূর্ব পুরুষের উৎপাদন দক্ষতা বিবেচনার মাধ্যমে :

ষাঁড়ের জেনোটাইপের কৌলিক গুনাবলি ৫০% আসে পিতা থেকে এবং ৫০% আসে মাতা থেকে। পূর্ব পুরুষের উৎপাদন দক্ষতা ভালো হলে ষাঁড়ের উৎপাদন দক্ষতাও ভালো হয়। তাই ষাঁড় নির্বাচনে পূর্ব পুরুষের উৎপাদন দক্ষতা একটি গুরত্বপূর্ন বিষয়।

পরবর্তী প্রজন্মের উৎপাদন বিবেচনার মাধ্যমে :

এই পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী ষাঁড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে ষাঁড়ের বীজ থেকে অন্তত পক্ষে ১০০টি বাচ্চা উৎপাদন করে সেই সকল বাচ্চার দক্ষতা যাচাই এর মাধ্যমে ষাঁড় নির্বাচন করা হয়। এই পদ্ধতির সমস্যা হচ্ছে, যখন ষাঁড় নির্বাচন করা হয় তখন বীজ প্রদানকারী ষাঁড় বয়স্ক হয়ে পড়ে। তবে, ক্রায়োপিজারভেশন পদ্ধতির মাধ্যমে ষাঁড়ের বীজ সংরক্ষণ করে এই সমস্যা দূর করা সম্ভব।

সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে :

ওপরের তিনটি পদ্ধতি একসাথে প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা সঠিকভাবে উৎকৃষ্ট মানের ষাঁড় নির্বাচন করতে পারি। নির্বাচন যে ভাবেই হোক না কেন আমাদেরকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো খেয়াল রাখতে হবে।

১. সাধারণ তথ্য (পিতা মাতার ইতিহাস)
২. স্বাস্থ্যগত ও শারীরিক তথ্য
৩. বহিস্থ প্রজনন অঙ্গানু সম্পর্কিত তথ্য
৪. বীজের গুণাগুণ সম্পর্কিত তথ্য।

সাধারণ তথ্য :

১. ষাঁড়ের নম্বর
২. জাত
৩. জন্ম তারিখ
৪. জন্মকালীন ওজন
৫. বীজের পরিমাণ
৬. প্রজননের সমতার সময়
৭. ৬ মাসে কতবার বীজ সংগ্রহ করা হয়েছে
৮. বীজ দিয়ে কতগুলো বাচ্চা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে
৯. সার্ভিস পার কনসেপসন রেট
১০. মাতা-পিতার অবস্থান ও তাদের উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য
১১. রোগ বালাই সম্পর্কিত তথ্য।

শারীরিক তথ্য :

প্রজননের জন্য ষাঁড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নক্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে :

চোখ : উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় হতে হবে। চোখের সমস্যা থাকলে সেই ষাঁড় প্রজননের সমস্যার সম্মুখীন হবে। অন্ধত্ব, কনজাংটিভাইটিস, গ্লুকোমা ইত্যাদি সমস্যা চোখে থাকা চলবে না।

নাক: সাধারণ, উজ্জ্বল ও রিং পড়ার উপযোগী হতে হবে। ন্যাজাল প্যাপিলা, কনজিনেটাল ডিফেক্ট থাকা যাবেনা।

মুখ: মুখে সমস্ত দাঁত উপস্থিত থাকতে হবে। দাঁতের গঠন ঠিক থাকতে হবে যেন, ভালোভাবে খাবার গ্রহণ করতে পারে।

কান: কান স্বাভাবিক হতে হবে যেন কানে ইয়ার ট্যাগ লাগান যায়।

সীথ: সীথটি খুব বেশী লম্বা বা খুব টাইট হবে না। সীথটি হালকা ঢিলেঢালা হবে। এর সাথে কোনো ঝুলন্ত অংশ থাকবে না। এটি পেটের নিচের দিকে পেটের সাথে ভালোভাবে এঁটে থাকবে।

স্বাভাবিক সীথ অস্বাভাবিক সীথ

পা: পা সোজা হতে হবে। পা ভিতরের দিকে বা বাইরের দিকে বাঁকানো হবে না। পায়ের খুর স্বাভাবিক হতে হবে। এটি বাঁকা বা খুব ছোট হবে না।

চলনভঙ্গি: চলনভঙ্গি স্বাভাবিক হতে হবে। ষাঁড়কে সামনে পিছনে হাঁটিয়ে চলনভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

যৌনকামনা (Lidido)

ষাঁড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি ষাঁড় স্বভাবতই অন্য ষাঁড় বা গাভীর উপর লাফ দেয়। কোন ষাঁড় যদি কখনো অন্য ষাঁড়ের উপর লাফ না দেয় তাহলে বুঝতে হবে যে ষাঁড়ের যৌনকামনার অভাব আছে। এই সকল ষাঁড়কে পালের অন্যান্য ষাঁড় থেকে অনেক আগেই আলাদা করে নিতে হবে।

বহিস্থঃ প্রজনন অঙ্গানু সম্পর্কিত তথ্য :

ষাঁড় নির্বাচনের জন্য সাধারণত নিম্নোক্ত তিনটি বহিঃ প্রজনন অঙ্গের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে।

১. অন্ডকোষ (Scrotum)
২. শুক্রাশয় (Testis) ও
৩. পুংজননেন্দ্রিয় (Penis)।

অন্ডকোষ

অন্ডকোষটি ইংগুনাইল রিজিয়নে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। মুররা ষাঁড় মহিষে অন্ডকোষ ডিম্বাকার হয়ে থাকে। অন্ডকোষটি ফুলা আছে কিনা, হারনিয়া বা টিউমার আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হবে। সেই সাথে অন্ডকোষে পোকার কামড় বা অন্য কোনো ক্ষত আছে কিনা তা অত্যন্ত ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে। অন্ডকোষের পরিধি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এটি সরাসরি বীর্য উৎপাদনের সাথে জড়িত। সাধারণত মহিষের অন্ডকোষের পরিধি ২৮-৩৪ সে.মি. হয়ে থাকে। অন্ডকোষের মাঝামাঝি এলাকায় অন্ডকোষের পরিধি মাপা হয়।

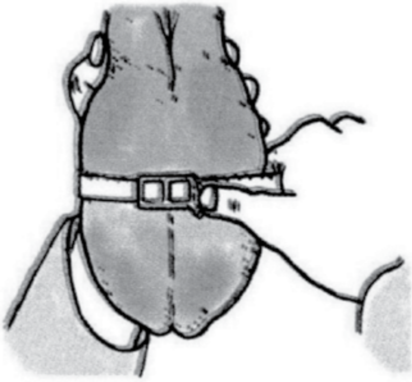

চিত্র : অন্ডকোষের মাপ নেওয়ার পদ্ধতি

শুক্রাশয়

শুক্রাশয় দুটি পাশাপাশি সমান ভাবে অন্ডকোষের মধ্যে নড়া চড়া করবে। খেয়াল রাখতে হবে শুক্রাশয়টি পরীক্ষা করার সময় ষাঁড় মহিষ কোনো অসুস্থতা অনুভব করছে কিনা। যদি ষাঁড় মহিষটি অসুস্থতা অনুভব করে তাহলে বুঝতে হবে শুক্রাশয়ে সমস্যা আছে। এছাড়া, ষাঁড় মহিষের নিম্নলিখিত সমস্যা আছে কিনা তা খেয়াল করতে হবে,

১। হাইপোপ্লাসিয়া (Hypoplasia)
২। নরম শুক্রাশয় (Soft testis)
৩। ক্রিপটোটোসিজম (Cryptochidim)।

শুক্রাশয়ের দৈর্ঘ্য বয়স ভেদে পরিমাপ করতে হবে এবং এর বৃদ্ধি ঠিকমত হচ্ছে কি না সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। ডান এবং বাম শুক্রায়ের দৈর্ঘ্য সমান হতে হবে। এটি সঠিকভাবে মাপতে হবে।

পুংজননেন্দ্রিয়

পুংজননেন্দ্রিয় পরিক্ষা করতে হবে যখন ষাঁড় মহিষ বীর্য প্রদানের জন্য অন্য মহিষের উপর ঝাঁপ দিবে। এটি স্বাভাবিক হতে হবে। অনেক সময় স্ক্রুর মত পুংজননেন্দ্ৰয়ি দেখা যায়। এছাড়া পুংজননেন্দ্রিয় ভেঙে বা গুরুতর আঘাত পেলে সেই ষাঁড় মহিষকে নির্বাচন থেকে বাদ দিতে হবে।

চিত্র: অস্বাভাবিক পুংজননেন্দ্রিয়

বীর্যের গুণাগুণ সম্পর্কিত তথ্য

সফল প্রজননের জন্য ভালো গুণাগুণ সম্পন্ন বীর্যের প্রয়োজন। সুতরাং, প্রজননের জন্য ষাঁড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বীর্যের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে।

শুক্রের রং

মহিষের বীর্যের রং দুধের ন্যায় সাদা। এই সাদার মাঝে খুব হালকা নীল আভা আছে। মহিষের বীর্য দুধের ক্রিমের মত ঘন হয়; তবে এই ঘনত্ব বীর্যে শুক্রকীটের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল।

বীর্যের পরিমাণ

মহিষের বীর্যের পরিমাণ গরুর বীর্যের পরিমাণের চেয়ে কম হয়। অন্যদিকে নদীর মহিষের (River Buffelow) বীর্যের পরিমাণ জলাভূমির মহিষের (Swamp Buffelow) বীর্যের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হয়। সাধারণত নদীর মহিষের বীর্যের পরিমাণ ২.৫-৪ সিসি হয়। অপরপক্ষে, জলাভূমির মহিষের বীর্যের পরিমাণ ১-২ সিসি হয়ে থাকে। মহিষের শুক্রের গড় সান্দ্রতা (Average viscocity) ৪.৫ সেন্ট্রিপয়েজ (Centri poise)। সাধারণত প্রতি সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৩ বার বীর্য সংগ্রহ করা যায়। বার বার বীর্য সংগ্রহ করলে, ষাঁড়ের শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে বা আবহাওয়া অত্যন্ত গরম হলে বীর্যের ঘনত্ব কমে যায় এবং বীর্য পাতলা হয়ে যায়।

pH

শুক্রের pH ৫-৬ এর মধ্যে থাকতে হবে। এর বেশী বা কম pH এ শুক্রকীটের সচলতা ও সংখ্যা কমে যায়।

শুক্রকীটের সংখ্যা

মহিষের শুক্রকীটের সংখ্যা দেশ, জাত, ঋতু ও বীর্য সংগ্রহের পৌনঃপৌনিকতা অনুসারে কম বেশি হয়। সাধারণত প্রতি সিসি বীর্যে ৬০০-২০০০ মিলিয়ন শুক্রকীট থাকে। তবে, বসন্ত ঋতুতে (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল) বেশী সংখ্যক শুক্রকীট এবং শরৎ ঋতুতে (আগস্ট-অক্টোবর) কম সংখ্যক শুক্রকীট পাওয়া যায়।

শুক্রকীটের সচলতা

মহিষ ষাঁড়ের শুক্রকীটের সচলতা ৫০% এর উপরে হতে হবে। এর থেকে কম হলে সেই বীর্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। এছাড়া, অস্বাভাবিক শুক্রকিটের সংখ্যা ৩০% এর অধিক হবে না।

আমরা নিম্ন লিখিতভাবে প্রজনন ষাঁড়ের কার্ড তৈরি করে ভাল জাতের ষাঁড় মহিষ নির্বাচন ও তার তথ্য সংরক্ষণ করতে পারি।

ষাঁড় নির্বাচন ও তথ্য সংগ্রহের ছক

জাত		উৎপত্তিঃ	পূর্ব পুরুষের তথ্য		শরীর সম্পর্কিত তথ্য	
ট্যাগ নং			পিতা	পিতার পিতা	চোখ	
জন্ম তারিখ					পা	
জন্মের সময় ওজন		উৎসঃ			খুর	
				পিতার মাতা	অস্থি সংযোগ	
বয়ঃসন্ধি প্রাপ্তির তারিখ		ষাঁড়ের রংঃ			সীথ	
		জেনোটাইপ (%):	মাতা	মাতার পিতা	পুংজননেন্দ্রিয় (Penis)	
প্রথম বীর্য সংগ্রহের তারিখ/ পাল দেওয়ার সময়					অন্ডকোষ (Scrotum)	
				মাতার মানা	যৌনকামনা (Libido)	
					চলনভঙ্গি	

ওজন, দৈর্ঘ্য, বুকের মাপ এবং অন্ডকোষের পরিধি সম্পর্কিত তথ্য								রোগ সম্পর্কিত তথ্য			
তারিখ	বয়স	ওজন	দৈর্ঘ্য	বুকের পরিধি	অন্ডকোষের পরিধি (সে.মি.)	শুক্রাশয়ের দৈর্ঘ্য		তারিখ	রোগ	মন্তব্য	
						ডান	বাম				

বীর্যের গুণাগুণ সম্পর্কিত তথ্য									টীকা প্রদান ও কৃমি দমনের তথ্য		
তারিখ	বয়স	বীর্যের রং	বীর্যের আয়তন	বীর্যের pH	শুক্রকীটের সংখ্যা	শুক্রকীটের সচলতা	জীবিত শুক্রকীটের হার(%)	স্বাভাবিক শুক্রকীটের হার (%)	টীকা প্রদান		কৃমি নাশক প্রদানের তারিখ
									টীকার নাম	তারিখ	

মন্তব্যঃ

প্রজননের জন্য ষাঁড় বাছুরের যত্ন:

- ৫-৬ মাস বয়সের এঁড়ে বাছুর ভবিষ্যতে প্রজননের জন্য বাছাই করতে হবে। বাছাইকৃত এঁড়ে বাছুর, বকনা বাছুর থেকে আলাদা করতে হবে। এই সকল এঁড়ে বাছুরের মধ্যে সমন্বিত বাছাই পক্রিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট বাছুর আলাদা করতে হবে।
- বাছুরকে দড়ি ব্যবহার করে সহজ ও সাধারণভাবে চলাফেরার অভ্যাস করতে হবে।
- বাছুরকে ৫-৬ মাস বয়সের পর হতেই প্রতিদিন ৩০ মিনিট ব্যায়াম করাতে হবে। ব্যায়ামের সময় ধীরে ধীরে ১ ঘণ্টায় উন্নীত করতে হবে। কারণ, প্রাপ্ত বয়স্কদের ১ ঘণ্টা করে ব্যায়াম করানো প্রয়োজন হয়।
- সহজভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য ষাঁড়কে নাকে ধাতব রিং অথবা দড়ি পরাতে হবে। ৮-১২ মাস বয়সেই রিং পরাতে হবে। মরিচা পরে না এ ধরণের ধাতব রিং ব্যবহার করতে হবে। বাড়ন্ত বাছুরকে প্রথম ৫-৬ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের হালকা বা মধ্যম ওজনের রিং পরাতে হবে। পরবর্তীতে পূর্ণ বয়স্ক (২ বছর বয়স) ষাঁড়ে পরিণত হওয়ার পর উক্ত রিং এর পরিবর্তে ৬-৮ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের রিং পরাতে হবে।
- রিং পরানোর পর যথাযথভাবে ঘা শুকানোর সময় দিতে হবে। ঘা শুকাতে প্রায় ৮-১০ দিন সময়ের প্রয়োজন হয়।
- বাছুর ষাঁড়কে প্রতিদিন গোসল করাতে হবে।
- শরীরকে ঠান্ডা রাখার জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে ২ বার শরীরে পানি ছিটাতে হবে।
- ষাঁড় বাছুরকে নিয়মিত কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে। সাধারণত ৬ মাস পর পর কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হয়।
- ষাঁড় বাছুরকে ঠিক মত টিকা দিতে হবে; সেই সাথে ব্রুসিওলোসিস এবং টিউবারকুলোসিস আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
- অসুস্থ হলে নিকটস্থ প্রাণী ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহন করতে হবে।

মহিষ ষাঁড় পরিচর্যা :

ষাঁড় মহিষ পালনের জন্য মহিষের সাধারণ শরীরতত্ত্ব, বাসস্থান, খাদ্য, পুষ্টি, পালন, রোগ ও এদের প্রতিকার সম্পর্কে জানতে হবে। নিচে সংক্ষেপে এ সকল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

মহিষের ষাঁড়ের সাধারণ শরীরতত্ত্ব :

মহিষের ষাঁড়ের সাধারণ দৈহিক তাপমাত্রা ১০০±১° ফারেনহাইট হয়ে থাকে। মহিষ ষাঁড়ের সাধারণ হৃদস্পন্দন প্রতিমিনিটে ৪০-৬০ বার হয়। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের হার ২৩-২৫ বার প্রতি মিনিটে। মহিষ ষাঁড় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাপমাত্রা, শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদস্পন্দনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কোনো মহিষ ষাঁড় যদি খাবার গ্রহণ না করে বা কম খায় তাহলে সাথে সাথে তার প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে এবং খেয়াল করতে হবে সে অসুস্থ কিনা। প্রয়োজনে ডাক্তরের স্বরণাপন্ন হতে হবে।

ষাঁড় মহিষ যখন থেকে বীর্যপাত করবে তখন থেকেই ষাঁড় মহিষ বয়ঃসন্ধি প্রাপ্তি হবে। ষাঁড় মহিষ সাধারণত ২-৩ বছরের মধ্যে বয়ঃসন্ধি প্রাপ্তি হয়। তবে পাল দেওয়া বা বীর্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত সময় ৩-৩.৫ বছরে। কারণ, এই সময় থেকে ভালো বীর্য উৎপাদন শুরু হয়। প্রথম বীর্য সংগ্রহ অথবা পাল দেওয়ার পর ৪.৫ বৎসর পর্যন্ত সময় ষাঁড় মহিষের বীর্যের গুণাগুণ ঠিক থাকে। সাধারণত সপ্তাহে দুই বা তিন বার বীর্য সংগ্রহ করলে ষাঁড় মহিষের বীর্যের গুণাগুণ ভালো থাকে। ২ বছরের কম ও ৩০০ কেজি ওজনের কম ষাঁড়ের বীর্য সংগ্রহ করা উচিত নয়। এছাড়া, সারা বৎসরে সর্বাধিক ৭৫ বারের বেশি ষাঁড় মহিষের বীর্য সংগ্রহ করা উচিত নয়।

মহিষ ষাঁড়ের বাসস্থান :

মহিষ ষাঁড়ের গরম সহ্যের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। তাই মহিষ ষাঁড়ের বাসস্থান এমনভাবে করতে হবে যেন এতে তাপের প্রবেশ কম হয়। তাপ কমানোর জন্য চালার নিচে চাটাই দেওয়া যেতে পারে। বাসস্থানের পাশে গাছ লাগিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করলে ঘরের তাপমাত্রা কম থাকে এবং বীর্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ঘরে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা করে ঘরের তাপমাত্রা কমানো যায়। এছাড়া, মহিষ ষাঁড়ের গায়ে দিনে ৩ থেকে ৪ বার পানি ছিটিয়ে তাপমাত্রা কমান যায়। সবচেয়ে ভাল হয় ঘরে মধ্যে ঝরনার ব্যবস্থা করলে। ঘরের মেঝে পাকা হতে হবে; তবে, এটি অমসৃণ হবে। ঘরটি সিমেন সংগ্রহকারি চুটের নিকটবর্তী হতে হবে। ব্যায়াম করার জন্য ঘরের পাশে বা উন্মুক্ত জাইগার বা প্যাডকের ব্যবস্থা থাকতে হবে। বীর্য সংগ্রহের সময় নীরব পরিবেশ তৈরি করতে হবে। সেই জন্য ঘর ও বীর্য সংগ্রহের স্থান নিরব জায়গায় তৈরি করা ভাল। প্রতি ৬-১২ মাস বয়সী মহিষের জন্য ৪-৫ বর্গ মিটার, ১৩-২৪ মাস বয়সী মহিষের জন্য ৫-৬ বর্গমিটার এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ষাঁড় মহিষের জন্য নূন্যতম চাল যুক্ত জায়গা ১২ বর্গমিটার এবং চালাবিহীন আঙিনা ১২০ বর্গমিটার রাখতে হবে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ষাঁড় মহিষ হতে সিমেন বা বীর্য সংগ্রহের জন্য নিম্নে উপস্থাপিত দুই সারি বিশিষ্ট অন্তর্মুখী লিখিতভাবে চালা যুক্ত ঘর নির্মাণ করা যেতে পারে।

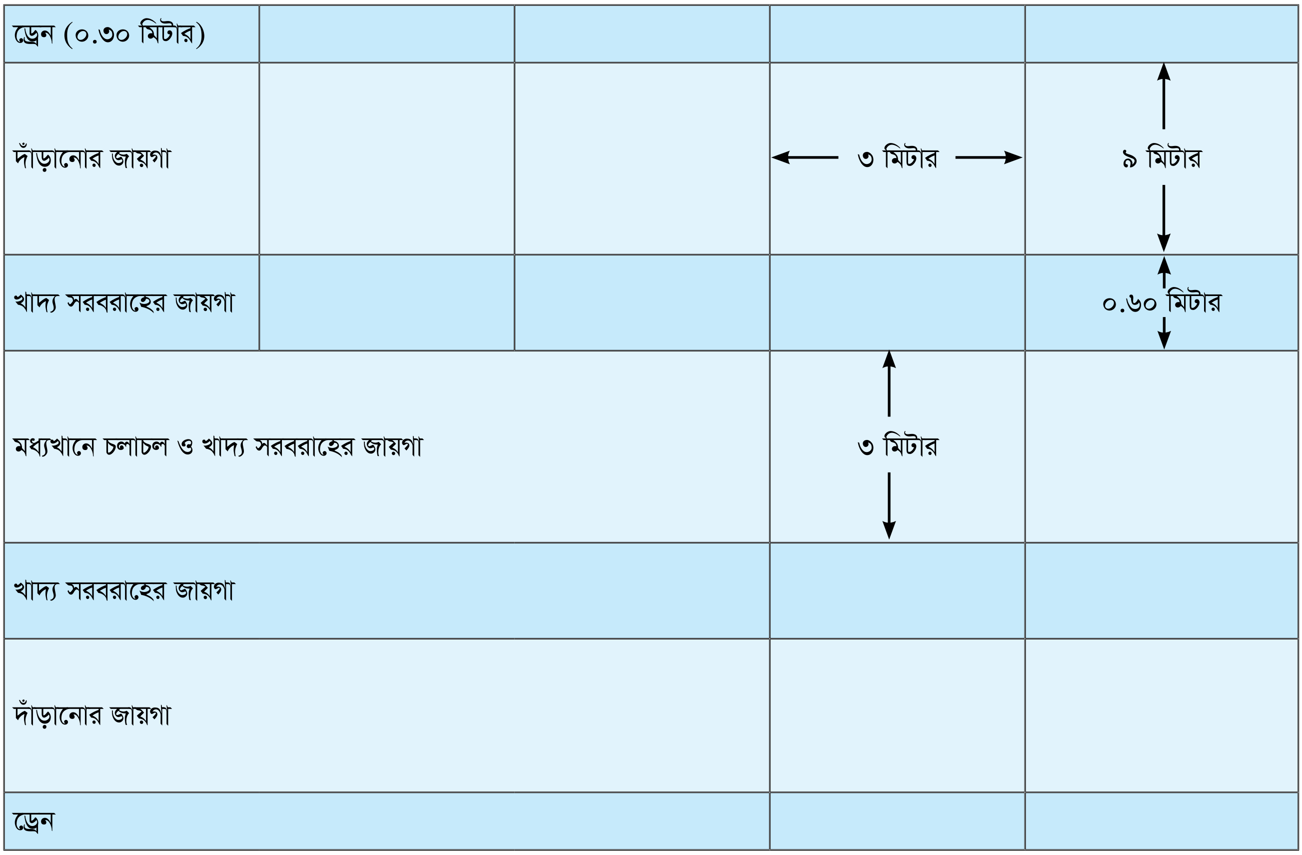

চিত্র: দুই সারি বিশিষ্ট অন্তর্মুখী ঘর

মহিষ ষাঁড়ের খাদ্য ও পুষ্টি :

সাধারণত মহিষ অধিক আঁশযুক্ত খাবার হজম করতে পারে। তবে ভাল খাবারের উপর বীর্যের উৎকর্ষতা নির্ভর করে। সাধারণতঃ ষাঁড়কে দিনে দুইবার খাবার দেওয়া হয়। ১০০ কেজি ওজনের মহিষের ষাঁড়ের জন্য দিনে ৩-৩.৫ কেজি শুষ্ক পদার্থের প্রয়োজন হয়। এই শুষ্ক পদার্থ আঁশযুক্ত এবং দানাদার খাদ্য হতে সরবরাহ করতে হবে। নিম্নলিখিতভাবে খাদ্য সরবরাহ করা যায়।

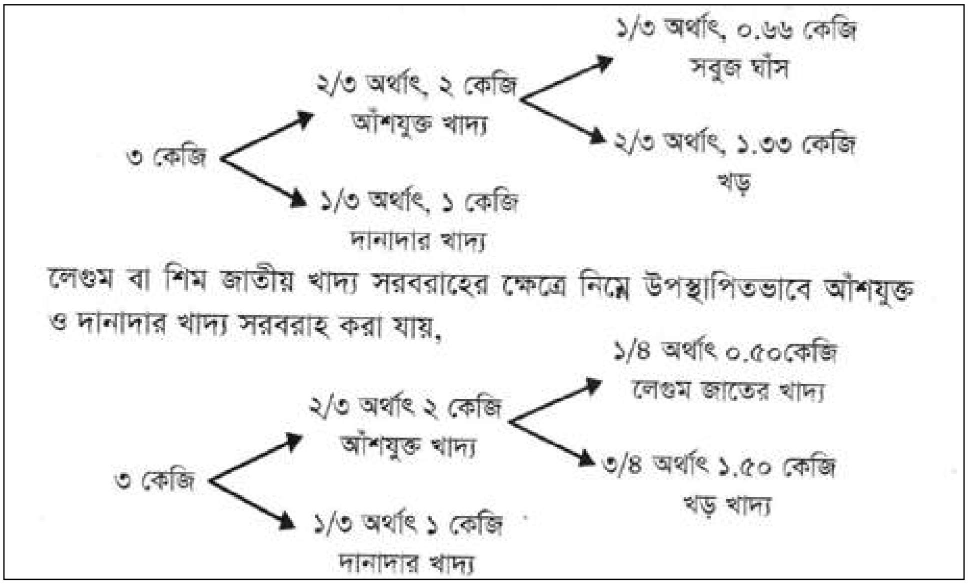

এছাড়াও ১% হারে খাদ্য লবন ও প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার পানি সরবরাহ করতে হবে। বয়সভেদে মহিষ ষাঁড়ের খাদ্যের চাহিদায় ভিন্নতা রয়েছে। সুতরাং, বয়স অনুসারে নিম্ন লিখিতভাবে ষাঁড় মহিষকে খাদ্য খাওয়ানো প্রয়োজন।

বাছুর অবস্থায় খাদ্য তালিকা :

শালদুধ নবজাতক বাছুরকে কলস্ট্রাম বা শালদুধ খাওয়াতে হবে। শালদুধ হচ্ছে সেই দুধ যা বাচ্চা জন্মাবার ২-৩ দিন পর্যন্ত গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়। শাল দুধ বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত জরুরি। শাল দুধের উপকারী দিকগুলো হলোঃ

১) শালদুধ নতুন প্রসবকৃত মহিষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এতে ২০ টিরও বেশি অ্যান্টিবডি (Antibody) আছে যা অনেক ক্ষতিকর রোগ ধ্বংস করে।

২) শালদুধে বিভিন্ন রকম গ্রোথ ফ্যাক্টর রয়েছে যা ষাঁড় বাছুরের দৈহিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৩) শালদুধে A, B1, B2, B6, B12, E, C ভিটামিনসহ ক্যালসিয়াম, ক্লোরাইড, আয়োডিন, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, জিংক, সোডিয়াম আছে যা বাছুরের প্রাথমিক পর্যায়ে অত্যন্ত জরুরি।

৪) শালদুধ নতুন প্রসবকৃত বাছুরের Bowel movement এ সাহায্য করে। তাই খামারিদের উচিত ষাঁড় মহিষ জন্মানোর পর একে প্রচুর পরিমানে শালদুধ খাওয়ান।

১ দিন থেকে ৩ মাস পর্যন্ত খাদ্য তালিকা নিচে দেওয়া হল

ষাঁড় বাছুরের বয়স	ননীযুক্ত (মিলি)	টানা দুধ (মিলি)	প্রাথমিক খাদ্য (গ্রাম)	সবুজ ঘাস (গ্রাম)
জন্মের পর ১ম তিন দিন	২৫৮০ (কলস্ট্রাম বা শালদুধ)		-	-
৪র্থ-৭ম দিন	২৫০০	-	-	-
২য় সপ্তাহ	৩০০০	-	৫০	২৫০
৩য় সপ্তাহ	৩২৫০	-	১০০	৩৫০
৪র্থ সপ্তাহ	৩০০০	-	৩০০	৫০০
৫ম সপ্তাহ	১৫০০	১০০০	৪০০	৫৫০
৬ষ্ঠ সপ্তাহ	-	২৫০০	৬০০	৬০০
৭ম সপ্তাহ	-	২০০০	৭০০	৭০০
৮ম সপ্তাহ	-	১৭৫০	৮০০	৮০০
৯ম সপ্তাহ	-	২২৫০	১০০০	১০০০
১০ম সপ্তাহ	-	-	১২০০	১১০০
১১ম সপ্তাহ	-	-	১৩০০	১২০০
১২ম সপ্তাহ	-	-	১৪০০	১৪০০
১৩ম সপ্তাহ	-	-	১৭০০	১৯০০

নিম্নলিখিতভাবে প্রাথমিক খাদ্য তৈরি করা যায়

খরের চূর্ণ -	৫০ ভাগ
বাদমের খৈল -	৩০ ভাগ
গমের ভুসি-	৮ ভাগ
মাছের গুড়া/ গুড়া দুধ-	১০ ভাগ
খনিজ পদার্থ-	২ ভাগ
মোট =	১০০ ভাগ

১০০ ভাগ প্রাথমিক খাদ্যের সাথে নিম্নলিখিত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে,
চিটাগুড়- ৫-১০ কেজি
ভিটামিন- ১০ গ্রাম
খাদ্য লবণ-৫০০ গ্রাম

এঁড়ে মহিষের ষাঁড় খাদ্য তালিকা :

১৫০ কেজি দৈহিক ওজন বিশিষ্ট একটি মুররাহ মহিষের বৃদ্ধির হার ৪৫০ গ্রাম/দিন এবং নিম্নলিখিত হারে খাদ্য উপাদানসমূহ প্রয়োজন

শুষ্ক পদার্থ (কেজি)	পরিপাচ্য আমিষ (কেজি)	সামগ্রিক পরিপাচ্য খাদ্য পুষ্টি (কেজি)	ম্যাটাবলিক লাইজেবল কর্মশক্তি (মেগা ক্যালরি)	ক্যালসিয়াম (গ্রাম)	ফসফরাস (গ্রাম)
৩.৪	০.৩২০	২.৩	৮.৪	৮	৬

উপরোক্ত খাদ্য উপাদানসমূহের চাহিদা নিম্ন লিখিতভাবে পূরণ করা যায়

ষাঁড় বকনা মহিষের বয়স	দানাদার খাদ্য (কেজি)	সবুজ ঘাস (কেজি)	খড় (কেজি)
৩-৬ (মাস)	১.৫	৩	২
৬-১২ (মাস)	২	৫	৩
১ বছর-৩.৫ বছর	২	৩০	৩

ষাঁড়ের খাদ্য তালিকা:

ষাঁড় মহিষকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য খাওয়ানোর প্রয়োজন নাই। কারণ এতে মহিষের বেশি মেদ জমে যাবে এবং মহিষ থেকে বীর্য সংগ্রহে সমস্যা হবে। ৬০০ কেজি ওজনের মহিষ ষাঁড়কে প্রতিদিন নুন্যতম ৪০-৫০ কেজি সবুজ ঘাস ২-৩ কেজি খড় ও ২ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। দানাদার খাদ্যের মধ্যে অঙ্কুরিত ছোলা দেওয়া যেতে পারে। ছোলাকে একদিন ভিজিয়ে পরের দিন দেওয়া হয়। এটি ষাঁড়কে প্রচুর শক্তি প্রদান করে সেই সাথে ভিটামিন ই সরবরাহ করে বীর্যের গুণাগুণ বৃদ্ধি করে।

রোগ:

ষাঁড় মহিষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গরুর থেকে বেশি। কিন্তু একবার রোগাক্রান্ত হলে মৃত্যুর সম্ভাবনা গরুর তুলনায় বেশি। তাই ষাঁড় মহিষের রোগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করতে হবে। ষাঁড় মহিষের যৌনাঙ্গে নিম্নলিখিত রোগ হয়ে থাকে :

১. ইপিডিডাইমেটিস (Epididymitis)
২. অরকাইটিস এবং পেরি অরকাইটিস (Orchitis & Periorchitis)
৩. ব্যালানোফসথেটিজ (Balenophosthitis)

এই সকল রোগ হলে ষাঁড় মহিষকে যত দ্রুত সম্ভব সরিয়ে ফেলতে হবে।

এছাড়া, ষাঁড় মহিষের দেহে নিম্নলিখিত রোগ হয়ে থাকে

রোগের উৎস	রোগের নাম	রোগের উৎপাদকের নাম	প্রতিরোধ
ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ	তড়কা (Anthrax)	ব্যাসিলাস এনথ্রাসিস	টিকা
	গলাফুলা (Hemorrhagic Septicemia)	পাস্তরেলা মাল্টোসিডাটাইপ 'বি'	টিকা
	বাদলা (Black Leg)	কসট্রিডিয়াম চৌভি	টিকা
	যক্ষ্মা (Tuberculosis)	মাইকোব্যাকটেরিয়াম স্পিসীজ	টিকা
	ব্রুসেলোসিস (Brucellosis)	ব্রুসেলা এবোরটাস	আক্রান্ত প্রাণীর অপসারন। নতুন প্রাণীর ক্ষেত্রে কোয়ারেন টাইন।
	ভিব্রিওসিস (Vibriosis)	ভিব্রিও ফিটাস	
	লেপটোস্পাইরোসিস (Leptospirosis)	লেপটোস্পাইরা স্পিসীজ	
ভাইরাস ঘটিত রোগ	খুরা রোগ (Foot and mouth Disease)	ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ ভাইরাস	টিকা
	জলাতঙ্ক (Rabis)	র‍্যাবিস ভাইরাস	টিকা

রোগের উৎস	রোগের নাম	রোগের উৎপাদকের নাম	প্রতিরোধ
পরজীবী ঘটিত রোগ	ফ্যাসিওলিয়াসিস (Fascioliosis)	ফ্যাসিওলা জাইগান্টিকা ফ্যাসিওলা হেপাটিকা	কৃমিনাশক ওষুধ সময় মত খাওয়ানো।
	সিস্টোসমিয়াসিস	সিস্টোসোমা স্পিসীজ	
	এসকারিয়াসিস	নিউএসকারিস ভাইটুলোরাম	
	কাঁধে ঘা (Hump Sore)	স্টিপ্যানোফিলারিয়া অ্যাসামিনসিস (Stephanofilaria assamensis)	মাছি বসা প্রতিহত করতে হবে তারপিন ব্যবহা করতে হবে।
বিপাকিয় রোগ	বদহজম (Indigestion)	নিম্ন মানের খাবার সরবরাহ করলে	ভালো মানের খাবার সরবরাহ করতে হবে।
	পেটফাঁপা (Bloat / Timpany)	লেগুম ও দানাদার খাদ্য অতিরিক্ত খেলে	

মহিষ ষাঁড়কে রোগমুক্ত রাখতে হলে নিয়মিত টিকা প্রয়োগ করতে হবে। টিকা প্রদানের জন্য নিকটস্থ রেজিস্টার্ড ভ্যাটেরিনারী ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহন করতে হবে। নিম্নে টিকা প্রয়োগ সংক্রান্ত পদ্ধতি উপস্থাপন করা হলো।

মহিষ ষাঁড়ের টিকা প্রদান পদ্ধতি :

রোগের নাম	প্রথম টিকা দেওয়ার সময়/ বয়স	প্রথম টিকার পর বুষ্টার টিকা দেওয়ার সময় বয়স	পুণরায় টিকা দেওয়ার সময়/ বয়স	টিকা প্রয়োগের স্থান
বাদলা	৪ মাস	-	৬ মাস	চামড়ার নিচে
তড়কা	৬ মাস	২-৩ বৎসর	১ বৎসর	চামড়ার নিচে
গলাফুলা	৬মাস	-	১ বৎসর	চামড়ার নিচে
খুরারোগ	৬ মাস	-	৪-৬	চামড়ার নিচে
জলাতঙ্ক	৩ মাসের বেশি	-	৪-৬ মাস	মাংসের মধ্যে
ধনুষ্টংকার	৩-৪ মাস	-	১ বৎসর	চামড়ার নিচে

বীর্য সংগ্রহের সময় লক্ষণীয় ও করণীয় :

- বীর্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত ডামি ষাঁড়কে সুস্থ্য ও নিরোগ হতে হবে।
- প্রতিবার বীর্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত ডামি ষাঁড়কে ভালোভাবে গোসল করাতে হবে।
- ডামি ষাঁড়ের পিছনের দিকে যেন কোন ময়লা বা মল না লেগে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- যে ষাঁড় থেকে বীর্য সংগ্রহ করতে হবে তার সিথে লোম থাকলে তা পরিস্কার করতে হবে।
- বীর্য সংগ্রহের জায়গা পরিস্কার থাকতে হবে। জায়গাটি পাকা হলে ভালো হয়। তবে এটি একেবারে মসৃন হবে না। তা না হলে ষাঁড় লাফ দিতে গিয়ে পড়ে যেতে পারে। এই সমস্যা দূর করতে বীর্য সংগ্রহের জায়গায় চটবা ছালা বিছিয়ে দিলে সিমেন সংগ্রহের সুবিধা হয়।
- প্রথম দুই বার ষাঁড়ের সিথটি সরিয়ে দিয়ে মিস করাতে হবে। তৃতীয় বার এভি সেটের মাধ্যমে বীর্য সংগ্রহ করতে হবে। এতে উচ্চ গুনাবলীসম্পন্ন বীর্য পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- বীর্য সংগ্রহের সময় সিমেন ভায়েল যেন দেহের তাপের সংস্পর্শে না আসে সেই জন্য সিমেন ভায়েলের বাইরে প্রোটেকটর থাকতে হবে।
- বীর্য সংগ্রহের সময় ষাঁড়কে উত্তেজিত করা যাবে না। ষাঁড়কে ভয় দেখানো বা লাঠি দিয়ে আঘাত করা ঠিক নয়।
- ছায়াযুক্ত স্থানে বীর্য সংগ্রহ করতে হবে।
- দিনের প্রথম ভাগে বীর্য সংগ্রহ করতে হবে।
- বীর্য সংগ্রহের পর যত দ্রুত সম্ভব প্রক্রিয়াকরণ করে ক্রায়োপিজারভেশন করতে হবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

আহসানুল কবির এবং ড. টি এন নাহার

মহিষ খামারে জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

লাভজনকভাবে মহিষ খামার পরিচালনার পূর্বশর্ত সুস্থ মহিষ। বিভিন্ন ধরণের রোগের কারণে খামারে মহিষের মৃত্যু হয়। এ ক্ষতি খামারিদের ব্যাপক লোকসান বয়ে আনে। ঔষধ ও ডাক্তারের জন্য ব্যয় ছাড়াও কিছু কিছু রোগের জন্য অনেক মূল্যবান মহিষকে খামার থেকে ছাটাই করতে হয়, এ কারণেও অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়।

আমরা জানি, শারীরিকভাবে দুর্বল মহিষের চেয়ে স্বাস্থ্যবান মহিষের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী থাকে। এছাড়া পরিস্কার পরিচ্ছন্ন খামারে রোগ-জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে না। উন্নত মানসম্পন্ন সুষম খাদ্য মহিষের সু-স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং কার্যকর টিকা প্রদান কর্মসূচী মহিষকে সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা করে। রোগব্যাধি মুক্ত খামার পরিচালনার ক্ষেত্রে আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ উক্ত বিষয়গুলোর প্রতি নজরদারী করার পদ্ধতিকেই জীব-নিরাপত্তা (Biosecurity) বলা হয়।

বায়ো সিকিউরিটি

জীব-নিরাপত্তা বা বায়ো সিকিউরিটি হল খামার ব্যবস্থাপনার এমন কিছু কৌশল বা সমন্বিত প্রয়াস যা কোন নির্দিষ্ট এলাকার ভেতরে বা আশেপাশে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর অনুপ্রবেশ, বিস্তার এবং ঐ স্থানে পালিত প্রাণীর কোন রকম সংক্রামণ ঘটানো অথবা বিপদগ্রস্থ করা থেকে বিরত রাখে। জীব-নিরাপত্তা আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনার একটি অপরিহার্য অংশ। খামারে জীব-নিরাপত্তা রক্ষা করা প্রত্যেক দর্শনার্থী এবং শ্রমিক সকলের দায়িত্ব।

রোগ ছড়ানোর মাধ্যম

- প্রাণী, মানুষ এবং খামারের যন্ত্রপাতি
- আগন্তুক ও যানবাহন
- নতুন মহিষ
- ইঁদুর, ঘুণপোকা, শিয়াল, কুকুর ও অনান্য বন্য প্রাণী
- প্রতিবেশী খামারের প্রাণী।

জীব-নিরাপত্তা মেনে চলার উপকারিতা

- নতুন রোগ প্রবেশ করতে বাধা দেয়
- রোগের বিস্তার রোধ করে
- খামার বা ফার্মের প্রাণীদের সুস্থ রাখে
- রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে চিকিৎসা খরচ কমায়
- খামার দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

খামারে জীব-নিরাপত্তা বা বায়ো সিকিউরিটি বিঘ্নিত হওয়ার কারণ

বিভিন্ন কারণে মহিষের খামারে রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে-

ক) **মানুষের অসচেতনতা:** খামারে মানুষের যাতায়াত, কুকুর, বিড়াল, শিয়াল ও ইঁদুর ইত্যাদি অনেক সময় খামারের জীব-নিরাপত্তা বিনষ্ট করে।

খ) **প্রতিবেশী খামার:** প্রতিবেশী রোগক্রান্ত খামার থেকে প্রায়ঃসই রোগের সংক্রামন ঘটে থাকে। এক খামার থেকে অন্য খামার নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে।

গ) **আগন্তুকঃ** খামারে বিভিন্ন প্রয়োজনে অনেক দর্শনার্থী এবং ক্রেতার আগমন ঘটে থাকে। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার অভাবে এই সকল আগন্তুক অনেক সময় রোগ উৎপত্তির মাধ্যম হয়।

ঘ) **কর্মরত জনবল :** খামারে বিভিন্ন প্রয়োজনে অনেক লোকজনের দরকার হয়। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এই সকল কর্মী অনেক সময় রোগ ছড়াতে পারে।

ঙ) **আরোগ্য লাভকারী মহিষ:** রোগ থেকে আরোগ্য লাভকারী মহিষ বাহ্যিকভাবে সুস্থ্য মনে হলেও অনেক সময় তাদের শরীরে রোগের জীবাণু থেকে যেতে পারে। ফলে, সুস্থ্য মহিষ ঐ সকল মহিষের সংস্পর্শে আসার মাধ্যমেও রোগ ছড়াতে পারে।

চ) **খাদ্য:** খাদ্য জীবাণুমুক্তভাবে সংগ্রহ, পরিবহন, সংরক্ষণ এবং পরিবেশন না করা হলে খাদ্যের মাধ্যমেও অনেক জীবাণু মহিষকে আক্রমন করতে পারে।

ছ) **পানি:** পানির মাধ্যমে বেশীর ভাগ সময় জীবাণু সংক্রামিত হয়। পানি সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সরবরাহের সময় জীবাণুর সংস্পর্শে আসা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পানির পাত্র নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

জ) **বিক্রির জন্য বাজারে নেওয়া:** খামারি বিক্রির জন্য অনেক সময় মহিষ বাজারে নেয়। বাজারে নেয়া মহিষ অন্য অচেনা রোগক্রান্ত মহিষের সংস্পর্শে আসে। আবার বিক্রি না হওয়া মহিষ পুনরায় খামারে ফিরিয়ে আনা হয়। রোগাক্রান্ত মহিষের সংস্পর্শ বিভিন্ন রোগ বিস্তারের জন্য বাজার আশংকাজনক স্থান।

ঝ) **মহিষের ঘর:** স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পর্যাপ্ত জায়গাসহ মহিষের জন্য ঘর তৈরি করতে হবে। অস্বাস্থ্যকর ঘর ও অপর্যাপ্ত স্থানে বিভিন্ন রোগের জীবাণু বেঁচে থাকে যা রোগ বিস্তারে সহায়তা করে। অনেক সময় এই ধরণের বাসস্থান মহিষকে ধকলে (Stress) ফেলে যা পরবর্তীতে বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রমনে সহায়তা করে।

ঞ) **ধকল (Stress):** বিভিন্ন ধরণের ধকল (Stress) রয়েছে যা মহিষের রোগ সৃষ্টির সম্ভবনাকে বাড়িয়ে দেয়। এগুলো হলঃ

- ঠান্ডা
- অত্যধিক গরম
- পানির স্বল্পতা
- পুষ্টির স্বল্পতা
- অধিক কোলাহল
- অপ্রতুল খাদ্য ও পানীয়ের জায়গা
- কম খাদ্য গ্রহণ
- ত্রুটিপূর্ণ বাসস্থান
- নিম্নমানের বাতাস চলাচল ব্যবস্থা (Poor ventilation)
- দূর পাল্লার যাতায়াত
- সুষম খাদ্যের অভাব
- ত্রুটিপূর্ণ বাতাস চলাচল ব্যবস্থা
- মাছির উপদ্রব এবং দূর্গন্ধ
- ঠান্ডা বাতাস
- টিকা প্রদান (vaccination)
- ওজন নেয়া

মহিষ খামারে বিভিন্ন কারণে জীব-নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝানো হলোঃ

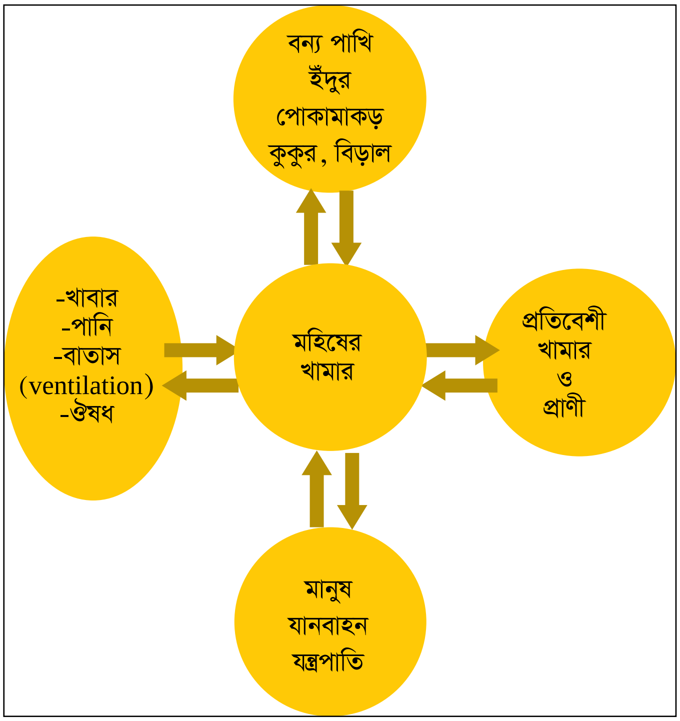

চিত্র: মহিষ খামারে জীব-নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণসমূহ

রোগ প্রতিরোধের জন্য করণীয় বিষয়সমূহ

ক) **মানসম্পন্ন খাদ্য :** মানসম্পন্ন খাদ্য উপাদান থেকে সুষম খাদ্য প্রস্তুত ও সরবরাহ করতে হবে। এতে মহিষের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

খ) **বিশুদ্ধ খাবার পানি :** পানি জীবাণু এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য মুক্ত হতে হবে।

গ) **স্বাস্থ্যসম্মত থাকার জায়গা :** খোলামেলা ও আলোর উপস্থিতি আছে এমন জায়গায় মহিষের বাসস্থান তৈরি করতে হবে।

ঘ) **প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ :** খামারে কর্মরতদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক পরিধানের বিষয়টি অবশ্যই একটি প্রতিরোধের ব্যবস্থা, যা, খামারে জীবাণু ছড়ানোকে বাধা দেয়। দর্শনার্থীদের মহিষের ঘরে প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে।

ঙ) **স্বাস্থ্যকর পরিবেশ :** খামারে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার নিয়ম কানুন কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংক্রামক রোগের জীবাণুর বিস্তার হ্রাস করে।

চ) **কার্যকর টিকা প্রদান পরিকল্পনা :** কার্যকর টিকা প্রদান কর্মসূচী পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করে মারাত্মক সংক্রামক রোগগুলি থেকে মহিষকে রক্ষা করতে হবে। নিম্নে মহিষের কার্যকর টিকা প্রদান কর্মসূচী দেয়া হলোঃ

রোগের নাম	১ম ডোজ	বুস্টার ডোজ	টিকার পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি
ক্ষুরারোগ	৩ মাস	৬ মাস অন্তর	২ মি. লি.,ঘাড়ের চামড়ার নীচে
হিমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া/ গলাফুলা	৪ মাস		
	বছরে এক (১) বার	২ মি. লি.,ঘাড়ের চামড়ার নীচে	
তড়কা রোগ (এনথ্রাক্স)	গ্রেজিং সিজন এর ১ মাস পূর্বে রোগ যে সময় হয় তার পূর্বে	বছরে ১ বার	১ মি. লি. মাংসে/ চামড়ার নীচে
ব্রুমেলা	৪ মাস বা তার উপরে	বছরে ১ বার	২ মি. লি. চামড়ার নীচে

মহিষ খামারের জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনাঃ

১. খামারের চারিদিকে নিরাপদ দূরত্বে বেষ্টনী থাকতে হবে। যাতে খামারে কুকুর, বিড়াল, শিয়ালসহ অন্যান্য প্রাণী প্রবেশ করতে না পারে।

চিত্র: আধুনিক খামারে নিরাপত্তা বেষ্টনী

২. আধুনিক পদ্ধতিতে মহিষের খামার করতে হলে প্রধান গেইট এর সাথে গোসলখানা থাকবে। খামারের কর্মচারী যখন খামারে প্রবেশ করবে তখন বাইরের পোষাক রেখে গোসল করে খামারের পোষাক ও জুতা পড়ে খামারের ভেতরে প্রবেশ করবে। খামার থেকে বের হবার সময় খামারের পোষাক ও জুতা খুলে নিজের পোষাক পরে বাইরে আসবে।

৩. কর্মরত লোক ছাড়া বাইরের কোন লোক খামারে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। যদি কোন লোক প্রবেশ করতে দিতেই হয় তবে নিয়ম অনুযায়ী গোসল করে খামারের পোষাক ও জুতা পরে খামারে প্রবেশ করবে।

চিত্র: খামারে প্রবেশের নির্ধারিত পোশাক ও খামারে প্রবেশের সময় জুতা পরে প্রবেশ

৪. খামারের প্রবেশ পথে নিচু পাকা মেঝে (ফুটবাথ) থাকতে হবে; যেন, সেখানে জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি রাখা যায় এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি বহনকারীর গাড়ীর চাকা জীবাণু মুক্ত করা হয়। জীবাণুনাশকের কার্যকারিতা শেষ হওয়ার পরপর নতুনভাবে জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানি রাখতে হবে।

চিত্রঃ খামারে প্রবেশ পথে ফুটবাথ এবং দ্রব্যাদি বহনকারীর গাড়ির চাকা জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে

৫. খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্যাদিকে যে বস্তায় বহন করা হবে সে বস্তা নতুন এবং জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণু মুক্ত করে নিতে হবে। একইভাবে পরিবহনের জন্য যানবাহন জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণু মুক্ত করতে হবে।

৬. ফাংগাসযুক্ত কোন খাদ্য মহিষকে সরবরাহ করা যাবে না। তাই খাদ্য বেশী দিন মজুদ করা যাবে না। মাঝে মাঝে মজুদ খাদ্য পরীক্ষা

চিত্রঃ খামারের প্রবেশের পর প্রবেশকৃত গাড়ির চাকা জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে

করতে হবে।

৭. ইঁদুর যেন খাদ্য গুদামে প্রবেশ করে খাদ্য খেয়ে রোগ ছড়াতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৮. খাদ্যগুদাম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরি করতে হবে; যেন, ঘর শুষ্ক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়।

৯. বর্ষা ও গরমকালে মিশ্রিত সুষম খাদ্য তৈরি করে সাধারণত ৭ দিনের বেশী সংরক্ষণ করা উচিত নয়। কারণ, এতে খাদ্যের গুনগতমান নষ্ট হতে পারে।

১০. মূল খামারের উত্তর পূর্ব কোনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তসহ একটি আইসোলেশন সেড তৈরি করতে হবে। এখানে খামারে আনা নতুন মহিষ ১৫ দিন পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অসুস্থ মহিষকে এখানে রাখতে হবে। প্রতিবার ব্যবহারের পূর্বে এবং পরে জীবাণুনাশক দিয়ে ঘর ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

চিত্র: আইসোলেশন সেড

চিত্র: মহিষ কোয়ারেন্টাইন সেড

১১. খামারের সকল মহিষকে বছরে দুইবার কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে। মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
১২. মহিষের খাদ্য ও পানি জীবাণুমুক্ত হতে হবে। মাঝে মাঝে খাদ্য ও পানির মান পরীক্ষা করতে হবে।
১৩. প্রতিদিন সকালে এবং বিকালে মহিষের ঘর পরিস্কার করতে হবে। ঘরের মেঝে যাতে নিচু না থাকে, নিচু হলে পানি জমে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে থাকবে।

চিত্র: সকালে ও বিকালে মহিষের ঘর পরিস্কার

১৪. খামারে নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য নিরাপদে কম্পোষ্ট করার জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে। অন্যথায় যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেললে পরিবেশ নষ্ট হবে।
১৫. সপ্তাহে ১ দিন ঘর এবং ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি কার্যকরী জীবাণুনাশক দিয়ে পরিস্কার করতে হবে।
১৬. বিভিন্ন বয়সের মহিষের জন্য পৃথক ঘর বা কক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে।

চিত্র: নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য ফেলে কম্পোস্ট তৈরি করা হচ্ছে

১৭. অসুস্থ্য মহিষ দ্রুত পালের অন্য মহিষ থেকে আলাদা শেডে সরাতে হবে, এতে বয়স্ক মহিষ থেকে রোগ বাচ্চায় সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

১৮. রোগাক্রান্ত মহিষ প্রজননের কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

১৯. মা মহিষের কক্ষ পরিস্কার রাখতে হবে। বাচ্চা হওয়ার পর ঘরে রক্ত ও অন্যান্য বর্জ্য দ্রুত পরিস্কার করতে হবে। পরিস্কারের পর ঘরের সকল স্থানে জীবাণুনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

২০. খামারের মহিষ চড়ানোর জমি প্রতি বৎসর অন্তত একবার চাষ করে দিতে হবে। এতে জমির ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া এবং কৃমির ডিম ও লার্ভা মারা যাবে।

২১. খামারের ভেতরে ও ঘরের আশে পাশে যে সকল স্থানে সূর্য্যের আলো কম পড়ে অথবা স্যাতস্যতে থাকে ঐ সকল স্থানে ১০-১৫ দিন পর পর চুন প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া, সম্পূর্ণ খামারের ভেতরের মাটি বৎসরে একবার ওলটপালট করে দিতে হবে।

২২. মৃত মহিষ নিজেই মৃত্যুর পর রোগের উৎসে পরিণত হয়; তাই, যত দ্রুত সম্ভব মৃত মহিষ খামারের অন্য মহিষ থেকে পৃথক করে সম্পূর্ণরুপে পুড়ে ফেলতে হবে অথবা গভীর গর্ত করে পুঁতে রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিয়াল বা কুকুর এই মৃতদেহ খুঁজে না পায়।

২৩. খামার এলাকার ঝোপ-ঝাড় নিয়মিত পরিস্কার রাখতে হবে। ঝোঁপ-ঝাড় বন্য প্রাণীর যেমন, শিয়াল, কুকুর, সাপ, বেজি, ইত্যাদির আশ্রয়স্থল হতে পারে। খাবারের উচ্ছিষ্ট, মলমূত্র নিয়মিত সংগ্রহ করে পরিকল্পিতভাবে জৈবসার উৎপাদনে ব্যবহার করতে হবে।

২৪. খাবারের উচ্ছিষ্ট ও মলমূত্র নিয়মিত সংগ্রহ করে পরিকল্পিতভাবে জৈব সার উৎপাদনে ব্যবহার করতে হবে।

চিত্র: পরিকল্পিতভাবে জৈব সার উৎপাদন

উপসংহার:

জীব-নিরাপত্তা বা বায়োসিকিউরিটি উন্নত খামার ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম অঙ্গ যা খামারে রোগ বালাই ছড়িয়ে পড়ার সম্ভবনাকে শুরুতেই হ্রাস করতে সক্ষম। তাই জীব-নিরাপত্তার শর্তাবলী কঠোরভাবে মেনে চলা বা না চলার উপরই নির্ভর করছে একটি খামার লাভজনক হবে কি না। একটি খামারকে লাভজনক করতে হলে খমারটির পরিবেশ অবশ্যই রোগ বালাই মুক্ত রাখতে হবে আর এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জীব-নিরাপত্তা বা বায়োসিকিউরিটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা এবং তা যথাযথভাবে মেনে চলা।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. টি এন নাহার এবং শারমিন আক্তার

মহিষের অন্তঃপরজীবী বা কৃমি দমন মডেল

প্রাসঙ্গিক কথা

মহিষ বর্তমান বিশ্বের ক্রমবর্ধমান আমিষ চাহিদার অন্যতম যোগানদাতা হিসেবে প্রাণিবিজ্ঞানী, প্রাণিচিকিৎসক, পুষ্টিবিশারদসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রাণিজ আমিষের প্রধান দুই উৎস মাংস ও দুধ উৎপাদনে এশিয়ান মহিষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও ফিলিপাইনের ন্যায় মহিষ বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদের মধ্যে অন্যতম। মহিষ পালন বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে মহিষ নানাবিধ কাজে ব্যবহার হয়। আমাদের দেশে দুধ ও মাংস উৎপাদনের চেয়ে মহিষ হালচাষ, মালামাল বহন, ফসল মাড়াই ইত্যাদি কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে, এ দেশের মহিষ গরু অপেক্ষা অধিক উৎপাদনশীল ও রোগবালাই সহিষ্ণু। এদের রোগবালাই গরু অপেক্ষা তুলনামুলক কম এবং জীবনীশক্তি বেশি হওয়ার কারণে মহিষ পালন ক্ষেত্রবিশেষে গরু পালন অপেক্ষা অধিক লাভজনক। এ প্রাণী পালনের ক্ষেত্রে রোগবালাই সম্পর্কিত যে সকল সমস্যা সবচেয়ে বেশি বাধার সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে পরজীবী রোগসমূহ অন্যতম। মানুষসহ সকল গবাদিপ্রাণি পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয়। মহিষকে আক্রমনকারী পরজীবীসমূহকে প্রধানতঃ অন্তঃপরজীবী, বহিঃপরজীবী ও রক্ত পরজীবী এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। অন্তঃপরজীবী বা অন্ত্রীয় পরজীবী সাধারণতঃ কৃমি নামে ব্যপক পরিচিত। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বেই এই পরজীবীসমূহের প্রাদুর্ভাব রয়েছে। উষ্ণ ও আদ্র জলবায়ু পরজীবীর বংশ বিস্তারে সহায়ক বলে ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষ করে, বাংলাদেশে পরজীবীসৃষ্ট রোগসমূহের প্রাদুর্ভাব তুলনামূলক ভাবে বেশি। এসকল পরজীবীসৃষ্ট রোগসমূহের কারণে কৃষকেরা প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অন্তঃপরজীবী বা কৃমি প্রতক্ষ্য ও পরোক্ষভাবে আক্রান্ত প্রাণীর ক্ষতিসাধন করে, উৎপাদন ব্যহত করে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীর মৃত্যুও ঘটায়। ফলশ্রুতিতে, মহিষ চাষীরা ব্যপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য বিশ্বব্যাপী বৃহত্তর মহিষ উৎপাদনকারী দেশগুলিতে অন্তঃপরজীবীর এই ভয়াবহতা ও ব্যাপক ক্ষতির তথ্য জানা থাকলেও বাংলাদেশের মহিষে অন্তঃপরজীবীর প্রকোপ, সংক্রমণ ও ব্যাপকতা সম্পর্কে গবেষণালব্ধ সুনির্দিষ্ট তেমন কোন তথ্য নেই। অন্যান্য গবাদি প্রাণী যেমন, গরু, ছাগল ও ভেড়ায় অন্তঃপরজীবী বা কৃমির প্রকোপ, সংক্রমণ ও ব্যাপকতা নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হলেও বাংলাদেশের মহিষে পরজীবীর আক্রমন সংক্রান্ত গবেষণা এতদিন উপেক্ষিত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (কম্পনেন্ট-বি) এর একটি গবেষণা থেকে বাংলাদেশের মহিষে অন্তঃপরজীবীর প্রকোপ, সংক্রমণ ও ব্যাপকতার ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য মহিষের অন্তঃপরজীবী বা কৃমি প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে পারাই প্রকৃত উপায়।

মহিষের পরজীবীর প্রকারভেদ

মহিষের পরজীবী মূলত : তিন প্রকারের হয়ে থাকে। যথাঃ-

১। বহিঃপরজীবী বা External parasites (চিত্র ১ ক ও খ) : এ সকল পরজীবী মহিষের শরীরের ওপরের অংশের অর্থাৎ, ত্বকে আক্রমণ করে। বহিঃপরজীবী মহিষের শরীরের রক্ত, ত্বক ও পশম বা লোম খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে। বহিঃপরজীবীর আক্রমণে মহিষের ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি হয়। ক্ষতস্থান অনবরত চুলকাতে থাকে এবং চুলকানির ফলে মহিষ অস্বস্থি বোধ করে। এছাড়া, বহিঃপরজীবী বিভিন্ন রোগের বাহক হিসেবেও কাজ করে। আক্রান্ত মহিষ পর্যাপ্ত উৎপাদনে আসতে পারে না। আঠালী, উকুন, মাইট ইত্যাদি বহিঃপরজীবীর অর্ন্তভুক্ত।

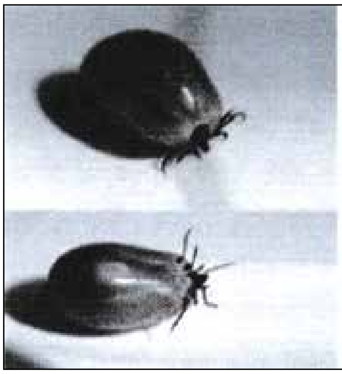

চিত্র-১ (ক): মহিষের আঠালী চিত্র-১ (খ): মহিষের ওলানে আঠালীর আক্রমণ

চিত্র-৪: মহিষের পাতা কৃমি বা কলিজা কৃমি

২। অন্তঃপরজীবী বা Internal parasites : এ সকল পরজীবী মহিষের শরীরের পরিপাকতন্ত্রে বা অন্ত্রে বাস করে তাই, এদের অন্তঃপরজীবী বা অন্ত্রীয় পরজীবী বলে। প্রচলিত ভাষায় এগুলো কৃমি নামে পরিচিত। কৃমির আকৃতির ওপর নির্ভর করে মহিষের কৃমিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

ক) **গোল কৃমি :** এরা দেখতে কেঁচোর মতো। এরা মহিষের পাকস্থলী বা অন্ত্রে বাস করে। মহিষে আক্রমনকারী কৃমিসমূহের মধ্যে এদের প্রাদূর্ভাবই সর্বাধিক। প্রজাতিভেদে এদের আকার ও আকৃতি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। মহিষ বাছুরে এদের আক্রমনের হার সর্বাধিক এবং এদের আক্রমনে বাংলাদেশে প্রতি বছর বহু মহিষ বাছুর মারা যায় (চিত্র-২)।

চিত্র-২: মহিষের গোল কৃমি

চিত্র-৩: মহিষের ফিতা কৃমি

খ) **ফিতা কৃমি :** এরা দেখতে ফিতার মতো এবং বেশ লম্বা হয়। এরা মহিষের পাকস্থলী বা অন্ত্রে বাস করে। প্রজাতিভেদে এদের আকার বেশ কয়েক মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে (চিত্র-৩)।

গ) **পাতা কৃমি :** এরা দেখতে পাতার মতো চ্যাপ্টা হয়। এরা সাধারণতঃ গরু মহিষের কলিজায় বাস করে। এরা কলিজা কৃমি নামেও পরিচিত (চিত্র-৪)।

৩। রক্ত পরজীবী বা Blood parasites : এরা মহিষের রক্তে বাস করে। এরা এক কোষীয় এবং আণুবীক্ষণিক। খালি চোখে এদের দেখা যায় না।

অন্তঃপরজীবী কৃমি আক্রান্ত মহিষের লক্ষণ (চিত্র-৫ ও ৬)

অন্তঃপরজীবী বা কৃমি আক্রমনের ফলে রোগাক্রান্ত মহিষে বিভিন্ন রকম লক্ষণ প্রকাশ পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত মহিষে লক্ষণ দেখে অন্তঃপরজীবীর আক্রমন সনাক্ত করা যায়। কৃমি আক্রান্ত মহিষে সাধারণত নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় :

- আক্রান্ত মহিষ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে
- মহিষের কর্মশক্তি ও উৎপাদন কমে যায়
- মহিষ বাছুরের বৃদ্ধি ব্যহত হয়
- ক্ষুধামন্দা হয় ও মাঝে মাঝে ক্ষুধাধিক্য দেখা যায়
- বাছুরের পেট ফুলে যায়
- চোয়ালের নিচে পানি জমে (কলিজা কৃমির ক্ষেত্রে)
- পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া হয়। তবে, কখনো কখনো কোষ্ঠ কাঠিন্যও দেখা যায়
- মহিষ হাড্ডিসার হয়ে পড়ে
- চামড়ার উজ্জ্বলতা থাকে না ও চামড়া খসখসে হয়ে যায়
- লোম উঠে যায় এবং
- ওজন হ্রাস পায়।

চিত্র ২: কৃমি আক্রান্ত মহিষ

চিত্র ৩: কৃমি আক্রান্ত মহিষ বাছুর

পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতিসমূহ

অন্তঃপরজীবী বা বহিঃপরজীবী যেটাই হোক না কেন, এরা মহিষসহ অন্যান্য গবাদি প্রাণীর প্রভূত ক্ষতিসাধন করে থাকে। কৃমি প্রাণীর পুষ্টিতে ভাগ বসায় ফলশ্রুতিতে, প্রাণী পুষ্টিহীনতায় ভোগে। কোন কোন কৃমি মহিষের অন্ত্র থেকে রক্ত পান করে এবং রক্তপাত ঘটায়, এর ফলে মহিষ রক্তশূন্যতায় ভোগে। কলিজাকৃমি কলিজায় ঘায়ের সৃষ্টি করে, এতে কলিজায় রক্তক্ষরণ হয়, জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে, কলিজা নষ্ট হয়ে মহিষ মারা যায়। কৃমি, বিশেষ করে ফিতা কৃমি অন্ত্রনালী বন্ধ করে মহিষের মৃত্যু ঘটাতে পারে। কৃমি মহিষের শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটায়। কোন কোন কৃমি মহিষের নাকে ক্ষত সৃষ্টি করে, এতে রক্তক্ষরণ হয়। ফলশ্রুতিতে, রক্তশুন্যতার ও জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণের ফলে মহিষ মারাও যেতে পারে। কিছু কিছু কৃমি ফুসফুসে ক্ষত সৃষ্টি করে, এতে রক্তক্ষরণ হয় ফলে, ফুসফুসে জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। কখনো কখনো এতে নিউমোনিয়ায় সৃষ্টি হয়। কৃমির আক্রমণের ফলে মহিষের গায়ের লোম উশকোখুশকো হয়ে যায় এবং লোম উঠে যায়। বহিঃপরজীবী মহিষের বহিঃত্বক বা এর নিম্নস্থ কলায় বাস করে ও ত্বকীয় কলা, লোম, পশম রক্ত খেয়ে জীবন ধারণ করে। এতে চামড়ায় ঘায়ের সৃষ্টি হয়। ফলে, চামড়ায় গুণগতমান কমে যায়। কিছু কিছু বহিঃপরজীবী মহিষের রক্ত পান করে ফলে, রক্তক্ষরণ হয়ে রক্ত শূন্যতার ও জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। চামড়ার ক্ষতে দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে মহিষ মারাও যেতে পারে। কিছু কিছু বহিঃপরজীবী অনেক জটিল রোগের মধ্যম বাহক হিসেবে কাজ করে। এরা এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে অনেক জটিল রোগ যেমন, ব্যাবেসিওসিস, থেইলেরিওসিস ইত্যাদি রোগের সংক্রমণ ঘটায়। পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত মহিষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে, এরা সহজেই অন্যান্য জটিল রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলশ্রুতিতে, মহিষ বিভিন্ন রোগ-বালাই দ্বারা আক্রান্ত হয়। এতে মহিষের উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়, অনেক সময় মহিষ মারা যায়। ফলে, খামারি ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

অন্তঃপরজীবী আক্রান্ত মহিষের চিকিৎসা

অন্তঃরজীবী আক্রান্ত মহিষের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কৃমির ধরণ নিশ্চিত হয়ে চিকিৎসা করলে সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায়। এ জন্য মহিষের গোবর পরীক্ষা করে চিকিৎসা করা ভাল। তবে, গোবর পরীক্ষা করার সুযোগ না থাকলে ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমিনাশক বাজার থেকে সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে হবে। বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানীর কৃমিনাশক ঔষধ বাজারে পাওয়া যায়। বাজারে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার কৃমির ঔষধের মাত্রা ভিন্ন। তাই, কৃমিনাশক থেকে সর্বোত্তম ফল পেতে ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী মহিষের দৈহিক ওজন অনুপাতে কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে। মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (কম্পনেন্ট-বি) এর অধীনে পরিচালিত গবেষণা থেকে নিম্নলিখিত কৃমিনাশক ব্যবহার করে পরজীবী আক্রান্ত মহিষের চিকিৎসায় সুফল পাওয়া গেছে।

ক) লিভামিসল হাইড্রোক্লোরাইড এটা একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্রড - স্পেকট্রাম কৃমিনাশক, যা মহিষের গোল কৃমি, ফিতা কৃমি ও পাতা কৃমির বিরুদ্ধে কার্যকর। মহিষের প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৭.৫ মি.গ্রা. করে একবার খাওয়ালে সুফল পাওয়া যায়। কৃমির প্রাদুর্ভাব থাকা সত্ত্বেও কৃমির প্রজাতি নির্ণয়ের সুযোগ না থাকলে এই ব্রড স্পেকট্রাম কৃমিনাশকটি ব্যবহার করা যতে পারে।

খ) ফেনবেন্ডাসল-হাইড্রোক্লোরাইড- এটাও একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্রড স্পেকট্রাম কৃমিনাশক যা, মহিষের গোল কৃমির বিরুদ্ধে অধিক কার্যকর হলেও ফিতা কৃমি ও পাতা কৃমির বিরুদ্ধেও কাজ করে। মহিষের প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৭.৫ মি.গ্রা. হিসেবে একবার খাওয়ালে সুফল পাওয়া যায়।

গ) টেট্রামিসল হাইড্রোক্লোরাইড - এটাও একটি ব্রড স্পেকট্রাম কৃমিনাশক। এরা মহিষের গোল কৃমি, ফিতা কৃমি ও পাতা কৃমির বিরুদ্ধে কাজ করে। মহিষের প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১৫ মি.গ্রা. হিসেবে একবার খাওয়ালে সুফল পাওয়া যায়।

ঘ) এলবেন্ডাসল- এলবেন্ডাসল ব্রড স্পেকট্রাম কৃমিনাশক হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত। মহিষসহ যাবতীয় প্রাণীর গোল কৃমি, ফিতা কৃমি ও পাতা কৃমির বিরুদ্ধে এই ঔষধ কাজ করে। কিন্তু ঔষধটির মাত্রারিক্ত ব্যবহার কৃমিনাশকটির কার্যকারিতা অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছে। তথাপি, মহিষের প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৭.৫ - ১০ মি.গ্রা. হিসেবে একবার খাওয়ালে সুফল পাওয়া যায়।

ঙ) থায়াবেন্ডাসল- এলবেন্ডাসল ও থায়াবেন্ডাসল একই জাতের কৃমিনাশক। এলবেন্ডাসল এর মতো এই জাতের কৃমিনাশকেরও ব্রড স্পেকট্রাম কার্যক্ষমতা আছে। কিন্তু, এরা মহিষের গোল কৃমির বিরুদ্ধে অধিক কার্যকর। মহিষে ৭.৫ - ১০ মি.গ্রা./কেজি দৈহিক ওজন হিসেবে খাওয়ালে সুফল পাওয়া যায়।

চ) ট্রাইক্লাবেন্ডাসল- এটা একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ন্যারো স্পেকট্রাম কৃমিনাশক যা মূলতঃ মহিষের পাতা কৃমির বিরুদ্ধে কার্যকর। মহিষের প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০-১৫ মি.গ্রা. হিসেবে একবার খাওয়ালে সুফল পাওয়া যায়।

ছ) নাইট্রোক্সিনিল- এটাও একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ন্যারো স্পেকট্রাম কৃমিনাশক যা মূলতঃ মহিষের পাতা কৃমির বিরুদ্ধে কার্যকর। পাতা কৃমি ছাড়াও এটা কিছু কিছু গোল কৃমির বিরুদ্ধে কাজ করে। মহিষের প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০-১৫ মি.গ্রা. হিসেবে ঘাড়ের চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হয়।

জ) হেক্সাক্লোরোফেন- নাইট্রোক্সিনিল এর মতো এটাও একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ন্যারো স্পেকট্রাম কৃমিনাশক যা মূলতঃ মহিষের পাতা কৃমির বিরুদ্ধে কার্যকর। হেক্সাক্লোরোফেন ফিতা কৃমি সংক্রমনেও ব্যবহার করা যায়। মহিষের প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০-১৫ মি.গ্রা. হিসেবে খাওয়াতে হয়। কিন্তু দুর্বল মহিষের ক্ষেত্রে এই কৃমিনাশক প্রয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। দুর্বল মহিষের ক্ষেত্রে দৈহিক ওজন অনুসারে নির্ধারিত মাত্রার অর্ধেক করে এক সপ্তাহ ব্যবধানে পুর্ণ মাত্রা প্রয়োগ করতে হবে।

মহিষের পরজীবী দমন ও প্রতিরোধের উপায়

আমাদের দেশের মহিষ পালনকারীরা মহিষকে নিয়মমত কৃমিনাশক খাওয়ানোর বিষয়ে বেশ অবহেলা করে থাকেন। তাঁরা শুধুমাত্র কৃমি আক্রান্ত মহিষকেই কৃমিনাশক খাওয়ান। এছাড়াও লক্ষনীয় যে, মহিষ বা তার বাছুর যতক্ষণ না পর্যন্ত কৃমির আক্রমনের কারণে ভয়াবহভাবে রোগাক্রান্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা কৃমিনাশক ব্যবহারে অনীহা প্রকাশ করেন। ফলে যথাসময়ে কৃমি নাশক না খাওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে, মহিষ বাছুর মারা যায়। মহিষের উৎপাদন কমে যাওয়ায় কৃষকেরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। যেহেতু, পরজীবী পরোক্ষভাবে বেশি ক্ষতি সাধন করে, সেহেতু, পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি সহসা নজরে আসে না। এমতাবস্থায়, মহিষের পরজীবী সঠিকভাবে দমন ও প্রতিরোধের জন্য 'মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (কম্পনেন্ট-বি)' এর অধিনে উপগবেষণা প্রকল্প হিসেবে পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে সমন্বিত কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে (চিত্র-৭)।

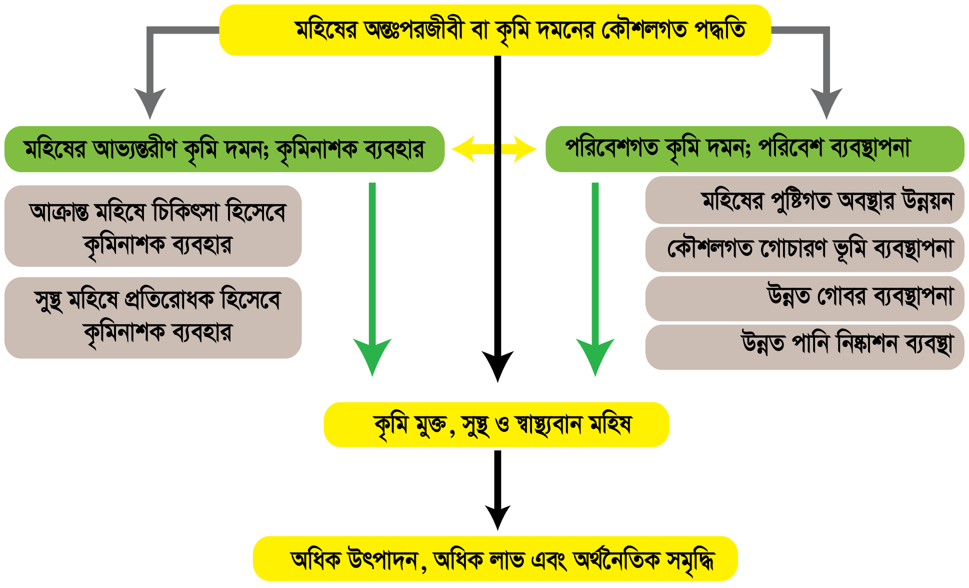

মহিষের অন্তঃপজীবী বা কৃমি দমনের সমন্বিত কৌশলগত পদ্ধতি

উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর কারণে বাংলাদেশে পরজীবীসৃষ্ট রোগসমূহের প্রাদুর্ভাব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। তাই, বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বাংলাদেশে মহিষের পরজীবী দমন ও প্রতিরোধের কৌশল কিছুটা ভিন্ন ও পরিবেশ সম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশে মহিষের পরজীবী দমন ও প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে মহিষের পরজীবী বা কৃমি দমন ও প্রতিরোধের উপায় বা কৌশল নির্ধারণ করা উচিৎ।

১। **পরজীবী সম্পর্কিত তথ্য :** যে এলাকার পরজীবী বা কৃমি দমন ও প্রতিরোধ করতে হবে সে এলাকায় প্রাপ্ত পরজীবী সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য যেমন, বিভিন্ন প্রজাতির পরজীবীর উপস্থিতি, প্রাচুর্য ও বিস্তার সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য থাকতে হবে।

২। **পরজীবীর জীবনচক্র সম্পর্কে ধারণা :** পরজীবীর জীবনচক্র এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয় যা মহিষের ভিতরে এবং বাইরের পরিবেশে পরজীবী আচার-আচরণ বুঝতে সাহায্য করবে। কিছু কিছু পরজীবীর জীবনচক্র সরাসরি, আবার কিছু কিছু পরজীবীর জীবনচক্রে অন্তবর্তী বা মাধ্যমিক পোষকের প্রয়োজন। যেমন, বেশিরভাগ গোল কৃমির জীবনচক্র হচ্ছে সরাসরি কিন্তু পাতা কৃমি ও ফিতা কৃমির জীবনচক্রে মাধ্যমিক বা অন্তবর্তী পোষকের প্রয়োজন (চিত্র- ৮)। পরজীবী বা কৃমির জীবনচক্র সম্পর্কে ধারণা থাকলে পরজীবী দমন ও প্রতিরোধের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া সহজ।

চিত্র: মহিষের অন্তঃপরজীবীর সাধারণ জীবন চক্র

৩। **মহিষের পুষ্টিগত অবস্থা :** মহিষের পুষ্টিগত অবস্থা পরজীবীর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে উত্তরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে সুস্থ, সবল ও সুষম পুষ্টি সম্পন্ন প্রাণীতে কৃমি বা পরজীবীর ক্ষতিকর প্রভাব অসুস্থ, দুর্বল ও পুষ্টিহীন প্রাণীর তুলনায় কম। অতএব, মহিষের খাবারে পর্যাপ্ত পুষ্টির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পারলে কৃমি বা পরজীবীর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মহিষকে রক্ষা করা সহজ হবে।

৪। মহিষচারণ ভূমি ব্যবস্থাপনা :

ক) **স্টকিং রেট বা মহিষচারণ ভূমিতে মহিষের সংখ্যা :** চারণ ভূমিতে মহিষের সংখ্যা বেশি হলে চারণভূমির দূষণ মাত্রার হার বেশি হবে। চারণ ভূমিতে অধিক সংখ্যক মহিষ পালন করা হলে কৃমির ডিম ও লার্ভার দ্বারা চারণভূমি সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে বিধায় উক্ত চারণভূমিতে পালনকৃত মহিষে কৃমি সংক্রমণের হার বেশি হয়। মহিষ পালনের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রতি হেক্টর জমিতে ১০ টি মহিষ চরাণোর সুপারিশ করা হয়।

খ) **গোচারণ বা মহিষচারণ ভূমির সবিরাম ব্যবহার :** মহিষচারণ ভূমিতে কৃমির ডিম ও লার্ভার সংক্রমণ কমানোর লক্ষ্যে মহিষচারণ ভূমি অবিরাম ব্যবহার না করে সবিরাম ব্যবহার করা যেতে পারে। মহিষচারণ ভূমির সবিরাম ব্যবহার বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন মহিষচারণ ভূমি থেকে মহিষের পালসহ অন্যান্য গবাদি প্রাণীকে সরিয়ে নিয়ে চারণ ভূমিস্থ কৃমির ডিম ও লার্ভা ধ্বংস করা বোঝায়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কোন চারণ ভূমিতে ২ মাস মহিষ চরাণোর পর ঐ চারণ ভূমিকে ২ মাসের জন্য অব্যবহৃত রাখলে ঐ চারণ ভূমি কৃমির ডিম ও লার্ভার সংক্রমণ মুক্ত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

গ) **বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণিপোষকের সঙ্গে মহিষচারণ ভূমির বিকল্প ব্যবহার :** এক্ষেত্রে এক প্রজাতির পোষককে একটি মহিষচারণ ভূমিতে চরাণোর পর অন্য প্রজাতির কোন পোষককে ঐ মহিষচারণ ভূমিতে চরাণো হয়। যেহেতু, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিপোষকের কৃমির প্রকারও ভিন্ন, সেহেতু, প্রজাতিভেদে গবাদিপ্রাণী একই চারণ ভূমিতে চরাণোর ফলে কৃমি বা পরজীবীর সংক্রমণের হার কমে যায়। এক্ষেত্রে, মহিষ চরাণোর পর ভেড়া বা ছাগল চরাণো যেতে পারে। এভাবে মহিষ ও ভেড়া পর্যায়ক্রমে চরাণো কৃমি দমনের জন্য খুব সাধারণ এবং কার্যকর পদ্ধতি।

ঘ) **একই প্রজাতির পোষকের সঙ্গে গোচারণ ভূমির বিকল্প ব্যবহার :** প্রজাতি ভেদে গবাদিপ্রাণী একই চারণ ভূমিতে চরাণোর সুযোগ না থাকলে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে একই চারণ ভূমিতে একই প্রজাতির পোষক চরাণো হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করা হয়ঃ

১) গোচারণ ভূমিতে প্রথমে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মহিষ বা বাছুর চরাতে হবে। এক্ষেত্রে চারণ ভূমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেয়া যেতে পারে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক মহিষ বা বাছুর চরাণোর পর উক্ত ভাগগুলোতে প্রাপ্ত বয়স্কদের মহিষ চরাতে হবে। যেহেতু, প্রাপ্ত বয়স্ক মহিষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি, সেহেতু, তাদের কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।

২) **চারণ ভূমির ঘাসের ব্যবহার :** মহিষ বা মহিষ বাছুরকে লম্বা ঘাসের উপরের অংশ খাওয়াতে হবে। বেশির ভাগ কৃমির ডিম ও লার্ভা ঘাসের গোড়ার দিকে থাকে। এজন্য মাটি থেকে কমপক্ষে ১০ সেঃমিঃ উচ্চতায় ঘাস খাওয়ালে কৃমি সংক্রমণের হার অনেক কমে যায়।

৩) **চারণ ভূমি ব্যবহারে সময়ের ভূমিকা :** দিনের প্রথম ও শেষ ভাগে যখন তাপমাত্রা কম থাকে, তখন লার্ভা সহজেই ঘাসের ডগায় চলে আসে। আবার রোদ উঠলে লার্ভা মাটিতে নেমে যায়। এজন্য রোদ উঠার পর বিশেষ করে ঘাসের শিশির কণা শুকিয়ে গেলে পরে মহিষ চরাণো উচিত।

ঙ) **গোবর ব্যবস্থাপনা :** কৃমি সংক্রমণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে গোবর। সাধারণত গোবর মাধ্যমেই কৃমি এক মহিষ থেকে অন্য মহিষে সংক্রমিত হয়। এজন্য মহিষের গোবরের যথাযথ ব্যাবস্থাপনা কৃমি প্রতিরোধ ও দমনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। এজন্য মহিষের গোবর গোয়াল ঘর থেকে দূরে নিরাপদ স্থানে ফেলতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব গোবর গোয়াল ঘর থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে মহিষের খাদ্য যাতে কোনভাবেই গোবরের সংস্পর্শে না আসে। প্রয়োজনে গোবরে ইউরিয়া মিশানো যেতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১২৫ ভাগ গোবরে ১ ভাগ ইউরিয়া মিশালে গোবরের মধ্যকার লার্ভা এবং কৃমির ডিম ধ্বংস হয়।

চ) **ড্রেনেজ বা পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন :** গোয়াল ঘরের ড্রেনেজ বা পানি নিষ্কাশন ব্যাবস্থার উন্নয়ন মহিষের কৃমি দমন ও প্রতিরোধে অবশ্য পালনীয় একটি বিষয়। ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ কৃমির ডিম ও লার্ভার বৃদ্ধির জন্য আদর্শ; এজন্য গোয়াল ঘর যথাসম্ভব শুকনো রাখতে হবে। গোয়াল ঘরে আলো বাতাস চলাচলের পর্যাপ্ত ব্যাবস্থা রাখতে হবে।

ছ) **কৃমিনাশক ব্যবহার :** মহিষের কৃমি দমন ও প্রতিরোধে কৃমিনাশক ব্যবহারে কৌশলী হতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পরজীবী দমন ও প্রতিরোধের প্রচলিত কৌশল অনুযায়ী বছরে দুইবার কৃমিনাশক প্রয়োগের চেয়ে মহিষে বছরে তিনবার অর্থাৎ, প্রতি চার মাস পরপর কৃ

মিনাশক প্রয়োগ অধিকতর ভালো ফল বয়ে আনে। এক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখতে হবে যে, কৃমিনাশক মহিষকে সেসময় পর্যন্তই কৃমি মুক্ত রাখে যতক্ষণ কৃমিনাশকের ঔষধি গুণাগুণ মহিষের উপর বর্তমান থাকে। কৃমিনাশক কখনই কৃমির পুনঃআক্রমন রোধ করে না যদি না মহিষের পারিপার্শিক পরিবেশ থেকে কৃমির উৎস নির্মূল করা যায়। কৃমিনাশক ব্যবহারের পাশাপাশি পরিবেশ থেকে কৃমির উৎস নির্মূল করা আবশ্যক। সুস্থ মহিষে প্রতিরোধক হিসেবে কৃমিনাশক প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পন্থা অনুসরণ করলে সর্বাধিক ভালো ফলাফল লাভ সম্ভব বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।

- যথাযথভাবে অন্তঃপরজীবী দমনের জন্য পালের সকল মহিষকে একই সাথে কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে।
- প্রতি চার মাস পরপর বছরে তিনবার নিয়মিতভাবে পালের সকল মহিষকে একই সাথে কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- জলজ, স্যাতসেতে ও কর্দমাক্ত এলাকায় মহিষ চরাণোর ক্ষেত্রে জলাশয়ে বা ঐ স্থানের শামুকের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। প্রয়োজনে শামুক নিধনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- কাটা ঘাস বা জলজ উদ্ভিদ ভালোভাবে ধুয়ে মহিষকে খাওয়াতে হবে। মহিষের গোবর নিরাপদ দূরত্বে ফেলতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে মহিষ বা বাছুরের খাবার গোবরের সংস্পর্শে না আসে।
- মহিষকে যথাযথ পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার সরবরাহ করতে হবে।

উপকারিতা

মহিষের পরজীবী দমন ও প্রতিরোধের কৌশল যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে তা নিশ্চিতভাবে পালনকারীর আর্থিক সুফল বয়ে আনবে। এই কৌশল মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষিত। মহিষ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত আলোচ্য নির্দেশনা খামারিরা অনায়াসে অনুসরণ করতে পারে। এখানে উল্লেখিত কৃমিনাশকসমূহ বাজারে সহজলভ্য ও দামে সাশ্রয়ী। ফলে, খুব অল্প খরচে মহিষ খামারিগণ তাদের মহিষকে কৃমি মুক্ত রাখতে পারবেন। এতে মহিষের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। উৎপাদন ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলশ্রুতিতে মহিষ খামারিদের আয় বৃদ্ধি পাবে।

কাঙ্ক্ষিত ফলাফল

মহিষের পরজীবী দমন ও প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনাগুলি নিয়মিত প্রয়োগের মাধ্যমে মহিষকে পরজীবীমুক্ত রাখা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি। নির্দেশনা অনুসরণে মহিষের মাংস ও দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যাবে, যা মহিষ খামারিদের আর্থিক সচ্ছলতা বাড়িয়ে তাঁদের আত্মনির্ভশীল হতে সাহায্য করবে। যা প্রকারান্তরে দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণেও বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. কে. বি. এম সাইফুল ইসলাম এবং ড. টি এন নাহার

গাভীতে আমব্রায়ো ট্রান্সফার প্রযুক্তি ব্যবহার

ভূমিকা

ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তিটি প্রয়োগের ফলে গবাদিপ্রাণীর প্রজনন ক্ষমতা বাড়ানো এবং কৌলিক মানের উন্নয়ন সাধিত হয়। তাছাড়া যে সমস্ত গাভী উর্বর কিন্তু বাচ্চা উৎপাদনে অক্ষম এবং বয়স্ক গাভীকে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাচ্চা উৎপাদনে সক্ষম করা সম্ভব। প্রযুক্তিটি উন্নত বিশ্বে সীমিত পর্যায়ে ব্যবহার হয় এবং আমাদের দেশী গাভীতে এর উপযোগিতা যাচাইপূর্বক ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য/সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রযুক্তিটির মূল বিষয় হচ্ছে, কোনো নির্দিষ্ট গাভীর সাধারণ বংশ বৃদ্ধি হার এবং পরোক্ষভাবে প্রজন্মের কৌলিকমান উন্নয়ন। সাধারণত প্রতি ঋতুকালে একটি গাভী একটি মাত্র বাচ্চা উৎপাদন করে। সে মতে একটি গাভীর পুন:উৎপাদনকাল সময়ে গড়ে ৮-১০ টি বাচ্চা উৎপাদন করতে সক্ষম। কিন্তু উক্ত নির্দিষ্ট গাভীটির প্রতি ঋতুকালে একাধিক ভ্রূণ উৎপাদন ও সংগ্রহ করা সম্ভব। উক্ত সংগৃহীত ভ্রূণ অন্য ঋতুবর্তী সাধারণ গাভীতে স্থানান্তর করা সম্ভব।

- একটি নির্দিষ্ট গর্ভকালীন সময়ে কাঙ্ক্ষিত গাভীর একাধিক বাচ্চা উৎপাদন করা যায়
- ভ্রূণ উৎপাদন, সংগ্রহ, চিহ্নিতকরণ এবং স্থানান্তর প্রতিটি পদক্ষেপই অতিশয় সংবেদনশীল এবং বিজ্ঞানভিত্তিক
- প্রাপ্ত তথ্য মতে কাঙ্ক্ষিত গাভী থেকে বছরে দুন্বারের বেশি একাধিক ভ্রূণ উৎপাদন ও সংগ্রহ করা উচিত নয়।

ব্যবহার পদ্ধতি

ভ্রূণ উৎপাদন এবং স্থানান্তর প্রযুক্তিটি নিম্নলিখিত চার (৪) টি ধাপে সম্পন্ন করা হয়।

১. ভ্রূণ দাতা ও গ্রহীতা গাভী নির্বাচন
২. দাতা গাভী থেকে ভ্রূণ উৎপাদন ও সংগ্রহ
৩. গবেষণাগারে ভ্রূণ চিহ্নিত ও পৃথকীকরণ এবং
৪. গ্রহীতা গাতীতে ভ্রূণ স্থানান্তর।

(ক) ভ্রূণ দাতা ও গ্রহীতা গাভী নির্বাচন

দাতা গাভী অবশ্যই অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে। দাতা এবং গ্রহীতা গাভী নির্বাচনকালে গাভীর প্রজনন স্বাস্থ্য সুস্থ হতে হবে। অর্থাৎ দাতা গাভীর উৎপাদন ও পুন:উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলী ভালো থাকতে হবে। গ্রহীতা গাভীর স্বাস্থ্য ও দৈহিক ওজন দাতা গাভীর বাচ্চা ধারণের উপযোগী কি না তা পূর্বেই নির্ধারণ করা উচিত।

(খ) দাতা গাভী থেকে একাধিক ভ্রূণ উৎপাদন ও সংগ্রহ

খ. ১ একাধিক ভ্রূণ উৎপাদন ও গ্রহীতা গাভীর গরম অবস্থা সমকালীনকরণ

দাতা গাভী থেকে একাধিক ভ্রূণ উৎপাদনের জন্য ইনজেকশনের মাধ্যমে দুই ধরনের হরমোনের যে কোনো একটি প্রয়োগ করা হয়। এগুলো হচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে প্রাপ্ত Pregnant Mare Serum Gonadotrophin (PMSG) অথবা Follicle Stimulating Hormone (FSH)। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে PMSG হরমোন স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায় এবং এর ব্যবহার পদ্ধতিও FSH হরমোনের তুলনায় সহজ।

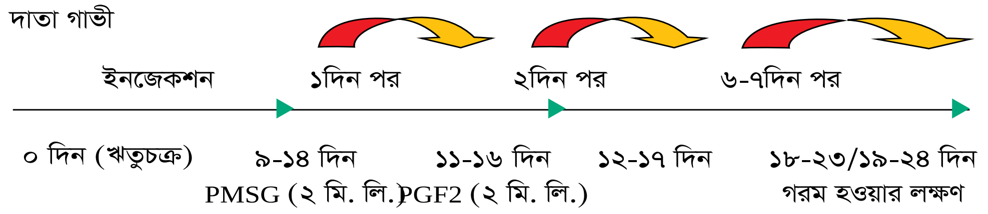

ভ্রূণ সংগ্রহ ও প্রজনন (১২-১৮ ঘণ্টার মধ্যে)

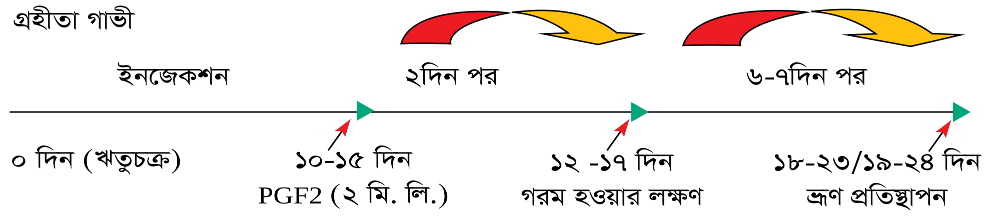

এখানে উল্লেখ্য যে, দাতা গাভীকে PMSG হরমোন প্রয়োগ করতে হবে সাধারন ঋতু চক্রের ঠিক ৯ থেকে ১৪ দিন পর। কারণ এ সময়ে ফলিকলগুলো (Follicle) বৃদ্ধির পর্যায়ে থাকে এবং ওভুলেশনের হারও বেশি হয়। কাজেই এই সময়ে PMSG হরমোন প্রয়োগ করলে অধিকসংখ্যক ভ্রূণ সংগ্রহ করা সম্ভব। PMSG হরমোনটি হীপের (Hip) মাংশপেশীতে প্রয়োগ করা হয়, যার মাত্রা ২৫০০-৩০০০ IU হওয়া আবশ্যক। করপাস লিউটিয়ামের কার্যক্ষমতা হ্রাস এবং গাভীর গরম অবস্থা সঠিকভাবে প্রদর্শনের জন্য PMSG হরমোন প্রয়োগের ২ দিন পর PGF2α হরমোন ইনজেকশন দেয়া হয়। গ্রহীতা গাভীকে ভ্রূণ স্থানান্তরের জন্য প্রস্তুতের লক্ষ্যে দাতা গাভীকে PGF2α ইনজেকশন প্রয়োগের এক (১) দিন পূর্বেই গ্রহীতা গাভীকে উক্ত ইনজেকশনটি দেয়া হয়। কারণ সুপার ওভুলেটরি হরমোনাল ট্রিটমেন্টের জন্য দাতা গাভী গ্রহীতা গাভীর ১২-১৮ ঘণ্টা পূর্বে হিটে আসে।

খ. ২ দাতা গাভী গরম হওয়া নির্ণয়

ভ্রূণ স্থানান্তরের সাফল্য নির্ভর করে দাতা গাভী গরম হওয়ার সঠিক সময় নির্ণয়ের ওপর। এ ব্যাপারে পারদর্শী না হলে ভ্রূণ স্থানান্তরের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। সুতরাং প্রতিদিন সকাল ও বিকেল গাভীকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গরম হওয়ার সঠিক সময় চিহ্নিত করে প্রজনন করাতে হবে।

খ. ৩ দাতা গাভীকে প্রজনন করানো

দাতা গাভীর গরম অবস্থা শুরু হওয়ার ১২-১৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রজনন করাতে হবে। দুইবার প্রজনন করাতে হবে। অর্থাৎ দাতা গাভী সকালে গরম হলে বিকেলে এবং পরের দিন সকালে প্রজনন করাতে হবে। প্রজনন পদ্ধতি প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম যে কোনোটাই হতে পারে।

খ. ৪ ভ্রূণ সংগ্রহ

দাতা গাভীকে প্রজনন করার ৬-৭ দিন পর ফ্লাশিং করে ভ্রূণ সংগ্রহ করতে হবে।

ভ্রূণ সংগ্রহের জন্য দাতা গাভীর প্রস্তুতি

- লেজের অগ্রভাগ ক্লিপ দিয়ে আটকিয়ে ৭০% অ্যালকোহল দ্বারা স্পাইনাল কলাম পরিষ্কার করতে হবে যাতে উক্ত স্থান জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত না হয়।
- গাভীর স্পাইনাল কর্ডে লোকাল এনেসথেসিয়া (Anesthesia) প্রয়োগ করে মলদ্বারে হাত দিয়ে ওভারিতে ওভুলেশনের পার্শ্ব (ইউটেরাইন হর্ন) চিহ্নিত করতে হবে।
- ভ্রূণ সংগ্রহের জন্য ফ্লাশিং মিডিয়া অর্থাৎ ল্যাক্টোরিঙ্গার দ্রবণ জরায়ুতে প্রবেশ করিয়ে ভ্রূণ সংগ্রহ করতে হয় যাকে ফ্লাশিং বলে। ইউটেরাইন হর্ন ফ্লাশিং পদ্ধতিতে (Uterine horn flushing method) ফ্লাশিং করা হয়। এ পদ্ধতিতে দুই মুখবিশিষ্ট ফলিক্যাথেটার (Two way catheter) ব্যবহার করে ভ্রূণ সংগ্রহ করা হয়।

(গ) ভ্রূণ চিহ্নিত এবং পৃথকীকরণ

ফ্লাশিং এর মাধ্যমে ইউটেরাইন হর্ন থেকে প্রাপ্ত তরল (প্রায় ১ লিঃ) একটি জীবাণুমুক্ত গ্লাস বোতলে সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে এমকন ফিল্টার (0.22µ pore size) দ্বারা ছাকনের পর মাইক্রোস্কোপের ১০× ম্যাগনিফিকেশনে ভ্রূণ চিহ্নিত করতে হবে। মাইক্রোস্কোপে ভ্রূণ চিহ্নিত করণের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভ্রূণকে পরিষ্কার করে গ্রহীতা গাভীতে প্রতিস্থাপন করতে হবে। সাধারণত ভ্রূণকে ২০% ফিটাল কাফ সিরাম এবং এন্টিবায়োটিক (পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন) দ্বারা পরিষ্কার করা হয়। ভ্রূণ স্থানান্তরের পূর্বে ভ্রূণকে মূল্যায়ন (Embryo quality) করতে হবে। এক্ষেত্রে অতি উত্তম (Excellent) এবং উত্তম গুনাবলী সম্পন্ন (Good quality) ভ্রূণ স্থানান্তর করা বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) ভ্রূণ স্থানান্তর

ভ্রূণ সংগ্রহ, চিহ্নিতকরণ এবং পরিষ্কারকরণের পর পূর্বে প্রস্তুতকৃত গ্রহীতা গাভীতে স্থানান্তর করার জন্য ট্রাবিসে (Travis) আনা হয় এবং মলদ্বারে হাত দিয়ে ইউটেরাইন হর্নে করপাস লিউটিয়াম চিহ্নিত করতে হয়। ভ্রূণ স্থানান্তরের কৌশল অনেকটা কৃত্রিম প্রজননের মতোই। গ্রহীতা গাভীর ওভারীতে করপাস লিউটিয়াম চিহ্নিত করণের পর ৭০% অ্যালকোহল দ্বারা স্পাইনাল কলাম পরিষ্কার করতে হয়। এরপর ভ্রূণ স্থানান্তরের জন্য বিশেষভাবে তৈরিকৃত যন্ত্রটি (Embryo Transfer Gun) সতর্কতার সাথে গ্রহীতা গাভীর ইউটেরাইন হর্ণের (Uterine horn) যে পার্শ্বেকরপাস লিউটিয়াম থাকে সেই ইপসিলেটারাল (Ipsilateral) হর্নে প্রবেশ করে ভ্রূণ প্রতিস্থাপন করতে হবে।

আয়-ব্যয়

প্রযুক্তিটি ব্যবহারের ফলে ভ্রূণ স্থানান্তরের মাধ্যমে একটি গাভী থেকে একই সময়ে একের অধিক বাচ্চা পাওয়া যায়। একটি গাভী তার জীবদ্দশায় ৮-১০টি বাচ্চা দেয়। কিন্ত ভ্রূণ স্থানান্তরের মাধ্যমে একটি গাভী থেকে ২৫-৩০টি বাচ্চা পাওয়া সম্ভব।

ব্যবহারের সম্ভাবনা

প্রযুক্তিটি আমাদের দেশের জন্য একেবারেই নতুন। তবে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি প্রজনন খামারগুলোতে দুগ্ধজাত গাভীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তিটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের সতকর্তা/বিশেষ পরামর্শ

- গরম অবস্থা সঠিকভাবে নির্ণয় এবং সঠিক সময়ে প্রজনন করতে না পারলে ভ্রূণ স্থানান্তরের আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।
- অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করলে ফ্লাশিং এর ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ সঠিকভাবে ফ্লাশিং করতে না পারলে ট্রিটমেন্ট খরচ অনেক বেড়ে যাবে। এছাড়া ফ্লাশিং এর ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন না করলে গাভীর প্রজনন অঙ্গের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।
- ভ্রূণ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে অতি দ্রুত ভ্রূণ স্থানান্তর করতে না পারলে ভ্রূণ মারা যেতে পারে। এতে ভ্রূণ স্থানান্তরের সাফল্য পুরোটাই ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হবে।
- গ্রহীতা গাভীর গরম অবস্থার সাথে দাতা গাভীর সামঞ্জস্যতা না হলেও ভ্রূণ স্থানান্তরের সাফল্য ব্যর্থ হবে। কাজেই উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা না করলে একদিকে যেমন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অন্যদিকে তেমন সময় ও শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন হবে না।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

সালমা আক্তার, ড. মোঃ আবদুল জলিল, ড. আজহারুল ইসলাম তালুকদার, ড. বিপ্লব কুমার রায়, মোঃ গউজ মিয়া এবং মোঃ সাহেব আলী

লাভজনক খামার ব্যবস্থাপনায় বিএলআরআই ফিড মাস্টার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার

ভূমিকা

অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রাণী পালন ও উৎপাদন সামাজিক মর্যাদার একটি মানদন্ড হিসেবে প্রচলিত ছিল। সে সময়ে মানুষ কেবল শখের বশে অথবা চাষাবাদের জন্য কিংবা পরিবারের আমিষের চাহিদা পুরনের জন্য প্রাণী পালন করত। সেখানে লাভ ক্ষতির বিষয়টা বিবেচনার বাইরে থাকত। কিন্তু বর্তমান কালের খামারিরা এই ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে কম খরচে লাভজনক ভাবে অধিক উৎপাদনশীল প্রাণী পালনে আগ্রহী হচ্ছে। লাভজনক প্রাণী উৎপাদন অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এবং খাদ্য খরচ এদের মধ্যে অন্যতম। যেহেতু, খাদ্য খরচ মোট উৎপাদন খরচের প্রায় ৬০ থেকে ৭০ ভাগ সেক্ষেত্রে প্রাণীর লিঙ্গ, বয়স, উৎপাদন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কম খরচে সঠিক পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুত করলে তা একদিকে যেমন প্রাণীর দৈহিক চাহিদা মেটাবে তেমনি খামারিরা আর্থিক ভাবে লাভবান হবে। খামারিদের প্রাণী দেহের পুষ্টির চাহিদা নিরূপন করা, চাহিদা অনুসারে খাদ্য সরবরাহ করা এবং ঘাসজাতীয় খাদ্য চাষের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা কষ্টসাধ্য কাজ। কারণ, উক্ত বিষয়ে তাদের বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের অভাব রয়েছে। মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে "বিএলআরআই ফিডমাষ্টার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন" উদ্ভাবন করা হয়েছে যা প্রাণীর বয়স, লিঙ্গ এবং উৎপাদন অবস্থার ওপর ভিত্তি করে খাদ্য সরবরাহের দিক নির্দেশনা দিতে পারে। সেই সাথে বিজ্ঞানভিত্তিক গৃহ নির্মাণ, ওজন অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ, সঠিক সময়ে টিকা প্রদানসহ প্রাণী পালনের মৌলিক বিষয়গুলো খামারিদেরকে অবহিত করতে পারে। মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি গরু এবং মহিষ উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহার যোগ্য।

সুবিধা

- বিএলআরআই ফিডমাস্টার একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন। তাই সাশ্রয়ী হিসাবে অ্যাপ্লিকেশনটি যেকোন এ্যানড্রয়েড মোবাইলে ব্যবহার করা যায়
- এর মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে বয়স, লিঙ্গ এবং উৎপাদন অবস্থার উপর ভিত্তি সরবরাহের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়
- অ্যাপ্লিকেশনটি প্রাণির দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের পরিমাণ নির্ধারণের পাশাপাশি খামারিদের মাসিক এবং বাৎসরিক ঘাস উৎপাদন পরিকল্পনা প্রনয়নে নির্দেশনা প্রদান করতে পারে
- প্রাণির চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওজনের ওপর ভিত্তি করে ঔষধের মাত্রা নির্ণয়ে প্রাণি ডাক্তারদের সহযোগিতা করতে পারে
- অ্যাপ্লিকেশনটিতে প্রাণির টিকাদান সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা ও স্বয়ংক্রিয় এ্যালার্ম ব্যাবস্থাপনা সংযোজন রয়েছে। ফলে, খামারিরা সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে টিকা প্রদান করতে পারে এবং খামারে রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে পারে এবং
- উক্ত অ্যাপ্লিকেশনে বিএলআরআই কতৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি ও প্রাণী পালনের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ই-বুক আকারে বাংলায় সংযোজিত রয়েছে। সেই সাথে নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্য খামারিদের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা রয়েছে।

ব্যবহার বিধি

রেশন: রেশন অপশনের মাধ্যমে প্রাণির চাহিদা অনুসারে খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। এখানে রেশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা (ওজন) দুই পদ্ধতিতে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে (ওজন স্কেল এবং ফিতা)। সাধারণত খামারিদের ওজন দেওয়ার জন্য ওজন স্কেল এর ব্যবস্থা থাকে না। উক্ত অবস্থা বিবেচনা করে চাহিদা অনুসারে রেশন তৈরির জন্য ফিতা অপশন দেওয়া হয়েছে। ফলে, খামারিরা বুকের মাপ ও দৈর্ঘ্যের মাধ্যমে ওজন ইনপুট দিতে পারবে। এই অ্যাপসটি ব্যবহার করে দুই ধরণের রেশন তৈরি করা যায়। একটি বাড়ন্ত এবং ষাঁড়ের জন্য (মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত) অপরটি দুধাল, গর্ভবতী এবং শুষ্ক প্রাণির জন্য। প্রথম রেশনে ১৯.৬% সিপি এবং ১১.১১ মেগা জুল বিপাকীয় শক্তি/কেজি ডিএম রয়েছে এবং দ্বিতীয় রেশনে ১৭.২২% সিপি এবং ১১.৬৭ মেগা জুল বিপাকীয় শক্তি/কেজি ডিএম রয়েছে (ফিড পিডিয়া অনুসারে)। সেই সাথে দ্বিতীয় রেশনে দুধ উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায় এবং ৬ মাসের অধিক গর্ভাবস্থা বিবেচনা করে সম্পূরক রেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। অ্যাপসটি সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়ের সাথে সাথে দৈনিক আঁশ জাতীয় খাদ্যের এবং চাহিদা পূরণের জন্য বার্ষিক ঘাষ উৎপাদন পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে।

সচিত্র ব্যবহার পদ্ধতি

মোবাইল অ্যাপসটি ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই তৈরি করা হয়েছে। নির্বাচেনের পর প্রথমে রেশন অপশনটি নির্বাচন করে বাড়ন্ত ও প্রাপ্ত বয়স্ক প্রাণীর সংখ্যা নির্ধারিত ঘরে বসাতে হবে। ওজন স্কেল ও ফিতা উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে ওজন নির্ণয় করা যায়। প্রাণীর সংখ্যা বিবেচনায় ওজন দুইভাবে নেয়া যায়: প্রত্যেকটির আলাদাভাবে অথবা একটির সাপেক্ষে গড় ওজন। ওজন স্কেলে কেজিতে ওজন দিতে হবে কিন্তু ফিতায় বুকের মাপ ও দৈর্ঘ্য ইঞ্চিতে দিতে হবে। ওজন দেওয়ার পর বাড়ন্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে সরাসরি দানাদার খাদ্য ও ঘাস জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক প্রাণীর ক্ষেত্রে উৎপাদন অবস্থার তথ্য প্রদান সাপেক্ষে দানাদার ও ঘাস জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। দৈনিক খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি এর মাধ্যমে খামারের সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক কি পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে তার প্রাক্কলিত মূল্যসহ খামারিদের ধারণা দিতে পারে। ঘাস জাতীয় খাদ্য অপশনটি নির্বাচন করার ফলে বিভিন্ন উন্নত মানের ঘাস (যেমন- ভুট্টা, জাম্বু, জার্মান, ওট ও নেপিয়ার) প্রতিদিন কি পরিমাণ সরবরাহ করতে হবে, উক্ত পরিমাণ ঘাস (এক মাস) সরবরাহ করার জন্য কি পরিমাণ জমি চাষ করা প্রয়োজন, কি পরিমাণ বীজ কাটিং এর প্রয়োজন এবং কি পরিমাণ সারের প্রয়োজন তা সহজেই নির্ণয় করা যায়। বার্ষিক ঘাস উৎপাদন পরিকল্পনা অপশনের মাধ্যমে এক বছরে খামারে ঘাসের চাহিদা পূরণের জন্য কি পরিমাণ জমি চাষ করা প্রয়োজন এবং উক্ত জমিতে কখন কি ঘাস লাগানো দরকার তার দিক নির্দেশনা রয়েছে।

রেশন অ্যাপসটি ব্যবহারের সুবিধা

প্রাণীর উৎপাদন অবস্থা পরিবর্তনশীল। প্রাণীর পরিবর্তনশীল উৎপাদন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে উক্ত অ্যাপসটি প্রাণীর রেশন তৈরি করে। যেমন: প্রাণীর দুধ উৎপাদন অবস্থা পরিবর্তনশীল; ফলে, প্রাণী বিভিন্ন পরিমাণ দুধ উৎপাদন অবস্থায় বিভিন্ন ধরণের রেশনের প্রয়োজন হয়। অ্যাপসটি উৎপাদনের ভিন্নতা অনুসারে রেশন তৈরি করে খামারিদের লাভবান করবে।

বাসস্থান

বিজ্ঞান ভিত্তিক বাসস্থান অধিক লাভজনক গবাদি প্রাণী পালনের পূর্বশর্ত। এই অ্যাপসটি বাসস্থান এর জন্য জায়গা নির্বাচন এবং বাসস্থান তৈরির মডেল সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

ওজন

ওজন অপশনের মাধ্যমে গবাদি প্রাণীর বুকের মাপ ও দৈর্ঘ্যের মাপের মাধ্যমে ওজন নির্ণয় করা যায়।

ওজনের ব্যবহার

১। গবাদি প্রণীর চিকিৎসা প্রদানের জন্য ওজনের ওপর ভিত্তি করে ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। এই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে সহজে ওজন নির্ণয় করা যায়।

২। গবাদি প্রাণীর বিক্রি বা ক্রয়ের জন্য ওজন নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সহজে নির্ণয় করা যায়।

ওজন নির্ণয়ের সচিত্র বর্ণনা

একটি ফিতার সাহায্যে ইঞ্চিতে মাপতে হবে এবং শূণ্য স্থানে বসাতে হবে। বুকের বেড় মাপার পর দৈর্ঘ্য চিত্র অনুসারে মাপতে হবে এবং শূণ্য স্থানে বসিয়ে চাপুন অপশনের মাধ্যমে ওজন নির্ণয় করা যাবে।

টিকার এলার্ম

শুধু পুষ্টিকর খাবার দিলেই খামারে লাতবান হওয়া যায় না। খামারে রোগের প্রাদুর্ভাব কমানোর জন্য খামারে রোগ প্রবেশের আগে সঠিক সময়ে সঠিক টিকা প্রদান করা প্রয়োজন। রোগের প্রতিকার, রোগের চিকিৎসা থেকে উত্তম। কোন প্রাণী রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার জন্য প্রচুর ব্যয় হয়, তাছাড়া প্রাণীটি সুষ্থ্য হওয়ার পরে পূর্ব উৎপাদন অবস্থায় সহজে ফিরে আসতে পারে না। ফলে, খামারি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে টিকা প্রয়োগ করলে খামারে রোগের প্রাদুর্ভাব কমিয়ে খামারিরা অধিক লাভবান হতে পারে। টিকা প্রদানের পাশাপাশি কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগের জন্যও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি খামারিদের দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

ব্যবহার পদ্ধতি

টিকার এলার্ম অপশনটির উপরের দিকে চালু এবং বন্ধ অপশন রয়েছে। চালু অপশনটির মাধ্যমে টিকার এালার্মটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু করা যাবে। এই অপশনটি চালু থাকলে ক্ষুদ্র বার্তার মাধ্যমে বিনা খরচে খামারি জানতে পারবে তার গবাদি প্রাণীর জন্য কখন কি টিকা এবং কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে করতে হবে। তালিকার নিচে টিকা প্রদানের পদ্ধতি ও সতর্কতার বার্তা রয়েছে। খামারিরা সেটি অনুসরণ করে সঠিক পদ্ধতিতে টিকা প্রদান করতে পারবে।

বই

বিএলআরআই ফিড মাস্টার অ্যাপ্লিকেশনের বই অংশে খামারিদের প্রাণীপালন, উচ্চ ফলনশীল ঘাসের চাষ পদ্ধতি, প্রাণীখাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রাণীর সাধারণ রোগ ও প্রতিকার এবং বিএলআরআই এর প্রতিবছর উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার ব্যাবস্থা সংযোজন করা হয়েছে। নেপিয়ার, এন্ডোপোগন, স্প্লেনডিডা, রোজী, জাম্বু, গিনি, সিগনাল, জার্মান, দল, পারা, ভুট্টা, কাউপি, ওট এবং ট্রিটিক্যালিসহ অন্যান্য উচ্চ ফলনশীল ঘাসগুলোর সাধারণ পরিচিতি, চাষের সময়, জমির প্রকৃতি, চাষ পদ্ধতি, সার প্রয়োগ, সেচ, ঘাস কাটার সময়, কাটিং সংখ্যা এবং প্রতি কেজি কাচা ঘাসের পুষ্টিমান সম্পর্কে তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। গরু মোটাতাজাকরণের জন্য বিএলআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রাণীপালন পদ্ধতি অপশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সহজে জানতে পারবে।

প্রাণীর খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন- দেশীয় পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তি, বর্ধাকালে ভেজা খড় সংরক্ষণ প্রযুক্তি, ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক উৎপাদন প্রযুক্তি এবং ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র তৈরি পদ্ধতি সম্পর্কে অ্যাপ্লিকেশনটি খামারিদের মৌলিক ধারণা দিতে পারবে। এছাড়া গবাদি প্রাণীর সাধারণ জীবাণুঘটিত রোগ যেমন তড়কা, বাদলা, গলাফুলা, ধনুষ্টঙ্কর, গাভীর সংক্রামক গর্ভপাত, যক্ষা, ক্ষুরারোগ, নিউমোনিয়া, পা পঁচা; পরজীবি বা কৃমিজনিত রোগ যেমন কলিজা কৃমি, রুমেন কৃমি, গোল কৃমি; চামড়ার রোগ যেমন কাধে ঘা, উকুন, আঠালী ও মাইটের আক্রমণ; গাভীর রোগ যেমন ওলান প্রদাহ বা ম্যাস্টাইটিস, দুগ্ধ জবর, কিটোসিস, জরায়ুতে পুঁজ, পেট ফাঁপা; বাছুরের সমূহের সাধারণ তথ্য, প্রচলিত নাম, রোগের কারণ, রোগের লক্ষণ, রোগের চিকিৎসা এবং প্রতিকার সম্পর্কিত তথ্য খামারিরা সহজে পেতে পারবে। বিএলআরআই কর্তৃক আবিষ্কৃত নতুন প্রযুক্তিসমূহ অপশনের মাধ্যমে খামারিরা প্রতি বছর বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারবে। এতে গবেষণাগারে উদ্ভাবিত তথ্য সহজে খামারি বা সম্প্রসারণ কর্মী জানতে পারবে এবং গবেষণায় উদ্ভাবিত দিক নির্দেশনার মাধ্যমে গবাদি প্রাণী পালন করে অধিক লাভবান হবে। আগে তথ্যের জন্য খামারিদের বিএলআরআই এসে সঠিক পদ্ধতিতে আবেদনের মাধ্যমে তথ্য সেবা পেতে হতো যা কিছুটা সময় এবং কষ্ট সাপেক্ষ ছিল। মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি বিএলআরআই এর তথ্য ও সেবা সহজে খামারিদের দোর গোড়ায় পৌছে দিতে পারবে।

জরুরি যোগাযোগ

এই অপশনটি খামারি ও বিজ্ঞানীদের মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ করবে। এই অপশনটির মাধ্যমে বিএলআরআই এ কর্মরত বিজ্ঞানীদের মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর সহজেই খামারিরা পেয়ে যাবে এবং খামারের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানীদের সাথে আলোচনা করতে পারবেন এবং খামারে উদ্ভুত সমস্যার তাৎক্ষনিক সমাধান করতে পারবে।

উৎস্য: এ মোবাইল অ্যাপসটি বিএলআরআই এর ওয়েবসাইট (www.blri.gov.bd) এবং গুগুল প্লে-স্টোর এ BLRI FeedMaster নামে পাওয়া যাবে।

উপসংহার

দেশে দুধ ও মাংসের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে এবং সরকারের শ্বেতবিপ্লব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এই অ্যাপ্লিকেশনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। এটি একটি ডিজিটাল পরামর্শক হিসেবে কাজ করতে সক্ষম যা খামারি এবং সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের গবাদি প্রাণী পালনে বিভিন্ন উদ্ভুত সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদি প্রাণী পালন খামারিদের দোর গোড়ায় পৌছে দিতে পারে। এই অ্যাপ্লিকেশনের উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে এবং খামারি পর্যায়ে এই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহারের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশে স্মার্ট-ফোনের ব্যাপক বিস্তার এই অ্যাপ্লিকেশনটিকে খামারিদের কাছে অধিক জনপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হচ্ছে। মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহারজনিত কোন সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবক পরিচিতি অপশনে প্রদত্ত উদ্ভাবকদের স্বয়ংক্রিয় মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা যাবে।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

মোঃ আহসানুল কবির, মোঃ ফয়জুল হোসাইন মিরাজ, ড. টি এন নাহার এবং ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন

রক্তের নমুনা থেকে ডিএনএ নিষ্কাশন

ভূমিকা

জৈব প্রযুক্তি বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে গতিশীল, বর্ধনশীল ও পরিবর্তনশীল বিষয়। বর্তমান সময়ে জৈব প্রযুক্তি প্রাণীসম্পদ উন্নয়নে তথা জীববিজ্ঞানের সর্ব বিষয়ে বিপ্লব ঘটিয়েছে। জীন বংশগতির ধারক ও বাহক। সাধারণভাবে জীন বা (ডিএনএ) অণু বংশ পরম্পরায় অপরিবর্তিত থাকে। জীবকোষের ক্রোমজোমে অবস্থিত কোন নির্দিষ্ট জীন অথবা জীন সমষ্টির জেনেটিক পদার্থের পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, পুনর্বিন্যাসকরণ, মেরামতকরণ, সংশ্লেষকরণ, ত্রুটিসমূহ দূরীকরণ ইত্যাদিকে জীন প্রকৌশল বা জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। জীনগুলো ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড বা ডিএনএ দ্বারা গঠিত। জীন প্রকৌশল বা জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে কোন বিশেষ জীনকে ক্রোমজোমের ডিএনএ অণু থেকে পৃথক করে উক্ত পৃথকীকৃত জীনকে কোন জীবের কোষে প্রবেশ করিয়ে উক্ত জীবটির বৈশিষ্ট্যের বংশগতিতে পরিবর্তন সাধন করা যায়, যা মূলত জৈব-প্রযুক্তিরই ফসল।

উদ্দেশ্য

ডিএনএ নিষ্কাশনের মাধ্যমে জাতের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যায়। এ ছাড়া প্রাণীর এ্যালিল ফিকুয়েন্সি, কৌলিক ভেদ, কৌলিক দূরত্ব, বংশগতির ভেদ নির্ণয় করা যায়। ডিএনএ নিষ্কাশনের মাধ্যমে প্রাণীর ডিজিস ডায়াগনোসিস করা যায়।

ডিএনএ নিষ্কাশন

জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে ডিএনএ নিষ্কাশন করা হয়। এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে ডিএনএ নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে। ডিএনএ নিষ্কাশন সাধারণত প্রাণীর রক্ত, টিস্যু, পশম, পালক, লিভার ইত্যাদি থেকে করা হয়।

ডিএনএ নিষ্কাশনের পদ্ধতি

ডিএনএ নিষ্কাশনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

যেমন:

(ক) হাই সল্ট পদ্ধতি
(খ) স্ট্যান্ডার্ড স্যালাইন সাইট্রেট বাফার বা এসএসসি পদ্ধতি
(গ) ফেনল ক্লোরোফর্ম নিষ্কাশনের পদ্ধতি।

স্ট্যান্ডার্ড স্যালাইন সাইট্রেট বাফার বা এসএসসি পদ্ধতি

বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরিতে স্ট্যান্ডার্ড স্যালাইন সাইট্রেট বাফার বা এসএসসি পদ্ধতিতে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে ডিএনএ নিষ্কাশন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে (Roe-et al) -১৯৯৬ এর পদ্ধতি অনুসরণ এবং মডিফিকেশন করা হয়েছে। রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে ডিএনএ নিষ্কাশনের পদ্ধতি নিচে আলোচনা করা হলো।

রক্তের নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ডিএনএ নিষ্কাশনের জন্য রক্তের নমুনা সংগ্রহ একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জাতের প্রতিটি প্রাণী থেকে ৫ মিলিলিটার রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। রুমিনেন্ট প্রাণীর জুগলার ভেন থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং তা বায়ুরোধি টিউবের মধ্যে রাখা হয় যাতে বাইরের কোন দূষিত পদার্থ দ্বারা সংক্রামিত হতে না পারে। এক্ষেত্রে ডাই সোডিয়াম ইথিলিন ডাই এ্যামাইন টেট্রা এ্যাসিটেট্র (ইডিটিএ) টিউব ব্যবহার করা হয় যাতে রক্ত জমাট বেঁধে না যায়। সংগ্রহকৃত রক্তের নমুনা সাধারণত ৪° সে. রেফ্রিজারেটরের মধ্যে রাখা হয়, তবে দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষণ করা হয় - ২০° সে. তাপমাত্রায়।

চিত্র ১: বিভিন্ন দ্রবণ

রক্তের নমুনা থেকে ডিএনএ নিষ্কাশন

চিত্র ১: রক্তের নমুনা

রক্তের জন্য সেন্টিফিউজ টিউবের মধ্যে প্রতিটি নমুনা থেকে ৪০ মাইক্রোলিটার রক্তের নমুনার মধ্যে ৮০০ এবং ১০০০ মাইক্রোলিটার স্ট্যান্ডার্ড স্যালাইন সাইট্রেট বাফার বা এসএসসি বাফার মিশিয়ে ১৩,২০০ রোটেশন পার মিনিট (আরপিএম) এ ৫ মিনিট সেন্টিফিউজ করা হয় এবং উপরের অংশ ফেলে দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। পরে ৩৭৫ মাইক্রোলিটার ০.২ ঘনমাত্রার সোডিয়াম এ্যাসিটেট দ্রবণ যোগ করা হয়। মিশ্রণের মধ্যে ১০% সোডিয়াম ডোডো সালফেট (এসডিএস) এবং ৫ মাইক্রোলিটার প্রোটিনেজ কে যোগ করে মিশ্রিত করা হয় এবং ৫৫° সে. তাপমাত্রায় এক ঘন্টা ইনকুবেট করা হয়, যার ফলে ডিএনএ ছাড়া অন্যান্য উপাদানগুলো ধ্বংস করে দেয়। ইনকুবেশনের পর ২৫ মাইক্রোলিটার ফেনল ক্লোরফর্ম আইসোএ্যামাইল অ্যালকোহলের (পিসিআই) দ্রবণ যোগ করা হয় এবং মিশ্রিত করে ১৩,২০০ রোটেশন পার মিনিট (আরপিএম) এ ৫ মিনিট সেন্টিফিউজ করা হয়। প্রতিটি নমুনা থেকে উপরের তরল অংশ খুব সতর্কতার সাথে নতুন সেন্টিফিউজ টিউবের মধ্যে তুলে নেওয়া হয় যাতে অন্য কোন মিশ্রণ না থাকে। অতপর একশত ভাগ (১০০%) ঠাণ্ডা বরফকৃত ১০০০ মাইক্রোলিটার ইথাইল অ্যালকোহল যোগ করা হয় এবং এই ধাপে প্রত্যক্ষ করা যায় DNA তন্তু। অতপর মিশ্রিত করে ১৩,২০০ রোটেশন পার মিনিট (আরপিএম) এ ৫ মিনিট সেন্টিফিউজ করা হয় এবং উপরের তরল অংশ খুব সতর্কতার সাথে ফেলে দেওয়া হয় যাতে ডিএনএ ওয়াশ হয়ে না যায়। এরপর শতকরা সত্তরভাগ (৭০%) ঠাণ্ডা বরফকৃত ১০০০ মাইক্রোলিটার ইথাইল অ্যালকোহল এবং ২০ মাইক্রোলিটার ২ ঘনমাত্রার সোডিয়াম এ্যাসিটেট দ্রবণ যোগ করে মিশ্রিত করা হয় এবং ১৩,২০০ রোটেশন পার মিনিট (আরপিএম) এ ৫ মিনিট সেন্টিফিউজ করা হয়। এক্ষেত্রে ডিএনএ পরিষ্কার করা হয় এবং উপরের তরল অংশ খুব সতর্কতার সাথে ফেলে দেওয়া হয় যাতে ডিএনএ ওয়াশ হয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। অ্যালকোহলের গন্ধ দূর হলো কিনা সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে এবং ডিএনএ কনসেনট্রেটরের মাধ্যমে ডিএনএ পিলেট শুকাতে হবে। এরপর দশ ভাগ ট্রিস ও এক ভাগ ডাই সোডিয়াম ইথিলিন ডাই এ্যামাইন টেট্রা এ্যাসিটেড (ইডিটিএ) (১০:১) এর দ্রবণ ১৮০ মাইক্রোলিটার যোগ করা হয় এবং ৫৫° সে. ওভার নাইট ইনকুবেটরের মধ্যে ইনকুবেট করা হয়।

নিষ্কাশিত ডিএনএ নমুনা সংরক্ষণ

ইনকুবেশনের পর পিপেটিং করে নিষ্কাশিত ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত নমুনাতে কি পরিমাণ ডিএনএ আছে তা স্পেক্ট্রোফটোমিটার দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়। ইলেক্ট্রোফরেসিস এর মাধ্যমে নমুনাতে ডিএনএ আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়। এবং তা রেফ্রিজারেটরের মধ্যে দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হয় -২০° সে. তাপমাত্রায়।

চিত্র ৩: নমুনা

চিত্র ৪: পিপেটিং

উপসংহার

বাংলাদেশের বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে গবাদিপ্রাণীর জাতের বিশুদ্ধতা, প্রাণীর এ্যালিলিক ফ্রিকুয়েন্সি (Allelic Frequency), কৌলিক ভেদ (Genetic Variation), কৌলিক দূরত্ব (Genetics Distances), বংশগতির ভেদ (Hereditary Variation) এবং ডিএনএ নিষ্কাশনের মাধ্যমে প্রাণীর রোগ নিরূপণের লক্ষ্যে উদ্ভাবিত কৌশল অনুসরণ করে স্বল্প খরচে সহজভাবে ডিএন নিষ্কাশন করা সম্ভব।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক

ড. টি এন নাহার, ড. কামরুন নাহার মনিরা, মোছাঃ ফারহানা আফরোজ এবং মোঃ মজনু সরকার

গবেষণাগারে ভ্রূণ উৎপাদন প্রযুক্তি

ভূমিকা

একটি গাভী স্বাভাবিক প্রজনন প্রক্রিয়ায় বছরে একটি করে বাচ্চা দেয়। তবে জৈব-প্রযুক্তি (যেমন: MOET, IVP) ব্যবহার করে একটি গাভী থেকে অনেকগুলো বাচ্চা উৎপাদন করা সম্ভব। গবেষণাগারে ভ্রূণ উৎপাদন এবং গাভীর জরায়ুতে তা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীল জাতের গরুর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে দুধ ও মাংসের যোগান দ্রুত বাড়ানো সম্ভব। উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি অধিক উৎপাদনশীল গাভী থেকে বছরে নুন্যতম ১৮-২০ টি পর্যন্ত বাচ্চা উৎপাদন করা সম্ভব। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে তাদের নিজ নিজ দেশে গো-সম্পদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে দেশীয় গো-সম্পদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ড. গৌতম কুমার দেব-এর তত্ত্বাবধানে বায়োটেকনোলজি বিভাগের এক দল বিজ্ঞানি বিগত ২০১১ সাল থেকে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কসাইখানা থেকে গরুর ডিম্বাশয় সংগ্রহ পূর্বক গবেষণাগারে ব্লাস্টোসিস উৎপাদন এবং উৎপাদিত ব্লাস্টোসিস্ট ৩টি রেড চিটাগাং এবং ২টি বিসিবি-১ জাতের গাভীর জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা হয়। উল্লেখিত ৫টি গাভীর মধ্যে একটি রেড় চিটাগাং জাতের গাভী গর্ভধারণ করে এবং ২৭৭ দিন গর্ভধারণের পর বাংলাদেশে বর্তমানে ২টি জমজ বকনা বাছুর জন্ম দেয়।

IVP পদ্ধতি কি?

বংশগতভাবে অধিক উৎপাদনশীল দাতা গাভী/বকনার ডিম্বাশয় থেকে অপরিপক্ক/বাড়ন্ত ডিম্বাণু সংগ্রহ পূর্বক গবেষণাগারে পরিপক্ককরণ (in vitro maturation), নিষিক্তকরণ (in vitro fertilization) এবং কালচার (in vitro culture) করে ব্লাস্টোসিস (Blastocyst) পর্যায় পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা হয়। পরবর্তীতে ১-২টি ভালমানের ব্লাস্টোসিস কম উৎপাদনশীল নিয়মিত ঋতু চক্রে আসা ধাত্রী গাভীর জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা হয়। গাভী গর্ভধারণ করলে প্রতিস্থাপিত ভ্রূণ জরায়ুতে প্রাকৃতিক নিয়মে বড় হতে থাকে এবং স্বাভাবিক গর্ভধারণকাল অতিক্রম করার পর সুস্থ সবল বাচ্চা জন্ম নেয়।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- বংশগতভাবে অধিক উৎপাদনশীল দাতা গাভী/বকনার ডিম্বাশয় থেকে অপরিপক্ক/বাড়ন্ত ডিম্বাণু সংগ্রহ পূর্বক গবেষণাগারে অনেকগুলো ভ্রূণ (ব্লাস্টোসিস) উৎপাদন করা যায়
- গবেষণাগারে উৎপাদিত ভ্রূণ ধাত্রী গাভীর জরায়ুতে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি অধিক উৎপাদনক্ষম গাভী থেকে অধিক সংখ্যক বাছুর উৎপাদন করা যায়
- প্রচলিত নির্বাচিত বাছাই প্রজনন পদ্ধতির সাথে ব্যবহার করে গরুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা যায়
- উৎপাদিত ভ্রূণগুলো সরাসরি অথবা সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে ব্যবহার করা যায়
- গবেষণাগারে সংকরজাতের গরুর ভ্রূণ উৎপাদন সম্ভব এবং
- বিলুপ্ত প্রায় গরুর জাত সংরক্ষণ কাজে বিশেষ উপযোগী।

প্রযুক্তির উপযোগীতা

বড় আকারের বাণিজ্যিক গরুর খামারগুলোতে প্রযুক্তিটি ব্যবহার উপযোগী।

IVP পদ্ধতিতে বাচ্চা উৎপাদনের ধাপসমূহ

- ডিম্বাণু সংগ্রহ এবং পূর্ণতাপ্রাপ্তকরণ (oocyte aspiration and in vitro maturation)
- ডিম্বাণু নিষিক্তকরণ (in vitro fertilization)
- ইন-ভিট্রো কালচার (in vitro culture; IVC) উৎপাদিত ব্লাস্টোসিস্ট ধাত্রী গাভীর জরায়ুতে প্রতিস্থাপন
- গর্ভধারন নিশ্চিতকরণ (Pregnancy Diagnosis) এবং
- সুস্থ সবল বাচ্চা জন্মদান।

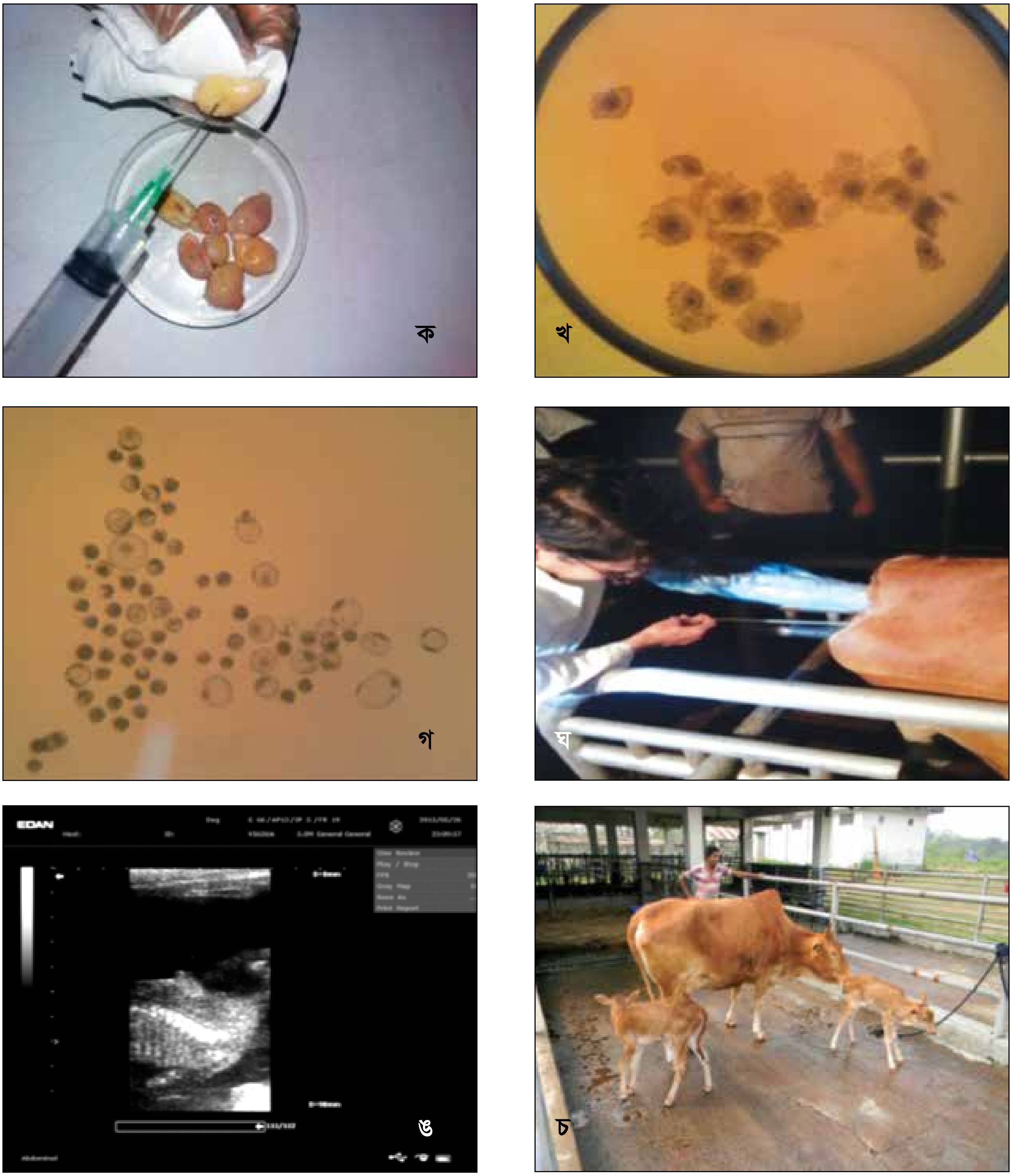

ছবি: ১ IVP পদ্ধতিতে বাচ্চা উৎপাদনের ধাপসমূহ

ক) কসাইখানা থেকে সংগ্রহীত ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু সংগ্রহ, খ) ডিম্বাণু পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং নিষিক্তকরণ, গ) উৎপাদিত ব্লাস্টোসিস্ট, ঘ) উৎপাদিত ব্লাস্টোসিস্ট ধাত্রী গাভীর জরায়ুতে প্রতিস্থাপন, ঙ) গর্ভধারণ নিশ্চিতকরণ (Pregnancy Diagnosis) এবং চ) সুস্থ সবল বাচ্চা জন্মদান

বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির সাথে IVP পদ্ধতির তুলনামুলক তথ্য

বর্তমান ব্যবহৃত প্রজনন পদ্ধতি	টেষ্টটিউব পদ্ধতিতে বাচ্চা উৎপাদন পদ্ধতি
১। সাধারণত একটি গাভী থেকে বছরে একটি বাচ্চা পাওয়া যায়।	১। অধিক উৎপাদনশীল দাতা গাভী থেকে ডিম্বাণু সংগ্রহপূর্বক গবেষণাগারে ভ্রূণ উৎপাদন করে তা ধাত্রী গাভীতে স্থানান্তরের মাধ্যমে বছরে ২০-২৫টি বাচ্চা উৎপাদন সম্ভব।
২। বর্তমান প্রজনন পদ্ধতিতে অধিক উৎপাদশীল ষাঁড়ের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন করে গরুর জাত উন্নয়ন করা হয়।	২। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ষাঁড়ের পাশাপাশি অধিক উৎপাদনশীল গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে গরুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব।
৩। এই পদ্ধতিতে গরুর জাত উন্নয়নে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়।	৩। এই প্রযুক্তির সফল প্রয়োগে স্বল্প সময়ে অধিক সংখ্যক প্রজেনী পাওয়া যায় বলে জাত উন্নয়নে কম সময় লাগে।
৪। এই প্রযুক্তিটি ছোট বা বড় যে কোন ধরনের খামারে ব্যবহার করা যায়।	৪। এই প্রযুক্তিটি গবেষণা কাজে বা বড় আকারের বাণিজ্যিক খামারে প্রয়োগ করা যায়।

প্রযুক্তি হতে প্রাপ্তি

প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে বংশগতভাবে অধিক উৎপাদনক্ষম গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেশে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

বিএলআরআই এই প্রযুক্তিটি পরীক্ষাগারে সফলভাবে ব্যবহার করে প্রথম বারের মত দেশে টেস্ট টিউব বাছুর উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। ধাত্রী গাভী ২৭৭ দিন গর্ভধারণের পর ২টি জমজ বকনা বাছুর জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে। বাছুর ২টিকে ফাল্গুনী এবং চৈতালী নামকরণ করা হয়েছে। ফাল্গুনী এবং চৈতালীর জন্মকালীন ওজন হচ্ছে যথাক্রমে ১২.৮৭ এবং ১৮.৫৯ কেজি। বকনা বাছুরদ্বয় স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে। ধাত্রী গাভী ও বকনা বাছুরদ্বয় স্বাভাবিক গর্ভধারনের মাধ্যমে পুনরায় বাচ্চা প্রদান করেছে।

প্রযুক্তির আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব

এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ষাঁড়ের পাশাপাশি অধিক উৎপাদনশীল গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে গরুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব যা দেশের দুধ ও মাংসের যোগান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ধাত্রী গাভী ও বকনা বাছুরদ্বয়ের স্বাভাবিক গর্ভধারন এটাই প্রমান করে যে গাভী ও বাচ্চার স্বাভাবিক বৃদিধ ও প্রজননের উপর এই প্রযুক্তির কোন বিরূপ প্রভাব নেই।

উপসংহার

এই পদ্ধতিতে একটি গাভী থেকে অধিক সংখ্যক বাচ্চা উৎপাদন করা যায় বিধায় প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতির সাথে ব্যবহার করে অধিক উৎপাদনশীল গরুর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদে দেশের দুধ ও মাংসের যোগান বাড়ানো সম্ভব।

প্রযুক্তি উদ্ভাবক

ড. টি এন নাহার, ড. গৌতম কুমার দেব, ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, মোছা: ফারহানা আফরোজ, মোঃ আহসানুল কবির, মোঃ ফয়জুল হোসেন মিরাজ এবং ড. মোঃ সাহেব আলী

মিনামিক্স-গবাদিপ্রাণির জন্য প্রিমিক্সফিড

পূর্বকথা

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিক ধারায় পরিবর্তিত হচ্ছে। সূচিত বাণিজ্যিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রসারের সাথে সাথে দেশী এবং বিদেশী নানা প্রকার প্রিমিক্সফিড বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। ফিবছরই নতুন নামের প্রিমিক্সফিডের ব্যবহার বাড়ছে। ফিডপ্রিমিক্স বা প্রিমিক্সফিড বলতে একাধিক পুষ্টি উপাদান সম্বলিত খাদ্যের পূর্বমিশ্রণ বুঝায়, যা মূল খাদ্যের সহিত মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। প্রাণীর উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি, রোগদমন, জৈবিক বিপাকীয় প্রক্রিয়া দক্ষ করা, রশদের গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখা, খাদ্য সংরক্ষণ, রশদে ট্রেস উপাদানগুলোর উপস্থিতি নিশ্চিত করা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে প্রিমিক্সফিড ব্যবহার প্রয়োজন হয়। খনিজ, ভিটামিন, প্রোটিন, এ্যামাইনো বা ফ্যাটি এসিড, প্রোবায়োটিক, প্রিবায়োটিক বা এ্যান্টিবায়োটিক, এ্যানজাইম, প্রিজারভেটিভ ইত্যাদি এক বা একাধিক প্রিমিক্সফিড বিভিন্ন প্রকার প্রাণী উৎপাদনে ব্যবহার হয়।

বাংলাদেশে যত প্রকার প্রিমিক্সফিড ব্যবহার হয় তন্মধ্যে ভিটামিন ও মিনারেল প্রিমিক্সের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। সারা দেশেই এগুলোর বাজার ও ব্যবহার রয়েছে, এবং আনুমানিক ১৬টি বড় কোম্পানি বিভিন্ন নামে ভিটামিন এন্ড মিনারেল প্রিমিক্স তৈরি অথবা বাজারজাত করছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে Nutrition Premix Manufacturing Association of Bogra, Bangladesh (Anuprema) শিরোনামে একটি সমিতি তাদের নামে পোল্ট্রি, ডেইরি ও গরুমোটাতাজাকরনের জন্য ভিটামিন এন্ড মিনারেল প্রিমিক্স তৈরি ও বাজারজাত করছে। এছাড়াও, ভেন্যুপ্রেমা নামে আরো একটি সমিতি একই ধরনের ব্যবসার সহিত জড়িত। অবশ্য এর মধ্যে কেউ কেউ ইলেক্ট্রোলাইট জাতীয় প্রডাক্ট বাজারজাত করে থাকেন। দেশে উৎপাদিত অথবা আমদানি মিলিয়ে বছরে আনুমানিক ১০০০.০ টন ভিটামিন এন্ড মিনারেল প্রিমিক্স খামারিগণ ব্যবহার করছেন। এসমস্ত প্রিমিক্সফিডের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আমদানি, রপ্তানি, বিপণন, বিতরণ এবং আনুসাঙ্গিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে সরকার গত ২৮ জানুয়ারি, ২০১০ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিখাদ্য আইন পাশ করেছেন। বাজারে বিদ্যমান এবং প্রতিবছর অনুপ্রবেশকারী নতুন প্রিমিক্সফিডের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ হওয়া প্রয়োজন।

মিনারেল এন্ড ভিটামিন প্রিমিক্সফিডের প্রয়োজনীয়তা

বিএলআরআই এর এক গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রায় প্রতিটি নামকরা কোম্পানী রোমান্থকারী প্রাণীর জন্য প্রিমিক্সফিড হিসেবে মিনারেল এর সহিত ভিটামিনগুলো যুক্ত করে ভিটামিন এন্ড মিনারেল প্রিমিক্স হিসেবে বাজারজাত করছেন, এবং খামারিগণ সেগুলো অর্থ ব্যয় করে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করছেন। প্রিমিক্সফিড হিসেবে ভিটামিনগুলো কেন ব্যবহার করে খামারিদেরকে প্রতারণা করা হচ্ছে তার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই। অসুস্থ প্রাণীর চিকিৎসায় ভিটামিনগুলো ইনজেকশন হিসেবে ব্যবহার হতে পারে, এবং সেটা বিজ্ঞান সম্মত। কিন্তু, রোমান্থনকারী প্রাণীকে সরাসরি ভিটামিন খাইয়ে তার উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে কোনরুপ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আমাদের জানা নেই। বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছাড়া প্রিমিক্স ভিটামিন খাদ্য হিসেবে ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নয়, এর ফলে ব্যবহারকারী খামারিগণ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন।

প্রকৃত বিষয় হচ্ছে রোমান্থকারী প্রাণীর জন্য ভিটামিন এ, ডি, ই, কে এবং বি-কমপ্লেক্স প্রয়োজন আছে। কিন্তু, এর কোনগুলোই তৈরিকৃত অবস্থায় খাদ্যের মিশ্রণে সরবরাহের প্রয়োজন নেই। ভিটামিন এ, ই, কে ও বি-কমপ্লেক্স প্রাণীর ভুঁড়ির মধ্যে প্রয়োজনমতে বিশ্লেষণের জন্য বিদ্যমান রুমেনের জীবাণুগুলোই যথেষ্ট। প্রয়োজন শুধু সঠিক মাত্রায় ও পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করা। বরং, তৈরিকৃত প্রিমিক্স ভিটামিন খাওয়ালে জীবাণুগুলো খাদ্য হিসেবে সেগুলো হজম করে ফেলে; প্রাণীর দেহে সেগুলো ভিটামিন হিসেবে ব্যবহার হওয়ার সুযোগ মোটেই থাকেনা। অন্যদিকে, ভিটামিন-ডি প্রাণীর দেহে তৈরি হয়। অতএব, রোমান্থকারী প্রাণীকে ভিটামিন খাওয়ানো অর্থের অপচয় বৈ আর কিছু নয়। বরং, প্রতিদিন মাথাপিছু ন্যূনতম ২-৩ কিলো সবুজ ঘাস খাওয়ালে প্রয়োজনীয় সকল ভিটামিনগুলো প্রাণীর দেহে তৈরি হতে পারে। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন হতে হবে; সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের গবেষণার ফলাফল ভিত্তিক উৎপাদন সহায়ক প্রযুক্তি ব্যবহারে আরো এগিয়ে আসতে হবে।

মিনামিক্সের গঠন, খাওয়ানোর পদ্ধতি, উপকারিতা এবং বাজারজাতকরণ

উল্লেখিত বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো এবং বাণিজ্যিক প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রিমিক্সফিডের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে মিনামিক্স খণিজ মিশ্রণটি বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং প্রাথমিকভাবে ব্র্যাক কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ব্র্যাক বর্তমানে প্রতিমাসে গড়ে ১২৫.০ টন মিনামিক্স দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে বাজারজাত করছে। মিনামিক্স ব্যবহারের ফলে রোমন্থকারী প্রাণীর (গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া) যে উপকারগুলো হয় তা নিম্নে দেয়া হল।

মিনামিক্সে যে সকল খণিজ বিদ্যমান তা নিম্নে দেয়া হল।

উপাদানের নাম	গঠন
ক্যালসিয়াম	১৩.৪%
সোডিয়াম	২৫%
ক্লোরাইড	৩৯%
আয়োডিন	৩৮.৪ পিপিএম

প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে মিনামিক্সের উপকারিতা

ক) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই) কর্তৃক প্রাণিসম্পদের জন্য অনুমোদিত ফিডিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণে মিনামিক্স প্রিমিক্স প্রযুক্তিটি উদ্ভাবিত হয়েছে
খ) প্রাণীর প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম ও আয়োডিনের উৎস হিসেবে কাজ করে
গ) দুধালো গাভীর দুধজ্বর প্রতিরোধক
ঘ) রক্তে ইলেক্ট্রোলাইট সঞ্চালন সহায়ক
ঙ) হাড় গঠনে সহায়তা করে ও মজবুত রাখে
চ) গ্রোয়িং প্রাণীর অস্টিওম্যালাসিয়া রোগ প্রতিরোধক
ছ) শক্তি, ভিটামিন এবং অন্যান্য খণিজের বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে
জ) খাদ্যে বিদ্যমান ফসফরাস প্রাণীর শরীরে ব্যবহারে সহায়ক
ঝ) বাজারের অন্যান্য খনিজ প্রিমিক্সের তুলনায় মূল্য সাশ্রয়ী

মিনামিক্স খাওয়ানোর পদ্ধতি

মিনামিক্স দানাদার খাদ্যের সহিত মিশিয়ে খাওয়াতে হবে, এবং কখনও পানির সহিত মিশিয়ে খাওয়ানো উচিত না। প্রাণীর অন্যান্য খাদ্যের সহিত প্রতিদিনই কিছু পরিমাণ (ন্যূনতম মাথাপিছু ২-৩ কিলো) সবুজ ঘাস দিতে হবে।

প্রাণী	মাথাপিছু সর্বোচ্চ দৈনিক পরিমাণ	খাদ্যে প্রয়োগ পদ্ধতি
(ক) গরু ও মহিষ		
গ্রোয়িং প্রাণী	২০০ গ্রাম	কন্সেন্ট্রেটের ৪-৫% হারে মিশিয়ে
গরুমোটাতাজাকরণ	১৫০ গ্রাম	কন্সেন্ট্রেটের ৩-৫% হারে মিশিয়ে
দুগ্ধবতী গাভী (≤৩০০ কিলো)	২০০ গ্রাম	কন্সেন্ট্রেটের ৫-৬% হারে মিশিয়ে
দুগ্ধবতী গাভী (≥৩০১ কিলো)	২৫০ গ্রাম	কন্সেন্ট্রেটের ৪-৫% হারে মিশিয়ে
শুষ্ক গর্ভবতী গাভী (≤৩০০ কিলো)	১৫০ গ্রাম	কন্সেন্ট্রেটের ৩-৫% হারে মিশিয়ে
শুষ্ক গর্ভবতী গাভী (≥৩০১ কিলো)	২০০ গ্রাম	কন্সেন্ট্রেটের ৩-৫% হারে মিশিয়ে
ছাগল ও ভেড়া	১০- ১৫ গ্রাম	কন্সেন্ট্রেটের ৩-৫% হারে মিশিয়ে

মিনামিক্স তৈরীর ক্ষেত্রে দেশের কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়েছে, এবং প্রাণীকে যে সমস্ত খাদ্য খাওয়ানো হয় সেগুলো হতে প্রাপ্ত খনিজ বাদে প্রয়োজনীয় আন্যান্য খনিজ পদার্থগুলোর সমন্বয়ে মিনামিক্স তৈরী করা হয়েছে। মিনামিক্স খাওয়ালে সাধারণ সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব বলে গবেষণায় প্রমাণিত। তবে, অধিক উৎপাদন-শীল গাভী বা ষাঁড়ের জন্য আরো প্রয়োজনীয় খনিজগুলো সংমিশ্রণ প্রয়োজন রয়েছে। ভবিষ্যতে প্রিমিক্সফিড সূত্রে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

মিনামিক্স ব্যবহারে খামারিগণ উপকৃত হউক, সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারে খামারিদেরকে উৎসাহিত করা হউক এবং দেশী প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্যোক্তাগণ এগিয়ে আসুক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক: ড. খান শহীদুল হক

বিএলআরআই এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে প্রাণিসম্পদের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ এখন একটি সম্ভাবনাময় ও লাভজনক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দিতে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, পরিবেশ ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে চাহিদার নিরিখে যুগোপযোগী গবেষণা করার নিমিত্তে বিএলআরআই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের প্রাণিসম্পদের বিশেষ করে গবাদি প্রাণীর সংরক্ষণ, উৎপাদন, সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, গবাদি প্রাণী ও পাখির রোগবালাই দমন, প্রাণিস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, ভ্যাকসিন সিড উদ্ভাবন, গবাদি প্রাণীর খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে এবং উৎকর্ষতার গবেষণার জন্য ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৮ নম্বর অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঢাকার অদূরে সাভার উপজেলায় ৪২৬ একর জমির উপর প্রাণিসম্পদ-এর একটি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৬ সাল থেকে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। সময়ের চাহিদা অনুসারে এবং বিএলআরআই-এর জন্য পূর্ববর্তী আইনগুলি রহিত করে বাংলাদেশ সরকার "বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৮" আইনটি প্রবর্তন করেন। এ আইনটিতে বিএলআরআই-এর পরিচালনসহ যাবতীয় কার্যক্রম এবং করণীয় বিশদভাবে নির্দেশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিএলআরআই-এর সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত রয়েছে। ১৪ সদস্য বিশিষ্ট্য একটি পরিচালনা বোর্ড ইনস্টিটিউটের পরিচালনা পর্ষদ হিসেবে কাজ করে। পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি হলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় সহ-সভাপতি এবং বিএলআরআই মহাপরিচালক হলেন এই বোর্ডের মুখ্য নির্বাহী। বর্তমানে বিএলআরআইতে মোট ১২৭ জন বিজ্ঞানী, ১২ জন কর্মকর্তা, ৯০ জন কর্মচারী, ৪৯ জন আউট সোর্সিং কর্মচারী এবং ৩২ জন মাস্টার রোল কর্মচারী কর্মরত আছেন। বিএলআরআই-এর গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর এবং পরিচালক (গবেষণা) এর দপ্তরসহ বিএলআরআই সর্বমোট ১২ টি বিভাগ এবং ৩ টি রিসার্চ সেন্টার নিয়ে গঠিত। এছাড়াও গবেষণার মানদন্ডের উৎকর্ষতায় এ ইনস্টিটিউট-এ ন্যাশনাল রেফারেন্স ল্যাবরেটরী ফর এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (NRL-AI) সার্ক রিজিওনাল লিডিং ডায়াগনোস্টিক ল্যাব ফর পিপিআর (RLDL-PPR), অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স রেফারেন্স ল্যাবরেটরি (গবেষণা) ল্যাবরেটরি তিনটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বিএলআরআই অদ্যাবধি ৯৩ টি প্রযুক্তি ও প্যাকেজ (৭৪ টি প্রযুক্তি ও ১৯ টি প্যাকেজ) উদ্ভাবন করেছে। তন্মধ্যে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি, পিপিআর ভ্যাকসিন, গোট পক্স ভ্যাকসিন, বিএলআরআই লেয়ার স্ট্রেইন-১ (শুভ্রা), উচ্চ ফলনশীল ঘাসের জাত উদ্ভাবন (নেপিয়ার ১,২, ৩ ও ৪ এবং লবণসহিষ্ণু জাতের ঘাস), দেশীয় জাতের রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি), কমপ্লিট প্যালেট ফিড বহুল পরিচিত। বিএলআরআই-এর প্রধান কার্যালয় ছাড়াও দেশব্যাপী সুষ্ঠুভাবে গবেষণা ও জনগণকে সেবা-সহায়তার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫ টি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রাণী ও পোল্ট্রি গবেষণায় ৫টি প্রধান ক্ষেত্র যথা, ক) এনিমেল এন্ড পোল্ট্রি জেনেটিক্স অ্যান্ড ব্রিডিং, খ) ফিডস ফডার অ্যান্ড নিউট্রিশন, গ) বায়োটেকনোলজি, এনভাইরোনমেন্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজেলিয়েন্স, ঘ) এনিমেল এন্ড পোল্ট্রি ডিজিজেজ এন্ড হেল্থ এবং ঙ) সোসিও-ইকোনমিক অ্যান্ড ফার্মিং সিস্টেমকে বিবেচনায় নিয়ে বিএলআরআই-এর গবেষণা কার্যক্রমগুলি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করে থাকে। নিরাপদ প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গবেষণার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অভিলক্ষ্য নিয়ে এসডিজি-২০৩০, ভিশন-২০৪১, ডেল্টাপ্লান-২১০০ বাস্তবায়নে গবেষণা করতে বিএলআরআই অঙ্গীকারাবদ্ধ।